মুখবন্ধ

কাব্যজগৎ উপমানের জগৎ। রূপের শোভা এই আদর্শলোকে, উপমালোকে। বাঙলা সাহিত্যের প্রশস্ত মধ্যযুগে এক এক রকমের উপাসনা-পদ্ধতি এবং জীবনবাসনাকে ঘিরে একই ছবি বহু মূর্তিতে রূপবান। 'উপমার কথা শুন এক মত নয়।' বিভিন্ন কাব্যপর্বে উপমার সেই বহুমুখ মনোহারিত্বের সন্ধান পেয়েছি। পৃথক মানসিকতার ফলে শোভার স্বাদ বিচিত্র বলেই আলোচনাকালের উপমাকে 'thy soul the fixed foot' শেষপর্যন্ত বলা যায় না। কাব্যের রূপগত (form) বিভিন্নতার সঙ্গে চিত্রগত স্বাতন্ত্র্য উপমালোকের ব্যাপক পরিধি চিনিয়ে দেয়। C. Day Lewis-এর The Poetic Image আমার আলোচনার বিষয় নির্বাচনের মূল প্রেরণা।

ইমেজের থিওরী নিয়ে আলোচনা নেই বললেই চলে। যেটুকু আছে, কাব্য ধরে ধরে রূপ বিচারের কালে তা উল্লেখ করেছি। আমার আলোচ্য বিষয় ইমেজের প্রয়োগ, ইমেজের স্বরূপ নয়। তবু প্রাচীন আধুনিক, স্বদেশী বিদেশী সব রকমের তত্ত্বকথার স্বাদ-গন্ধ এ বইতে আছে বলে মনে করি। বাঙলা সাহিত্যে এ ধরনের আলোচনা এই প্রথম। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া প্রথম লিখিয়ে হিসেবে নিজের লেখার মায়ায় খানিকটা জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। ফলে কোন কোন অধ্যায় কিছু দীর্ঘ। এক্ষেত্রে পাঠকের সহৃদয়তা আমার ভরসা।

এ বই আমার আলোচনার প্রথম খণ্ড মাত্র। দ্বিতীয় খণ্ড উনবিংশ শতাব্দী। তৃতীয় খণ্ডে রবীন্দ্রনাথ। পরবর্তী খণ্ডে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক সাহিত্য। ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করার মনস্কামনা আছে।

সাধারণ ও ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের সাহায্য পেয়েছি। পৃষ্ঠপোষকদের নাম উল্লেখ করতে গেলে তালিকা দিতে হয়, সে কাজ অশোভন। আমি তাঁদের কাছে মনে মনে কৃতজ্ঞ। জ্ঞানত কোথাও সত্যের অপলাপ করিনি।

আচার্য শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্নেহনির্দেশ এ গ্রন্থের উত্তমাংশ। তাঁর অন্তর্ভেদী সাহিত্যবিচারের আলোয় আমার তাবৎ প্রচেষ্টা উদ্দীপ্ত। সেই

আচার্যকে নমস্কার। শ্রদ্ধেয় শ্রীসুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র সেন মহাশয়ের মূল্যবান উপদেশ এ গ্রন্থের সম্পদ।

অলঙ্কার ও রসতত্ত্ব দীর্ঘদিন ধরে শিখতে পেয়েছি অধ্যাপক ডক্টর সুধীর কুমার দাশগুপ্তের কাছে। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'উপমা কালিদাসস্য' আমার আলোচনার উদ্দীপক গ্রন্থ। তাছাড়া এ কাজের ব্যাপারে তাঁর স্নেহ ও সহৃদয়তা খুব নিকট থেকে পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আজ গ্রন্থ প্রকাশ করতে গিয়ে পূজনীয় এই দুজন তপস্বী অধ্যাপকের কথা মনে পড়ছে।

শ্রীবিজিত কুমার দত্ত আমার আকৈশোর বান্ধব। তাঁর নিরন্তর সখ্য ও সদিচ্ছা শুধু এ গ্রন্থের নয়, আমারই আত্মবিন্যাসের মূলে। শ্রীসুধাংশু ঘোষ ও শ্রীমুকুন্দদেব লাহিড়ী একই প্রযত্নে স্মরণীয়।

স্নেহাস্পদ শ্রীমুরারি মণ্ডল, শ্রীকল্পনাকুমার রায়, শ্রীতাপস সান্যাল, শ্রীস্বপন চৌধুরী আমাকে এ কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। আমি প্রুফ্ দেখতে জানিনা বললেই চলে। ফলে নিজের চেষ্টায় ছাপার ভুল যত বাড়িয়েছি, তার জন্যে পাঠকের ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বইটি প্রকাশের ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় শ্রীনারায়ণ লাহিড়ী ও শ্রীবাসুদেব লাহিড়ীকে শুভেচ্ছা জানাই। শ্রীবিমল দাস যত্ন করে বইটির প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন।

শিবচন্দ্র লাহিড়ী

॥ সূচীপত্র ॥

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

বাঙলা কাব্যে উপমালোক

প্রথম অধ্যায়

উপক্রম

চর্যাগান থেকে কবিগান পর্যন্ত এই আটশো বছরের বাঙলা কাব্য আমাদের আলোচ্য বিষয়। সাহিত্যের ইতিহাসে এই দীর্ঘ কালের দুটি ভাগ, প্রাচীন ও মধ্যযুগ। যেহেতু আমাদের প্রতিপাদ্য, এক একটি যুগের মানস-প্রতিফলন উপমার আধারে কিভাবে কাব্যের মধ্যে নীত ও আলোড়িত, সেইহেতু কাব্য-রচয়িতা কবিদেব বিশিষ্ট দৃষ্টিক্রম অনুসরণ করার বদলে আমরা কাব্যের উন্মেষ-ক্রমটি অনুসরণ করেছি। একই অথবা একজাতীয় কাব্যরচনায় অনেকক্ষেত্রেই একাধিক কবির দর্শন মেলে, স্বতন্ত্রভাবে তাঁদের রচনাশিল্পের লক্ষণ আলোচনা করতে গেলে উপমার আলোকে নির্দিষ্ট একটি যুগবাসনা নির্ণয় করা কঠিন হয়। আমরা সেজন্যে এক একটি পর্বেব সমগ্র রচনাকে একত্রে গ্রহণ কবেছি, তাদের উপমাক্রিয়ার রূপশোভাগত মানস-লক্ষণগুলি (সমাজমানস ও কবিমানস দুই-ই) নির্দেশ করার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি।

আমাদের আলোচনা-ক্ষেত্রে প্রযুক্ত উপমার চরিত্র তিন ধরনের। প্রথাসিদ্ধ, প্রথাস্মৃত এবং প্রথামুক্ত বা নতুন উপমা। প্রথাসিদ্ধ উপমার গোটা ক্ষেত্রটাই সংস্কৃত রাজত্বের করদ রাজ্য। কবি কালিদাস সে রাজত্বের 'নগাধিরাজ'। বাঙালী কবিচিত্তের অপ্রস্তুত কল্পনাভূমিতে কালিদাসীয় উপমার লীলা প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যর্থতার কাবণ, আকাঙ্ক্ষা এবং ক্ষমতার নিদারুণ অসহযোগ। 'কমল বদনী রাধা হরিণ-নয়নী।' প্রথার ভাণ্ডার থেকে কুড়িয়ে পাওয়া মুদ্রার মুদ্রণ-মূল্য অচল হয়েছে, ধাতুমূল্যটুকুই যা অবশিষ্ট। অন্ধ অনুকরণের মোহে বাঙালী কবির উপমা-প্রয়োগ কেবলমাত্র বস্তুর সঙ্গে বস্তুর তুল্যযোগ দেখিয়েই শেষ। গ্রন্থের মধ্যে যথাস্থানে সে বিষয়ের বিশদ আলোচনা করেছি।

প্রথাস্মৃত উপমার ক্ষেত্রে প্রয়োগফল আরও একটু স্বাদু। এখানে সংস্কৃত উপমার রূপশোভার একটা মডেল সামনে রেখে বাঙালী কবি স্বীয় জীবনভূমির অভিজ্ঞতাকে রূপমণ্ডিত করেছেন। একটা উদাহবণ দিই। নারীর দেহশোভা বর্ণনা করে বাঙালী কবি বললেন, 'ডমরু সদৃশ মধ্য'। কালিদাস পার্বতীর দেহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'মধ্যেন সা বেদিবিলগ্নমধ্যা'। তপোবন-আদর্শের কবি কালিদাস নারীর কটিদেশের উপমা চয়ন করেছিলেন তাঁর চিত্তানু-কল্ অভিজ্ঞতা থেকে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গ্রাম্যকবি যজ্ঞবেদি দেখেন নি, দেখে-

ছেন গাঁয়ের বাজনদারের হাতের ডুগডুগি। কিন্তু প্রথার স্মৃতি তাঁর এই নতুন প্রয়োগভূমির মধ্যেই আভাস দিল। গ্রন্থমধ্যে বিষয়টি যথাস্থানে আলোচিত।

প্রথামুক্ত বা নতুন উপমা লোককাব্যগুলির ক্ষেত্রেই বেশি। এস্থানে কবি উচ্চ আদর্শলোক থেকে উপমান চয়ন করেন নি। কামনান্তর সমোচ্চ হওয়ার ফলে উপমেয়-উপমানের রাজযোটক মিল দেখা দিয়েছে। সে নায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ অথবা কুরঙ্গনয়ন, কিছুই নয়, একেবারে 'দুই চক্ষু জেন পেয়াজের কোস'। রূপের এমন ঘরগড়া সজীবতা অন্যত্র দুর্লভ। যথাপ্রসঙ্গে মন্তব্যটি ব্যাখ্যাত।

১

আধুনিক কালে বাঙলা কবিতার ইমেজ নিয়ে রীতিমত সোরগোল উঠেছে। আমাদের সমস্যা হল, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা কবিতার উপমাকে ইমেজ বলা যাবে কিনা। ইমেজের বাঙলা চিত্রকল্প, অনেকদিনের চলতি নাম। অথচ এ নাম ইমেজের মূল ব্যঞ্জনার বদলে শুধু লক্ষণ চিনিয়ে দেয়। শ্রীঅমলেন্দু বসু বলেছেন বাক্‌প্রতিমা। প্রতিমান অন্য একটি নাম। এর দ্বারা আমাদের সমস্যার কোন মীমাংসা হয় নি।

হিন্দি সাহিত্যে সিম্বলের নামে ছায়াবাদ চলছে। আমাদের সংস্কারে এ শব্দের ঝঙ্কার নেই। সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা উপমা নিয়ে এত চুলচেরা বিচার করলেন, অথচ ইমেজ ব্যাপারটির কোন খোঁজই রাখেন নি তারা। শিল্পী কালে কালে ইমেজ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু ইমেজ শব্দটি চিরকালের চেনা নয়। তাই কালিদাস, বাণভট্ট, ভবভূতির ইমেজ সাদৃশ্যমূল কোন না কোন অলঙ্কার-ভাগের পরিচয় নিয়েই এতকাল চলছিল। সে চলন একালের উপযোগী নয়।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা উপমা বলতেন। উপমা কালিদাসস্য। তাঁদের উপমা-চিন্তার পদ্ধতি একালের থেকে স্বতন্ত্র ছিল। তারা অলঙ্কারকে নানান ভাগে ভাগ করেছিলেন। সাদৃশ্যমূল, শৃঙ্খলামূল, বিরোধমূল, ন্যায়মূল, গূঢ়ার্থ-প্রতীতিমূল ইত্যাদি। এর থেকে অনুমান করা সঙ্গত যে, সেকালের রূপশিল্পে অনির্দিষ্টতা বা অনির্দেশ্যতার বালাই ছিল না। সবই স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, যুক্তিযুক্ত এবং বিচারবদ্ধ। উপমার দুটি পক্ষ, উপমেয় এবং উপমান। আবার উপমেয়-রূপ, উপমান-রূপ, সাধারণ ধর্ম, তুলনাবাচক শব্দ ইত্যাদি পরস্পরের সঙ্গে শ্রেণীর নিয়মানুসারে সাজানো। অর্থাৎ উপমেয় এবং উপমান পক্ষের গুণ, ক্রিয়া, ধর্ম ইত্যাদিকে পরস্পরের সঙ্গে ঠিক খাপে খাপে মিলতে হবে। নইলে তা প্রয়োগ হিসেবে অসম্পূর্ণ অথবা দুষ্ট। ইমেজ কিন্তু এমন পুরোপুরি খাপে খাপে মাপসই সাদৃশ্যের প্যাটার্ণ নয়। হয়ত এর মধ্যেও উপমেয় উপমানের উক্ত অথবা অনুক্ত ভাগ আছে। তবু এদের সাদৃশ্য এমন সরাসরি নয়। রূপের

জটিল উর্ণাসূত্রে কোন একটি দুর্লক্ষ্য সাঙ্কেতিক বিন্দুতে এরা পরস্পরকে স্পর্শ করে। বাকি সবই স্রষ্টার বিচিত্র মানস-অভিজ্ঞতার অ-সরল উত্তরফলের মত। আধুনিক ইমেজ হেঁয়ালি অথবা পাগলামি নয়। অথচ বিচারের ক্রম সাজিয়ে গড়া অলঙ্কারও এ নয়। বাসনালোকে মগ্ন জীবনের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা যখন ছবির আকারে সাড়া দেয়, তখনই একটা ইমেজ পাওয়া যাবে। 'Residua of racial experiences stirred in the unconscious depths of the mind.'[১] এককথায় জাতি-জীবনের বিচিত্র এবং জটিল অভিজ্ঞতার ডুবুরিকেই ইমেজিস্ট বলব।

সত্যি কথা বলতে কি, জাতি-জীবনের যে কালে কবিরা (সাহিত্য সৃষ্টিতে) চূড়ান্ত ভাববাদী, এবং খানিকটা বাস্তব-নিরপেক্ষ, সে কালের জীবনে মানুষে মানুষে সামাজিক সম্বন্ধের জটিলতা অনেক কম। সে সময়ে মানুষ তার ব্যবহারিক বন্ধনগুলোকে 'ট্যাবু' ধরনের এক একটা প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তোলে। যেমন বিবাহ-সম্বন্ধ, দাম্পত্য-সম্বন্ধ, তপোবন-সম্বন্ধ, ধর্মপালন-সম্বন্ধ, শাসন-সম্বন্ধ ইত্যাদি। তখন মানুষের চেয়ে মানুষের গড়া এই প্রতিষ্ঠানগুলোরই আধিপত্য। এমন অবস্থায় রূপকাব্য রচনার ক্ষেত্রেও জীবনের বিচিত্রতা কমে যায়। সংস্কৃত কালের কবিদের উপমা প্রয়োগ করবার কতকগুলো (প্রায়) নির্দিষ্ট ক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল। যেমন নায়িকার বয়ঃসন্ধি, নায়ক-নায়িকার পূর্বরাগ, অভিসার এবং মিলন, দৌত্য, বিপ্রলম্ভ ও বিরহ, রাজপ্রশস্তি, রাজ্যপাট বর্ণনা ইত্যাদি। আর প্রতিটি বিষয় বর্ণনার জন্য কবিদের হাতে নির্দিষ্ট কতকগুলি উপমা থাকতো। আলঙ্কারিকের হাতে এই ছক আরও কায়েম হল। স. জড়িয়ে জীবনের অজস্র সম্ভাবনার বহুবঙ্কিম রূপরেখা কবিদের দুচোখ এড়িয়ে যেতে থাকল।

উপমার আলোকে বৈষ্ণবীয় কাব্যপর্ব মধ্যযুগের বাঙলা কবিতার চূড়ান্ত সৃষ্টিকাল। তথাপি এ কালের লেখাতেও ইমেজ নির্মাণের একটা গুরুতর দুর্বলতা রয়ে গেছে। বৈষ্ণব যুগে চৈতন্য-উদ্দীপ্তি বড় কথা অবশ্যই, কিন্তু এর বেগ মূলত আধ্যাত্মিক। সমাজবিধির সনাতন নিয়মের মধ্যেই এর পরিণতি। আসলে, সামাজিক জীবনযাপনের বাঁধা ছকটাকে নতুন করে ভেঙে সাজার সুযোগ না ঘটলে ইমেজের ক্ষেত্রে নতুন প্রয়োগ-শৃঙ্খলা দেখা দেয় না। বৈষ্ণব কবিতায় শিল্পগত অভাববোধ, অতৃপ্তি, আকুলতা, সবই আছে। কিন্তু রূপের ক্ষেত্রে অভিনব প্রাপ্তি বিশেষ নেই। কৃষ্ণই একালের একটা বড় সিম্বল হতে পারতেন। সম্ভব হয়নি, কেননা বৈষ্ণব কবি আদৌ ভক্ত। দ্বিতীয় কথা, আগেই

---

১ 'Studies of Type-Images in Poetry, Religion and Philosophy'—by Maud Bodkin.

বলেছি, প্রথাসিদ্ধ উপমার গোটা ক্ষেত্রটাই সংস্কৃত রাজত্বের করদ রাজ্য। তবু আমাদের আলোচনা-কাল রূপশোভার প্রসঙ্গে সর্বস্বান্ত নয়। ব্যাপক ও বিপুলভাবে রূপসৃষ্টির আয়োজন যে কেবলমাত্র বৈষ্ণব কাব্যপর্বেই হয়েছিল, গ্রন্থমধ্যে তার বিশদ আলোচনা আছে। পূর্ববঙ্গ মৈমনসিংহ গীতিকায় এক-ধরনের নতুন ইমেজ দেখা দিয়েছিল। এসব রচনার কবিরা নতুন একটা জীবন-পদ্ধতিতে বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন। জীবনের ভাবমূল্য রক্ষণশীল এবং শুচি রেখেও বেঁচে থাকার ব্যবহারিক উপায়গুলির মধ্যে তাঁরা বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে উদ্যমধারা গঙ্গা-যমুনার মত বিপুলকায়া নয়। তাই অচিরে অন্তঃশীল হতেও এর দেরি হযনি।

সংস্কৃত কবিদের উপমাকে ইমেজ নাম দেওয়ার একটি বড় বাধা আছে। এ প্রসঙ্গে কালিদাস সংস্কৃত কবিগোষ্ঠীর পুরোধা। কালিদাসের কাব্যে রূপ-রচনার ক্ষেত্রগুলি মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, বস্তুর সঙ্গে বস্তুর তুল্যযোগ নির্ণয় করেই চমৎকৃতি উৎপাদনের চেষ্টা সর্বাধিক। হয়ত কবি-কল্পনার আদর্শলোক উচ্চ, কামনাস্তর অনেক প্রসারিত, উপস্থাপনার ভঙ্গি সূক্ষ্ম নিপুণ, এমনকি সহজে সন্তুষ্টও নয়, তবু উপমা-নির্মাণের ব্যাপারে বস্তু-প্রাধান্যই শেষ কথা। দু একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি সহজ করি,

> নাগেন্দ্র-হস্তাস্বচি কর্কশত্বাদেকান্ত শৈত্যাৎ কদলী-বিশেষাঃ।
> লব্ধ্বাপি লোকে পবিণাহি রূপং জাতাস্তদূর্বোরুপমান-বাহ্যাঃ॥

হাতির শুঁড় কলাগাছ ইত্যাদি নারীর উরুদেশের শোভানির্ণায়ক উপমান কালি-দাসের বড়ই প্রথাজীর্ণ মনে হয়েছে। যেহেতু হাতির শুঁড় কর্কশ আর কলাগাছ মসৃণ হলেও ঠাণ্ডা। ফলে উমার অপরূপ উরুদেশের উপমান তারা কেমন করে হবে। সৌন্দর্য সম্বন্ধে উদ্বেগ এবং অসন্তোষ কবির মনে যতই থাক না কেন, বস্তুর সঙ্গে বস্তুর বিনিময় ও বিনিয়োগেই এখানকার উপমেয়-উপমান সম্পর্ক নির্ণীত। আর একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক।

> চন্দ্রং গতা পদ্মগুণান্ন ভুঙ্‌ক্তে পদ্মাশ্রিতা চান্দ্রমসীমভিখ্যাম্।
> উমামুখন্তু প্রতিপদ্য লোলা দ্বিসংশ্রয়াং প্রীতিমবাপ লক্ষ্মীঃ॥

শ্লোকটিতে উপমানের শোভাকে দ্বিগুণিত করে উমারূপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সর্বত্রই 'যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন', সব সময়েই 'সর্বোপমাদ্রব্য-সমুচ্চয়েন' কালিদাস এ কাজ করেছেন। 'শিরীষ-পুষ্পাধিক-সৌকুমার্যৌ বাহূ'র ক্ষেত্রেও কবির যেমন 'বিতর্কঃ', অন্যক্ষেত্রেও তেমনি উদ্বেগ এবং

সংশয়। অথচ কবির অসন্তোষ উপমান-বস্তু সম্বন্ধে মনোনয়ন-অমনোনয়নের ঊর্ধ্বে পৌঁছয় নি। কালিদাসের বেশিরভাগ সৌন্দর্য-বর্ণনাক্ষেত্রে এই ধরনের বস্তুপ্রাধান্য। কেবলমাত্র ছবির সঙ্গে ছবি জুড়ে বিশেষ একটা চিত্তাবস্থা কোথাও উদ্‌ঘাটিত হল না।

কালিদাসের কাব্যে চিত্রের দ্বারা উদ্বোধিত মানসিক অবস্থানের সূক্ষ্ম পরিচয় ক্ষেত্র বড় কম। অবশ্য তাঁর পরিণত কাব্য রঘুবংশে সার্থক ইমেজ কিছু কিছু আছে। স্বয়ম্বর সভায় ইন্দুমতীর পতি নির্বাচনের ছবি কালিদাস এঁকেছেন,

> সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা।
> নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ ॥

পতিংবরা ইন্দুমতীতে দীপশিখার উপমা জীবনে আশা-নৈরাশ্যের যে মানসিক পটখানি মূর্ত করে তুলল, তাতে উপমেয়-উপমানের বস্তুগ্রাহ্য তুল্য-যোগ কতটুকু। এখানে দেহ-সৌন্দর্যের কথা আছে, তা প্রত্যঙ্গবাচক নয়। এখানে প্রথাবদ্ধ উপমানেরই ব্যবহার, অথচ প্রয়োগের নতুন শৃঙ্খলা সমস্ত প্রকাশটিকে স্বতন্ত্র অবস্থান দিয়েছে। ইমেজের সৌন্দর্যে আর যাই থাকুক না কেন, এই মানসিক অবস্থানের পরিচয়টি প্রকাশিত থাকা চাই-ই চাই। আর সে মানসিক অবস্থান শিল্পীর আজন্ম অভিজ্ঞতার ধন। আর একটি দৃষ্টান্ত,

> শরীরসাদাদসমগ্রভূষণা মুখেন সালক্ষ্যত লোধ্রপাণ্ডুনা।
> তনুপ্রকাশেন বিচেয়তারকা প্রভাতকল্পা শশিনেব শর্ব[illegible]

ইক্ষ্বাকু বংশের নামগৌরবকারী রাজা রঘুর জন্মলগ্নের কথা। নবচন্দ্রমা রামচন্দ্র এই নামগৌরবে খ্যাত হয়েছিলেন। রাজসিক মর্যাদার সে হিরণ্যচ্ছটা ভারতবাসীর পুরাণ-বাসনাকে আলোকিত করে আছে। কালিদাসের মান-সিকতা ভারতবাসীর সেই চিত্তসংস্কারকে গর্ভিণী মাতা সুদক্ষিণার রূপ-বর্ণনার মধ্যে প্রকাশ করল। প্রভাতকল্পা শর্বরী। এখানে উপমাপ্রসঙ্গে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর তুল্যযোগ অনুপস্থিত নয়। কিন্তু বড় কথা হল, আসন্ন মাতৃত্বের ভাবগৌরব। অনুভূতির শোভায় বস্তুরূপ আকৃষ্ট হয়েছে, দেহ-শোভায় নয়। এটিকেই সার্থক ইমেজ বলব। কালিদাসের কুমারসম্ভবেও ইমেজ আছে।' 'কিঞ্চিৎপরিলুপ্তধৈর্যঃ' যোগীশ্বর শিবের বর্ণনা স্মরণ করি। বস্তুত কালিদাস শিবরূপ বর্ণনার সর্বত্রই ভারতবাসীর ধ্যান-কল্পনার সংস্কারকে মান্য করেছেন। আর তার ফলে যোগীশ্বরের রূপ-বিষয়ে যে সম্ভ্রম আমাদের

কল্পনাকে স্তম্ভিত করে রেখেছিল, তারই ঠিক ঠিক প্রকাশ ঘটেছে কালিদাসের কাব্যে। আমাদের অস্বচ্ছ ধ্যানের ভাষাচিত্রকর কালিদাস।

বিশেষ করে কালিদাসের কাব্যের ইমেজ আলোচনা করার প্রয়োজন আমাদের ছিল। যেহেতু পুরোনো বাঙলা কবিতার উপমা সংস্কৃতের মূলত কালিদাসের অনুপন্থী। কালিদাসের কাব্যে উপমার মনোহারিতা সর্বত্রই, তাঁর সৃষ্টিলোক সে ঐশ্বর্যে ঝলমল। তবু কবির ইমেজ সৃষ্টির অবকাশ এ বিপুল কাব্যকাণ্ডে অজস্র নয়। কালিদাসের পরিণত কাব্য থেকে শুধু নয়, কালিদাসের কাব্যের ইমেজ-বিচারক শুধু কুমারসম্ভবের মধ্যেই ইমেজের ক্রমিক পরিণতির সূত্র খুঁজে পাবেন। প্রমাণ, উমার রূপপ্রসঙ্গ। কালিদাস ইমেজ-সৃষ্টি অবশ্যই করেছেন, কিন্তু এ বিশেষ শিল্পকৃতিত্বের পরিচয়ে 'উপমা কালিদাসস্য' আরও সার্থক নাম।

সংস্কৃত উপমার ঋণে জর্জরিত পুরোনো বাঙলা কবিতার এই শিল্প-কলাকে তাই ইমেজ বলা সহজ নয়। আরও একটা কথা আছে। কালি-দাসের উপমা যে সব ক্ষেত্রে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর বিশদ তুল্যযোগ ঘটাতে ব্যস্ত, আমাদের আলোচ্য কালের কবিরা সেই সব স্থান থেকেই ঋণ গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয়ত, আমাদের কবিদের শিল্পবাসনার চেয়ে অনেক বড় কথা ছিল ধর্মবাসনা। কবিদের এই বিশেষ মানসিকতার ফলে সংস্কৃত উপমাগুলো হস্তান্তরিত সম্পদের সব কর্তৃত্বগৌরব হারিয়ে ফেলেছে। প্রথার ভাণ্ডার থেকে কুড়িয়ে আনা উপমাগুলোকে যেমন তেমন ভাবে জুড়ে দিয়েই আমাদের কবিরা দ্রুত তাঁদের মূল বিষয়-ভাবনায় মনোযোগ দিয়েছেন। এ সব কারণেই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা কবিতার উপমাকে ইমেজ বলতে বাধে।

আমাদের আলোচ্য কালের আগাগোড়াই গান। চর্যাগীতি, মঙ্গলগীতি, বৈষ্ণবগীতি, লৌকিক প্রণয়-গীতি, কবি-সংগীত সবই। কাব্য বললেও এগুলি যতটা গেয়, ততটা পাঠ্য নয়। সংগীতের বিশেষজ্ঞ বুঝবেন, গানের প্রকরণ কবিতার প্রকরণের থেকে কোথায় আলাদা। গানের ক্ষেত্রে সুর এবং কবিতার ক্ষেত্রে ভাব বড় কথা। অবশ্য গানেও ভাব চাই, কাব্যেও সুর আবশ্যক। কবিচিত্তের প্রশান্ত অনুভূতি এবং সংযত আবেগের মধ্যে কাব্যের প্রতিটি শব্দ যে পরিমাণ প্রতীক মূল্য (Symbolic Value) পায়, গানের একতান সুরপ্রবাহে সে মূল্যসৃষ্টি সম্ভব হয় না। হয় না বলেই সংগীতের শব্দবর্গ ভাল কোন ইমেজ সৃষ্টি করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের গানের ব্যতিক্রম স্মরণে রেখেই একথা বলা চলে। প্রাচীন ও মধ্যযগের বাঙলা কবিতা আমাদের পক্ষে

পাঠ্য হলেও রচনার সমকালে সাঙ্গীতিক প্রকরণে প্রস্তুত ছিল। এ পর্বের রূপলোকে তাই Congruity of images সহজলভ্য হয়নি।

দীর্ঘনিরুদ্ধ পুথির জগৎ এ কাব্যলোক। একাধিক লিপিকর ও অসংখ্য গায়েনের হাতে এ সব কাব্যের মূল পুথির অদল-বদল অনেক হয়েছে। লিপি-করের অশিক্ষা এবং গায়েনের ব্যক্তিগত সুবিধের চাপে পড়ে কাব্যের মোট রমণীয়ত্ব অনেক স্থানে কমেছে বৈ বাড়ে নি। এর থেকে আশা করা স্বাভাবিক, উপমা-সৃজনের ক্ষেত্রবিশেষ কোথাও কোথাও ক্ষতিগ্রস্ত। গ্রন্থমধ্যে আমরা সে রকম কয়েকটি ক্ষেত্রের পরিচয়ও দিয়েছি।

এইসব ব্যাপারগুলি মনে রাখলে আমাদের আলোচ্য কালের উপমার আধুনিক নামকরণ খুব সঙ্গত হয় না। আর উপমা কথাটি যখন স্বরূপের দিক থেকে (in substance) সমস্ত অলঙ্কার-জগতেরই পরিচায়ক, তখন এ নামটিই আমাদের গ্রন্থশীর্ষক রূপে গ্রহণ করলুম।

কাব্যে পরোক্ষভাষণের প্রয়োজনীয়তা কি, কাব্যকে শ্রীমণ্ডিত করতে কেন কবিরা উপমা-প্রবণ হয়ে পড়েন, এই উপমা-বৃত্তির উৎস কোথায়, এ প্রসঙ্গই সম্প্রতি আলোচ্য মুখশ্রীকে সুন্দর বলে কবুল করতে গিয়ে কেন কবি বলেছেন, 'মুখচাঁদ জ্যোৎস্না ছড়ায়'। poetic passion বা poetic emotion থেকে কবির মনে প্রথমেই আসে, তাঁর বর্ণনীয় বস্তু বা বাস্তবটিকে সুন্দররূপে এমনকি অভিনবরূপে প্রকাশ করবার জন্যে একটি কল্পনাবৃত্তি। অর্থাৎ কবি তাঁর পরিচিত বাস্তবের সৌন্দর্যে আর তুষ্ট থাকতে চান না, তাকে অতিক্রম করে তাঁর মনের আদর্শ-সম্ভব লোক থেকে একটি সাদৃশ্যমূল রূপবস্তু সংগ্রহ করেন। যেমন মুখকে বর্ণনা করতে গিয়ে চাঁদের কথা বলেন। বর্ণনীয় বস্তুকে এইভাবে আদর্শায়িত বাস্তব (idealised real) করে তোলার পথে কবি বাইরের যে আদর্শ-সম্ভব বস্তুটির সন্ধান করেন, যাকে আলঙ্কারিক পারিভাষিক অর্থে বলেছেন উপমান বস্তু, সেটি আর কবির আর্তিময় (passionate) অথবা আবেগময় (emotional) মনের কাছে দুর্লভ আদর্শবস্তু থাকে না, কবি ধীরে ধীরে তাকে অর্থাৎ সেই ideal টিকে কাঙ্ক্ষিত বাস্তব (desired reality) হিসেবে বেদনার মধ্যে পেতে থাকেন। এবং কাব্যরচনার সার্থক মুহূর্তে তিনি তাকে 'realised ideal' বা বাস্তবায়িত আদর্শরূপে কাব্যের মধ্যে লাভ করেন। এ অবস্থায় কাব্যসূচনার সেই সংকীর্ণ বাস্তবটি এবং অলভ্য আদর্শটি আর তাদের পরস্পরের গুণগত পার্থক্যে বহু দূরবর্তী থাকে না। ক্রমশই তারা কবিমন থেকে তীব্রতর আবেগ এবং উত্তাপ সংগ্রহ করে পরস্পরের

মধ্যে মিলিত হয়। তখন actual reality টি হয় idealised reality, ঐ উপমানের প্রসাদে, এবং ideal টি বা desired reality টি হয়ে ওঠে realised ideal, ঐ উপমেয়ের স্পর্শে। মুখ আর ঠিক 'মুখ' থাকে না, 'চাঁদ'ও তাই, কবি তাদের সদৃশ সৌন্দর্যটুকু ছানিয়ে নিয়ে এক অজ্ঞাতপূর্ব বাস্তবের সৃষ্টি করেন। যে নতুন বাস্তব কবিভাবনার জঠরে জন্মলাভ করে, সমালোচক তাকে আর 'অনুকরণ' বলে তিরস্কার করতে পারেন না, কবি হয়ে ওঠেন এক অভিনববিধাতা।

মানুষ উপমা ব্যবহার করে, তার একমাত্র আশা, জীবনের পক্ষে এই সব দুর্লভ আদর্শকে যদি আমার নিত্যদিনের ব্যবহারের মধ্যে পেতে পারি। বাইরের উপমান বা আদর্শকে সে কোন নিরাসক্ত সৌন্দর্যতাত্ত্বিক মন নিয়ে আস্বাদন করবার চেষ্টা করেনি, জীবনের নিত্য প্রয়োজনে পাবার আগ্রহে সে যথার্থ-বাস্তবের কথাটি বলতে গিয়ে আপন আবেগে একটি অযথার্থ আকাঙ্ক্ষাকে জুড়ে দিয়েছে। আগেই আলোচনা করেছি, মানুষ তার ideal কে নিজের অপ্রচুর উপকরণের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে desired reality হিসেবে পেতে চেয়েছে। জীবনধারণ-তত্ত্বের এই প্রাথমিক বা মূল নীতির মধ্যে দুটো সত্য কার্যকরী; বাস্তবজীবনের অভাব এবং অপ্রাপনীয়কে কামনা করার আবেগ। জীবনধারণ-তত্ত্বের প্রাথমিক ক্ষেত্রেই এর প্রমাণ আছে,

ওগগ্‌র ভত্তা বম্ভঅ পত্তা
গাঈক ঘিত্তা দুদ্ধ সজুত্তা
মোঈনি মচ্ছা নালিচ গচ্ছা
দিজ্জই কন্তা খা পুণবন্তা।

ওপরের ছত্রগুলিতে কোন উপমা দেওয়া হয়নি। কিন্তু বক্তব্যটি কি, 'দিজ্জই কন্তা খা পুণবন্তা।' সেই অজ্ঞাত কোন পুণ্যবানের নিত্যভুক্ত প্রাচুর্যের প্রতি ঈর্ষার দৃষ্টি নিয়ে উপবাসী রচয়িতা তাঁর নিজের অনাস্বাদিত সৌভাগ্যের একটি পরিপাটি কল্পনা করে বসলেন। এ ক্ষেত্রে সমস্ত রচনাটিকেই যদি কবির অনুক্ত বাস্তবের উপমান বলে ধরে নিই, হয়ত কোন ভুল হয়না। এ ছাড়া, চিত্র হিসেবে ছত্রগুলি শুধু কোন এক ঐতিহাসিক-অতীতের জীবনতথ্য সরবরাহ করেই শেষ হয়ে যায়। একে কাব্য হিসেবে আস্বাদন করতে হলে কবি-মনের সেই না-বলা বেদনার কথাটি খুঁজে বার করে নিতে হবে। বিশেষত বর্তমান কবিতাটিকে নিছক চিত্র হিসেবে কোনমতেই উপেক্ষা করা চলে না। কেননা, 'দিজ্জই কন্তা, খা পুণবন্তা' কথার মধ্যে কবি এমনই একটি

অশ্রুর ইঙ্গিত রেখে গেছেন যে এর আপাত-তৃপ্তির নীচে বেদনার দিকটিই বড়ো হয়ে দাঁড়ালো।

নিছক জীবনধারণ ব্যাপারেও দেখলাম, আদর্শ সুখী-জীবনের একটা অনুক্ত কামনা কবিবাসনায় রয়েছে। এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, কবি জীবনের এই আদর্শকে তাঁর নিষ্ঠুর বাস্তবতার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা করেছেন। ছত্রগুলির মধ্যে একটি মাত্র অভাব বা অপেক্ষা থেকে গেছে শুধু, সেটি কবির উপমেয়, বর্ণনীয় বস্তু বা বাস্তব। আপাতভাবে মনে হয়, বর্তমান ছত্রগুলি যেন কবির বর্ণনীয় বস্তু, কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, এটি কবির কাঙ্ক্ষিত বস্তু, বর্ণনীয় বস্তু নয়।

এবার শিল্পগত অভাববোধের একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। প্রিয়ার প্রতি প্রিয়ের নির্ভরশীলতা প্রকাশ করতে কবি বললেন,

> শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরীষির বা।
> বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।।

উপমাগুলি লক্ষ্য করবার মত। প্রিয়া কেমন? শীতের একখানি আতপ্ত ওড়নার মত, গ্রীষ্মকালে শীতল বাতাসের মত, বর্ষাকালে শিরস্ত্রাণের মত আর মাঝ সমুদ্রে নৌকার মত জীবন রক্ষাকারিণী। উপমাগুলি সবই দৈনন্দিন ব্যবহারের জীবন থেকে নেওয়া। কবি প্রিয়া-নির্ভরতার ছবিটি তাঁর জ্ঞাত আদর্শলোক থেকেই সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু এ কল্পনার মধ্যে তাঁর কামনাটি কি? প্রিয়া সমস্ত রকম দুঃখে বিপদে এমন ভাবেই তাঁকে যেন আগলে করে রাখে। কবির আর্তি বা ভাবাবেগের মধ্যে এখন আদর্শটি আর অপ্রাপনীয় হয়ে রইলো না। সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দিয়ে তা কবির বাস্তব প্রিয়ার যথার্থ গুণগুলির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল। কবি তাঁর আবেগের মধ্যে আদর্শকে পেলেন কাঙ্ক্ষিত বাস্তবরূপে। অপূর্ণজীবনের অতৃপ্তিকে কবি এইভাবে একটি পরিপূর্ণ জীবনের স্বাদে মধুময় করে দিলেন। বাস্তব-জীবনের দুর্লভকে তিনি আবেগ-জীবনের বাস্তব করে তুললেন।

অভাব থেকে আসে অসন্তোষ। অসন্তোষ থেকে অন্বেষণ। আর এই অন্বেষণের নিষ্ঠাতেই, যাকে আমরা কবিভাব বলছি, জাগে পরিতর্পণ। মানবমনে উপমাবৃত্তির এই হল, আমাদের মতে, উদ্দেশ্য।

বাস্তবিক অভাববোধ থেকে মানবমনে যে উপমার প্রেরণা, তার দ্বারা কেবল মাত্র লৌকিক উপমাবোধ জাগতে পারে। এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রথম দৃষ্টান্ত স্মরণীয়। শিল্পগত উপমা-প্রবণতা, যা সৌন্দর্যমগ্ন কবির গভীর রূপমোহের

মধ্যে জন্মলাভ করে, এ জাতীয় অভাববোধ ও আদর্শব্যাকুলতা সেখানে উপমার উদ্দীপক কারণ নয়। বাস্তবিক অভাব ছাড়াও আদর্শানুকূল শিল্প-প্রকাশের এক সূক্ষ্ম অভাববোধও কবিমনে থাকে, যার জন্যে আপন ভাবনাটিকে রূপবান করতে কবি বহির্বিশ্বের রূপবস্তু থেকে উপমান চয়ন করেন। বৈষ্ণব পদাবলীর আলোচনায় আমরা সে বিষয়ের ব্যাখ্যা বিস্তারিত ভাবে করেছি। তবু সূত্রাকারে এখানে বলে রাখি, মানুষের সীমাবদ্ধ মুখের ভাষা মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তাগুলিকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে অপারগ হয বলেই, কবি বাইরে থেকে উপমান আহরণ করে থাকেন। এখানে উপমার প্রেরণা প্রসঙ্গে কবির মানসক্রিয়া ততটা বাস্তব অভাববোধসূচক নয়, যতটা সম্পূর্ণতাবিধায়ক।

বাঙলা কাব্যের উন্মেষকাল থেকে সুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে মধ্যযুগীয় কাব্যের অবসানকাল পর্যন্ত আমরা অলঙ্কারের বিচিত্র প্রয়োগের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, অপহ্নুতি, বিরোধাভাস ইত্যাদি নানান অলঙ্কারের নব নব রূপাবস্থান লক্ষ্য করেছি। কিন্তু উপমার (Simile) প্রয়োগ ক্বচিৎ মিলেছে। এখন এ প্রশ্ন স্বাভাবিক, এ দীর্ঘকালের বাঙলা রূপ-কবিতায় উপমার (Simile) দর্শন মিললো না কেন? অথচ অন্যান্য (প্রায়) সব রকমেরই অলঙ্কার বহুবার বহুস্থানে আহৃত। আসলে উপমার (Simile) মধ্যে উপমেয়-পক্ষ এবং উপমান-পক্ষ মৃদুভাবে পরস্পরের সঙ্গে লগ্ন হয়ে দুটি স্বতন্ত্র সৌন্দর্য-বিশ্বের অতিসন্নিহিত রূপাবস্থান নির্ণয় করে। অন্যান্য অলঙ্কারে উপমেয়-পক্ষ উপমান-পক্ষের দ্বারা ক্রমে ক্রমে গ্রস্ত হয়ে একীভূত রূপবিন্দুতে পরিণত হয়। রূপক অতিশয়োক্তি ইত্যাদি অলঙ্কারে রূপশোভার প্রসারিত পট ঘনীভূত হয়ে বিন্দু-পরিণাম লাভ করে।

'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।'

দক্ষ কবির শিল্পকর্মে এ অলঙ্কৃত রূপবিন্দু আপন অন্তরে শোভার সিন্ধু-পরিচয় গোপন রেখেছে। পাঠকের চর্বণার মধ্যেই তার ক্রমিক উন্মোচন (Unfurling)। কিন্তু আমাদের আলোচ্য কালের কবিদের ব্যবহৃত উৎপ্রেক্ষা রূপক ইত্যাদি অলঙ্কার সেদিক থেকে এতই প্রতিশ্রুতিহীন যে, তাঁদের ব্যবহৃত ঐসব অলঙ্কার শ্রোতার মনে শোভার কোন কম্পন সৃষ্টি করতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপারগ। যেখানে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর তুল্যযোগ ঘটিয়ে অলঙ্কার নির্মাণের উদ্যোগ, অলঙ্কারের শোভায় মানসিক অবস্থানটিক নির্দেশ

করে দেবার তাগিদ যেখানে নেই, সেখানে উপমার (Simile) মত বিবৃত অলঙ্কার-কর্মে মন্দের ভাল ফল পাওয়া যেত। কিন্তু আমাদের কাব্যের কবিদের মনে সেই প্রশান্ত অবসরটুকুই বা কোথায়। হয় কোন ধর্মের প্রত্যাদেশে, না হয় কোন শাস্ত্র-দর্শনের অনুজ্ঞায় সমগ্র মধ্যযুগের বাঙলা কাব্য নিয়ন্ত্রিত। উপমার (Simile) দ্বারা উদ্বোধিত শিল্পশোভার বর্ণনায় কবিমনের যে অখণ্ড রূপাবকাশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, বাঙালী কবিদের কাব্য-সংকল্পে তার বিন্দুবিসর্গও ছিল না। তাই উৎপ্রেক্ষা রূপক ব্যতিরেক ইত্যাদির সাহায্যেই তাঁদের আলঙ্কারিক উদ্যমের ত্বরিত রূপ-নিষ্পত্তি ঘটেছে। শোভার কথাটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর করা নয়, কোনও মতে তাকে স্থাপিত করে দিয়ে আপন আদর্শ-প্রেরণার সামনে প্রণত হতে পারাতেই বাঙালী কবিচিত্তের স্বস্তি।

ভারতচন্দ্র ও কবিওয়ালার গানের কাল থেকেই আমরা উপমা ভাবনার একটা পরিবর্তন ও রূপান্তরের আভাস পেয়েছি। 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।' কবিওয়ালার গানে সে রূপান্তর আরও স্পষ্ট। এখানে অনুচিন্তা হিসেবে আমরা সেই ভাবেরই ক্রমসূত্র পাচ্ছি নিধুবাবুর (রামনিধি গুপ্ত) গানের মধ্যে। লক্ষণীয়, নিধুবাবুর সংযমগাঢ় ও মার্জিত প্রকাশভঙ্গিতে গানগুলি কলুষতামুক্ত হয়ে হৃদয়ের গহন বেদনাকে নিরপেক্ষ মানবভাষায় হাজির করেছে। এ প্রেম-কবিতা রাধাকৃষ্ণের নাম-ব্যবহার বর্জিত; কবিসত্তার ব্যক্তিস্পর্শে বাঙলা-কাব্যে পূর্ণাঙ্গ গীতিকবিতার প্রথম আবির্ভাব সার্থক। বৈষ্ণব কবিতাকেও গীতিকবিতা বলা চলে। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের নামধৃত এবং কবিদের ব্যক্তি-চিত্তের স্পর্শবঞ্চিত হয়ে এ পদগুলি একলা কবির গান হয়ে ওঠার বদলে গোষ্ঠীর গান হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীর কবি বিহারিলাল চক্রবর্তীকেই রবীন্দ্রনাথ বাঙলাকাব্যের প্রথম গীতিকবি বলে নির্ণয় করেছেন। কিন্তু নিধুবাবুর রচনাগুলি মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলে দেখা যাবে, বিহারিলালের গীতি-প্রতিভায় যে মানবীয় আনন্দ-বেদনা কবিচিত্তের ব্যক্তি অনুভূতিকে অবারিত করে দিয়েছে, তারই পূর্বসংকেত নিধুবাবুর গান।

এবার আমরা নিধুবাবুর গানের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় লিপিবদ্ধ করব। কবি গেয়েছেন,

> আমার নয়ন হয়ে যদি হেরে তারে।
> সমাধিক সুখী হতে অবশ্য সে পারে॥

নিধবাবর গানে প্রেমের ব্যাপারে নয়নের মূল্য সমধিক স্বীকৃত। আঁখিই যে

হৃদয়ে অনুভূত প্রণয়ের অগ্রদূত, এ কথাটি কবি তাঁর রচনায় ইতস্ততঃ উল্লেখ করেছেন।

নয়নের দোষ কেন,
মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নেরে দোষ কেন।
আঁখি কি মজাতে পারে, না হলে মন মিলন।।

এই নয়নের শক্তিই হৃদয়ে প্রেমকে বিজ্ঞাপিত করে দেয়। নয়নের পথে হৃদয়ের এই যে নব জাগরণ, কবি তাকেই ভাবঘন কবিতার মূর্তিতে প্রকাশ করেছেন বিচিত্র বেদনায়।

মুকুরে আপন মুখ সদত দেখো না ধনি।
আপনার রূপ, দেখি অপরূপ, অধীনে ভুল কি জানি।
দেখ আপনার ধন, সদত দেখে যে জন,
কবিতে যে ব্যয়, তার হয় দায়, সকলের মুখে শুনি।।

প্রাণের আকার কেহ দেখেছ কেবল,
মোর প্রাণের, একরূপ বিধি নিরমিল।
সন্দেহ ইহাতে যদি হয় চিতে,
আমার আঁখিতে দেখিতে হইল।।

ছাড মোর হাত নাথ, লোকে দেখে পাছে।
আমার কি আছে লাজ, তোমার কাছে।।
সময়ে ধরিলে পায়, তাহা প্রাণ শোভা পায়।
অসময়ে হাতে ধরা, কি সুখ আছে।।

বিচ্ছেদে যে ক্ষতি তার অধিক মিলনে।
আঁখির কি আশা পূরে ক্ষণে দরশনে।।
প্রবল অনল দেখ কিঞ্চিৎ জীবনে।
নির্বাণ হইতে কেহ দেখেছ কখনো।।

উদ্ধৃতিগুচ্ছে বিচিত্র হৃদয়-বেদনা কবি আপন অনুভূতির আলোকে প্রতি-ফলিত করেছেন। সংহত সুরের এ মৃদু কথাগুলিতে নায়িকার গোপন-গহন চিত্ত অবারিত। পূর্ণাঙ্গ গীতিকবিতার প্রথম আবির্ভাব-লগ্নে এর বেশি ভাবমগ্নতা আশা করা দুরাশা হবে।

আমরা স্মরণ রেখেছি, উপমার আলোকে কাব্যের ভাবমূল্য নির্ণয় করাই আমাদের বিষয়। এ পর্যন্ত নিধুবাবুর রচনায় নায়িকার হৃদয়াবস্থার যে বহু-

বিচিত্র ভাবরূপ দেখলুম, এবারে তারই অলঙ্কার-রূপগত প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করব।

হেরিয়ে কমল কেন প্রকাশে কমল।
জানিতাম তপন হেরি, বিকশে কমল॥

তপন দর্শন করেই কমল বিকশিত হয়, নায়ককে উপস্থিত দেখেই নায়িকার পুলক-শোভা সঞ্চার লাভ করে। নিসর্গের এ স্বভাব-শোভার উপমান দিয়েই আবহমান কাল থেকে নায়ক-নায়িকার আনন্দ-রূপ রচিত হয়ে এসেছে। এখানে কবি বলেছেন,—'জানিতাম তপন হেরি বিকশে কমল।' এ প্রকাশভঙ্গি যে রূপের প্রথাবদ্ধ, প্রাচীন ও জীর্ণ সংস্করণ, 'জানিতাম' শব্দটির অমনোনয়ন-সঙ্কেতে কবি তাকে বিশেষিত করলেন। নায়কের মুখকমল দর্শন করে নায়িকার নয়নকমল প্রস্ফুটিত হল। কবির এবম্প্রকার রূপস্থাপনায় নিসর্গ-স্বভাবের বিকৃতি ঘটেছে। উক্ত দৃষ্টান্তচ্ছত্রের ভাব থেকে মনে হয় যেন, রূপস্থাপনায় এ বিকৃতিটুকুও সহ্য করতে কবি প্রস্তুত আছেন, তথাপি প্রথাজীর্ণ রূপ-স্থাপনার অনুগত তিনি কোনমতেই হবেন না। উনবিংশ শতাব্দীর সুরু থেকে কবিতায় প্রাচীন ভাবের দিগন্ত-বদলের যেমন একটা নতুন উদ্যম দেখা গেছে, তেমনি অলঙ্কারের দ্বারা রূপ-রচনায় প্রথা-প্রসিদ্ধির অচলায়তন ভাঙারও উৎসাহ একটু একটু করে ফুটে উঠছে। অলঙ্কারের এ বিপরীত দ্যোতনা সংস্কৃতেও আছে। কিন্তু প্রচলিত প্রয়োগ-বিধিকে এমন স্পষ্টভাষায় কটাক্ষ করার পরিচয় অন্যত্র নেই।

কে বলে সখী, সরোজে শশীর নাহি পিরীত।
তার চাঁদমুখ নিরখিলে দেখ
হৃদয়-কমল হয় বিকশিত॥
তপনে কমলে প্রীত, এ নিয়ম অনুচিত,
অরুণ নয়ন, হেরে তবে কেন
হৃদয়-কমল হয় মুদিত॥

শশী-সরোজের প্রীতি অথবা অরুণ-কমলের বিসংবাদ যখন অলঙ্কার-রূপের মাধ্যমে কীর্তিত হয়, তখন প্রতিষ্ঠিত অলঙ্করণ-প্রসিদ্ধির রূপস্থাপনাকে প্রাচীন ও যুগের অযোগ্য বলেই ধার্য করা হয়। উদ্ধৃতির প্রথম ছত্রে, 'কে বলে সখী, সরোজে শশীর নাহি পিরীত।' এবং চতুর্থ ছত্রে, 'তপনে কমলে প্রীত, এ নিয়ম অনুচিত', বলে কবি যখন ঘোষণা করেন, তখন অলঙ্কারের মাধ্যমে প্রাচীন রূপস্থাপন-রীতির প্রতি কটাক্ষই করেন তিনি। অথচ, কবি স্বয়ং কোন নতুন

আলঙ্কারিক উপাদান (উপমেয়-উপমানগত) আপন নবযুগ-বাসনার থেকে সংগ্রহ করেন নি। কেবলমাত্র প্রাচীন অলঙ্কারের সাদৃশ্য-রীতিকে বিকৃত করে পুরাতনের রূপ-দৈন্য প্রকাশ করে দিয়েছেন। এ জাতীয় আরও কয়েকটি আলঙ্কারিক দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করব।

দেখ পিরীতের সই দুই গুণ।
দিবাকর নিশাকর, দুইএর গুণ যেমন॥
প্রচণ্ড তপনবৎ, বিরহ করে দাহন।
মিলন শশীস্বরূপ, সুধা করে বরিষণ॥

রাত্রিদিন একত্র প্রকাশ দেখ রাত্রিদিন।
কেশেরে বুঝহ নিশি, বদন অরুণ॥
তপন মুখ বলিতে, সন্দেহ নাহিক ইথে,
হেরিহে হৃদিকমল, প্রকাশে তখন।
কামিনীর মনসুখ, নিশিতে হয় অধিক,
কেশেরে তারধিক, করয়ে যতন॥

এ উপমা-ভঙ্গি বিদ্যাপতির কাব্যেও পাই। কিন্তু সেখানে রূপশোভার প্রয়োজনেই তার প্রয়োগ, প্রচলিত রীতিকে কটাক্ষ করবার জন্যে নয়। উদ্ধৃতি-গুলির স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের কাব্যে কবিমন আর প্রাচীন প্রথাসিদ্ধ অলঙ্কারের অনুগত হয়ে থাকতে চাইছে না। নতুন রূপসৃষ্টির ক্ষমতা তখনও ভাল করে জাগেনি, কিন্তু পুরোনোর প্রতি একটি অনীহা উগ্র হয়ে উঠেছে। তবে প্রথাগন্ধ যে একেবারেই লুপ্ত, তাও বলা যায় না। যেমন,

যাবে কেমনে হে কান্ত, এমন বরষাতে।
দেখ ঘন ঘন, বরিষে নয়ন, হইবে ভিজিতে॥
নিশ্বাস প্রলয় বায়, স্থির কি হইবে তায়,
খেদ সৌদামিনী, রাখি একাকিনী, শোকের পথেতে॥

দৃষ্টান্তের শেষাংশে আলঙ্কারিক প্রথারূপের অনুগমন-সঙ্কেত। দৃষ্টান্তের সুরুতে নতুন আরোপ-কুশলতার আভাস। এরূপ একটি আলঙ্কারিক রূপ-পরিচয় মধুসূদনের মেঘনাদবধ-কাব্যে সখি-সহ শোকাকুল চিত্রাঙ্গদার রাবণের রাজসভায় প্রবেশের মুহূর্তে দেখতে পাই। আবার, অলঙ্কার প্রয়োগের নবীন উদ্যমও এ সন্ধিকালের কাব্যে দ এক ক্ষেত্রে ঈষৎ আভাসিত।

কাজল নয়নে আর দিও না কখন।
শরে কেবা নাই মরে, বিষযোগ তাহে কেন ॥[১]

এখানে অলঙ্কারের বস্তু-উপাদান প্রথাগত, কিন্তু উপস্থাপনার ভঙ্গিটি আধুনিকতার ইঙ্গিতবহ।

সন্ধিকালের এ কাব্যে হৃদয়ভাবের ক্ষেত্রেও যেমন, অলঙ্কারের পরোক্ষ রূপকল্পনার ক্ষেত্রেও তেমনি, রূপান্তরের একটা সাড়া জেগেছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

'সৌন্দর্যভোগ সম্বন্ধে আমাদের একটা ঔদাসীন্য জড়িত সন্তোষের ভাব আছে। আমরা সৌন্দর্যরসের চর্চা করিতে চাই, কিন্তু সেজন্য অতি যত্নসহকারে মনের আদর্শকে বাহিরে মূর্তিমান করিয়া তোলা আবশ্যক বোধ করি না.............
আমাদের প্রাচীন কাব্যে প্রশংসাচ্ছলে গজেন্দ্র-গমনের সহিত সুন্দরীর মন্দগতির তুলনা হইয়া থাকে।...... তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের লোকেরা হাতি হইতে হাতির সমস্তটাই লোপ করিয়া দিয়া কেবলমাত্র তাহার মন্দগমনটুকু বাহির করিতে পারে, এজন্য ষোড়শী সুন্দরীর প্রতি যখন গজেন্দ্র-গমন আরোপ করে, তখন সেই বৃহদাকার জন্তুটাকে একেবারেই দেখিতে পায় না।'[২]

সৌন্দর্য সম্বন্ধে এই সন্তোষবোধটি মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের কবিমানসে থাকার ফলে বহুদিন ধরে কবিকল্পিত মূর্তিকে ভাবের অনুরূপ হবার দরকার হয়নি, সৌন্দর্য অনুভব করার জন্যে সুন্দর জিনিসের দরকার হয়নি। কোন একটা রূপবস্তুকে উপস্থিত-মত কল্পনা দিয়ে খাড়া করে হৃদয়ের ভাবাকুলতায় পরিপূরণ করে নিতে পারাতেই বাঙালী কবিচিত্তের সন্তোষ মিলেছে। তাই, বাংলা কাব্যের দীর্ঘ মধ্যযুগ ধরে আলঙ্কারিক রূপাঙ্কনের এমন একটা গড্ডলিকা প্রবাহ দেখা গেছে।

উপক্রম অংশের এখানেই শেষ। এবার আমরা কাব্যগুলিকে পৃথক পৃথক অধ্যায়ে বিশদ আলোচনার মধ্যে উপস্থিত করব। বিভিন্ন কাব্যরচনার সাল তারিখ নিয়ে বিচার মীমাংসা করিনি। তবে কালসীমার মোটামুটি হিসেব নিয়ে আলোচনাগুলিকে পরপর সাজিয়ে দিয়েছি।

১ নিধুবাবুর গানের উদ্ধৃতিগুলি 'কবিবর নিধুবাবুর গীতাবলী' থেকে গৃহীত।
২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পঞ্চভূত, 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ'।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চর্যাগানের উপমায় 'চিত্ত'

চর্যাগানে 'চিত্ত' নানান উপমান-বস্তুর সঙ্গে উপমিত।

হরিণ ; মুসা (মূষিক) ; মাআ হরিণী (মায়া হরিণ) ; মত্তহস্তী ; পিহাড়ী (পিঁড়ি) ; কর্ণধার ; তরু ; গগন ; কেড়ুআল (বৈঠা) ; ভুজঙ্গ ; বাণ ; তুলা ; খমনভতারি বা খমনসাঈ ; রুখের তেন্তলী ; দিবসই ; রাতি ; করুণা নাবী ; মাতেল গএন্দা (মত্ত গজেন্দ্র) ; বৃক্ষ ; হাঁড়ীত ভাত ; শৃগাল ; মনতরু ; বলদ ; গবিআ ;

'চিত্তে'র বিভিন্ন অবস্থা ও প্রকৃতি অনুসারে তাদের বিভিন্ন উপমান-বস্তু নির্ণীত।

১। যোগাবস্থায় স্থিত নির্বিকল্প চিত্তের উপমান,

মত্তহস্তী ; পিহাড়ী ; কর্ণধার ; গগন ; কেড়ুআল ; বাণ ; খমনভতারি ; রুখের তেন্তলী ; রাতি ; করুণা নাবী ; মাতেল গএন্দা ; হাঁড়ীত ভাত ; গবিআ ;

যোগাবস্থায় স্থিত নির্বিকল্প চিত্তের উপমান-বস্তুগুলিকে জাতি এবং প্রকৃতি অনুসারে কয়েকটি বিভিন্ন সারিতে সাজানো যায়।

(ক) পশুস্বরূপের সঙ্গে উপমিত—মত্তহস্তী ; মাতেল গএন্দা ; গবিআ ;

(খ) নাব্য উপমান-বস্তু—কর্ণধার ; কেড়ুআল ; করুণা নাবী ;

(গ) গৃহোপকরণের উপমান-বস্তু—পিহাড়ী ; রুখের তেন্তলী ; হাঁড়ীত ভাত ;

(ঘ) বিচিত্র উপমান-বস্তু—গগন ; বাণ ; খমনভতারি ; রাতি ;

দেখা যাচ্ছে, যোগ-সিদ্ধির আনন্দ এবং সাধন-নিষ্ঠাকে প্রকাশ করতে চর্যাকার যে সব উপমান-বস্তু ব্যবহার করেছেন, সেগুলিতে নির্বাচনের অনুরূপতা নেই।

'চিত্ত' সম্বন্ধে এই বহুতর উপমান-বস্তু উপমেয়ের স্বচ্ছ পরিচয়ের পথে বাধা স্বরূপ। চিত্ত কখনও কেড়ুআল, কখনও হাড়ীত ভাত, কখনও খমনভতারি, আবার কখনও বা মাতেল গএন্দা। ফলে শ্রোতার মন রূপবোধের ব্যাপারে বিভ্রান্ত। একটা অস্পষ্টতা এবং দুর্জ্ঞেয়তা এই যদৃচ্ছ সাদৃশ্য-সন্ধানের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল।

চর্যাকার হয়তো বুঝেছিলেন, রূপক অর্থে কেবল রূপ-গোপন-ক্রিয়াই একমাত্র। তা দিয়ে যে সৌন্দর্য স্থষ্ট হতে পারে, এবং রূপক ব্যবহারের মধ্যে সে শক্তির কথাই যে বড় কথা (অর্থাৎ তার আলঙ্কারিক দিক), সে বোধ হয়ত তাঁদের স্পষ্ট ছিল না। অথবা পক্ষান্তরে বলা চলে, গুহ্য যোগ-সাধনার অনুযায়ী করতেই চর্যাকার হয়ত সজ্ঞানে রূপকের প্রধান বৈশিষ্ট্যকে গৌণ করে তার অপ্রধান দিকটি আপন আকাঙ্ক্ষার পোষক করে তুলেছিলেন।

চর্যায় বিশেষ একটি উপমেয়-বস্তুর সঙ্গে বিশেষ একটি উপমান-বস্তুর সাধর্ম্য-সন্ধান নেই। অর্থাৎ বস্তুভার কমিয়ে দিয়ে একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে রূপস্থষ্টি করার অন্তর্ভেদী আগ্রহ অনুপস্থিত। প্রকরণের পর প্রকরণ সাজিয়ে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার রূপ-কে তাঁরা রূপকের আড়ালে গোপন করতে চেয়েছেন। তাঁদের সাধন-প্রক্রিয়ার এই পদ্ধতি মানব-জীবনের এক একটা বিশেষ বিশেষ কাজের আদ্যন্ত ভঙ্গির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। তাই নৌকা-বাওয়ার সমগ্র রূপক-কর্মক্রম এবং চিত্র-পারম্পর্য একত্রে চর্যাকারের সাধন-পদ্ধতির পারম্পর্যটিকে ইঙ্গিত করছে। অনুরূপভাবে হরিণ-শিকার, গৃহস্থালীতে ইঁদুরের উপদ্রবের ছবি, দাবাখেলার রীতিধারা ইত্যাদি খণ্ড চিত্র রূপকরূপে ব্যবহৃত। চিত্রগুলির বিভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে উপমান-বস্তুগুলির বিভিন্নতাও এসেছে। উপমেয়কে সুন্দর করার, বিশদ করার এবং স্পষ্ট করার আগ্রহ কবিমনে যদি প্রধান হত, তবে উপমানের সুষ্ঠু প্রয়োগের দ্বারাই কবি এই কাজ সহজে করতেন। কিন্তু উপমেয়কে গোচর করা নয়, গোপন করার দীক্ষাই তাঁদের ধ্যানানন্দ, এবং তার নিষ্ঠাই চর্যাগানকে গুরুগম্য দুর্জ্ঞেয়তা দিয়েছে।

(২) পার্থিব ভোগে বিড়ম্বিত চিত্তের উপমান,

হরিণ; মুসা; মাআহরিণ; ভুজঙ্গ; দিবসই; শৃগাল; মনতরু; তুলা; বলদ;

পার্থিব ভোগে বিড়ম্বিত চিত্তের উপমান-বস্তুগুলি প্রায়শ দুর্বল-প্রাণ, ভীত-চকিত এবং গোপন-স্বভাব পশু-স্বরূপের থেকে নেওয়া। অবক্ষিত এই চিত্তের সঙ্গে এক ক্ষেত্রে 'তুলা'র তুলনাবোধও পাই। তুলার লঘুত্ব ও সহজ-রূপান্তরশীলতার সঙ্গে এই অবস্থায় স্থিত চিত্তের নিরাপত্তাহীন চঞ্চলতার তুলনা-বোধ কবির মনে অবশ্যই ছিল। 'বলদ'এর সঙ্গে তুলনা কোথাও কোথাও আছে। অদীক্ষিত চিত্তে আসক্তির তীব্রতা এবং ভোগমোহ বলদের স্থূল প্রকৃতির সঙ্গে উপমিত।• 'দিবস'এর সঙ্গে এই চিত্তেরও তুলনা। বস্তুজগতের বিচিত্র রূপবিলাস দিনের আলোয়, আবির্ভাব-বিলয়শীল ক্ষণায়ু দৃশ্যবস্তুর রূপতর্পণের

মধ্যে চিত্তের শমতা নেই। তুলনাটি সার্থক। তরুর সঙ্গেও এই অব্যবস্থিত চিত্তের তুলনা। তরুর মত স্তম্ভিত জড়-স্বভাব চিত্তের এ অবস্থার একটা বড় লক্ষণ।

সমগ্র চর্যাপদে চিত্তেব মূলত দুটি পরিচয়। (১) যোগাবস্থায় স্থিত নির্বিকল্প চিত্ত। (২) পার্থিব ভোগে বিড়ম্বিত চিত্ত, এবং তারই স্তরভেদগত কয়েকটি অবস্থা। একটি ধ্যানশাসিত উদ্বুদ্ধ চিত্ত (বোধিচিত্ত ?), অন্যটি যোগবিরত প্রাকৃত জনচিত্ত। যোগমুক্ত দীক্ষিত চিত্ত সম্পর্কে চর্যাকারের যে পদমধ্যগত আত্মপ্রকাশ, সেখানে রূপক-ব্যবহারে পদকর্তার কেমন এক ধরনের দুর্জ্ঞেয় গোপন-প্রীতি প্রধান। আনন্দ প্রকাশের মধ্যে আত্মবিস্তারের আগ্রহ এখানে যেন কুণ্ঠিত। এর উপমা-ব্যবহারে রচয়িতা পাঠককে আনন্দের অংশ তো দেনই নি, উপরন্তু আত্মস্তুতির বিভোরতায় তাঁর মন যেন বিবশ। এসব চর্যাতেও রাগ-রাগিণীর নাম পাই অর্থাৎ গেয় হয়েও এর তাৎপর্যের গুরুগম্য গূঢ়তা কেবলমাত্র গোষ্ঠী-গত নিষ্ঠা এবং আনুগত্যের দ্বারা লভ্য।

পার্থিব ভোগে বিড়ম্বিত চিত্তের রূপক-প্রয়োগে পূর্ব প্রণালীর আড়ষ্ট গোপন-প্রীতি নেই। পরিবর্তে দেখা দিয়েছে স্পষ্টতা এবং নির্ণয়ী মনোবৃত্তি। চর্যাকারের অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। কেননা রচয়িতা অদীক্ষিত জনচিত্তের নির্ণয়ী। এখানে আত্মদর্শনের অহং এবং রুচি-স্বাতন্ত্র্যের তীব্র অভিমান নেই। যোগ-বিরত প্রাকৃত মন কিভাবে পরিস্থিতি এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করে অধোগতি পাচ্ছে, তারই একটি নিরাসক্ত দর্শন এসব রূপকে মূর্তিমান। যদিও চর্যাকার এখানে উপদেষ্টার উচ্চমঞ্চে আসীন, যদিও সাধারণ মানুষের মনকে যোগ-বোধে শিক্ষিত করার আগ্রহ তার মধ্যে ব্যক্ত, তবুও মন্ত্র-রহস্য বা প্রক্রিয়া-রহস্যের সার-সূত্রটি সহজে ব্যক্ত করতে তিনি সম্মত নন। যাজকতার আসক্তি এবং সম্বন্ধ-যোগ (দীক্ষিতের সঙ্গে অদীক্ষিতের) এখানে বর্তমান নেই। মন্ত্র-গোপনে এবং রহস্য-রক্ষায় প্রাধান্য-পরায়ণ যে যোগী-চিত্ত, তার দর্শনে তাই এক একটি নিরপেক্ষ চিত্র ফুটে উঠেছে।

চর্যাপদে রূপক ব্যবহারের মধ্যে রচয়িতার যে সজ্ঞান রূপবৈরাগ্য, কতকগুলি পদের ঘনিষ্ঠ আলোচনায় তার পরিচয় স্পষ্ট করা যাবে। গুণ্ডরীপাদের রচনা 'তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী' চর্যাকারের ভোগ-বৈরাগ্যের একটি বড় নজির। বলা হচ্ছে,

জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি॥

নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিচার করলে এখানে যোগসাধনার জটিলতা অনুপস্থিত, বোঝা যাবে। দয়িতার মুখ-চুম্বনের স্বাদ এবং আনন্দ যে কমল-রসপানের মত বিরলতম সুখবস্তু, এটি যেন কবি এক মুহূর্তের জন্যে আত্মবিস্মৃত মন নিয়ে চিন্তা করেছেন। কিন্তু বস্তু-জীবন সম্বন্ধে এই গভীর আস্তিক্যবোধ, দাম্পত্য-সুখের জন্য লালায়িত চিত্তখানি কিন্তু বেশিক্ষণ চুম্বনে মূর্চ্ছাতুর রইলো না। পর মুহূর্তেই কবি ঘোষণা করলেন,

সাসু ঘরেঁ ঘালি কোঞ্চা তাল।
চান্দসুজ বেণি পখা ফাল।।

জীবন সম্বন্ধে এই নিবিড়তম কল্পনা এবং উপভোগের এমন একান্ততম আসক্তি যোগসাধনার অগ্নিকুণ্ডে এক মুহূর্তেই বাষ্প হয়ে গেল। সাধকের যোগ কবির ভোগের ওপর জয় ঘোষণা করল। পদের শেষছত্রে কবি জানালেন,

নবঅ নারী মাঝেঁ উভিল চীরা।

কুক্কুরীপাদের রচনা, 'দুলি দুহি পিঠা ধরণ ন জাই'। পদটির রূপক, 'কোড়ি মাঝে একু হিঅহি সমাইড়'। সৌন্দর্য-সৃষ্টি তো দূরের কথা, বক্তব্যের স্বাচ্ছন্দ্যটুকুও এখানে লুপ্ত। পরিবর্তে অলঙ্কারের মাধ্যমে একটি অপরিচিত যোগসাধনার ইঙ্গিত দিতে গিয়ে কবি তৎকালীন সমাজের এক গোপন ব্যভি-চারের ছবি এঁকেছেন,

দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ।।[১]

চর্যা-রচয়িতা এ অংশটিতে কবি-কর্মের এক অপূর্ব সুযোগ অবহেলা করলেন। সমাজের এই বিশেষ চর্যা (আচরণ) গ্রহণ করেই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব কবি অপরূপ নিশাভিসারের ছবি দিয়েছেন, যা সমাজ-ব্যভিচারের গ্লানিকে গোপন করে অপরূপ এক আধ্যাত্মিক আনন্দে মুখরিত। চর্যারচয়িতা জীবনে এই ভোগের অবকাশটি তাঁর নির্জন যোগসাধনার অভিমানে উপেক্ষা করলেন। জীবনে রিক্ততার বেদনা, অভাবের আক্ষেপ সমাজের দোষ-দর্শনেই সান্ত্বনা পেল। বৈষ্ণব কবি সমাজের এই গোপন ব্যভিচারকে সুন্দরের মধ্যে বরণীয় করে তুলেছিলেন। পঙ্কের মধ্যে পঙ্কজের জন্ম-সম্ভাবনা তাঁদের চিন্তায় চরিতার্থ হয়েছিল। যোগসাধনার ঐশ্বর্য এবং মাহাত্ম্য-কীর্তন করতে গিয়ে

১ চর্যাগানের সবগুলি উদ্ধৃতি শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত 'চর্যাগীতি-পদাবলী' থেকে গৃহীত।

চর্যা-রচয়িতা মানুষের জীবনের স্বাভাবিক এবং সুন্দর উপভোগ-ক্ষমতাকে আক্রমণ করে বসেছেন। তাই বলি, নিরাসক্তভোগ-বৈরাগ্যই শুধু নয়, একটা সজ্ঞান ভোগদ্রোহ এই চর্যাকারদের জীবনে সকরুণ রসরিক্ততা এনেছিল।

এবার ভুসুকুপাদের রচনা, 'কাহেরে ঘিনি মেলি অচ্ছহু কীস'। সমস্ত পদটি ছবি হিসেবে হরিণ শিকারের একটি উপমা। হরিণের চঞ্চলতা, শিকারীর সন্ধানপরতা, হরিণের আতঙ্ক এবং আত্মমুক্তির উপায়, এ সবেরই পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু এ রূপকের উপমানগুলি যে উপমেয়ের স্পষ্টতা, চারুত্ব এবং ব্যাপ্তির সন্ধান দেবে, তা সাধন-অধিকারের দ্বারা সীমাবদ্ধ। অথচ সমগ্র কবিতাটির মধ্যে রূপের এমন এক তড়িৎপ্রবাহ রয়েছে যা এ রচনাকে অভিনব কাব্যগুণে মণ্ডিত করতে পারত। হরিণ এবং হরিণী উভয়ে উপস্থিত থেকেও তাদের অবয়বভার লঘু করতে করতে একেবারে লীন করে ফেলেছে। এ যেন দ্রুতসঞ্চারী মৃগচেতনা, মৃগ-চিত্র নয়। Metaphysical কবিতা রচনায় কবি John Donne যে কৃতিত্বের অধিকারী, সমগ্র চর্যাগানে এমনকি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে সিদ্ধাচার্য ভুসুকু একমাত্র সে জাতীয় কৃতিত্বের সমকক্ষতা করতে পারতেন। নারী-পুরুষের প্রেম-সম্পর্ক বোঝাতে Donne কম্পাসের দুটি কাঁটার কথায় রূপক এঁকেছেন,

> If they be two, they are two so
> As stiff twin compasses are two,
> Thy soul the fixed foot, makes no show
> To move, but doth, if th' other do.[১]

এ ধরনের নিখুঁত conceit ভুসুকুর আলোচ্য চিত্রাদির মধ্যে না ফুটলেও ভাবুকমনের একটা সমজাতীয়তা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যে তীক্ষ্ণ মননের বলে বাস্তব জীবনের সাধারণীকৃত ভাবগুলি conceit এ দানা বেঁধে ওঠে, ভুসুকুর তা ছিল না। অথচ সাধকের তীব্র উদ্বেগ হরিণের স্থূল আকারটি অনায়াসেই অপসৃত করতে পেরেছে।

চর্যাকার তাঁর সাধন-পদ্ধতিকে এমনই কঠিনভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ রেখেছেন যে, রূপকের ব্যঞ্জনাশক্তি এখানে সাধারণ শ্রোতার নির্বিশেষ মনে স্ফূর্ত হয় না। অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে কথার কাব্য-সম্ভাবনা চর্যাকারের রক্ষণশীলতার দ্বারা সমূলে বিনষ্ট। চিত্তের চঞ্চলতার সঙ্গে হরিণের তুলনা সংস্কৃত কাব্য এবং বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে। কিন্তু হরিণের আত্মভয়-ভীতির সঙ্গে সাধারণ

১ A valediction forbidding mourning. Love Poems. John Donne.
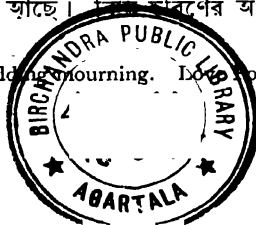
মানুষের মনে সংস্কার-গত যে সৌন্দর্যবোধ অগোচরে রয়েছে, তাকে প্রকট করেই এ সব কবিদের উপমা-ব্যবহার সার্থক। চর্যাপদগুলির বাণীতে অন্তর্জীবনের নিরাপত্তার দিকে চর্যাকারের মন এতই আবিষ্ট যে, ভয় উদ্বেগ এবং বিহ্বলতার মধ্যেও পলায়ণপর হরিণের একটি কমনীয় দুর্বলতা, একটি অরক্ষিত সৌন্দর্য[১] যে অবস্থান করতে পারে তা স্পষ্ট হবার সুয়োগ পায়নি। প্রতিরোধকামী দেহ-যোগ-সাধকের আত্মরক্ষা-কামনা এতই উগ্র যে রূপ-স্থষ্টির মধ্যে দিয়ে আত্মবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা এখানে অনুপস্থিত।

লুইপাদের রচনা, 'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল' পদটিতে রূপকে রচয়িতার আরোপ-পটুত্ব কাছে, নেই অন্তর্নিহিত রসদৃষ্টি। চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ করল, মানুষ অমৃতেব অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যু তাকে আচ্ছন্ন করছে, কারণ তার জীবন বৃক্ষের মতই জড়রূপী। সেখানে যোগসাধনার মধ্যে জীবনকে মৃত্যুজয়ী করার প্রতিশ্রুতি নেই। কায়া তরুবরের মতই মৃত্যুশীল। তাই বলা হল 'এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস'। সাধর্ম্য-সূত্রে যে উপমাটি আনা হল, তার মধ্যে কবি তাঁর বর্ণনীয়-বস্তুটি রূপে-রসে-রঙে বিস্তৃত করে দিলেন না। পক্ষান্তরে উপমার দ্বারা জীবন সম্বন্ধে একটা বিষন্নতার বোধ জাগিয়ে মানুষকে গতানুগতিক উপভোগ থেকে সরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন। সুতরাং 'কায়া'কে তরুবর নিজ শ্যামল পত্র-বিস্তারে সৌন্দর্য-মণ্ডিত করতে পারলো না। এক অর্থে উপমা-প্রয়োগ মানেই সৌন্দর্য-সচেতনতা ও রসস্পৃহা। না হলে এক বস্তুর মধ্যে অপরেব সাধর্ম্য খোঁজার প্রেরণা কোথায়? কিন্তু দার্শনিক তত্ত্ব[illegible]ী উপমা এই মৌলিক ধর্মরক্ষা না করে তার অর্থদ্যোতক শক্তির উপরই প্রধানত নির্ভর করে। আলোকমালার দ্যুতিময় সজ্জারূপ উপেক্ষা করে তার অন্ধকাব-নিবসনকারী প্রয়োজনার্থক দিকটাই কবিরা দেখেন। চর্যাপদের রচনায় রূপক আছে, রূপ-স্থষ্টি নেই। চর্যার রূপক সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলা চলে। কাব্যে সাধারণত রূপক অলঙ্কার ব্যবহার কবা হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বস্তুর প্রত্যক্ষ রূপ গোপন করে ব্যঞ্জনায় বা ইঙ্গিতে তারই একটি রমণীয় প্রতিরূপ স্থষ্টি করার জন্যে। আর চর্যাপদের তাত্ত্বিক আলোচনা করলে সহজেই বোঝা যাবে, চর্যাসাধক ও কবিরা তাঁদের সাধনার ক্ষেত্রে অধিকারী-ভেদ মানতেন। মন্ত্রের পবিত্রতা রক্ষা করাও তাঁদের সাধন-আকাঙ্ক্ষার অঙ্গীভূত ছিল। আর, আলঙ্কারিক রূপক যখন বস্তু-রূপ গোপন করতে

১ দুষ্যন্তের মৃগয়া। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। কালিদাস

পারদর্শী, তখন এসব গুপ্ত মন্ত্র রূপকের সাহায্যে বলতে পারায় চর্যাকবির অনেক আশ্বাস ছিল। আসলে, কোন সৌন্দর্য-সৃষ্টির আয়োজনে নয়, চর্যাপদের অলঙ্কার কেবলমাত্র সাধন-রীতির আচ্ছাদন (গোষ্ঠী-গণ্ডিতে উদ্‌ঘাটনও হতে পারে।) হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। কায়ার সঙ্গে বৃক্ষের তুলনা সংস্কৃত সাহিত্য এবং পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যেও পাই। সংস্কৃত সাহিত্যে দেহরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বৃক্ষ-শোভা উদাহৃত। কিন্তু দেহ-রূপের এক একটি প্রত্যঙ্গ কবির প্রাণে যে উল্লাস-সৃষ্টি করে, তারই আকর্ষণে বৃক্ষের এক একটি অংশ (সৌন্দর্যময় অংশ) আহৃত। সেখানে বর্ণনার স্পষ্টতা, বিস্তৃতি এবং বিশ্লেষণ-দক্ষতাই উপমা-সন্ধানের সূচক। পরবর্তী বাঙলা কাব্যে বৃক্ষের সঙ্গে কায়ার তুলনাও পাই। সেখানে কবির দৃষ্টিতে বস্তুরূপী বৃক্ষ ক্ষেত্র-বিশেষে কিন্তু দেহের সঙ্গে তুলিত হয়নি। বৃক্ষের রূপজাত আকর্ষণের চেয়েও তার আন্তর-স্বভাব, তার গুণ-গত প্রকৃতি কায়ার সঙ্গে উপমিত। আবার বৃক্ষের এই গুণগত প্রকৃতির সন্ধান সূক্ষ্মতর মানব-স্বভাবের মধ্যেই বিভাবিত। 'কি পেখলু নটবর গৌর কিশোর, অভিনব হেম-কল্পতরু সঞ্চরু (অবশ্য কল্পতরু প্রাকৃত বৃক্ষ নয়), সুরধুনী তীরে উজোর'। প্রতিবাদহীনতা এবং সহিষ্ণুতাধর্ম মানব-মন থেকেই বৃক্ষে আরোপিত। আবার সেই আরোপিত বোধটিকেই উপমান করে মানুষের (বিশেষ বিশেষ মানুষের) চরিত্র নির্ণয়ের কাজে উপমা হিসেবে লাগানো হয়েছে। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে উপমানবস্তুটি যতটা মন্ময় (subjective) ততটা তন্ময় (objective) নয়। এটি বৈষ্ণব-পদকর্তা গোবিন্দদাসের রচনাংশ। দ্বিজ হরিদাসের কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামে পাওয়া যায় (বৈষ্ণব-সাধক লোচনের কবিতাও স্মর্তব্য),

> কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
> মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষসম হইনু॥

এখানে (ঐ চর্যাপদ বর্ণনারই মত) কবিমনের সৌন্দর্য-সঞ্চার নেই। বৃক্ষের বিবেচনাহীনতা, জড়ত্ব এবং বদ্ধদশা মানুষের ঈশ্বর-চিন্তাহীন জড় জীববৃত্তির সঙ্গে উপমিত। তুলনার সাধর্ম্য আছে, কিন্তু উপমার সৌন্দর্য-স্বপ্ন অনুপস্থিত।

'চিত্ত'—এই সাধিত বা সাধ্যবস্তুর (কখনও সাধিত কখনও সাধ্য) উপমান সংগ্রহ করতে গিয়ে চর্যাকারের মনের যে সার্বিক রূপকুণ্ঠার পরিচয় পাওয়া গেল, উপরিউক্ত উদাহরণগুলির মধ্যে সে কথা স্পষ্ট হয়েছে। চিত্তের মূলত দুটি অবস্থার কথাই উপরের আলোচনায় উল্লিখিত। একটি যোগাবস্থায় স্থিত নির্বিকল্প চিত্ত, অন্যটি পার্থিব ভোগে বিড়ম্বিত চিত্ত। চর্যা-

পদের প্রথম দুটি উদাহরণ—'তিয়ড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী' এবং 'দুলি দুহি পিঠা ধরন ন জাই' চিত্তের ব্যাখ্যাত প্রথম অবস্থার নির্ণায়ক। এবং শেষের দুটি উদাহরণ 'কাহেরে ঘিনি মেলি অচ্ছহু কীস' এবং 'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল' চিত্তের ব্যাখ্যাত দ্বিতীয় অবস্থার নির্ণায়ক। প্রথম দুটি দৃষ্টান্তের মধ্যে রচয়িতার মনের সজ্ঞান রূপদ্রোহ যতটা প্রকট, শেষের দুটি দৃষ্টান্তের মধ্যে তেমন নয়। সেস্থানে রূপকুণ্ঠ এক অনিচ্ছুক রচয়িতার রচনার অবলীলা দেখতে পাই। রূপ-নির্মাণে এইসব চর্যাপদ 'চিত্তের' স্পষ্টতাকে গোচরে আনে, কিন্তু চারুত্বকে হৃদ্য করে তোলে না। প্রথম স্তরের উদাহরণে ঔপম্য 'চিত্তের' রমণীয়তা, স্পষ্টতা কিছুই নেই। পবিবর্তে একটি সজাগ রূপ-বিতৃষ্ণা কয়েকটি অসতর্ক মুহূর্তের আত্ম-বিস্মরণকে কঠোর যোগ-শাসনে তিরস্কার করেছে দেখতে পাই। ফলে এ সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক যে, চর্যাপদে অলঙ্কার আছে, আনন্দ নেই ; উপমা আছে, উল্লাস নেই ; রূপক আছে কিন্তু রূপ-সৃষ্টি নেই। আবার, কবিতায় অলঙ্কার-যোজনা প্রথাজীর্ণ হলে যে ম্রিয়মান রূপাঙ্কনের প্রাথমিকতা, তাও চর্যাপদের রচনারীতি নয়। চর্যাপদে উপমা-ব্যবহাব সম্বন্ধে যেটুকু অবশিষ্ট সত্য, তাব সাবাংশ হল, সৃষ্টির শক্তি থাকা সত্ত্বেও যে ইচ্ছার যোগ রচয়িতাব মনে আগ্রহ এবং আবেগ উদ্বেল করে দেবে, তার লক্ষণটি একেবারে লুপ্ত। চর্যাপদে ক্বচিৎ কাব্যধ্বনি শোনা যাব বলেই চর্যাকারের সৃষ্টির শক্তিকে স্বীকার করতে হয়। সাধনার সতর্ক শাসন চর্যাপদের সব-কথা হলেও শেষ-কথা নয়। আগেই বলা হয়েছে, চিত্রে এবং উপমায় চর্যাকারেব অতন্দ্র শাসন-প্রহবা কোথাও কোথাও শিথিল, [illegible]ম-কাঠিন্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অগোচব আত্মবিস্মরণেব বীজ নিহিত। এটা প্রকৃতির প্রতিশোধ, চর্যা-সাধকের জীবনেও তা স্বাভাবিক। চর্যাপদে যোগসজাগ সাধকের 'চিত্ত' পরীক্ষা করা গেল, এখানে কাব্য নির্বাসিত। এবারে ক্ষণবিস্মৃতযোগ সাধকের 'চিত্ত' পরীক্ষার পালা, কাব্যের চকিত নিশাভিসার সেখানে হয়ত দুরাশা হবে না।

চর্যাগীতির সাহিত্যকথা

চর্যাগানে একটি ভাবদ্বন্দ্ব আছে। এ দ্বন্দ্ব সাধন-শাসিত মনের সঙ্গে স্বভাব-সহজ মনের। সাধক-জীবন মানব জীবনকে আচ্ছন্ন করেছে পদে পদে। কিন্তু যেখানে উগ্র মানব-জীবনাকাঙ্ক্ষা সাধনার শিক্ষায় এবং সংযমে অবাধ্য, সেখানেই দ্বন্দ্বের দ্বৈরথ, সমশক্তিমান দুটি বোধের বিরোধ। মানব-কথা সেই ভাব-দ্বন্দ্বে উহ্য থাকেনি। প্রবল আসক্তির মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে, কিন্তু পরিসর এবং অবকাশ অজস্র নয় বলেই বাস্তব-মোহের উত্তেজনা অকস্মাৎ নিশ্চল হয়ে গেছে।

আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা
তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা ॥
কাহ্নু কহিঁ গই করিব নিবাস
জো মনগোঅর সো উদাস ॥

শুধু সমাজ-শাসন নয়, সাধনার শাসনও মানুষকে নির্বিঘ্ন জীবনভোগের পথে বাধা দিচ্ছে। 'নিবাস' করার যে কাঙ্ক্ষিত গৃহস্থ-পরিকল্পনা, তার অবসর জীবনে নেই। এ বোধ মনগোচর হলেই হৃদয়ে নৈরাশ্য আসে। বিলাস-ব্যসনে শিথিল ভোগ-জীবনের যেমন একটি মোহ এবং আসক্তি আছে, তেমনি কৃচ্ছ্রসাধনে ক্লিষ্ট বৈরাগ্যময় জীবনেরও একটি আকর্ষণ আছে। আর, চর্যা-সাধকের পক্ষে এ আকর্ষণ যে কত গভীর, সে কথা 'চিত্ত' পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি। একদিকে অতিপ্রবল সাধনার শাসন, অন্যদিকে মুক্ত মানব-মনের স্বভাব-কামনা। এই দুটি ভাবের দ্বন্দ্বে আলোড়িত জীবন থেকে ক্বচিৎ যে দীর্ঘশ্বাস পড়ে, ছন্দে স্পন্দিত কয়েকটি অনতিদৃষ্ট পঙক্তি আমরা পেয়েছি প্রক্ষিপ্ত কথার মত, সাধন-কথার নীরন্ধ্র গাম্ভীর্যের গায়ে গায়ে নিরুদ্ধ আবেগের বে-মানান-প্রলাপের মত। এগুলিই 'ক্ষণভঙ্গযোগ' সাধকের অবচেতন আত্মকথা, এগুলিতেই জীবনের যোগে আবেগের অল্পবিস্তর রঙ ধরেছে, এই বেদনার্ত মানব-কথা চর্যার সাহিত্যাংশ।

আমরা কয়েকটি চর্যাগান নিয়ে এই 'ক্ষণবিস্মৃতযোগ' সাধকের 'চিত্ত' পরীক্ষা করব। দেখা যাবে, মুহূর্তের যোগবিস্মরণের ফলে সাধক তার গভীর আসক্তি দিয়ে মমত্বময় গৃহী-জীবনের কামনা প্রকাশ করেছেন। কেবলমাত্র নির্লিপ্ত দর্শকের ছবি দেখা নয়, মগ্ন ব্যক্তি-জীবনের উত্তাপে যা সাহিত্যের

সত্য। চিত্রদানের নিপুণ এবং নির্ভুল উপস্থাপনাকে আমরা এ সব উদাহরণে সাহিত্যের সম্মান দিইনি, হয়ত দক্ষ বিচারের আলোয় দেখা যাবে, একটি ছবির মধ্যে বিষয়-যোজনার যে স্বীকৃত পরিমাণবোধ, তার প্রচুর অসদ্ভাব এই সব ছত্রে। তবু এই পরিচ্ছিন্ন ছত্রগুলি অসংলগ্নভাবে বক্তার অনুরাগে উষ্ণ একটি জীবন-বেদনার বাণীকে মরমীয় করে তোলে। অলঙ্কার ব্যবহারের সূক্ষ্ম পরিমাণবোধ হয়ত নেই, চিত্র-নির্মাণের রূপ-সন্নিবেশ একে হয়ত সার্থক করেনি, তবু সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যে গড়া পশ্চাৎবর্তী মানুষের জীবনকে লাভ করার অচেতন আসক্তি কয়েকটি অস্তব-কথায় ব্যাকুল। ছলনা নেই, শুধু অন্তরের আহ্বান আছে, এমন যে দু একটি ক্বচিৎ-দৃষ্ট কথা সমগ্র চর্যাপদে পেয়েছি, তাকেই আমরা সাহিত্যের মূল্য দিই।

গুড়রী রচিত 'যুগনদ্ধ হেরুক' চর্যায়,

> জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি
> তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি॥

রূপমোহ সৃষ্টিতে আবেগের চকিত আবির্ভাব এবং আকস্মিক নিশ্চলতা। পদকর্তার মন জীবনের কামনাক্ষণটিকে দীর্ঘস্থায়ী এবং বিলম্বিত করার সাহস করেনি। চর্যাপদের রূপ-রঙ-রস কিছুই যে একলা কবির মনের কথা নয়, তার ইতিহাস এইভাবেই আভাসিত। যে গুণে এই পদ্যাংশ সাহিত্যের শ্রেণীতে আসন পায়, তা হল, ত্বরিত-স্পন্দ একটি হৃদয়াবেগ অপরিসর অবস্থানে শ্রোতৃমনকে ক্ষণায়ু আলোয় উদ্ভাসিত করে। অগ্নিবিন্দু একটি স্ফুলিঙ্গের মত চকিত গতিতে তা পাঠক-হৃদয়ে অবগাহন করে। উষ্ণীষকমলের পরমার্থ-মধুপান করার উপমেয়টি হয়ত অনুসন্ধান করলে আবিষ্কৃত হতে পারে, কিন্তু তা ছত্রের মধ্যে অনায়াসে অনুস্যূত নেই। উপমেয়-উপমানের তুল্যযোগ চর্যাচিত্রে যে সব রূপক রচনায় নিযুক্ত হয়েছে, সেখানে দেখেছি, সাধর্ম্যের প্রাথমিক স্তরেই রূপক অলঙ্কারের সঞ্চার সীমাবদ্ধ। যোগ-প্রক্রিয়া উপমানের পারস্পর্যে তাৎক্ষণিক সাদৃশ্য-চেতনাকে হয়ত একটি সমান্তরাল রেখাচিত্রে স্থাপিত করে, অলঙ্কারের কৈবল্যই সেখানে সব কথা, তার মাধুর্য-বিস্তার অনভিপ্রেত। চর্যাপদে রূপক অলঙ্কারেরই একাধিপত্য। তবু রূপকের অন্তরশায়ী যে উপমেয়, তাকে অনুক্ত রেখে উপমানই যখন তার নিরপেক্ষ রূপে-রসে বাসনাকে বিমণ্ডিত করে দেয়, অলঙ্কার-সৌন্দর্যের দিক থেকে চর্যাপদে তখনই সাহিত্য-লক্ষণ অবারিত।

এবার কাহ্নুপাদের ‘অন্ত্যজ ডোম্বী’ চর্যার উদাহরণ নেওয়া যাক,

নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ
ছুই ছোই যাইসি বাহ্ম নাড়িআ ॥
অলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ ॥
এক সো পদমা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥
হালো ডোম্বী তো পুছমি সদ্‌ভাবে
অইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ ॥
তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চঙ্গতা
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়এডা ॥
তু লো ডোম্বী হাউঁ কপালী
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী ॥
সরবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ
মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ ॥

এ পদ তন্ত্রযোগীর উদ্‌ভট আসঙ্গলিপ্সার উজ্জ্বল চিত্র। নগরের সম্ভ্রান্ত সামাজিকতার বাইরে যে ‘ডোম্বী’র বসতি, সেখানে ‘লাঙ্গ জোই’ তার সঙ্গে সহবাস করতে চায়। তান্ত্রিক জীবনের এক মত্ত বীভৎসতা এ রূপকের মধ্যে ফুটে উঠেছে। সামাজিক জীবনের মধুর আশ্রম-শান্তির বাইরে মানুষের যৌন ক্ষুধার আদিমতম পাশবশলীলা চলে, তারই আভাস এ পদটির ছত্রে ছত্রে আঁকা। এ পদের পঙক্তিতে সৌন্দর্য আছে, কিন্তু জীবনের বৃহত্তর শুভবোধের অভাবে তা যেন নিরাপত্তাহীন। এ দেহ-ভোগ জীবনের বৃহৎ আশা-স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে, জীবনের অচঞ্চল কল্যাণদীপ ব্যভিচারের ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়ে সমাজকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি করে দেয়। জীবন-ভোগের প্রকৃত পথটা যখন রুদ্ধ, তখন অতৃপ্ত কামনা এই বিকৃত পথেই তার ক্ষুন্নিবৃত্তি করে থাকে।

এক সো পদমা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥

কল্পনায় অমার্জিত জীবনের উদ্দাম আসঙ্গলীলার ছবি ফুটিয়ে তোলে। ‘আলো ডোম্বী তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ’ কেমন যেন অশোভন আহ্বান, মোহময় পশু-শক্তিই যার কাম-তর্পণের একমাত্র উপায়। এ ছবিতে নায়ক নায়িকার বাস-ভূমির অপরিচয়, তাদের জীবনযাত্রার অ-সাধারণ রীতি, মিলনের নগ্ন আগ্রহ এবং তৃপ্তির আদিম উল্লাস, তাদের প্রীতিবোধ, তাদের বলিষ্ঠ জীবনবেগ,

সমস্তই এ পদের মধ্যে মূর্ত। উপমানের তীব্রতা এবং উত্তেজনা এত বেশি যে, বর্ণনীয়-বস্তুর কথাগুলিকে গৌণ করে দিয়ে একটি জীবন্ত ছবি এ পদে ফুটে উঠেছে। উপমান-বস্তু তার সাধর্ম্যের তীব্র আদর্শে এখানে উপমেয়কে জীবন্ত করেনি। আপন অন্তর্নিহিত শক্তির বেগে, রচয়িতার প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যে পাঠক-মনে এগুলি স্বয়ংক্রিয়। রূপকাশ্রিত উপমেয়-উপমানের 'ভূষ্য ভূষণ' ভাব এখানে নেই। বাইরের আক্ষিপ্ত বস্তু এখানে বর্ণনীয়কে অপসারিত করে নিজের দীপ্তিতে ভাস্কর। উপমেয়-উপমানের পরস্পর-স্পর্ধা-যোগ অনুপস্থিত। উপমেয় গৌণ (বরং উহ্য), উপমান মুখ্য (বরং একমাত্র), সাধনতত্ত্ব অবাঞ্ছিত, রূপনির্মাণ অভিনন্দন-ধন্য। তুলনার জীর্ণ প্রাথমিকতা নেই, কেবল চিত্রের গভীর ব্যঞ্জনা, অনুরাগে লালায়িত বাসনা একটি সমগ্র জীবনপদ্ধতিকে মূর্ত করে তুলেছে।

চর্যাগানে সাহিত্যকথার আরও একটি সত্য আছে। যোগসাধনার একনিষ্ঠ আগ্রহে তন্ময় মন মাঝে মাঝে যোগকাণ্ডের কৃচ্ছ্র-সাধনে ক্লান্ত হয়ে ফেলে-আসা গৃহস্থ জীবনের সুখ-শান্তির দিকে সকাতর নয়নে পিছন ফিরে চেয়ে দেখেছে। এই চেয়ে দেখার মধ্যে নির্লিপ্ত দর্শকের কোন মতবাদমণ্ডিত তাত্ত্বিক অভীপ্সা নেই, অপ্রাপনীয়কে হৃদয় থেকে বিদায় দেবার আগে শেষবারের মত যেন প্রাণ ভরে দেখে নেওয়া। অথচ একটি সুখী সমাজ-জীবন লাভ করা এই সব মানুষের পক্ষে মোটেই আকাশ-বাসনা ছিল না। অনায়াসেই যা জীবনে লাভ করা যায়, এমন একটি প্রাপ্য ভোগ, রূঢ় সমাজ-বৈষম্যের হাতে পড়ে জীবন থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। জীবনের সহজাত অধিকার যদি অকস্মাৎ অন্তর্ধান করে, তবে বাসনা করার ব্যথা মানুষের মনে থাকবেই। বাস্তব-জীবনে ভোগ করার সুযোগ না থাকলে বিষয়টি ভোক্তার মানস-জীবনকে দিয়ে ভোগ করিয়ে নেয়। বস্তু-জীবনের এমনই একটি মানস-উপভোগের অনুরাগ, কয়েকটি চর্যাগানে রূপে-রসে জীবনের স্পর্শ দিয়েছে। এ-ও ক্ষণবিস্মৃতযোগ সাধকের ভ্রান্তির ছবি, কিন্তু এ ছবির রস ত্বরিত উত্তেজনার ক্ষণিক মোহে ভোগবোধকে সচকিত করে দিয়ে যায় না, বরং একটি ধীর পরিবেশ-গঠনে এবং অচঞ্চল উপভোগে রূপ-কে মন্থর করে আনে। আগেই বলেছি, এ উপভোগ মানসিক। যোগী-জীবনের সুলভ ভাবাষঙ্গ থেকেই এসব চিত্রবোধ জন্ম নিয়েছে। সমাজ সংসারের প্রান্তে রিক্ততার শ্মশানে এ যোগী-জীবনের বসবাস, একদিকে গৃহবাসীর পারস্পরিক উত্তাপে উষ্ণ অভ্যস্ত জীবনযাত্রা, অন্যদিকে রূপরিক্ত শ্মশানভূমিতে সাধকের যোগীপীঠ। শান্ত উপভোগে মধুর গৃহস্থ-জীবনের আশ্রমশীর্ষে যখন দিনশেষের আলোটি রাঙা

হয়ে নামে, তখন ছিন্ন-মূল একটি মানব-ভাগ্যের বঞ্চনার পরিতাপ দীর্ঘশ্বাসে ছড়িয়ে পড়ে। চর্যাসাধকের এই পথ-চাওয়া আকুলতা 'পথ চলতে বধূ যেমন নয়ন রাঙা করে, বাপের ঘরে চায়'।

দুটি চর্যাগান এখানে উদ্ধার করব, যার বিশদ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন, কেবল বলার কথা এইটুকুই যে, এখানেও রূপক আছে, উপমেয় অপসারিত হয়েছে, উপমানের নিজস্ব মোহে একটি নিরপেক্ষ জীবন-কথা অবারিত। চর্যার সাহিত্যাংশ এইটুকুই, যেখানে যোগ-ভঙ্গে আত্মবিস্মৃত সাধক সুখী জীবনের দিকে শেষবারের মত রাঙা চোখে চেয়ে দেখছেন। চর্যার বাকি অংশ সাহিত্য নয়, তা পুরোপুরি যোগ-সাধনাই, যার সঙ্গে ডাকার্ণব দোহাকোষ ইত্যাদির কোন ভেদ নেই।

প্রথম উদাহরণ,

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরি
নিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দরী॥
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী॥
তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই॥
গুরুবাক পুঞ্চআ বিন্ধ ণিঅ মণে বাণেঁ
একে শরসন্ধাণেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণেঁ॥
উমত সবরো গরুআ রোষে
গিরিবর-সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে॥

দ্বিতীয় উদাহরণ,

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হিএঁ কুরাড়ী
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে সুষাড়ী॥
ছাড় ছাড় মাআমোহা বিষমে দুন্দোলী
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণ মেহেলী।
হেরি যে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা
যুকড় এবে রে কপাসু ফুটিলা॥

তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ী তাএলা
ফিটেলি অন্ধারি রে অকাশ ফুলিআ ॥
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা
অণুদিণ শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা ॥[১]

এবার, সেইজাতীয় দু একটি চর্যাগান আলোচনা করব, যেখানে অলঙ্কার আছে, কিন্তু আনন্দ নেই। এই ধরনের রূপক চর্যাগানে প্রায়শই মেলে, কিন্তু কবিমনের অনুরাগ এবং আবেগের দ্বারা রঞ্জিত হয়ে পাঠকের প্রাণে একটি জীবনরস অনুস্যূত করে দিতে পারে না। ভুসুকুর 'হরিণ আখাটি' চর্যাটি বিশদভাবে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, সুতরাং এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখন চাটিল-শিষ্যের 'নদী-সাঁকো' চর্যা 'ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী' আলোচনা করা যাক। সমস্ত পদটিই রূপকের দ্বারা আচ্ছন্ন। চর্যাকারের বর্ণনীয় বস্তুগুলি কয়েকটি উপমানের মধ্যে একটি কাজের ধারারূপ নিয়েছে। নদী গহন গম্ভীর, তাতে খরস্রোত; দুধারে পাঁক, মাঝখানে অথৈ জল। তার উপর সেতু গড়ে দেওয়া হল, পারগামী লোক যাতে অনায়াসেই পার হতে পারে। বড় বড় গাছ কেটে তক্তা বানিয়ে এই সাঁকো তৈরী হল। এ সাঁকোতে চড়লে এপাশ ওপাশ তাকাতে নেই, তা হলেই অনায়াসে পার হওয়া যাবে। ছবিটি জীবন্ত, কিন্তু নিত্য পরিচয়ের দ্বারা এতই জীর্ণ যে তাকে উপমান করে সৌন্দর্য-সঞ্চারের কাজে লাগানো যায় না, কেননা জীবনের কোন আদর্শ-সম্ভব স্তর থেকে একে সংগ্রহ করা হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত মানুষের প্রাণে পুলক-সঞ্চার করার মত কোন অভিনবত্ব এ কর্ম[illegible]মের মধ্যে নেই। ভবপ্রবাহ এবং জীবনপ্রবাহ এ রূপকের মধ্যে স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু জগৎ ও জীবনের কতকগুলি প্রাথমিক ও পরিচিত লক্ষণের সঙ্গে মিল করে উপমান-বস্তুকে সজ্ঞান মন নিয়ে কবি সাজিয়েছেন। অন্তঃপ্রেরণার গভীর ইঙ্গিতে এ সমস্ত উপমা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসতে পারে নি। তাই চর্যাকারের আসল বক্তব্যের অলঙ্কার-মূল্য এ সব রূপকে নেই, এরা কেবল কথাকে দুর্জ্ঞেয় করার কাজে হাত লাগিয়েছে।

কামলি'র 'সোনে ভরিলী করুণা নাবী' চর্যাটিতে রূপক সংগৃহীত হয়েছে নাবিক জীবনের মধ্যে থেকে। নাবিকের উদ্যম, উদ্যোগ, তৎপরতা, সাবধানতা ইত্যাদির সঙ্গে নৌচালনার সমগ্র আয়োজনটি চর্যাকার তাঁর বক্তব্যের রূপক নির্মাণে ব্যবহার করেছেন। ভারতবর্ষীয় পরলোক-চেতনা

১ চর্যাগানের সবগুলি উদ্ধৃতি শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত 'চর্যাগীতি-পদাবলী' থেকে গৃহীত।

বহুকাল থেকেই জলপথ, নৌকা, নাবিক, খেয়াপার, পরপার ইত্যাদি রূপকের ইঙ্গিতে রচিত। কেবল ভারতবর্ষীয় নয়, পাশ্চাত্যে১ও এ দৃষ্টির সন্ধান মেলে। নাবিক জীবনের একটি সামগ্রিক কর্মোদ্যম এ চর্যাপদের রূপকের মধ্যে মূর্ত। রূপকটি আবেদনে সার্বভৌম হতে পারতো, কেননা ভারতীয় মনে এ রূপক-সংস্কার দীর্ঘপোষিত। পরলোককামী আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার দেশে এসব রূপকের রসে একটা স্থায়ী সৌন্দর্য-মূল্য থাকে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পূর্বোক্ত চর্যাটিতেও আমাদের তীর্থাভিলাষ চরিতার্থ হবার রূপক-আয়োজন ছিল। কিন্তু যে নির্মোহ বৈরাগ্যবোধ এবং অচঞ্চল অধ্যাত্ম-আকাঙ্ক্ষা এ সংস্কারকে সবল করবে, চর্যাকবির মানসপটে সে প্রতিশ্রুতি নেই। প্রাণভয়-ভীত মানব-গোষ্ঠী যেখানে আত্মরক্ষায় আকুল, সেখানে বৈরাগ্যের শান্তি-প্রত্যাশা আকাশ-কুসুম মাত্র। তাই এ পদগুলি পরলোক-বাসনা বা তীর্থাভিলাষ চরিতার্থ করার মত উচ্চ মার্গ থেকে জীবনের কথা বলেনি। রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের কবিতায় সে পরলোকপ্রিয়তা এবং ইহলোক-বৈরাগ্য উপমায় ব্যক্ত। সেখানে আপনাকে নিবেদন করার একটি স্থিবপ্রতিজ্ঞা অচল হয়ে আছে। কিন্তু চর্যার গান ইহ-লোকের উপভোগের প্রতি তীব্রতম অনাস্থা নিয়েই গড়ে উঠেছে। এ অলঙ্কারের যে নিরাভরণ রিক্ততা, তা বৈরাগ্যের ক্ষমাসুন্দর রূপ নয়। আসলে জীবন এক্ষেত্রে পৃথিবীকে আরও মনোরম, আরও সুখকর করে গড়ে তোলার স্বপ্ন-বাসনা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। উপমার মধ্যে যে সাদৃশ্যের সুলভ প্রাথমিকতা, তার মূলেই রয়েছে রচয়িতার রূপকুণ্ঠ মন, যা তত্ত্বের আড়ালে আত্মরক্ষাশীল। তাই এখানে অধ্যাত্ম-সৌন্দর্য ও প্রত্যাশা করা যায় না। উপরন্তু, সাদৃশ্যের দ্বারা বস্তুর গভীর বৈচিত্র্যকে স্পর্শ করার, তার অনাবিষ্কৃত রহস্যকে জানবার কবি-কৌতূহলও এখানে নেই। রূপক আছে অথচ অনুরাগ নেই, তাই এ ছবি জীবন্ত হয়েও পাঠকের চেতনাকে কবুল করিয়ে নেয় না। সমস্ত অভিজাত হিন্দু-দর্শন-বিরোধী ধর্মতত্ত্ব আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতেই নিজ শক্তি নিঃশেষ করেছে। চর্যাগানের উপমা কেবল হাতছানি দেয়, রূপ-লোকের গভীরে নিয়ে যায় না। জীবনের বিবরণ এবং তার নিছক কর্মতালিকা সাহিত্য নয় বলেই চর্যার এইসব অজস্র রূপক-চিত্র সাহিত্যমূল্য পায় না।

১. Crossing the bar. Lord Tennyson.

চর্যাগীতে উপমার স্থান

চর্যাগানের উপমা-বিচার এ পরিচ্ছেদের প্রস্তাব নয়. চর্যাপদকর্তাব উপমা-প্রয়োগরীতি অনুসরণ করাই আমাদেব উদ্দেশ্য। তবে ব্যবহার-বিধি বুঝতে গিয়ে কোথাও কোথাও হয়ত প্রাসঙ্গিক ভাবে তাব আলোচনাও করতে হবে।

চর্যাগীতি পাঠের আলঙ্কারিক ফলাফল. তার রূপক ব্যবহারের একাধিপত্য। প্রায় পঞ্চাশটি চর্যাগান এবং 'পরিশিষ্ট' অংশের চৌদ্দটি অপূর্ণপদ, সবগুলিতেই রূপক অলঙ্কার একচ্ছত্র। অবশ্য এসব পদে ব্যবহৃত রূপকের প্রকৃতি ব্যবহারেব গুণে (বা দোষে) বিচিত্র হতে পারে, তবু জাতি হিসেবে এদের গোষ্ঠীসূত্র এক। এখন প্রশ্ন এই. অলঙ্কার-প্রয়োগের ক্ষেত্রে চর্যাগানে রূপক অতিপ্রধান হওয়ার কাবণ কি? চর্যাপদকে ধর্মীয় আত্মপ্রকাশের চিহ্ন বলে যদি সূচিত করি, তবে ঐতিহ্য সংস্কারের সূত্রে চর্যারচযিতার মনোভাব অস্বচ্ছ থাকে না। রূপকের দ্বারা আত্মসত্য-নির্ণয়. হিতোপদেশ. জীবন এবং জগৎ-চিন্তা বৈদিক কাল থেকেই একটা প্রথাগত নিযমেব মত প্রাচীন ভাবতবর্ষীয় ধর্মবোধে অনুসৃত হয়ে আসছে। আখ্যান রূপক (Allegory), উপ-রূপক (Parablc), কথা-রূপক (Fable) ইত্যাদিব মাধ্যমে উপনিষদের বহু তত্ত্বভাবনাই ব্যাখ্যাত। আর. চর্যাগীতির রহস্যময় 'সন্ধ্যা' চিন্তা যখন পিতৃপবিচযহীন স্বয়ম্ভূ সাধনা নয়, তখন রূপক ব্যবহারের দ্বারা এ সংস্কার সমর্থিত হতে পাবে। চর্যাসাধকে মূলত ছিলেন বেদ-বিরোধী। চর্যাগান এবং দোহাকোষে এ ধারণার অজস্র ইঙ্গিত আছে।

চর্যা

জাহেব বাণ-চিহ্ন রূব ণ জানী।
সো কইসে আগম-বেএঁ বখানী॥

জে সচবাচব তিঅস ভমন্তি।
তে অজবামব কিম্পি ন হোন্তি॥

দোহা

ঝাণ বাহিঅ কি কীঅই ঝাণেঁ।
জো অবাঅ তহি কাহিঁ বখাণে।

দেব ম পূজহু তিথ ন জাবা।
দেবপূজাহি মোক্‌খ ণ পাবা॥

ধর্মীয় সাধনগীতির প্রথানুগতি ছাড়া একটি আলঙ্কারিক কারণকে এ ব্যাপারে ক্রিয়াশীল দেখি। সেটি রূপক অলঙ্কারের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। সাধারণ উপমার মধ্যে উপমেয়-উপমানের যে সাধর্ম্য-বিবৃতি, রূপকে তা ঘনীভূত হয়ে একটা সংহত রূপ নেয়। উপমার (Simile) মধ্যে উপমেয়-উপমানের যে বস্তুগত বা ভাবগত দূরত্ব, রূপকে তা অপসারিত হয়ে উপমেয় উপমানের দ্বারা গ্রস্ত হয়ে ওঠে। রূপমোহের এই ঘনীভূত অবস্থাটি রূপকে পাই বলেই সেখানে উপমেয়-উপমানের রূপসম্পর্ক বা ভাবসম্পর্ক অতি নিকট। রূপক-নির্মাণের জন্য একটি উপমান সংগৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা কেবলমাত্র উপমেয়ের সঙ্গে লগ্ন হয়ে তার সৌন্দর্যবৃদ্ধি করে না, বরং একটু সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, আরোপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উপমাটি বস্তুর স্থূল (দৃষ্টিগোচর বা অনুভূতিগোচর) আকারটিকে (অর্থাৎ উপমেয়ের স্থূল অভিধাকে) আত্মসাৎ করে নেয়, এবং তারপর আপন সৌন্দর্যে বিমণ্ডিত করে তাকে একটি অভিনব মূর্তিতে উপস্থাপিত করে। বর্ণনীয়-বস্তুর এই নতুন উপস্থাপনা তার নিজ প্রাথমিক পরিচয়ের রূপ-দৈন্য থেকে মুক্তি পেয়ে বিভূষিত মূর্তি লাভ করে। সুতরাং, রূপক-স্বভাবটি সামগ্রিকভাবে চিন্তা করলে পাই, প্রথমে বস্তুর স্থূল রূপকে ঈষৎ স্বীকৃতির পর গোপন করার পরিচয় এবং পর-মুহূর্তে তাকে এক নতুন সৌন্দর্যে গোচর করার শক্তি। রূপগোপন ক্রিয়া এবং রূপগোচর ক্রিয়া, এই দুটি ক্রিয়াকে আমরা রূপক অলঙ্কারের মধ্যে লাভ করি। এবার চর্যাকারের রচনার শপথটি স্মরণ করা দরকার।

অইসণি চর্যা কুক্কুরীপাত্রঁ গাইউ
কোড়ি মঝেঁ একু হিঅহিঁ সনাইউ॥

কোটির মধ্যে কেবলমাত্র যে কোন একজনেরই বোধ্য হলে চলবে না। যে শুধু এই পথেরই যাত্রী, তার পক্ষেই তা বোধগম্য।—'মূঢ়া হিঅহি ণ পইসঈ।' সুতরাং এই প্রখর অধিকারীভেদজ্ঞান এবং সজাগ গূঢ়ার্থ-গোপন-বাসনা চর্যাপদকর্তার মনে ক্রিয়াশীল ছিল বলেই সাধন-তত্ত্বের সমস্ত সূত্রগুলি রূপকের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। চর্যাপদের সাধন-ঐতিহ্যের আলোচনাকালে দেখতে পাবো, এ তত্ত্বকথার উৎস অনেক

প্রাচীন। চর্যার রূপক অলঙ্কার সাধারণের পক্ষে ভাব-দুর্গম হলেও সাধক-গোষ্ঠীর পক্ষে সুবোধ্য থাকা স্বাভাবিক। তাই গোষ্ঠীগত ভাবশুদ্ধি রূপকাশ্রিত করার প্রয়োজনও ছিল। সেকালের রচয়িতার মনের কোন ইতিহাস আমরা পাই না, ফলে এ অনুমান হয়ত সম্ভাব্য হবে যে চর্যাকার রূপকের রূপ-গোপন-ক্ষমতাটিকে আপন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কাজেই লাগাতে চেয়েছেন। এরপরে প্রশ্ন দাঁড়ায়, রূপ গোপন করার আগ্রহ নিয়ে চর্যাকার যদি রূপক অলঙ্কারই ব্যবহার করে থাকেন, তবে এ রচনাব মধ্যে রূপকের সৌন্দর্য-উচ্ছ্বাস সুলভ হল না কেন? পূর্ববর্তী 'চিত্ত' এবং 'সাহিত্য' পরিচ্ছেদে আমরা চর্যা-সাধকের জীবনের ভোগবৈরাগ্য এবং ভোগদ্রোহের কথা আলোচনা করেছি, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শুধু বক্তব্য, ভোগবৈরাগ্য এবং ভোগদ্রোহ থেকেই চর্যা-সাধকের মনে রূপবৈরাগ্য এবং রূপদ্রোহের জন্ম। কিন্তু বস্তুজীবনের আবেগ এবং অনুরাগ ছানিয়ে নিয়েই অলঙ্কারেব আনন্দ। ভোগের ভাগ্যে বঞ্চিত এই মানুষগুলির আত্মপ্রকাশে তাই রূপকের মত একটি অলঙ্কারের পরিপূর্ণ সহযোগ নেই। তত্ত্বের তাৎপর্য সুলভ হযে উঠতে পাবে এই আশঙ্কাই চর্যাসাধকের অলঙ্কার-ব্যবহারকে রূপগোচর হযে উঠতে দেয়নি। রূপকের মধ্যে যে সৌন্দর্যশক্তি অন্তরশায়ী, চর্যাসাধক তাকে আপন প্রাণের অনুরাগময় পরিচর্যা দিয়ে বিকশিত করে তোলেন নি। পক্ষান্তরে তাঁর মনের সজ্ঞান রূপকুণ্ঠা রূপকের অনায়াসে সঞ্চারশীল আনন্দের পক্ষশাতন করেছে। চর্যাপদে রূপক প্রায় একাধিপত্য কবলেও উপমার পরিপূর্ণ রসমন্থনে রচয়িতা অনিচ্ছুক। এবার উদাহরণের দ্বারা আমাদেব প্রস্তাবের একটা পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। 'লুই'র চর্যার প্রথম দু ছত্র,

> কাআ তরুবর পঞ্চ-বি ডাল।
> চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥

এখানে 'কায়া' এই বর্ণনীয়-বস্তু 'তরুবর' এই উপমানের সঙ্গে অভেদ-যুক্ত হওয়াতে রূপক হল। 'পঞ্চ-বি ডাল' উপমানের উপমেয় 'পঞ্চ-ইন্দ্রিয়' অনুক্ত থাকলেও রূপক-প্রক্রিয়াটি বুঝে নিতে আমাদের কোন বিঘ্ন হয় না। এখানে একটি ব্যাপার সহজে লক্ষ্য করা যাবে যে, পঞ্চ-ইন্দ্রিয় যেহেতু কায়ার আধারে স্থিত রয়েছে, সেইহেতুই মোহনাশের

আকাঙ্ক্ষায় আকুল চর্যাসাধকের প্রথম উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়-বিনাশের দ্বারা কায়া-শোধন অথবা কায়াসাধন। 'ভুসুকু'র চর্যাতে পাই,

দহিঅ পঞ্চ পাটণ ইন্দি-বিসআ ণঠা
ণ জানমি চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা ।।

'ভুসুকু'র মনে 'চিত্ত' সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন উদ্বেগ নেই, কেননা পঞ্চপাটন-রূপ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ইতিমধ্যে দগ্ধ হয়ে বিনষ্ট হয়েছে। পূর্বোক্ত 'লুই'র চর্যাতেও রচয়িতার প্রথম লক্ষ্য, 'পঞ্চ-বি ডাল'-রূপ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, যাকে বিনষ্ট করে 'কায়াতরু' মোহনির্বাণমার্গে নিযুক্ত হবে। চাটিল-শিষ্যের 'নদী-সাঁকো' চর্যায় 'কায়াতরু'র এই পরিণামই দেখি,

ফাড়িঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ
আদঅ দিঢ়ি টাঙ্গী নিবাণে কোড়িঅ ।।

সাধকের দৃষ্টিতে কায়া যখন মোহময় তরু আর তাকে বিদীর্ণ করে তার বিকাশ-শক্তি ধ্বংস করাই যখন সাধন-আদর্শ, তখন কায়া-বৃক্ষের বিকাশক-শক্তি অর্থাৎ পল্লবনির্ভর সঞ্চারশক্তিই চর্যাকারের প্রথম বধ্য। যেহেতু 'পঞ্চপল্লব'-রূপ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় যোগসাধনার বিশেষ বাধা-স্বরূপ, সেইহেতুই এ উপমান 'পঞ্চপল্লব' চর্যাকারের প্রধান উদ্বেগের বিষয়। আর পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের নিরবশেষ বিনষ্টিই এ যোগাচারের কামনা, দেহের নির্মূল উচ্ছেদ নয়। কেননা দেহ-নির্ভর এ কায়াসাধনায় দেহই প্রধান অবলম্বন, তাকে অবলুপ্ত করা নয়, পরিশুদ্ধ করাই চর্যার শিক্ষা। সুতরাং পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে উন্মূল করতে হবে, দেহকে উত্তীর্ণ করতে হবে, এই হল চর্যা-সাধকের শপথ। বিকশিত পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দিক-বিস্তারের পথ ধরে কায়ার অন্তরশায়ী 'চিত্তে' যেমনভাবে কাল প্রবেশ করেছে, তেমনিভাবেই একটি নির্মম নিষেধবুদ্ধি নিয়ে চর্যাসাধকের রূপাক্ষিপ্ত মন পঞ্চপল্লবের পথে তরুর অন্তরে প্রবেশ করেছে। ভোগমোহ যে তরুকে পল্লবিত মুকুলিত পুষ্পিত করে আপন আরোপদক্ষতায় ধন্য হতে পারতো, চর্যাসাধকের ভোগদ্রোহ আপন সাধনার প্রতিষেধিকা শক্তিতে সে বিকাশকে আকুঞ্চিত করে দিয়েছে। তরুর পাঁচটি ডাল পাতায় পাতায় সবুজ হয়ে রূপ-রস-গন্ধের সোহাগে রসিকের মনে নিমন্ত্রণ পাঠায় না, তথ্য-বিবরণের

একটা নিষ্ফল লাঞ্ছনায় তা বর্ণহীন। 'কাহ্ন'এর 'নিষ্ফল বৃক্ষ-ছেদ' চর্যাতে এ বক্তব্য আরও স্পষ্ট,

মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা
আসা বহল পাতহ বাহা ॥
বরগুরুবঅণে কুঠারেঁ ছিজহ
কাহ্ন ভণই তরু পুণ ন উইজঅ ॥

পঞ্চইন্দ্রিয়-রূপ পঞ্চশাখার পথেই মন-রূপ তরুর মধ্যে রচয়িতা প্রবেশ করেছেন। সুন্দরকে তার সঞ্চার-ক্রমের অনুগত হয়ে না দেখে তাকে বিপরীত ভাবে দেখার ফলেই বৃক্ষের বৃদ্ধি এবং বিস্তার, তার পুলক-হিল্লোল অতিশাসনের আড়ষ্টতায় রূপগোচর হয়ে ওঠেনি। উপমানের যোজনা তাই এ ক্ষেত্রে আলঙ্কারিক হলেও আনন্দশূন্য। উপমেয় পঞ্চইন্দ্রিয়, আশা, ভোগকায়া, বহির্মুখ মন ইত্যাদি সাধনায় অনভিপ্রেত বলেই তাদের রূপপ্রকাশক উপমান পঞ্চশাখা, বৃক্ষপত্র, তরু ইত্যাদি চর্যারচয়িতার অনুরাগে লালিত নয়। এ বক্তব্য এইজন্যেই সত্য, যেখানে অন্যত্র 'তরু' (এই উপমান ব্যবহার) চর্যা-সাধকের কাঙ্ক্ষিত উপমেয়-বস্তুকে রূপগৌরবে মণ্ডিত করে তার সহজাত সঞ্চারশক্তিকে মনোহর করে উপস্থিত করে।

তীল্‌পা ও সরহের দোহা,

অদ্দঅ চিত্ত-তরুঅনহ গউ তিহুবণেঁ বিত্থার।
করুণা ফুল্লী ফল ধরই ণাউ পরত্ত উআর ॥[১]

এই জাতীয় রূপক ব্যবহারের দুটি একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করলেই চর্যাসাধকের অলঙ্কার-প্রয়োগের সমগ্র পদ্ধতিটি স্পষ্ট হবে। 'শবর-শবরী প্রেম' চর্যায় শবর-পাদ বলেছেন,

ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।

পরিশিষ্ট পর্যায়ে 'শবর' এর আরও একটি চর্যাতে পাই,

অপূব্ব বসন্ত দুকেল্লা শবরো অম্বর ফলই ফুল্লই।

১ শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত 'চর্যাগীতি-পদাবলী' ধৃত।

উপরের উদাহরণগুলির প্রতিক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, চর্যাসাধকের সাধন-ধারণা অনুযায়ী আকাশ যেখানে তরুর মত কুসুম ফোটায়, পত্র-পল্লব বিস্তার করে, ফল ফলায়, সেখানেই বৃক্ষজন্মের সার্থকতা।

গঅণ-শিহরেঁ **জই ফুল্লই ফুল্ল**
শান্তি ভণই তবেঁব **তুট্টই ভুল্ল**।

রচয়িতার কণ্ঠ বিস্ময়ে আনন্দে চকিত। 'মৌলিল রে,' 'অপূব্ব বসন্ত' ইত্যাদি বিস্ময়বোধক বাক্যাংশই তার প্রতিপাদক। কিন্তু যেখানে মাটির মানুষ তরুর মত পুষ্পে-পল্লবে ফলে-মুকুলে আপনাকে বিকশিত করতে চায়, সেখানেই চর্যাসাধকের নিষেধ। 'অম্বর ফলই ফুল্লই' অর্থাৎ আকাশে কুসুম-কামনার সাধন-আগ্রহ হয়ত সাধারণ রসিকের ভোগবাদী দৃষ্টিতে নিছক রামধনু-স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু 'অম্বর' অথবা 'গঅণ' যেখানে চর্যাসাধকের ঐকান্তিক প্রার্থনার মধ্যে প্রতিমুহূর্তে মিশ্রিত হচ্ছে, সেখানে এই 'গঅণ'-রূপী প্রভাস্বরশূন্যতা প্রত্যক্ষগম্য কোন বাস্তব না হলেও তা সাধকের পক্ষে একটি ধ্যানের বাস্তব অবশ্যই। আবার চর্যাকার যাকে নিয়ত স্মরণের মধ্যে প্রতিক্ষণে লাভ করছেন, তার স্বরূপ,

আই ণ অন্ত ণ মজ্ঝ ণউ ণউ ভব ণউ নিব্বাণ।
এহু সো পরমমহাসুহ ণউ পর ণউ অপ্পাণ।।[১]

অবাঙ্-মানসগোচর যে নির্গুণ সাধনবস্তু, তাকে উপমেয় করতে হলে উপমানরূপে 'অম্বর-তরু'র যোজনা কোনমতেই অসঙ্গত হতে পারে না। আকাশের মত আদি-অন্তহীন, উদার উজ্জ্বল বিস্তারকেই সে কারণে চর্যাসাধক বৃক্ষরূপে কল্পনা করেছেন। আর যেহেতু সাধারণ ভোগী মানুষেব জীবন-ভাবনা থেকে এক 'অপূর্ব বিজ্ঞান'শক্তির বলে সাধকের জীবন-ভাবনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, বরং বিপরীত, সেইহেতু সাধকের আকাশ-বাসনা তার পক্ষে কোন অবিশ্বাস্য উদ্ভট রূপে পরিগণিত হয়নি। পরিশিষ্ট একটি চর্যাংশ সেই কথারই সাক্ষী।

ভব ভুঞ্জই ন বাজ্ঝই বে অপূব বিনাণা।
জেব বি লোঅর বান্ধন (তেব) বি জোইর মেলাণা।।

সাধকের অভিপ্রায় এবং অভিরুচির প্রসাদে 'অম্বর-তরু'ও আকাশ-কুসুম ফোটাতে পারে, এবং তা সাধকের অনুরাগে উষ্ণ হয়ে নতুন

১ সরহের দোহা, শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত 'চর্যাগীতি-পদাবলী' ধৃত

পুলকে পল্লববিস্তারও করতে পারে। তাই বৃক্ষ যখন শূন্যতার উপমান, তখন বৃক্ষজন্ম বা রূপকভাবনা অভিনন্দিত। কিন্তু বৃক্ষ যখন ভোগকায়ার উপমান, তখন তার আমূল বিনাশ কাঙ্ক্ষিত এবং রূপক-ভাবনা অভিশপ্ত।

অভেদ সম্বন্ধে রূপক গঠিত হলেও কমপক্ষে একটি উপমেয় এবং একটি উপমান গোচরে অথবা অগোচরে রূপক নির্মাণের উপাদান স্বরূপ। আবার সব ক্ষেত্রেই এ উপাদানের যে কোন একটি কখনও প্রকট কখনও প্রচ্ছন্ন। উপমেয়-উপমানের কোন একটির উপস্থিতি বা অন্তর্ধানের উপর নির্ভর করে অথবা কোন একটির প্রাধান্যের উপর নির্ভব করে রূপকের যে সৌন্দর্য-গোচর-শক্তি সূচিত হয়, চর্যাগীতির পদগুলিকে তারই মানদণ্ডে আমরা কতকগুলি ভাগে সাজিয়েছি।

১ উপমেয়-প্রবল রূপক।
২ তুল্যমূল্য রূপক।
৩ উপমান-প্রবল রূপক।

এছাড়া আরও কতকগুলি চর্যাগান, যা উপরোক্ত বিভাগের অনুগত নয়, উদ্ধৃতি হিসাবে তাদেরও শিরোনাম করা যায়।

৪ স্বল্পালঙ্কার চর্যাগীতি।
৫ নিরলঙ্কার চর্যাগীতি।

এবার এক একটি বিভাগের অলঙ্কার-পরিচয় ক্রমানুযায়ী পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করব।

উপমেয়-প্রবল রূপকঃ গুডবীর 'যুগনদ্ধ-হেরুক' চর্যা; কাহ্নের 'রাজহংস' চর্যা; ভুসুকুর 'বিকচকমল' চর্যা; কাহ্নের 'মত্তমাতঙ্গ' চর্যা; কাহ্নের 'ডোম্বী-হেরুক' চর্যা। মহিণ্ডাশিষ্যের 'চিত্তগজেন্দ্র' চর্যা; ভুসুকুর 'আখেটিক' চর্যা; ভুসুকুর 'সহজানন্দ চন্দোদয়' চর্যা; ধাম-এর 'গৃহদাহ' চর্যা; এছাড়া পরিশিষ্টের ১৩ সংখ্যক চর্যাংশ; মীননাথের ২ সংখ্যক চর্যাংশ। দারকের 'সঙ্গীত-চর্যা।'

রূপকের সংজ্ঞা অনুযায়ী রূপের আরোপ উপমেয়কে অপ্রধান করে উপমান-প্রধান হয়। উপমানের গুণ বা ক্রিয়ার বর্ণনা থেকে এই প্রাধান্য বোঝা যায়। কিন্তু আমাদের প্রস্তাব অনুসারে উপরোক্ত চর্যাগীতিগুলির রূপক উপমেয়-প্রবল, এ কথা বলা হল। বলা বাহুল্য, উল্লিখিত চর্যা-

গুলিতে রূপক-প্রয়োগ সমগ্র পদের কোন একটি পঙক্তি বা বাক্যাংশকে অবলম্বন করে উপস্থিত নেই, পক্ষান্তরে এ সব রূপকের উপমান তার গুণ, ক্রিয়া অথবা ধর্মের বর্ণনায় সমগ্র পদে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু গুণ, ক্রিয়া অথবা ধর্মের বর্ণনায় যে উপমান-পক্ষের শক্তি উপমেয়-পক্ষকে অপ্রধান করে নিজ রূপের প্রবলতায় রূপক অলঙ্কারের সার্থক পরিচয় দেবে, তার প্রতিশ্রুতি উপমানগুলির মধ্যে নেই। এইসব চর্যাগানে ব্যবহৃত রূপকগুলি যদি সমগ্র পদকে আচ্ছন্ন করে উপস্থিত না থাকতো, অর্থাৎ কোন একটি পঙক্তিতে কোন একটি বাক্য বা বাক্যাংশকে ভূষিত করেই এর সঞ্চার সীমাবদ্ধ হত, তবে এগুলিকে সহজেই আমরা 'স্বল্পালঙ্কার চর্যাগীতি' শিরোনামের তালিকাগত করতে পারতাম। একটি বা দুটি পঙক্তিকে আলোকিত করার পরিমিত সামর্থ্য নিয়ে এই রূপকগুলি সমগ্র পদের সুদীর্ঘ বক্তব্যের মধ্যে প্রসারিত। ফলে রূপ-নির্মাণের কেন্দ্রসংহতি হারিয়ে রূপকগুলি তরল সম্প্রসারণে বিস্বাদ। শক্তির অতিরিক্ত এই অতিব্যাপ্তি ছাড়াও রূপকগুলির আরও ত্রুটি এই যে, চর্যাকারের সাধনশিক্ষা এবং সোৎসাহ যোগ-ভাবনা রূপকগুলির উপমেয়-পক্ষের অনুচর হয়ে উপমেয়-কথাকে উচ্চকণ্ঠ করে তুলেছে। তাই সাধনার সাগ্রহ কলরবের আড়ালে উল্লিখিত পদের রূপকগুলি দীনভাবে অবস্থিত। এবার এ বিভাগোক্ত পদগুলি থেকে দু একটি চর্যা উদাহৃত করলে আমাদের বক্তব্য পরিচ্ছন্ন হবে। ভুসুকুর 'বিকচকমল' চর্যাতে,

অধরাতি ভব কমল বিকসউ
বতিস জোইণী তসু অঙ্গ উহ্লসিউ ॥
চালিউ সসহব মাগে অবধূই
রঅণহু ষহজে কহেই (সোই) ॥
চালিঅ সসহর গউ ণিবাণেঁ
কমলিনি কমল বহই পণালেঁ ॥
বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ
জো এথু বুঝই সো এথু বুধ ॥
ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেঁ
সহজানন্দ মহাসুহ লোলেঁ ॥

পদটিতে দেখা যাচ্ছে, প্রথম এবং দ্বিতীয় ছত্রে অর্ধরাত্রিব্যাপী কমল-বিকাশের সৌন্দর্যপুলক এবং বত্রিশ যোগিনীর উল্লসিত অঙ্গের মাদন-বিলাস।

কিন্তু এই পুলক-লাস্য পরবর্তী ছত্রগুলিতে সংক্রামিত হবার উপমানশক্তি সঞ্চিত রাখেনি। স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে, কমল বিকাশের আনন্দ-সহচর 'সসহর' বা চাঁদ অর্থাৎ উপমান-পক্ষীয় আনুষঙ্গিক ধর্ম আপন জ্যোৎস্না-মাধুর্য বিস্তৃত করার পূর্বেই চর্যাসাধকের যোগরাহু তাকে গ্রাস করেছে। তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম পঙক্তিতে, 'শশধর অবধূতিমার্গে চালিত হয়ে সহজ-কথিত নির্বাণ-আশ্রয় লাভ করল।' অর্থাৎ শশধরের যে আরোপ উপমেয়কে গৌণ করে নিজ উপমান-শক্তিকে সৌন্দর্যে মোহময় করে তুলতে পারতো, সাধনকথার উচ্চকণ্ঠ উপমেয়শক্তি, রচয়িতার উৎসাহের প্রবলতর আকর্ষণে মলিন হয়ে গেল। শশধর এখন তার উপমান-পক্ষীয় আত্ম-পরিচয় হারিয়ে উপমেয়-পক্ষীয় 'শুক্র'—এই 'সন্ধ্যা'অর্থের প্রতিশব্দ মাত্র। শশধরের গুণ ক্রিয়া বা ধর্ম আর রূপে বিস্তৃত নেই, 'শুক্র'রূপী কামনা-ক্ষরণের তুলনামাত্র হয়ে শশধর অবধূতিমার্গে বা শৈব যোগশাস্ত্রানুযায়ী সুষুম্না নাড়ীতে চালিত হয়ে নির্বাণ লাভ করেছে। শক্তির অতিরিক্ত অতিব্যাপ্তি এ রূপকে থাকার ফলেই শশধরের স্বর্গসুষমা তার তীব্র কেন্দ্রসংহতি হারিয়ে যোগরীতির সামান্য উপমেয়-কথার কথক। এই 'সসহর'কে অলঙ্কারের কঠিন নিয়ম অনুসারে রূপক বলব অবশ্যই, কেননা এর অনুক্ত উপমেয় 'সন্ধ্যা'ভাষার 'শুক্র'। কিন্তু এই 'সসহর' ক্রিয়া গুণ বা ধর্মের পরিণাম অনুযায়ী অলঙ্কার হিসেবে সাধারণ উপমাই। যেমন,

নয়ন-পল্লব শিশিরসিক্ত＝রূপক
নয়ন-পল্লব অশ্রুসিক্ত＝উপমা

এইভাবে উল্লিখিত বিভাগের চর্যাগুলি উপমেয়-পক্ষে সবল হয়ে অলঙ্কারের রূপক-সম্ভাবনাকে প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই উপমায় সীমিত করেছে। অবশ্য এ সবই চর্যারচয়িতার ইচ্ছাকৃত হওয়া সম্ভব, কারণ তাঁদের ভোগাকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই যোগাকাঙ্ক্ষার চেয়ে বড় ছিল না। দেখা যাচ্ছে, প্রয়োগের ব্যাপারে পরিমাণ-বোধের অভাব উপমানকে এসব ক্ষেত্রে মুখ্য হয়ে উঠতে দেয়নি। অথচ চর্যারচয়িতার অধিকারী-ভেদজ্ঞান এবং গোপনবুদ্ধি রূপককে সবলে প্রলম্বিত করে গুহ্য-কথাটি আবৃত করতে চেয়েছে। ফলে, রূপক এ পদগুলিতে স্থিতিস্থাপকসীমা (elastic-limit) ছিন্ন করে আপন কেন্দ্রবিন্দু হারিয়েছে। ষষ্ঠছত্রে পুনরায় কমল-কথা উত্থাপিত হলেও তা ছিন্নমূল

প্রক্ষেপের মত। কেননা পরবর্তী ছত্রগুলির মোহমুদ্গরে আবার তাকে অনুরূপ ভাবে শয্যাশায়ী দেখি।

এইভাবে আরও কতকগুলি উদাহরণ উদ্ধার করা যায়। পরিশিষ্ট ১৩ সংখ্যক চর্যাংশে,

মূঢ়া অন্তরাল পরিমাণহ।
তুট্টই মোহজাল গুরু পুচ্ছিঅ জানহ॥

গুরুকে জিজ্ঞাসা করে হয়ত মোহনাশের পথ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু 'জাল' ছিন্ন করার কাজে গুরুর পরামর্শ সমাধান দেবে না। 'মোহজাল'— এই রূপকে উপমান-পক্ষের গুণ-ক্রিয়া-ধর্মকে উপেক্ষা করে উপমেয়-পক্ষকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এখানে 'মোহজাল' রূপক অলঙ্কার নয়, উপমেয়-প্রতাপে তা উপমা অলঙ্কার মাত্র। 'তুট্টই' (ক্লান্তিতে, টুটে) এই ক্রিয়াপদের বদলে যদি 'চ্ছিজ্জই' (ছিদ্যতে, ছেদ করা হয়) এরূপ ব্যবহার থাকতো, তাহলে 'মোহজাল' রূপকটির উপমান-প্রাধান্য স্পষ্ট হত। জয়নন্দীর চর্যাংশ,

ণৌ দাটই ণৌ তিমই ন চ্ছিজই
পেখ মাঅ-মোহে বলি বলি বাঝই॥

এখানে 'মায়ামোহে'র কোন উপমান উল্লিখিত না থাকা সত্ত্বেও সাধারণ-ধর্ম-বিবৃতির আকর্ষণে 'জাল'এর প্রতীতি ঘটেছে। মহিণ্ডা-শিষ্যের 'চিত্ত গজেন্দ্র' চর্যার অংশ-বিশেষ,

মাতেল চীঅ গঅন্দা ধাবই
নিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই॥
পাপ পুণ্য বেণি তিড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা।
গঅণ টাকলি লাগি রে চিত্তা পইঠ নিবানা॥

উল্লিখিত চর্যাগীতাংশে মাতাল চিত্তগজেন্দ্রের রূপক তার সমস্ত গুণ-ক্রিয়া-ধর্ম নিয়ে তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম পঙক্তিতে নিখুঁতভাবে শোভমান। গজেন্দ্রের মত্তগতি, বিপর্যয় সাধনে তার স্থূল পশুবুদ্ধি, শিকল ও স্তম্ভস্থান ভাঙ্গার উন্মাদ অস্থিরতা সবই সুন্দরভাবে পরিবেশিত। 'চিত্ত' এই উপমেয়কে অপ্রধান বা আচ্ছন্ন করে উপমান 'ঐরাবত' আপন জান্তব-স্বভাবে সার্থক। কিন্তু অকস্মাৎ অনাহত-ধ্বনি শুনেই প্রচ্ছন্ন উপমেয়

'চিত্ত' সর্বময় হয়ে মত্ত গজেন্দ্রের প্রকট উপমানটিকে, সমগ্র রূপক-চিত্র-পরিচয়টিকে, নির্বাসিত করে দিল। ফলস্বরূপ চিত্ত নির্বাণে প্রবিষ্ট হল। সমগ্র রূপক-আয়োজন আকস্মিক এই উপমেয়-দৌরাত্ম্যে নিষ্ফল হয়ে গেল। অবশ্য নবম ছত্রে, 'খররবিকিরণ-সন্তাপে রে গগনগঙ্গা গই পইঠা' এ কথা থাকলেও, উপমেয় 'চিত্তে'রই খররবিকিরণ-ক্লান্তি এবং গগনগঙ্গায় প্রবেশের কথা একমাত্র। 'মত্তগজেন্দ্র' বহুপূর্বেই 'এহো বাহ্য'।

এইভাবেই ধামের 'গৃহদাহ'-চর্যা, কাহ্নের 'মাওমাতঙ্গ'-চর্যা, গুড়রীর 'যুগনদ্ধ হেরুক'-চর্যা ইত্যাদির আলোচনা করলে আমরা একই উত্তরফল পাবো। পদগুলির দুটি একটি ক্ষেত্রে হয়ত উপমার রূপক-ভ্রম আছে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রূপকের উপমান-পক্ষের সঞ্চারশক্তিকে শাসন করার দৃষ্টান্ত। এ পর্বে রূপকের এই প্রয়োগ-সঙ্কোচের জন্যেই আমরা তাকে 'উপমেয়-প্রবল রূপক' নামে আখ্যাত করেছি।

তুল্যমূল্য রূপকঃ কাহ্নের 'নৌযাত্রা'-চর্যা এবং 'নিষ্ফলবৃক্ষছেদ' চর্যাদুটিতে উপমেয়-উপমানের তুল্য-যোগ সম্পর্ক। এখানে রূপকের উপমেয়-উপমান, গুণ, ক্রিয়া এবং ধর্মে সমশক্তিমান হওয়ার ফলে যেমন উপমান-পক্ষের রূপবিস্তার নেই, তেমনি তুলনার জীর্ণ সাধর্ম্যের মধ্যে উপমেয়ের তত্ত্ব-প্রাবল্যও অনুপস্থিত। উপমেয়-কথা এবং উপমান-কথা তাদের নিজ নিজ গুণ বা ক্রিয়ানুযায়ী অতি ঘনিষ্ঠভাবে সমান্তরাল পথে আত্মপরিচয় দিয়েছে। কোন একটি উপাদানের প্রভাব বা দুর্বলতা অপরটিকে গৌণ অথবা মুখ্য করে রসোৎকর্ষ বা রসভঙ্গ করেনি। ঠিক সেই কারণে এ পদগুলিতে রূপকের অপলাপ হয়ত নেই, কিন্তু রূপকের তীব্র অভেদসাধনে রূপের ঘন সৌন্দর্যও নেই। দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের মত পরস্পর-সন্নিহিত উপমেয়-প্রবাহ এবং উপমান-প্রবাহ ফলিতার্থে এক না হয়ে একটা প্রণিধান-গম্য সাদৃশ্য রক্ষা করে স্বতন্ত্র রয়েছে। অথচ একে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার না বলে রূপকই বলেছি, কেননা সমগ্র পদের মধ্যে ইতস্তত রূপকের ক্রিয়া-লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট। কাহ্নের 'নৌযাত্রা' চর্যাটি,

> তিশরণ নাবী কিঅ অঠকমারী
> নিঅ দেহ করুণা শূন মেহেরী।।
> তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা
> মঝ বেণী তরঙ্গ ম মুনিআ।।
> পঞ্চ তথাগত কিঅ কেড়ুআল
> বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল।।

গন্ধ পরস রস জইসোঁ তইসোঁ
নিন্দ বিহুনে সুইনা জইসো ॥
চিঅ কণ্ণহার সুণত-মাঙ্গে
চলিল কাহ্নু মহাসুহ-সাঙ্গে ॥

এখন উপমেয় এবং উপমানগুলিকে যদি তাদের অনুগমনের ক্রমানুসারে রাখা যায় তবে দাঁড়ায়,—ত্রিশরণ=নৌকা ; নিজদেহ=করুণা ; শূণ্য=অন্তঃপুর ; ভবজলধি=মায়াস্বপ্ন; পঞ্চতথাগত=কেরোয়াল; কায়া=নৌকা; মায়া=জাল; গন্ধ-স্পর্শ-রস=নিদ্রা-বিহনে স্বপ্ন ; চিত্ত=কর্ণধার ; শূন্যতা=পাছ গলুই। উপমেয়-পক্ষে এবং উপমান-পক্ষে যথাক্রমে দুটি বক্তব্য মোটামুটি সমান্তরাল-ভাবে দাঁড়িয়েছে। একটি তত্ত্বের কথা, অন্যটি রূপের কথা। এরা পরস্পরের অতিসন্নিহিত, কিন্তু আচ্ছন্ন নয়। একে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার বলা চলত, কেননা ফলিতার্থে উপমেয়-প্রবাহ এবং উপমান-প্রবাহের ধর্মের সাদৃশ্য আছে, যা প্রণিধানগম্য, কিন্তু ঐক্য বা একরূপতা নয়। তথাপি ষষ্ঠ এবং নবম পঙক্তি এ আখ্যার অন্তরায়। এখানেই আরোপমূল ইঙ্গিতের দ্বারা অলঙ্কারটি রূপকাশ্রয় পেয়েছে। 'বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল' এবং 'চিঅ কণ্ণহার সুণত-মাঙ্গে'—এখানেই চর্যাকার ছিন্নসূত্রকে সংযোজিত করেছেন, ফলিতার্থে অভেদ সাধনের দ্বারা। এ অলঙ্কার আসলে রূপক, কিন্তু দৃষ্টান্ত-বিভ্রমও এতে অনুপস্থিত নয়। কোন একটি বিশুদ্ধ আদর্শের অনুবর্তন না থাকাতে অলঙ্কারটি রূপকের তীব্র অভেদ-সৌন্দর্যও পায়নি, এবং দৃষ্টান্তের লক্ষণে সার্থক হওয়ার ভাগ্যেও বঞ্চিত। ফলে ব্যঞ্জনাময় কোন সৌন্দর্যচেতনা এ অলঙ্কারে নেই। অবিনাবদ্ধ দুটি বক্তব্যপ্রবাহ যেন অতিসন্নিহিতভাবে বর্তমান, ফলিতার্থে ক্বচিৎ এক হওয়ার লক্ষণ এতই মৃদু এবং অস্পষ্ট যে, তারা পরস্পরের স্বভাব-দ্যোতক বা রূপ-প্রকাশক হয়ে ওঠেনি।

কাহ্নের 'নিষ্ফলবৃক্ষ-ছেদ' চর্যাটিও এই 'তুল্যমূল্য' রূপকের প্রকৃতিগত। অবশ্য এ পদটিতে উপমানের প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি, কেননা এর তৃতীয় ও চতুর্থ পঙক্তি,

বরগুরুবঅণে কুঠারেঁ ছিজহ
কাহ্ন ভণই তরু পুণ ন উইজঅ ॥

শেষ পঙক্তি,

ছেবহ সো তরু মূল ন ডাল ॥

উপমেয় এবং উপমানকে সাধর্ম্য-সূত্রে আকর্ষণ করেছে এবং সেখানে অভেদ সাধিত হয়েছে।

উপমান-প্রবল রূপক ঃ কুক্কুরীপাদ-শিষ্যের 'নিষ্প্রপঞ্চ' চর্যা ; বিরুআ-শিষ্যের 'শুঁড়ি-বাড়ী' চর্যা ; কামলির 'নৌবানিজ্য' চর্যা ; কাহ্নের 'অন্ত্যজ-ডোম্বী' চর্যা ; কাহ্নের 'নয়বল' চর্যা ; ডোম্বীর 'নৌবাহিকা ডোম্বী' চর্যা ; বীণার 'বুদ্ধনাটক' চর্যা ; কাহ্নের 'ডোম্বীবিবাহ' চর্যা ; কুক্কুরীপাদ-শিষ্যের 'দরিদ্র গর্ভিণী' চর্যা ; ভুসুকুর 'মূষিক' চর্যা ; তান্তির 'কটবয়ন' চর্যা ; কাহ্নিলার 'সহজনিদ্রা' চর্যা ; সরহের 'নৌবাহিক' চর্যা ; কুক্কুরীপা-এর 'রাজ্যজয়' চর্যা ; চাটিলশিষ্যের 'নদী-সাঁকো' চর্যা ; ভুসুকুর 'হরিণ আখটি' চর্যা ; শবর পাদের 'শবর-শবরী প্রেম' চর্যা ; শবরেব 'মত্তশবর মৃত্যু' চর্যা এবং পরিশিষ্ট চর্যাংশে শান্তির ৫ সংখ্যক চর্যা ; শান্তির ৭ সংখ্যক চর্যা ; ১০ সংখ্যক চর্যা (রচয়িতার নাম নেই) ; ১৪ সংখ্যক চর্যা (রচযিতার নাম নেই) ; কাহ্নের ৩ সংখ্যক চর্যা ; শবরের ৮ সংখ্যক চর্যা ; ১২ সংখ্যক চর্যা (রচয়িতার নাম নেই) ;

মূল চর্যাগানের আঠারটি এবং পরিশিষ্ট অংশের সাতটি 'উপমান-প্রবল রূপক' শিরোনামেব অন্তর্গত। উপমান-প্রাধান্যে রূপকের শুদ্ধতম পবিচয় এবং উপবোক্ত গোত্রে পদেব সংখ্যা-গরিষ্ঠতা চর্যাপদকর্তার রূপক-আসক্তিকে প্রবলতম রূপে সূচিত কবে। এখন কথা এই, পদগুলিকে কেবলমাত্র রূপক না বলে কেন উপমান-প্রবল রূপক বলা হল। অথচ জানা কথা যে, সার্থক রূপক উপমান-প্রবল হয়েই থাকে। ত্‌ . , আখ্যা প্রয়োজনীয়, যখন দেখি, উপমান-প্রাবল্যের ক্রম অনুসাবে উক্ত গোত্রের পদগুলিরও পুনর্বিন্যাস সম্ভব। এবার আরোপ-প্রাধান্যের মাত্রা (degree) অনুযায়ী পদগুলির কিছু উদাহবণ দেওয়া যাক। বিরুআ-শিষ্যের 'শুঁড়ি-বাড়ী' চর্যাটি,

এক সে শুণ্ডিনী দুই ঘবে সান্ধঅ
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ ॥
সহজে থির কবী বারুণী বান্ধ
জে অজরামর হোই দিঢ় কান্ধ ॥
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ
আইল গরাহক অপণে বহিআ ॥
চউশঠী ঘড়িয়ে দেত পসারা
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা ॥
এক ঘড়ুলী সরুই নাল
ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল ॥

মদ-চোলাই ও শুঁড়ীর দোকানে মদ বিক্রয়ের বর্ণনা দিয়ে সহজাবস্থা প্রাপ্তির ইঙ্গিত। এখানে রূপবর্ণনায় উপমান-পক্ষ প্রবল, ফলত তত্ত্বখ্যাপনায় উপমেয়-পক্ষ গৌণ, কিন্তু উপেক্ষিত বা অনুপস্থিত নয়। তৃতীয় চতুর্থ ছত্র-দুটি এই বক্তব্যেরই নির্ণায়ক, 'সহজে থির করী বারুণী বান্ধ, জে অজরামর হোই দিঢ় কান্ধ॥'—এই উপমেয়কে আশ্রয় করেই উপমান 'শুণ্ডিণী'-বৃত্তি রূপের কক্ষপথ রচনা করেছে। তাই এখানে অভেদ-সর্বস্বতায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়নি। আবার এ অলঙ্কারকে 'মালারূপক'ও বলা চলে না, কেননা একই উপমেয়-বস্তুকে কেন্দ্র করে তারই রূপ-প্রকাশক বহুবিধ উপমানের দ্বারা একাধিক রূপবৃত্ত রচিত হয়নি। যদি উক্ত পর্বের উপমেয়-বস্তুটি ক্রিয়া, গুণ এবং ধর্মে জড়বৎ হত এবং বহু-বিধ সাদৃশ্যমান উপমান-শক্তিতে তারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ মণ্ডলাকারে রচিত হত, তবে এ অলঙ্কারের 'মালারূপক' নাম দেওয়ায় বাধা ছিল না। কিন্তু এখানে উপমেয়স্বরূপ যোগপ্রক্রিয়াটি কতকগুলি আচরণের ক্রমান্বয়ে এমনই একটি ধারাপ্রবাহ, যার উপমান-পক্ষ কেন্দ্রমুখী কোন সৌন্দর্যসৃষ্টি করে না। পক্ষান্তরে বস্তুজীবনের থেকে নেওয়া লৌকিক আচরণেরই অংশ-পরম্পরা উপমান-পক্ষে রূপ নেয়। আবার এ অলঙ্কারকে 'সাঙ্গরূপক'ও বলা যায় না। কেননা যদিও উপমেয়ে উপমানের অভেদ-নির্দ্দেশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অঙ্গগুলিরও যথাযথ অভেদ-নির্দ্দেশ রয়েছে, তবু ঐ সব চর্যাগীতে যোগপদ্ধতির এবং জীবনযাপনের পারম্পর্যময় ধারারূপ উপমেয়ে এবং উপমানে যে রীতিতে উল্লিখিত, সে রীতিকে সাঙ্গরূপকের নিয়ম আয়ত্ত করতে পারে না। বরং ঐ রূপককে 'পরম্পরিত রূপক' আখ্যায় ভূষিত করা যেতে পারে, যেহেতু একটি উপমেয়-বস্তুতে রূপের আরোপ হওয়ার ফলে তৎ-সম্পর্কিত অন্য বস্তুতে রূপের আরোপ ঘটলে রূপকগুলির পারম্পর্য হেতু পরম্পরিত-রূপক হয়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, উপরোক্ত পর্বের পদগুলি পারম্পর্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছে সত্যি, কিন্তু এই ক্রিয়া-পারম্পর্যের পথেই তা এক একটি আখ্যান গড়ে তুলেছে, যা নীতি-মূলক এবং গূঢ়ার্থ। এই গূঢ়ার্থ আখ্যানময় রূপকই আখ্যান-রূপক। আখ্যা-নের ছদ্ম আবরণের তলে তলে সাধন-তাৎপর্যময় চর্যাশিক্ষা সমান্তরালভাবে বহমান এবং প্রকৃত অর্থের ইঙ্গিতবাহী। উহ্য উপমেয়, উপমানকেই আত্ম-প্রকাশক শক্তিতে সবল ক'রে আখ্যান গড়ে তুলেছে। তবে আখ্যান-রূপক (Allegory) হিসেবে চর্যাগুলি পূর্ণ শুদ্ধ নয়, কেননা পদের মধ্যে প্রকৃত অর্থের সংক্ষিপ্ত নির্দ্দেশ কোথাও কোথাও উঁকি দিয়েছে। নিখুঁত আখ্যান-রূপক

সমগ্র বাঙলা সাহিত্যে দুর্লভ, তাই এ অংশের রূপগুলিকে ত্রুটিময় আখ্যান-রূপক বলা চলে। একটি প্রায় শুদ্ধ আখ্যান-রূপকের উদাহরণ দিই।

আশা কহে, বৎস অপূর্ব এ পুরী
আমার কানন ইহা,
প্রবেশে ইহাতে প্রাণী নিত্য নিত্য
মিটাতে প্রাণের স্পৃহা,
এ পুরী পশিতে আছে ছয় দ্বার
ছয় দ্বারী আছে দ্বারে।
কেহ সে ইহাতে আদেশ বিহনে
প্রবেশিতে নাহি পাবে।
. . . .
. . . .
দ্বিতীয় দ্বারেতে নিরখি বসিয়া
বৃদ্ধপ্রাণী একজন,
করি হেঁট মাথা বালুস্তূপ পাশে
বালুকা করে গণন।[১]

দেখা যাচ্ছে, কবিতাংশের সূচনাতেই 'আশা' এই উপমেয়-কথা উল্লিখিত। দৃষ্টান্তটি আখ্যান-রূপক হয়েও এই কারণে ত্রুটিপূর্ণ। এই ভাবে চাটিল-শিষ্যের 'নদী-সাঁকো' চর্যা, ভুসুকুর 'হরিণ আখটি' চর্যা এবং পরিশিষ্টের দশ সংখ্যক চর্যা (রচয়িতার নাম নেই) কাহ্নুর তিন সংখ্যক চর্যা, বার সংখ্যক চর্যা (রচয়িতার নাম নেই), ইত্যাদির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অবশ্য চাটিল-শিষ্যের 'নদী সাঁকো' চর্যাটি উপমেয়-কথায় একটু বেশি মুখর, কিন্তু নীতিনির্ভর আখ্যান বর্ণনায় রূপের বেগ এত প্রবল যে, উপমেয়ের উল্লেখগুলি বিষয়-আবেদনে প্রায় অগ্রাহ্য।

আমরা উপরোক্ত পর্ব 'উপমান-প্রবল রূপক' থেকে এখন কতক-গুলি চর্যাপদ উল্লেখ করব, যা উপমান-প্রাধান্য বজায় রেখেও আখ্যান-রূপক আখ্যার যথাযথভাবে যোগ্য হয়নি। আখ্যান অবশ্য এগুলিতেও আছে, তাদের ক্রিয়া-কর্মের পারম্পর্যও দুর্লক্ষ্য নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এগুলিতে উপমেয়-কথনের উৎপাত প্রকট হয়েছে, যদিও তা আবেদনে গৌণ। এগুলিকে আমরা পরম্পরিত ও আখ্যান-রূপকের মধ্যবর্তী এক

১ আশাকানন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিশ্র স্তরে স্থাপিত করেছি। পরম্পরিত-রূপক-লক্ষণের পারম্পর্য-সূত্র এবং উপমেয়-বিজ্ঞাপন যেমন এগুলিতে আছে, তেমনি আখ্যান-রূপক-লক্ষণের নীতিমূলক আখ্যানময়তা এবং আখ্যান-সরসতাও এতে আছে। বীণার 'বুদ্ধ নাটক' চর্যা,

সূজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী
অণহা দাণ্ডী চাকি কিঅত অবধূতী ।।
বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা
সুন তান্তি-ধনি বিলসই রুণা ।।
আলি কালি বেণি সারি মুণিআ
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ ।।
জবে করহা করহকলে চাপিউ
বতিশ তান্তি-ধনি সএল বিআপিউ ।।
নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধ-নাটক বিসমা হোই ।।

পদটিতে সূর্য শশী অনাহত অবধূতি ইত্যাদি উপমেয় যথাযথ উপস্থিত হয়ে বীণা-নির্মাণ ও বাদন পদ্ধতির উপমান-ধারার সমান্তরাল একটি বিষয়-ভাবনাকে দ্যোতিত করছে। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, উপমেয় রূপে ব্যবহৃত উক্ত শব্দগুলি দীর্ঘকাল ব্যবহারের জীর্ণতায় নিছক পরিভাষার মত উপস্থিত থাকলেও আসলে এগুলি অন্যতর কোন বর্ণনীয়-বস্তুরই উপমান। আর এই উপমানগুলি সাধন-প্রণালীর রূপক-পরিচয়রূপে প্রযুক্ত হতে হতে বহুকাল পরে ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে তাদের রূপশিল্প হারিয়েছে, পরিশেষে অতিপরিচিতের মত কেবলমাত্র সাধনকথার পরিভাষায় পরিণত হয়ে উপমেয়রূপে গণ্য হয়েছে। আবার, বুদ্ধ-নাটক অভিনয়-আয়োজনের সমান্তরাল একটি সাধনকথাও এ পদের মধ্যে প্রবাহিত। অভিনয়-আয়োজনের পরম্পরা একটি আখ্যানের মত সাধন-রীতির প্রক্রিয়াকে ঈষৎ আচ্ছন্ন করে অবস্থিত, দেখতে পাই। কিন্তু উপমেয়-কথাও এখানে উহ্য নেই। সাধকের তাত্ত্বিক আগ্রহ রূপক-কথার অতিসন্নিহিতভাবে আপন পরিচয়-চেষ্টা দেখিয়েছে। তাই, রূপকের এই জাতীয় ব্যবহারকে আমরা পুরোপুরি আখ্যান-রূপকের তালিকাগত না করে আখ্যানরূপক এবং পরম্পরিত রূপকের মধ্যবর্তী একটি মিশ্র পর্যায়ে স্থাপনা করছি। এই জাতীয় রূপকের আরও

কয়েকটির উল্লেখমাত্র করব, ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন মনে করি, তাতে দৃষ্টান্তগত বৈচিত্র্য বাড়লেও বক্তব্যের পুনরুক্তি দেখা দেবে। কুক্কুরীপা-এর 'রাজ্যজয়' চর্যা, কুক্কুরীপাদ-শিষ্যের 'দরিদ্র গর্ভিণী' চর্যা, কাহ্নের 'নয়বল' চর্যা, কাহ্নের 'অন্ত্যজ ডোম্বী' চর্যা, কামলির 'নৌবাণিজ্য' চর্যা, ভুসুকুর 'মূষিক' চর্যা, কুক্কুরীপাদ-শিষ্যের 'নিষ্প্রপঞ্চ' চর্যা, কাহ্নের 'ডোম্বী-বিবাহ' চর্যা, তান্তির 'কটবয়ন' চর্যা; ডোম্বীর 'নৌবাহিকা ডোম্বী' চর্যা, কাহ্নিলার 'সহজনিদ্রা' চর্যা ইত্যাদি এবং পরিশিষ্টের দারক রচিত 'সঙ্গীত' চর্যা, শান্তির পাঁচ ও সাত সংখ্যক চর্যা, চৌদ্দ সংখ্যক চর্যা, ইত্যাদি সদ্যোক্ত ব্যাখ্যার অনুগত উপমান-প্রবল রূপক।

উপমান-প্রবল রূপক পর্বে আমরা আরও কতকগুলি চর্যাগীতি পাই, যা চর্যারচয়িতার আবেগ এবং অনুরাগে উষ্ণ হয়ে কেবল একটি সার্থক রূপপ্রচ্ছায় রচনা করেনি, সঙ্গে সঙ্গে জীবন-ভোগের একটি নিবিড় বাসনাকে অনুস্যূত করে দিয়েছে। শবরপাদের 'শবর-শবরী-প্রেম' চর্যা, শবরের 'মত্ত-শবর-মৃত্যু' চর্যা, পরিশিষ্টে শবরের আট সংখ্যক চর্যাংশ এ কথার দৃষ্টান্ত। অভিপ্রেত উপমেয়-কথার রূপনির্মাণ উক্ত পদগুলিতে এতই নিপুণ, কবির আর্তি (Passion) এতই পরিচ্ছন্ন এবং ভোগ-জীবন-গোচর, ফলে সর্বজনীন আবেদনে অভিনন্দিত যে, এগুলিকে পৃথকভাবে আলোচনা করার প্রলোভন একান্ত স্বাভাবিক। এ পদগুলিকে আবেদনে সার্বভৌম বলেছি। তার কারণ হল, এদের উপমান-পক্ষ যে রূপনির্মাণ করে, তা বিরুয়া-শিষ্যের 'শুঁড়িবাড়ী' চর্যার মত একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সীমাবদ্ধ জীবনচেষ্টা নয়। নায়িকা সম্বন্ধে নায়কের প্রেম-পরিকল্পনা, তাদের মিলন-বিরহের বিচিত্র আনন্দ-বেদনা, এ সবই মানুষের মৌলিক জীবন-প্রকৃতি। অপরিচিত অথবা অর্ধ-পরিচিত আঞ্চলিক একটি জীবনাচারের সম্ভাব্য রূপসৃষ্টিতে আমাদের আলোচ্য পদগুলি কেবলমাত্র বিশ্বাস্য নয়, প্রতি মানুষের অনিবার্য অভিজ্ঞতার মধ্যে জন্মলাভ করে এগুলি এক একটি জীবন-সত্যে প্রতিষ্ঠিত। আবেদনে অতি তীব্র একটি জীবন-কথা এ পদগুলির রূপকে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় আমরা এগুলিকে আখ্যান-রূপক বা পরম্পরিত-রূপক স্তরে ধার্য করিনি। তত্ত্বকথার চেয়ে রূপগঠনের স্পৃহা তীব্র হওয়ার জন্যেই এবং সুন্দরের লীলা মূর্ত হওয়ার ফলেই এ সব পদের মধ্যে আতিশয্যপূর্ণ উপমান যোজনার নিদর্শন পাই। এ পদগুলির অলঙ্কারকে রূপকাতিশয়োক্তি বলা চলতে পারে। হয়ত এসব পদের মধ্যেও উপমেয়-কথা দুর্লক্ষ্য নয়,

গুরুবাক পুঞ্জআ বিন্ধ ণিঅ মণে বাণেঁ
একে শরসন্ধাণেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণেঁ।

অথবা

ছাড় ছাড় মাআ-মোহা বিষমে দুন্দোলী
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণ মেহেলী।।

কিন্তু শূন্য-অবরোধের অঙ্কশায়ী হলেও সাধকের তত্ত্ব-প্রতিপাদন এখানে বড় নয়। বড় কথা 'মহাসুহে বিলসন্তি সবরো', যখন দেখি 'ণইরামণি বালী' কেবলমাত্র শূন্যাবরোধের পরিভাষা নয়, পক্ষান্তরে একটি শরীরী কামনা এ রূপ-কথার আশ্রয়।

তো বিণু তরুণি ণিবন্তর ণেহেঁ
বোহি কি লব্‌ভই এণ-বি দেহেঁ।[১]

বোধিলাভের জন্যে তরুণীর সঙ্গ এবং সখ্য-কামনা হয়ত তন্ত্রযোগীর সাধনচর্যা হতে পারে, কিন্তু ভোগবাদীর আশা-স্বপ্নও এখানে অনুপস্থিত নয়। বরং সেই চেষ্টাকেই প্রকট বলব, যখন দেখি শবরীর নিবিড় সঙ্গ এবং প্রেমলাভের জন্যে চর্যাকার একটি মনোরম জনস্থান নির্বাচন করেছেন এবং অনুকূল পরিচ্ছদ ও পরিবেশ রচনা করেছেন,

উঁচা উঁচা পাবত তঁহিঁ বসই সবরী বালী
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।।
উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরি
ণিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দরী।।

সরহের দোহায় 'জোইণি গাঢ়ালিঙ্গণহি বজ্জিল লহু উবসন্ন' অর্থাৎ যোগিনীর গাঢ় আলিঙ্গনে বজ্রধর ঝটিতি উপসন্ন হন। এ কথা অবশ্যই তান্ত্রিক যোগাচারের সাধন-অঙ্গ, কোনক্রমেই তা ভোগবাদী কামনা-কথা নয়। কিন্তু আমাদের পূর্বোক্ত 'শবর-শবরী-প্রেম' চর্যাটি রূপক-রীতিতে কেবল তান্ত্রিক সাধন-সঙ্গিনী-বিলাসও নয়। তা যদি হত, তবে চর্যাকার

১ কাহ্নের দোহা, শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত 'চর্যাগীতি-পদাবলী' ধৃত।

'বজ্রধরকে ঝটিতি উপসন্ন' করবার জন্যে সাধনানুকূল একটি মিলনস্থলী রচনা করতেন, উপরোক্ত 'উঁচা উঁচা পাবত' জাতীয় সর্বজনীন একটি ভোগানুকূল প্রেমস্থলী বা সঙ্কেতস্থান রচনা করতেন না। আমাদের আলোচ্য পদগুলির মধ্যে নারী-নির্ভর সাধন-প্রক্রিয়ার পাশে পাশে মানবনির্ভর ভোগকথা গৌরব পেয়েছে। আর এই গৌরবের জন্যেই পদগুলির আবেদন সর্বজনীন। তাই এ সব পদে কেবল 'মিলনে নিখিল হারা'র কথাই নয়, 'বিরহে নিখিল ময়'তার কথাও পাই,

অপূব্ব বসন্ত দুকেল্লা শবরো অব্বব ফলই ফুল্লই।
ভোড়িঅ হাথে ন চাহিঅই বিরহেঁ কেলি করেই॥

উপনেয়-কথা এ সব পদের কোথাও কোথাও যোগ-কটাক্ষ হয়ত করেছে, কিন্তু তার ফলে উপমান-নির্মাণ কোনক্রমেই আহত হয়নি। বরং চর্যাপাঠকের উপভোগের দিক থেকে উপমানশক্তির সর্বস্বতায় সাধন-ছত্রগুলি বিরক্তিকর এবং অপ্রাসঙ্গিক বলেই বোধ হবে। সাধকের সংস্কার যেন মুদ্রাদোষের মত একটি সুডৌল রূপরচনার আশে পাশে আত্মপ্রকাশ করেছে। উপমেয়কে গ্রাস করবার এই তীব্র উপমান-শক্তি স্মরণে রেখে এবং উপমেয়ের ঈষৎ আভাস স্বীকার করে আলোচ্য পদগুলির অলঙ্কার-প্রয়োগকে আমরা রূপকাতিশয়োক্তি পর্যায়ের আখ্যা দিলাম।

স্বল্পালঙ্কার চর্যাগীতি ঃ লুইয়ের 'কায়বৃক্ষ ও ··গপীঠ' চর্যা; শান্তির 'ঋজুবর্ত্ম' চর্যা; শান্তির 'তুলাধোনা' চর্যা; আজদেবের 'অদ্‌ভুত-ভেলকি' চর্যা; সরহের 'ঋজুবর্ত্ম' চর্যা; ঢেন্‌ঢণ-পা এর 'প্রহেলিকা' চর্যা; ভাদের 'চিত্তবিনাশ' চর্যা; সরহের 'অবনীত চিত্ত' চর্যা; কাহ্নুর 'মূক-বধির উপদেশ' চর্যা; ভুসুকুর 'রজ্জুসর্পাদি-প্রতিভাস' চর্যা; কাহ্নিলের 'স্কন্ধ-বিয়োগ' চর্যা; জয়নন্দীর 'ছায়া-মায়া' চর্যা এবং পরিশিষ্টে শান্তির চার ও ছয় সংখ্যক চর্যা।

এ পর্বে অলঙ্কার আছে, কিন্তু পদের মধ্যে সর্বব্যাপী নয়। পক্ষান্তরে একটি বা দুটি ছত্র অধিকার করেই এদের রূপসীমা। এগুলির দ্বারা প্রায়শই রূপসৃষ্টি হয়নি, তবে ক্ষণিক সাদৃশ্যে চর্যাসাধকের সাধনবাণী ঈষৎ আভাসিত মাত্র। উপস্থিতি আছে অথচ আস্বাদ নেই, এমন ধরনের কয়েকটি ক্ষণায়ু রূপক এই পর্বের মধ্যে কোথাও কোথাও আছে, তাছাড়া

দৃষ্টান্ত, প্রতিবস্তূপমা, প্রবাদ-প্রবচন-নির্ভর অতিশয়োক্তি, উদ্‌ভট এবং অসম্ভব উপমা ইত্যাদিও আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটা নিরুত্তেজ অর্থগোচরতা এবং স্পষ্টতা সম্পাদন ছাড়া কোন উচ্চতর রূপশিল্প-পরিচয় এ বিভাগে সম্ভব হয়নি। লুইর চর্যায় কায়া—তরু, পঞ্চেন্দ্রিয়—পাঁচডাল, শূন্যতা—পাখা, শান্তির পনের সংখ্যক চর্যায় সহজরূপ উজুবাট, মাআমোহাসমুদা (মায়ামোহসমুদ্র), গুরু-বচনরূপ 'নাবন ভেলা'; শান্তির ছাব্বিশ সংখ্যক চর্যায় তুলা-ধোনার প্রথম দু তিনটি পঙক্তি; আজদেবের একত্রিশ সংখ্যক চর্যায় করুণা-ডমরুলি (করুণা ডমরুখানি); ঢেণ্ঢণ-পা এর তেত্রিশ সংখ্যক চর্যার প্রথম দু তিনটি ছত্র; সরহের ঊনচল্লিশ সংখ্যক চর্যায় 'গুরুবঅন-বিহারেঁ' (গুরুবচনরূপ বিহারে), জগ-জলবিম্বাকারে (জলবিম্বরূপ জগৎ) ইত্যাদি এ পর্বের রূপক-সঞ্চয়। স্তিমিত এবং স্বল্পায়ু খদ্যোৎ-দীপ্তিতে রূপকগুলি প্রায়শই বর্ণহীন। ম্রিয়মান আরোপে সৌন্দর্যের চকিত সঙ্কেতময়তা জাগেনি। বিবর্ণ সাদৃশ্যের সম্বল নিয়ে এ সব রূপক তত্ত্বের অন্ধকার-নিরসনকারী প্রয়োজনাত্মক দিকটাই ব্যক্ত করেছে। অবশ্য এর মধ্যে শান্তির ছাব্বিশ সংখ্যক চর্যার এবং ঢেণ্ঢণ-পা-এর তেত্রিশ সংখ্যক চর্যার রূপক-ব্যাখ্যা একটু পৃথক হতে বাধ্য। কেননা এগুলির রূপকে উপমান-পক্ষের অভেদ-প্রাধান্য এবং আরোপ-শক্তি দু তিনটি ছত্রকে একাদিক্রমে আবিষ্ট করে রেখেছে। এ দুটি অনায়াসেই 'উপমান-প্রবল রূপকে'র বিভাগে ভুক্ত করা চলত, যদি এদের পঙক্তিগত উপমান-দ্যোতনা সমগ্র পদের মধ্যে কোনক্রমে প্রসারিত থার্কত। বস্তুত সে প্রত্যাশার পূবণ হয়নি। আলোচ্য রূপকগুলি পঙক্তির সীমায় শাসিত, পদেব মধ্যে সর্বগ নয়। তাই এগুলিতে প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও এদের উচ্চতর কোন আসন দেওযা গেল না।

এবার আমরা এমন কতকগুলি অলঙ্কার নিয়ে আলোচনা করব, আপাত-লক্ষণে যাদের দৃষ্টান্ত অলঙ্কার বলেই বোধ হবে। কিন্তু আভ্যন্তর বিচারে যারা বিম্ব-প্রতিবিম্ব সাদৃশ্যে সাধারণ উপমা মাত্র, কখনো ক্ষেত্র-বিশেষে তারা সাধারণ কোন কথা বা বক্তব্য, অথবা কতকগুলি সাদৃশ্য-জ্ঞাপক শব্দের অনুচিত প্রয়োগে কেবল অলঙ্কার-বিভ্রম।

দৃষ্টান্ত-প্রতিম উপমা অলঙ্কার: আজদেবের 'অদ্‌ভুত ভেল্‌কি' চর্যায়,

চান্দেরি চান্দকান্তি জিম পতিভাসই
চিঅ বিকরণে তহি টলি পইসই॥

কাহ্নুর 'মূক-বধির উপদেশ' চর্যায়,

ভণই কাহ্নু জিণ-রঅণ বি কইসা
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা ।।

জয়নন্দীর 'ছায়া-মায়া' চর্যায়,

পেখই সুঅণে অদশ জইসা
অন্তবালে মোহ তইসা ।।

এছাড়া কাহ্নের 'নৌযাত্রা' চর্যায় সাত ও আট ছত্র; কাহ্নের 'রাজ-হংস' চর্যায় সাত, আট, নয় ও দশ ছত্র; লুইর 'দুর্লক্ষ্যতত্ত্ব' চর্যায় সাত ও আট ছত্র; ভুসুকুর 'সহজানন্দ চন্দ্রোদয়' চর্যায় সাত ও আট ছত্র; ভুসুকুর 'সমরস' চর্যায তিন ও চার ছত্র ইত্যাদি দৃষ্টান্তপ্রতিম উপমার অন্তর্গত।

সদ্যোক্ত পদগুলিতে পরস্পর সন্নিহিত দুটি বাক্যের গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি ধর্ম ফলিতার্থে এক না হয়েও প্রণিধানগম্য সাদৃশ্য সঙ্কেত করেছে। উপমেয়-উপমানের এই বুদ্ধি-বিভাবিত সাদৃশ্যকে বিম্ব-প্রতিবিম্ব সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার বলা চলত। কিন্তু 'জিম', 'জইসা' ইত্যাদি সাদৃশ্যজ্ঞাপক শব্দের প্রত্যক্ষ ব্যবহার, এ সব অলঙ্কারকে বুদ্ধিতে অনুধাবন-গম্য অপ্রকট সাদৃশ্যে গোচর করেনি। আর দৃষ্টান্ত (অথবা প্রতিবস্তূপমা) অলঙ্কারে এই জাতীয় সাদৃশ্যজ্ঞাপক শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ। বুদ্ধির অনু-শীলন তাই এসব অলঙ্কারে অপ্রয়োজনীয়, সাদৃশ্যজ্ঞাপক যোজকগুলির (জিম, জইসা) দ্বারা উপরোক্ত অলঙ্কারগুলির উপমেয়-উপমান সম্পর্ক তাই প্রণিধানগম্য নয়, সহজদৃশ্য। সাধারণ-ধর্মের প্রণিধানগম্য অভিন্নতা ভিন্নরূপে বিন্যাসের দ্বারা পুনরুক্তি-বারিত হলে রচনার যে পৃথক সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, উপরোক্ত পদগুলিতে তার প্রতিশ্রুতি নেই, এগুলি সাদৃশ্যের সহজ যোজকে যুক্ত হয়ে কেবল উপমেয়-উপমানের সুলভ সম্পর্ক সূচিত করেছে। অথচ ফলিতার্থে এক না হওয়ায় এগুলি বিম্ব-প্রতিবিম্ব সম্বন্ধে সাধারণ উপমা মাত্র। উপরোক্ত পদগুলির গদ্যে ভাষ্য করলে দাঁড়ায়, চন্দ্রের চন্দ্রকান্তি প্রতিসংহরণের মত বিকরণ-জাত চিত্তের তাহাতে প্রবেশ; কালার বোবাকে বোঝানোর মতই জিনরত্নটি (অবাঙ্মানসগোচর); স্বপ্নে দেখা আরশির মতই অন্তরাল-মোহ।

দৃষ্টান্ত-প্রতিম নিরলঙ্কার বক্তব্য ঃ কাহ্নের 'মত্তমাতঙ্গ' চর্যায়,

জিম জিম করিআ করিণিরেঁ রিসঅ
তিম তিম তথতা মঅগল বরিসঅ ।।

কাহ্নের 'রাজহংস' চর্যায়,

জইসে চান্দ উইআ হোই
চিঅরাজ তইসে সোহিঅই ।।

এ পদাংশদুটির গদ্য-ভাষ্য করলে যথাক্রমে পাই, করী করিণীতে প্রেমাসক্ত হয়ে তথতা (নিজ সত্যস্বভাব) বর্ষণ করে ; চাঁদ উদিত হলে চিত্তরাজ শোভা পায়। স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে পদগুলিতে দৃষ্টান্ত সম্ভাবনা বা বিম্ব-প্রতিবিম্ব-মূল উপমা-সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু ব্যবহার-বৈগুণ্যে তা কেবল সামান্য বক্তব্যের মতই উপস্থিত। বরং এদের মধ্যে ঈষৎ রূপক-লক্ষণ আছে, কিন্তু দৃষ্টান্ত বা উপমা রচনার চেষ্টা সফল হয়নি। 'করিআ', 'করিণি' 'চান্দ' 'চিঅরাজ' ইত্যাদি উহ্য উপমেয়ের উপমান অভেদে রূপক, কিন্তু তাও সামান্য বাক্য গঠনের মত সৌন্দর্য-নিষ্পন্দ। প্রত্যক্ষত এগুলির মধ্যে বিম্ব-প্রতিবিম্ব উপমার সকল উপাদানই উপস্থিত, তথাপি প্রয়োগ-বৈগুণ্যে তা অলঙ্কারে উত্তীর্ণ হয়নি। এর রূপক-শক্তিও অতিশাসিত, 'তথতা'-বর্ষণরূপী উপমেয়-কথার ক্রিয়া-খ্যাপনের উপদ্রবে এবং উপমাগত উপাদান-ব্যবহারের (জিম্ জিম, তিম তিম, জইসে, তইসে ইত্যাদি) আতিশয্যে পদগুলি রূপক নয়, দৃষ্টান্ত নয় অথবা উপমাও নয়, কেবলমাত্র কথা। আসলে করী, করিণী, চন্দ্র, চিত্তরাজ ইত্যাদি ব্যবহারের পৌণঃপুনিকতায় অতিজীর্ণ হয়ে তাদের উপমান-শক্তি হারিয়ে কেবলমাত্র উপমেয়ের পারিভাষিক প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এদের রূপদ্যোতক শক্তি আর নেই।

এবার কতকগুলি দৃষ্টান্ত–প্রতিবস্তূপমার আলোচনা করব। সরহের 'ঋজুবর্ত্ম' চর্যায়,

নিঅড়ি বোহি মা জাহু রে লাঙ্ক ।।
হাথে রে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ
অপণে অপা বুঝ তু নিঅমণ ।।

কাহ্নিল-এর 'স্কন্ধ-বিয়োগ' চর্যায়,

মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ন পেখই
দুধ মাঝেঁ লড় চ্ছন্তেঁ ণ দেখই ।।

প্রথমটি দৃষ্টান্ত অলঙ্কার। কেননা সন্নিহিত কথাদুটি ফলিতার্থে এক না হয়ে প্রণিধানগম্য সাদৃশ্য পেয়েছে। দ্বিতীয়টি প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার। কারণ সন্নিহিত বাক্যদুটির প্রতীয়মান-সাদৃশ্য সাধারণ-ধর্মে ফলিতার্থে এক হয়ে ভিন্নরূপে বিন্যস্ত। এছাড়া, আরও দুটি একটি দৃষ্টান্তের দর্শন মিলেছে, তাদের উল্লেখমাত্র করা গেল। কাহ্নিলা'র 'সহজনিদ্রা' চর্যায় সাত ও আট ছত্র, ভুসুকুর 'রজ্জুসর্পাদি প্রতিভাস' চর্যায় এক ও দুই ছত্র।

চর্যাগানে কতকগুলি প্রবাদ, প্রবচন, রীতিসিদ্ধ পদের প্রয়োগ পাই। এগুলি রূপকাতিশয়োক্তি। রচনায় রূপের দ্বারা চিত্রধর্মের সঞ্চার করতে হলে অথবা 'মিতভাষণের দ্বারা স্বল্প প্রয়াসে অর্থের সাক্ষাৎকার ঘটাতে হলে,' মানুষের সাধারণ জীবনের কতকগুলি আচরণকে বা স্বভাবকে অল্প কথায় ঘটনাগত রূপে প্রয়োগ করতে হয়। এই প্রয়োগই প্রবাদ প্রবচন বা রীতিসিদ্ধ পদ। এগুলির আবেদন দেশ-কালের মধ্যে প্রায়শই সীমাবদ্ধ, সার্বভৌম এবং সর্বকালীন নয়। কারণ বিশেষ যুগের সম্প্রদায়গত (বা অঞ্চলগত) মানুষের জীবনাচারকে অবলম্বন করে এ কথাগুলি জন্ম নেয়। উদাহরণ নেওয়া যাক। সরহের 'ঋজুবর্ত্ম' চর্যায়,

হাথে রে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ

প্রবাদবাক্য বাঙলাভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন মৈথিলীতে, 'হাথক কাঁকন অরসী কাজ' (বিদ্যাপতি ?)১

ঢেণ্ঢণ-পা এর 'প্রহেলিকা' চর্যায়,

হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী ॥

এটি বাঙলার বিশিষ্ট প্রবাদ-বাক্য। বীরভূমে প্রচলিত, 'হাঁড়িতে ভাত নেই নাঙ্গে ঢেলাচ্ছে'২

সরহের 'অবনীতচিত্ত' চর্যায়,

সরহ ভণই বর সুণ গোহালী কিমো দুঠ্ঠ বলন্দেঁ

১ শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত 'চর্যাগীতি-পদাবলী' ধৃত।
২ ঐ ঐ ঐ

এটি সর্বজনবিদিত বাঙলা প্রবচন। শবরের 'মত্তশবর মৃত্যু' চর্যায় 'কান্দই সগুণ শিআলী,' বিশিষ্ট প্রবচনরূপে বাঙলায় চলিত আছে।

চর্যাগানের প্রবাদ-প্রবচন লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, এগুলি বিশেষভাবে কৃষি-নির্ভর গ্রাম-বাঙলার ছবি। প্রথমটি গৃহস্থ জীবনের, দ্বিতীয়টি ব্যভিচারী জীবনের, তৃতীয়টি কৃষিজীবনের এবং শেষেরটি অসহায় উপেক্ষিত জীবনের। অথচ এ ছবিগুলিই উপমানের মত একটি অন্যতর উপমেয়-কথার আবরণ রচনা করে অবস্থান করছে। এগুলি রূপকাশ্রিত এবং রূপকেরই পরিণত রূপ বলে রূপকাতিশয়োক্তি অলঙ্কার। অপ্পয়দীক্ষিত তাঁর 'চিত্র-মীমাংসা'র 'কুবলয়ানন্দ' কারিকায় অতিশয়োক্তির যে সাত প্রকারের ভেদ করেছেন, তাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান ভেদের নাম দিয়েছেন রূপকাতিশয়োক্তি, যা ভেদে অভেদ রূপ। সদ্যোক্ত পদাংশগুলি উল্লিখিত অলঙ্কারেরই অন্তর্গত।

এবার কতকগুলি উদ্‌ভট ও অসম্ভব অলঙ্কারের উল্লেখ এবং আলোচনা করেই এ পর্ব-পরিচয় শেষ করব।

'দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ॥'

'কাল মুষা উহ ণ বাণ
গঅণে উঠি করঅ অমণ ধাণ॥'

'বলদ বিআএল গাবিআ বাঁঝে।
জো সো চৌর সোই দুষাধী।'

'নিতে নিতে ষিআলা ষিহেঁ ষম জুঝঅ'

'বাঙ্কি-সুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া।
বালুআতেলেঁ সসর-সিংগে আকাশ ফুলিলা॥'

'সসহর লই ষিঞ্চহুঁ পাণী॥
মেরু-শিখর লই গঅণ পইসই॥'

'কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা
কমলমধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা॥'

'হসই শান্তী সঅ আপণকরী সখী
আকাস বিআঅল দেখী॥'

এগুলি বিশুদ্ধ প্রহেলিকা-পদ যার অন্তরকথা রহস্যময় এবং দুর্জ্ঞেয়। অভিজ্ঞতার মধ্যে যে জীবনাচার বিশ্বাস্য, এগুলির অভিধার্থ তার বিপরীত। অথচ গূঢ়ার্থটি কেবলমাত্র অধিকারীর জ্ঞাতব্য। ধর্মতত্ত্বের অলঙ্কারাদি সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে যা পাওয়া যায় তা সহজেই বোধ্য, কেননা তা জীবনচেষ্টার প্রবর্তনের পথেই আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু এই জাতীয় ধর্মকথা জীবনচেষ্টার নিবর্তনের পথে প্রকাশ পাওয়ায় এদের অলঙ্কারাদি মানুষের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হয়নি। 'উল্টা-সাধন' বলেই জীবনের আচরণগুলিকে, স্বভাব এবং প্রবণতাটিকে কার্য-কারণের বিরুদ্ধ সম্পর্কে স্থাপিত করা হয়েছে।

এইখানেই হয়ত সর্বভারতীয় মিষ্টিক সাধনপন্থার সঙ্গে (সহজিয়া পন্থা) চর্যাকথার যোগ, যেখানে কবীরের দাদূর ভাবনা-সাদৃশ্য, মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির নগররুচি-পুষ্ট মার্জিত প্রহেলিকার নিদর্শন এবং পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যের বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল, শাক্ত-গীতাবলীতে যা অনুস্যূত। আমরা 'চর্যাগীতির উপমায় ভারতীয় উজান-সাধনার ঐতিহ্য' পরিচ্ছেদে এ আলোচনা বিস্তারিত করব। এখানে শুধু বক্তব্য এই, প্রহেলিকা-নির্ভর এই হেঁয়ালিময় অলঙ্কারগুলির ব্যবহার চর্যাপদের দুর্জ্ঞেয়তাকে সম্পূর্ণ করার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। অনির্বচনীয়ের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন-চেষ্টায় কতকগুলি অসম্ভব উপমা দার্শনিক আলোচনায় প্রথাগত হয়ে উঠেছিল, চর্যাপদে তারই অনুসরণ।

নিরলঙ্কার চর্যাগীতি: কাহ্নের 'বাটপাড়' চর্যা; কাহ্নের 'কামচণ্ডালী' চর্যা; সরহের 'অচিন্ত্যধর্ম' চর্যা; দারিকের 'মহাসুখলীলা' চর্যা; তাড়কের 'সহজানুভব' চর্যা; কঙ্কণের 'তথতানাদ' চর্যা; পবিশিষ্টে নয় ও এগার সংখ্যক চর্যাংশ।

উপরোক্ত চর্যাগীতিগুলির বিষয় সোজাসুজি আধ্যাত্মিক। তাতে জন্ম-মৃত্যুর, সুখ-দুঃখের দোলা থেকে মুক্তি পাবার, সহজ অবস্থায় মহাসুখ-নিবাসে পৌঁছবার ঠিকানা আছে, পরমার্থ-সত্য উপলব্ধির জন্যে গুরু-অনুগতির নির্দেশ আছে। এগুলি বিশুদ্ধ সাধনকথা, ধর্মাবেশে অতি-সংহত, অলঙ্কার-যোজনার অবকাশ এখানে অনুপস্থিত। চর্যাপদের অলঙ্কার-সত্যের একটি বড় দিক হল, অলঙ্কার এখানে রূপোদ্দীপক বা রসোদ্দীপক নয়, যতটা প্রয়োজনীয় তত্ত্বের অর্থ-প্রকাশক। তাই এ যুক্তি হয়ত সম্ভাব্য হবে যে, তত্ত্বকথা যেখানে যত গূঢ় এবং গোপনীয়, রূপাশ্রয়ী

অলঙ্কার-নির্মাণ-কামনা সেখানে তত বেশি। সদ্যোক্ত পদগুলির তত্ত্বকথা হয়ত ঐ গোষ্ঠীর পক্ষে সাধনার প্রাথমিক এবং পরিচিত পর্যায়ের মধ্যেই সমাসীন ছিল, তাই সরল-কথাকে অলঙ্কার-যোগে আলো দেখানোর ইচ্ছে হয়ত চর্যাকারের ছিল না। প্রকৃতপক্ষে কেন যে এই পদগুলিতে অলঙ্কার যোজনা হয়নি, তার সঠিক কারণ নির্ণয় করার কোনও সূত্র বা ইঙ্গিত এখানে নেই। সুতরাং মনের কুয়াশা আর দৃষ্টির আবিলতা দিয়ে ভিজে কম্বল আরো ভারী করা মূঢ়তা মাত্র, বিশেষত যেখানে গুরু বোবা আর শিষ্য কালা, সেখানে 'জেতই বোলী তেতবি টাল'।

এবার আমরা একটি পদের উপমা-বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করব। গুড়রীর 'যুগনদ্ধ হেরুক' চর্যার তিন ও চার ছত্র,

জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি ॥[১]

দ্বিতীয় ছত্রটিই আমাদের লক্ষ্য। এটি সাধারণ দৃষ্টিতে রূপক, কিন্তু আভ্যন্তর বিচারে একে অপরিণত রূপকই বলব। যদি ছত্রটি এইভাবে লেখা হত, 'তো মুহ কমলরস পীবমি' অর্থাৎ 'চুম্বী' কথাটি অনুক্ত থাকতো, তবে একে সার্থক রূপক বলতাম। কিন্তু 'চুম্বী' এই অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপকের সাধারণ-ধর্মের বিবৃতি থাকার ফলে (যা রূপকে তীব্র আরোপশক্তির বলে উহ্য থাকে) এটি সুপরিণত রূপক হতে পারেনি। অথচ অনুরাগের মাধ্যমে উপমানের তীব্র আরোপশক্তি এখানে সঞ্চারিত হয়েছে। ফলে একে রূপক না বললে বোধে ত্রুটি থাকে, আবার রূপক বললে অলঙ্কারের ত্রুটি ঘটে। পুনরায়, এ উভয়-সঙ্কটে সমাধান পেতে সংস্কৃতের 'ব্যস্ত রূপক' স্তরেও এ ব্যবহারকে ধার্য করা যায় না, কেননা 'ব্যস্ত রূপক' সমাস-ভাঙা পদ বা ব্যাসবাক্য দিয়ে গড়া। বলা বাহুল্য 'চুম্বী' কথাটি 'মুখকমল'এর ব্যাসবাক্য নয়। বরং এটি 'মুখকমল-রসপানে'র উপায়গত বিবৃতি বা আলঙ্কারিক ভাষায় উপমেয়-উপমানের সাধারণ ধর্ম, রূপকে যা কখনও উক্ত থাকে না, ব্যঞ্জিত হয় মাত্র। কিন্তু পক্ষান্তরে 'চুম্বী' উপভোগের এমন এক প্রত্যক্ষ-গম্য সবলতা সৃষ্টি করেছে, যার অভাবে রূপকের ইঙ্গিত সার্থক ব্যঞ্জনা-বহন করতে পারতো না। কবির এ ব্যবহার-বিধি অত্যন্ত চমকপ্রদ। নৈষ্ঠিক অলঙ্কার-প্রণালীতে একে সার্থক রূপক বা উপমা কিছুই বলা চলে না অথচ এ ছত্রের বোধ আমাদের লুব্ধ করে। ঘসা পয়সার মত

১ উদ্ধৃতিগুলি শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত 'চর্যাগীতি-পদাবলী' থেকে নেওয়া

এর তাম্র-মূল্য মুদ্রাঙ্কন-মূল্যকে ছাড়িয়ে গেছে। লেখকের আসল ঔৎসুক্য মুখচুম্বন ও তজ্জনিত আনন্দকে সহজানন্দের আধ্যাত্ম অনুভূতির প্রতিচ্ছবি রূপে প্রয়োগ করা। যাঁরা আধ্যাত্মতত্ত্বের সঙ্গে অপরিচিত তাঁরা এর মধ্যে কোন অলঙ্কারের অস্তিত্বই সন্দেহ করবেন না। এ যেন সম্পূর্ণ দেবাবরণকে কাদার তাল রেখে কেবল চোখের মধ্যে দৈবী ভাবের স্ফুরণ দেখানো। ছত্রটির অলঙ্কার অনির্ণেয় বলে একে 'অপরিণত রূপক' বলাই সঙ্গত মনে করি।

চর্যাগীতির উপমায় ভারতীয় উজান-সাধনার ঐতিহ্য

এ অধ্যায়ে আমরা চর্যাগানে উপমার একটি বিশিষ্ট দিকের আলোচনা করব। প্রশ্ন এই, উপমার মধ্যে দিয়ে চর্যাগীতি ভারতীয় ভাবধর্মসাধনার পথটিকে কিভাবে আপন করেছে। চর্যার রূপক-চিত্রগুলিতে জীবনের সজাগ ভোগবৈরাগ্য উদ্যত থাকলেও কোন কোন স্থানে অসতর্ক যোগী-চিত্ত থেকে জীবন ও জগতের প্রতি ঈষৎ এবং ক্বচিৎ অনুরাগ আভাসিত।

বলা বাহুল্য, গোটা চর্যাপদাবলীকে যদি কেবলমাত্র যোগী-জীবনের তত্ত্বোক্তি এবং দর্শনভাবনা বলে ধরে নিতে হয়, তবে এর মধ্যে কবিতার রূপলোক আশা করা চলে না। বিশেষত চর্যায় যে জীবনবাদ প্রণীত. তাতে ভোগ-নির্বাণ এবং প্রবৃত্তি-মুক্তিই একমাত্র কথা। অথচ আমাদের সন্ধানের বিষয়, কবিতার উপমা-কৌশল, যেখানে জীবনের প্রতি একটা মৌলিক এবং জৈব অনুরাগ থেকে প্রশ্রয়-লব্ধ প্রবৃত্তি উপভোগের নব নব পদ্ধতি, ভঙ্গি এবং রীতি-পরিচয় দেবে।

দর্শনের উপলব্ধি যখন অনুভূত অরূপকে লিখিতরূপে অপরের গোচর করতে চায়, তখন সেই অরূপের জন্যে রূপের, অমূর্তের জন্য মূর্তির আশ্রয় নিতেই হয়। চর্যাপদে যতই বলা যাক না কেন 'জেতই বোলী তেতবি টাল', তবু যেখানেই সাধকের ধ্যানানুভব স্পষ্ট, সেখানেই এ পৃথিবীর রূপাশ্রয় অপরিহার্য। এখন জিজ্ঞাস্য চর্যার আলঙ্কারিক রূপাশ্রয় এমন নিবিড় করে পৃথিবীর মায়াকে বেষ্টন করেছে কেন? রামপ্রসাদ সেন গেয়েছিলেন,

দে মা আমায় তবিলদারী
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।

প্রসাদী গানের ভাবমর্মে অবশ্যই অধ্যাত্ম-তৃষ্ণার কথা ঘোষিত, কিন্তু এর রূপচ্ছবি যে পার্থিব আকাঙ্ক্ষার কথা বলে, সেখানে বাস্তব সমাজের বিড়ম্বিত জীবনের কোন শঙ্কিত স্মৃতি কি উপস্থিত নেই। প্রকৃত-বাস্তবে ধনাগারিক হবার বঞ্চিত বাসনাই কি কবিকে অলৌকিক অধ্যাত্মমার্গে সান্ত্বনা দিচ্ছে না। হয়ত এ গানে গায়কের ব্যক্তিজীবনের বিফলতা-বোধ জাগেনি, কিন্তু একই কালে ভোগে আগ্রহী অথচ বঞ্চিত গোটা বাঙলা সমাজের মর্মব্যথার চিহ্ন এর সুরে ধরা পড়ে। উদ্ধৃত গানের

পদটিতে রামপ্রসাদের ব্যক্তি-মুক্তির পরলোক-কাতরতা থাকলেও এর রূপগত প্রকাশ ইহলোকের অনুরাগেই রচিত।

দার্শনিক কবিতার অলঙ্কার-কর্মের নিয়মটাই এই। অতি সূক্ষ্মকে প্রকাশ করতে অতি স্থূল রূপাশ্রয় প্রযুক্ত হয়। এ সব উপমায় উপমানের রূপচ্ছবি এবং উপমেয়ের ভাবমর্ম পরস্পর দূরবর্তী হয়ে সমান্তরাল অবস্থান রক্ষা করে। চর্যাগানের উপমাতেও রূপ আর ভাবনা ঠিক এমনই। ছবির দিক থেকে প্রায় স্বতন্ত্র এর অলঙ্কারে বস্তুজীবনের অনেক কথা ও কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। অলঙ্কারেব ছবির কথা নয়, অন্তর-কথা থেকে এখানে এই সাধনার স্বরূপ লক্ষ্য করব। তাছাড়া, সাধনার কোন্ প্রেরণায় অলঙ্কার এই বিশেষ প্রকৃতি লাভ করছে, তারও মর্ম অবগত হতে পারব।

চর্যাপদের ভাষা-ব্যবহার সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

> This enigmatic language of the old and mediaeval poetry is popularly styled as "Sandhyā-bhāsā", which according to its conventional spelling, literally means 'the evening language',—and the word evening here may be explained as pointing to the mystical nature of the language. In the Hindu as well as Buddhist Tantras, and in the Buddhist Dohās and songs, we find much use of this Sandhyā-bhāsā and MM. H. P. Sastri has explained it as the 'twilight-language', i. e., half expressed and half concealed (ālo-āmdhāri). But MM. Vidhusekhara Sastri in an enlightening article in the Indian Historical Quarterly (1928. Vol. IV. No. 2) has demonstrated with sufficient evidences from authoritative texts that the language is not Sandhyā-bhāsā but is Sandhā-bhāsā (Sam-dhā) or the 'intentional language', i. e.. the language literally and apparently meaning one thing, but aiming at a deeper meaning hidden behind. Reference to this word Sandhā-bhāsā is found in many texts of Pāli Buddhism as well as in Sanskrit Mahāyāna texts. Warning has often been given not to interpret the sayings of Buddha literally, but one should sink deep into them to catch the right meaning aimed at by the Lord,.........১

বৌদ্ধ ধর্মমত সম্বন্ধীয় প্রশ্ন সাধারণ্যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার সময় শ্রমণগণ 'অমরা বিক্ষেপিক'এর (অমরা নামক পিচ্ছিল-দেহ মৎস্যের ন্যায়

১ Obscure Religious Cults. Appendix.E. Page—477. By Dr. S. B. Das Gupta. M.A., P.R.S., Ph.D.

বক্রগতিতে গমনকারী। ঐ মৎস্যকে ধৃত করা অত্যন্ত কঠিন।) নিয়ম মানেন। পালি-বৌদ্ধ-গ্রন্থ 'দীঘ নিকায়'এ চারটি কারণে এই দ্ব্যর্থ কথা-বলার নিয়মের উল্লেখ আছে। কারণগুলি যথাক্রমে মিথ্যা-ভয়, উপাদান-ভয়, তর্ক ও বাদানুবাদ-ভয় এবং মূঢ়তার জন্য জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ভয়।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ ও বিধুশেখর শাস্ত্রীর উপরিউক্ত ব্যাখ্যা এবং 'দীঘ নিকায়' গ্রন্থের 'অমরা বিক্ষেপিক' পরিচ্ছেদের নির্দেশ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, মহাযান বৌদ্ধ-সাধনগীতি চর্যাগুলিতে ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট একটি ধর্মগত উদ্দেশ্যকেই মানা হত। তাই এ সব পদের রূপ-পরিচয়ে আমরা দুটি স্বতন্ত্র গুণ (quality) দেখতে পাই। প্রথম, চিত্র এবং অলঙ্কারের দ্বারা উদ্দীপিত সাধারণ লৌকিক জীবনের কথা। দ্বিতীয়, কথার অন্তরে অনুধ্যেয় সাধন-তাৎপর্যের সূক্ষ্ম সঙ্কেত। এ প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। অ-দার্শনিক উপমা-অলঙ্কারে উপমেয় এবং উপমান উভয়ে একই লক্ষ্যের পথ চিনিয়ে দেয়। সেখানে মূলভাব যা চায়, পৃথিবীর ছবিই তা উদ্বোধিত করে দেয়। আসলে, জীবনানুরাগ এবং বস্তু-উপভোগ এ উপমা-পরিকল্পনার মূল হওয়ার ফলেই ছবি আর ভাব পরস্পরের পরিপূরক। সেক্ষেত্রে ছবির অর্থ ভাবের অর্থ থেকে পৃথক অথবা বিপরীত হতে পারে না। রূপ-সৌন্দর্যের কবি কালিদাস জয়দেব বিদ্যাপতি প্রভৃতির রচনা থেকে যে কোন একটি উদাহরণ নিলেই এ কথা বোঝা যাবে। কিন্তু দার্শনিক উপমা-অলঙ্কারে সে লক্ষণ অনুপস্থিত। বিশেষত ভোগবিমুখতা যে দর্শনের সব কথা, সেখানে অলঙ্কারের অভিধা ও ব্যঞ্জনা স্বতন্ত্র এবং কোথাও কোথাও বিরুদ্ধ। এক্ষেত্রে অলঙ্কারের অভিধা থেকে যে রূপচ্ছবি জাগে, তার একটা নিগূঢ় উত্তরদ্যোতনা হয়ত আছে, কিন্তু নিরপেক্ষ একটা জীবনরূপও আছে, যাকে এক লহমায় আমাদের পরিচিত বলে চিনতে পারি। দার্শনিক অলঙ্কারে যে দুটি আলেখ্য (রূপালেখ্য ও ভাবালেখ্য) স্বতন্ত্র আবেদন নিয়ে ফুটে ওঠে, তার থেকে তাদের স্বতন্ত্র অনুষঙ্গও অনুমান করা যায়।

পালি ভাষায় রচিত 'ধম্মপদ' বৌদ্ধধর্মের একখানি প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বৌদ্ধধর্ম ও নীতির সার এ গ্রন্থে সংগৃহীত। চারটি আর্যসত্য বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি। দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখ-শান্তকারী আর্য-অষ্টাঙ্গ-মার্গ। এ গ্রন্থের নীতি-উপদেশগুলি বিশ্বজনীন শিক্ষার আধার। ভোগগতপ্রাণ জীবনের অনায়াস-প্রবাহের বিপরীত মুখে

চলবার প্রবর্তনাই এ গ্রন্থের শিক্ষা। বিভিন্ন 'বগ্‌গো'তে (বর্গ) বিভক্ত যে পদগুলি আমরা পাই, তাতে কেবল নীরস ধর্মমতই লিপিবদ্ধ নেই। জীবনের সহজ গতিকে সাধনার গতি দান করার গভীর উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে নীতিময় দৃষ্টান্তের যোগে পদগুলি মানবিক আবেদনে জীবন্ত। আমাদের আলোচ্য চর্যাগীতি মহাযানী বৌদ্ধ ভাবসাধনারই আনন্দ-গান। এ গানে ধর্মের দুর্জ্ঞেয়তা রূপের সুপরিচয়ের মাধ্যমে সর্বজনীন না হলেও গোষ্ঠিগত উপলব্ধির স্বচ্ছতা সৃষ্টি করেছে। চর্যাগানে অলঙ্কার-প্রকরণ সুপ্রাচীন বৌদ্ধ-নীতিকথার সঙ্গে গভীরভাবে ঐক্য রক্ষা করে প্রকাশিত। এখানে আমরা 'ধর্ম্মপদ' থেকে দুটি শ্লোক উদ্ধার করব।

বনং ছিন্দথ মা রুক্‌খং বনতো জায়তে ভযং।
ছেত্বা বনং চ বনথং চ নিব্বণা হোথ ভিক্খবে।।১

[মাত্র একটি বৃক্ষ ছেদন না করে সমুদয় অরণ্যের উৎপাটন কর, অরণ্য থেকে ভয়ের উৎপত্তি হয়। বন ও বনজ গুল্মাদি ছিন্ন করে, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা অরণ্যমুক্ত হও।]

সবন্তি সব্বধি সোতা লতা উব্ভিজ্জ তিট্‌ঠতি।
তং চ দিস্বা লতং জাতং মূলং পঞ্‌ঞায ছিন্দথ।।২

[জলস্রোত সর্বত্র প্রবাহিত হয়, লতা মৃত্তিকা ভেদ করে উত্থিত হয়; লতার উৎপত্তি দেখলে প্রজ্ঞাবলে তার মূল ছেদন করবে।]

কাহ্নের একটি চর্যার উপমার সঙ্গে উক্ত 'ধম্মপদ' দুটির মিল দেখা যায়।

মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা
আসা বহল পাতহ বাহা।।
বরগুরুবঅণে কুঠারেঁ ছিজঅ
কাহ্ন ভণই তরু পুণ ন উইজঅ।।
বাটই সো তরু সুভাসুভ পাণী
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী।।
জো তরু-ছেব-ভেবউ ন জাণই
সড়ি পড়িআঁ রে মূঢ় তা ভব মাণই।।
সুন তরুবর গঅণ কুঠাব
ছেবহ সো তরু মূল ন ডাল।।

১ মগ্‌গ বগ্‌গো। ধম্মপদ। ভিক্ষু শীলভদ্র।
২ তহ্না বগ্‌গো। ঐ ঐ

উপরের এই বৃক্ষছেদ চর্যায় অলঙ্কারের যে ছবি, পূর্বোক্ত ধম্মপদেও তারই সার্থক পূর্বাভাস। পার্থক্যের মধ্যে চর্যার ছবিটি রূপের আবেদনে যত স্বচ্ছ এবং বিবৃত, ধম্মপদে তা নেই। কিন্তু উভয়তই ইন্দ্রিয়-জয়ের গোপন অথচ প্রত্যক্ষ অনুজ্ঞা লক্ষ্য করা যায়।

'ধম্মপদে' ধর্মকথাই প্রধান বক্তব্য, উপমা কেবল বক্তব্যকে স্পষ্ট করার জন্যে প্রযুক্ত। চর্যাপদে অলঙ্কারের মাধ্যমে ছবি ফুটেছে, উৎপ্রেক্ষা রূপকে জীবনের কর্মচঞ্চলতার আভাস মিলেছে। 'ধম্মপদে' দৃষ্টান্ত, উল্লেখ ইত্যাদি অলঙ্কারের মত সাধারণ তুলনার পরিচয়।

সিঞ্চ ভিক্খু ইমং নাবং সিত্তা তে লহুমেস্সতি।
ছেত্বা রাগং চ দোসং চ ততো নিব্বাণমেহিসি ॥১

[হে ভিক্ষু এই তরী সেচন কর; সেচনে তা লঘু হবে. রাগ ও দ্বেষ বিনষ্ট করে তুমি নির্বাণে উপনীত হবে।]

এর সঙ্গে ডোম্বীর 'নৌবাহিক ডোম্বী' চর্যার অভিনব ঐক্য দেখা যায়।

পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিটত কাচ্ছী বান্ধী
গঅণ দুখোলেঁ সিঞ্চহু পাণী ন পইসই সান্ধি ॥

চর্য্যার চিত্রটি ধম্মপদের চিত্রের সঙ্গে হুবহু এক। এবং তারা মহাযানী বৌদ্ধমতের একই উৎসস্থান থেকে উৎপন্ন। অপর একটি ধম্মপদ,

পঞ্চ ছিন্দে পঞ্চ জহে পঞ্চচুত্তরি ভাবয়ে।
পঞ্চ সঙ্গাতিগো ভিক্খু ওঘতিণ্ণোতি বুচ্চতি ॥২

[পঞ্চ বন্ধন (সৎকায দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত, পরামর্শ এবং প্রতিঘ) ছিন্ন কর, অপর পঞ্চ (রূপ-রাগ, অরূপ-রাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা) পরিত্যাগ কর, তদুপরি পঞ্চেন্দ্রিয়ের (শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য, সমাধি এবং প্রজ্ঞা) ভাবনা কর। যে ভিক্ষু পঞ্চের (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) সহিত স্পর্শ অতিক্রম করেছেন, তিনি প্লাবনোত্তীর্ণ কথিত হন।]

১ ভিক্খু বগ্গো। ধম্মপদ। ভিক্ষু শীলভদ্র।
২ ঐ ঐ ঐ

অনুরূপ একটি চর্যাপদ,

পঞ্চ তথাগত কিঅ কেড়ুআল
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল ।।
গন্ধ পবস রস জইসোঁ তইসোঁ।
নিন্দ বিহুনে সুইনা জইসো ।।
চিঅ কণ্ণহাব সুণত-মাঙ্গে
চলিল কাহ্ন মহাসুহ-সাঙ্গে ।।

ধম্মপদে অলঙ্কারের স্থান অতি সঙ্কুচিত এবং উপমেয়-কথারই একাধিপত্য। নীতিশিক্ষার কথা মোটামুটি অপরোক্ষ ভঙ্গিতেই প্রকাশিত. তবে ক্বচিৎ ভাবের আলোক-সম্পাত ঘটেছে ক্ষীণদ্যুতি কয়েকটি অলঙ্কারে। ধ্যান-সাধনা গোপন করার চেষ্টাব দ্বারাই চর্যাগানে রূপক অলঙ্কাব প্রবর্তিত। অলঙ্কারের উপমেয়-পক্ষ আড়ালে থেকে উপমান-পক্ষকে সুপ্রকাশিত হবার স্থান দিয়েছে। চর্যাপদের মত ধম্মপদে এমন গোপন-প্রবণতা নেই।

আর একটি ধম্মপদ,

গহকাবক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং।
বিসংখবগতং চিত্তং তণ্হানং খযমজ্ঝগা ।।১

[জ্ঞানাভাবে গৃহকারকের অনুসন্ধানে বহু জন্ম অতিক্রম করেছি; পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ দুঃখ। কিন্তু গৃহকারক! এইবার তুমি ধৃত হয়েছ, আর তুমি গৃহ-নির্মাণ করতে পারবে না। তোমার পর্শুকাগুলি ভগ্ন ও গৃহকূট বিদীর্ণ হয়েছে। আমাব চিত্ত নির্বাণগত. তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত।]

এর সঙ্গে ধাম-এর 'গৃহদাহ' চর্যাপদেব নিম্নোক্ত ছত্রগুলি,

ডাহ ডোম্বী-ঘবে লাগেলি আগি
সসহর লই ষিঞ্চহুঁ পাণী ।।
নউ খর জালা ধূম ন দিশই
মেরু-শিখব লই গঅণ পইসই ।।
দাটই হরি-হর-বাহ্ম ভড়াবা
দাটা হই ণবগুণ শাসন-পডা ।।

১ জরা বগ্‌গো। ধম্মপদ। ভিক্ষু শীলভদ্র।

পদ দুটির মধ্যে গৃহদাহ কিংবা গৃহ-বিনাশের মাধ্যমে চিত্ত (প্রবৃত্তি-মুখ্য)-বিনাশের আনন্দ ব্যক্ত। ধম্মপদের চেয়েও চর্যাপদের উপরোক্ত ছবিটি আলঙ্কারিক রূপে কত বিবৃত কত স্পষ্ট। অবশ্য ধম্মপদটিতেও অলঙ্কার আছে, কিন্তু তার রূপচ্ছটা নেই। তথাপি দেহ এবং চিত্তনাশের যে দুটি একটি আলঙ্কারিক চিত্র ধম্মপদে পাই, তা সত্যই সুন্দর,

যানিমানি অপত্থানি অলাপূনেব সারদে।
কাপোতকানি অট্‌ঠীনি তানি দিস্বান কা রতি ॥১

[শরৎকালের (অব্যবহার্য) অলাবুর ন্যায় কপোতবর্ণ (ধূসর) এই যে অস্থিনিচয়, এ দেখলে আনন্দের স্থান কোথায়!]

দেহকে সুরক্ষিত করার প্রয়োজনে যোগী দুর্গ, প্রাকার এবং বিভিন্ন আয়ুধের উল্লেখ করেছেন। এখানে দুটি ধম্মপদ আমরা লিপিবদ্ধ করব,

নগরং যথা পচ্চন্তং গুত্তং সন্তরবাহিরং।
এবং গোপেথ অত্তানং খণো বে মা উপচ্চগা ॥
খণাতীতা হি সোচন্তি নিরয়ম্হি সমপ্পিতা ॥২

[সান্তরবাহির সুরক্ষিত প্রত্যন্ত নগরের ন্যায় আপনাকে রক্ষা করবে, মুহূর্তমাত্র সময়ও যেন হস্তচ্যুত না হয়। সুযোগের পরিহারে নিরয়-গামী ও অনুতপ্ত হতে হয়।]

এবং—

কুম্ভূপমং কাযমিমং বিদিত্বা নগরূপমং চিত্তমিদংঠপেত্বা।
যোধেথ মারং পঞ্‌ঞাযুধেন জিতং চ রক্খে অনিবেসনো সিযা ॥৩

[দেহকে কুম্ভকার-নির্মিত ভাজনরূপ জ্ঞান করে, চিত্তকে নগরের ন্যায় সুরক্ষিত করে, প্রজ্ঞায়ুধের দ্বারা মারের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, জয়লাভান্তে বিজিতের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে, পার্থিব সুখে অনাসক্ত হবে।]

১ জরা বগ্‌গো। ধম্মপদ। ভিক্ষু শীলভদ্র।
২ নিরয় বগ্‌গো। ঐ। ঐ।
৩ চিত্ত বগ্‌গো। ঐ। ঐ

সমভাবাক্রান্ত একটি চর্যাপদ,

কুলিশ-ভর-নিদ বিআপিল
সমতা জোএ মণ্ডল সঅল।।
বিষয় ইন্দিপুব সব জিতেল
শূনবাঅ মহাসুহেঁ ভইল।।
তূব শাখ্ধ ধনি অনহা গাজই
মোহ ভববল দূবে ভাজই।।
সুহ-নঅবীএ লই আগ খাতি
আঙ্গুলি উভ তোলি কুক্কুরীপা ভণথি।।

ধম্মপদের সরল উপদেশ-কথায় অলঙ্কারগুলি যৎকিঞ্চিৎ স্থান পেয়ে প্রবক্তার উদ্দেশ্যকে ঈষৎ স্পষ্ট করেই আপন দায়িত্ব শেষ করেছে। এ সব পদের উপদেষ্টা এ সকল রচনাকে জগৎ ও জীবনের পক্ষে কেবল শিক্ষা-মূলক বলেই স্থির করেছিলেন। তাই হিতকথাই কেবলমাত্র যে পদের প্রাণ, সেখানে কাব্যগত অলঙ্কারের স্থান ততটাই, যা দিয়ে উদ্দিষ্ট মর্মটুকু বোধ্য হয়। অলঙ্কার এবং তজ্জাত সৌন্দর্যের প্রতি রচয়িতার একটা গভীর অমনোযোগ এখানে ধরা পড়ে। সোজাসুজি ধর্মশিক্ষার অকপট পথ আপন গতির কৌশল জানে না। অথচ প্রত্যক্ষ-ভাষণের অভিধা পরোক্ষ এবং তির্যক-ভাষণেই কেবল অলঙ্কৃত-কথা হয়ে উঠতে পারে। চর্যাগানে কথাকে কুটিল করার আলঙ্কারিক কৌশল বড়, কেননা তা দিয়ে কবিসুলভ সৌন্দর্য-প্রয়াস না হোক, সাধকসুলভ মন্ত্র-শুচিতা রক্ষার প্রয়াস সিদ্ধ।

এবার যে সব ধম্মপদ এবং চর্যাগীতি উদ্ধার করব, তাদের মধ্যে উপমার ভাব-তাৎপর্যগত মিল পাওয়া যাবে। তবে ধম্মপদের ক্ষেত্রে উপমা বাইরের সজ্জা বিশেষ, চর্যাগীতের ক্ষেত্রে তা ভাবসমৃদ্ধির সহায়ক।

অলংকতো চে পি সমং চবেয্য
....
সো ব্রাহ্মণো সো সমণো স ভিক্খু।।[১]

[অলঙ্কৃত হয়েও যিনি শমচারী,............তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রমণ, তিনিই ভিক্ষু।]

১ দণ্ড বগ্‌গো। ধম্মপদ। ভিক্খু শীলভদ্র।

আর কাহ্নের চর্যাপদে,

আলি-কালি ঘণ্টা-নেউর চরণে
রবি-শশী কুণ্ডল কিউ আভরণে ॥
রাগ দ্বেষ মোহ লাইঅ ছাব
পরম মোখ লবএ মুত্তিহার ॥

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'তে পাই,

নিন্দা পরব ভূষণ করে,
কাঁটার কণ্ঠহার ;
মাথায় করে তুলে লব
অপমানের ভার।
দুঃখীর শেষ আলয় যেথা
সেই ধূলাতে লুটাই মাথা,
ত্যাগের শূন্য পাত্রটি নিই
আনন্দরস ভরে।

কাহ্নের চর্যাগানে অদ্ভুত প্রহেলিকাময় রূপক-ব্যবহার পাওয়া যায়,

মারিঅ শাসু নণন্দ ঘরে শালী
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইঅ কবালী ॥

এই চর্যারই পূর্বরূপ ধম্মপদে একটু বদল করে লেখা আছে,

মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানো দ্বে চ খত্তিযে।
রট্ঠং সানুচরং হন্ত্বা অনীঘো যাতি ব্রাহ্মণো ॥১

[মাতা, পিতা ও দুই ক্ষত্রিয় রাজাকে হত্যা করে অনুচরসহ রাষ্ট্রের বিনাশ সাধন করে ব্রাহ্মণ নির্দুঃখ হন।]

আরও একটি পদে,

মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানো দ্বে চ সোত্থিয়ে।
বেয্যগ্ঘ পঞ্চমং হন্ত্বা অনীঘো যাতি ব্রাহ্মণো ॥২

[মাতা পিতা ও দুই ব্রাহ্মণ রাজাকে হত্যা করে, পরে ব্যাঘ্রের বিনাশ সাধন করে ব্রাহ্মণ নির্দুঃখ হন।]

১ পকিণ্ণক বগ্গো। ধম্মপদ। ভিক্ষু শীলভদ্র।
২ ঐ ঐ ঐ

প্রথমোক্ত চর্যায় পরবর্তী দুটি ধম্মপদেরই উত্তরধ্বনি পাওয়া গেল। এখানে দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য, ধম্মপদে পাপ প্রবৃত্তির উন্মূলন আর চর্যাপদে জীবন-বাহনশক্তির উচ্ছেদ। একে পাপ, অপরে ভ্রান্ত ধর্মাচরণ ও সুস্থ ইন্দ্রিয়া-চারের উৎসাদন নির্দিষ্ট। এদের রূপক ব্যাখ্যা করার আগে পর্যন্ত যে ছবি পাওয়া যায়, তাতে জীবনবিরোধী নৃশংস এক নরঘাতকের খেয়ালী ক্ষমতার পরিচয় স্পষ্ট। কিন্তু এই ছবির রূপককেই যখন সাধনার আলোকে প্রতি-ফলিত করা যাবে, তখন এরই এক শুদ্ধসত্ত্ব রূপ ফুটবে। এখানে মাতা অর্থে তৃষ্ণা, পিতা অর্থে আত্মাভিমান, দুই রাজা অর্থে শাশ্বত-দৃষ্টি এবং উচ্ছেদ-দৃষ্টি, রাষ্ট্র অর্থে দ্বাদশ আয়তন, অনুচর অর্থে ভোগে তীব্র অনুরাগ এবং ব্যাঘ্র অর্থে 'বিচিকিৎসা-নীবরণ প্রসূত ভ্রান্তমার্গ'।[১] চর্যাপদের অংশটিতে 'শাসু' অর্থে সমাধির অবস্থায় রুদ্ধশ্বাস, 'ননন্দ' অর্থে আনন্দদায়ী পঞ্চেন্দ্রিয়, 'শালী' অর্থে নিঃস্বভাব করা, 'মাঅ' অর্থে মায়ারূপা অবিদ্যা।[২]

কি ধম্মপদে, কি চর্যাপদে, বৌদ্ধ ধর্মভাব-সাধনার প্রকাশভঙ্গিটাই এ জাতীয়। তবে চর্যাপদে গোপনীয়তা কিছু বেশি, তাই তার ভূষণ-যোজনার (উচিত ও অনুচিত) বাহুল্য তুলনায় চোখে পড়ে।

ভোগধর্মী সৌন্দর্য-সাধনায় উপমার যে সব উপমানবস্তু প্রবৃত্তিকে সুকুমার একটি প্রেরণা দিয়ে বিষয়ানুকূল করে তোলে, বৌদ্ধসহজিয়া ধর্ম-সাধনার প্রকাশ-ছত্রে সেই সব উপমানবস্তুই বিপরীত প্রসঙ্গে (opposite context) ব্যবহৃত হয়ে জগৎ ও জীবনের শূন্যতা দেখায়, ত্যাগ ও নিবৃত্তির মন্ত্রদান করে। এখানে ধম্মপদ থেকে দুটি একটি দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করব।

যো চেতং সহতী জম্মিং তণ্হং লোকে দুরচ্চয়ং।
সোকা তম্হা পপতন্তি উদবিন্দু ব পোক্খরা ॥[৩]

[এই হীন দুর্জয় তৃষ্ণাকে যে জয় করতে পারে, পদ্মপত্র থেকে বারিবিন্দুর মত তার শোক অপসৃত হয়।]

এখানে 'পদ্মপত্রে বারিবিন্দু' এই উপমানের উপমেয় হল 'শোক'। কিন্তু ভোগমুখী সৌন্দর্যসাধনায় 'পদ্মপত্রে বারিবিন্দুর' উপমেয় 'ইন্দ্রিয় সুখ'। 'পদ্মপত্রে বারিবিন্দু' এমন একটি মনোহর এবং ক্ষণস্থায়ী প্রীতি-প্রত্যাশাকে

১ ভিক্ষু শীলভদ্রের টীকা
২ চর্যাপদ, মণীন্দ্র মোহন বসু সম্পাদিত।
৩ তণ্হা বগগো। ধম্মপদ। ভিক্ষ শীলভদ্র।

সুখের সঙ্গে উপমিত না করে যখন জীবনে অবাঞ্ছিত শোকের সঙ্গে উপমিত করা হয়, তখন সমস্ত পদের তাৎপর্য এক মুহূর্তে জীবনবিমুখ রূপে ফুটে ওঠে। আরও একটি দৃষ্টান্ত,

ছেত্বান মারস্‌স পপুপ্‌ফকানি
অদস্‌সনং মচ্চুবাজস্‌স গচ্ছে ॥১

[মারের পুষ্পশর ছিন্ন করে মৃত্যুর অতীত হবে।]

'মদনের পুষ্পশর' জীবনে প্রেমানুরাগের রূপক। কিন্তু প্রেমের দেবতা মদনই যখন বৌদ্ধ 'মার'মূর্তি ধরেন, তখন সর্বপ্রকার রূপাবেদন স্খলিত হয়ে এক ভয়ঙ্কর মৃত্যুমূর্তি জেগে ওঠে। প্রবৃত্তিবাদী জীবনে 'মারের পুষ্পশর'—এই রূপক জীবনের নিশ্চয়তা, নিষ্ঠা এবং নিরাপত্তাকে ত্রস্ত করে দেয়।

মুক্তি, মোক্ষ বা অর্হত্ত্ব অথবা নির্বাণকামী সকল দার্শনিক মতের উপমায় এ জাতীয় জীবন-বিরুদ্ধ চিত্র দেখা যায়। চর্যাগানেও সেই একই কথা বার বার বলা হয়েছে। ধম্মপদ থেকে দুটি শ্লোক উদ্ধার করছি, সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্রের মূল দীক্ষা এগুলি, আমাদের আলোচ্য চর্যাগান এর প্রভাবে অনুবাসিত। জীবনের যে ভাব-অংশকে মূল রূপে স্বীকার করলে কবিতার জন্ম সম্ভব হয়, সমগ্র বৌদ্ধ-কথায় সে ভাবের কোনও প্রশ্রয় নেই, বরং কঠিন নিষেধের দ্বারা বিপরীত প্রবাহে চলার আদেশ আছে,

তস্মা পিয়ং ন কয়িবাথ পিয়াপায়ো হি পাপকো।
গন্থা তেসংন বিজ্জন্তি যেসংনথি পিয়াপ্পিয়ং ॥২

[অতএব প্রিয়ানুরাগী হয়ো না, প্রিয়-বিচ্ছেদ অশুভ। যাঁর প্রিয় ও অপ্রিয় নাই তিনিই গ্রন্থিহীন।]

এবং

পেমতো জায়তী সোকো পেমতো জায়তী ভয়ং।
পেমতো বিপ্পমুত্তস্‌স নথি সোকো কুতো ভয়ং ॥৩

১ পুপ্‌ফ বগ্‌গো। ধম্মপদ। ভিক্ষু শীলভদ্র।
২ পিয় বগ্‌গো। ঐ ঐ
৩ ঐ ঐ ঐ

[প্রেম থেকে ভয় ও শোকের উৎপত্তি হয়, যার প্রেম নেই তার শোকও নেই ভয়ও নেই।]

অন্য কবিতার অঙ্গে যে অলঙ্কার রমনীয়তার বর্ধক, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে তা ম্লান, নিষ্প্রভ ও মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনশীলতায় উদ্ভ্রান্তিকর। চর্যাগানে তা আবার একটু ইঙ্গিতগূঢ়, একটু শ্লেষবন্ধুর হয়ে মুমূর্ষুর মুখে পাণ্ডুর হাসির মত জীবনমাধুর্যকে বিস্বাদ করে দেয় ও মনকে একটা অসঙ্গতির ব্যঞ্জনায় সৌন্দর্য-রসাস্বাদনে বিমুখ করে তোলে। যেখানে জীবন থেকে প্রেম উৎসাদিত করার উপদেশ, প্রিয়বস্তু বা ব্যক্তিকে ত্যাগের দীক্ষা, এমনকি অপ্রিয়ের প্রতিও ঔদাসীন্যের মন্ত্র যার মর্ম, সেখানে অনুরাগের আভায় জীবনের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ জাগে না। ভোগের প্রতি সরোষ অবহেলার এ সূত্র আমরা আগের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি, চর্যায় যা পূর্ণ প্রকাশিত। তাই, চর্যাপদের রূপক যতক্ষণ অ-ব্যাখ্যাত থাকে, ততক্ষণ তা পার্থিব ভোগের দুর্দশা দেখিয়ে সর্বজনগোচর ত্যাগ-বৈরাগ্যের হিতোপদেশ দেয়। আর যখন ব্যাখ্যাত হয়, তখন তা গোষ্ঠীগত গুপ্ত এবং গুহ্য তন্ত্র-সাধন-প্রণালীর সঙ্কেত করে। বৌদ্ধগ্রন্থ 'থেরী গাথা'য় অসংখ্য শ্রমণার সিদ্ধি-বাণীতে সেই দৃপ্ত বৈরাগ্যের পরিচয় আছে। 'দীঘ নিকায়' গ্রন্থের 'ব্রহ্মজাল' সূত্রের প্রতিটি দীক্ষার অন্তে এই কথা পাই,

> ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত-বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকারী কহিবেন।[১]

এবার সুপ্রাচীন উপনিষদের শ্লোকগত ভাব ও ভাবনার সঙ্গে চর্যাগানের কোনও মিল আছে কিনা, দেখা যাক। প্রাচীন আচার্যরা বুৎপত্তি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, যাঁরা ব্রহ্মবিদ্যার কাছে উপস্থিত হয়ে ('উপ') নিশ্চয়ের সঙ্গে ('নি') এর অনুশীলন করেন, তাঁদের সংসারের বীজস্বরূপ অবিদ্যা প্রভৃতিকে এই ব্রহ্মবিদ্যাই বিনাশ করে ('সদ্')। আধুনিকদের মত অন্য। তাঁরা বলেন, শিষ্যেরা গুরুর কাছে ('উপ') গিয়ে যেখানে বসতেন ('নি-সদ্') মূলত সেই ছোট ছোট বৈঠকের নাম ছিল উপনিষদ। কালক্রমে সে সব বৈঠকের আলোচনা এবং সেই আলোচনার লিপিবদ্ধ বিদ্যাই উপনিষদ (ব্রহ্ম-বিদ্যা) নাম পেল। উপনিষদ শব্দের আরও একটি অর্থ, রহস্য। অতি-

১ দীঘ নিকায়, ভিক্ষু শীলভদ্র।

গাম্ভীর্য এবং ভাব-দুর্গমতার জন্যেই সাধারণ বিদ্যার মত এ বিদ্যা সর্বজন-প্রকাশ্য ছিল না। এজন্যে পরে উপনিষদ এবং রহস্য এ দুটি শব্দ একার্থক হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবী-রাজ্য দান করলেও অতি প্রিয় শিষ্য বা জ্যেষ্ঠ পুত্র ছাড়া এ বিদ্যা অদেয় ছিল। তাছাড়া 'ব্রাহ্মণে'র অন্তর্গত 'আরণ্যক' তো অরণ্যেই পাঠ করা হত। দুরূহ এবং গোপনীয় অনুভূতিতে সকলের অধিকার ছিল না।

এ সব ব্যাখ্যা-বিবরণ মন্থন করে উপনিষদের (ব্রহ্মবিদ্যা) তাৎপর্য আমরা অনুমান করতে পারি। এর লক্ষ্য জীবনের মূলানুভূতি, অবিদ্যানাশ। চর্চা-পদ্ধতি গোষ্ঠীবদ্ধ এবং গুরুগম্য। স্বরূপ দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যাবৃত।

দেখা যাচ্ছে, উপনিষদের স্বরূপ-লক্ষণ আলোচ্য চর্যাগানের সঙ্গে মেলে। আমাদের জীবনের প্রবৃত্তি যেহেতু বহির্মুখ এবং সহজেই ভোগলুব্ধ, তাই সাধনার ক্ষেত্রে তাকে পৃথিবীর এই নশ্বরতা থেকে সরাবার জন্যে বিপরীত পথে প্রবাহিত করে দিতে হবে। রূপ-প্রলোভনের মধ্যে নয়, স্বরূপ-সন্ধানের জন্যে উজান গতিতে এগোতে হবে। একেই কঠোপনিষদে 'ধীর'ব্যক্তির অমৃতত্ব-ইচ্ছায় 'আবৃত্তচক্ষুঃ' হওয়া বলে। বাইরের থেকে ভিতরের দিকে ফিরে তাকাবার এই যে সাধন, তা-ই উল্টাসাধন। সকল আধ্যাত্ম-সাধনারই এই এক পথ। চর্যাপদে বলা হয়েছে,

কোড়ি মঝেঁ একু হিঅহিঁ সনাইউ ॥

তেমনি উপনিষদও বলেছে,

এষঃ সর্বেষু ভূতেষু ভূঢ় আত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥১

অলঙ্কৃত প্রকাশভঙ্গিতে উপনিষদের মতই চর্যাতেও রূপাহরণ দেখা যায়। উপনিষদের একটি উদাহরণ,

ঊর্ধ্বমূলোহবাক্‌শাখ এষোহশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিন্‌ল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদুনাত্যেতি কশ্চনঃ ॥ এতদ্বৈতৎ ॥২

সত্য-স্বরূপের ঊর্দ্ধাবস্থান এবং প্রকৃতির অন্ধ প্রবাহে জীবের নিম্নাভিমুখী গতিকে উক্ত রূপকে সঙ্কেত করা হল। চর্যাপদেও প্রবৃত্তিবাদী জগতের সামনে,

১ কঠোপনিষদ
২ ঐ

মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা
আসা বহল পাতহ বাহা ॥

কিন্তু যে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আবৃত্তচক্ষুঃ, সে সহজেই এই ভোগমগ্ন ভ্রান্তির বিপরীত পটভূমিতে জীবনের সত্য-স্বরূপের সন্ধান পায়। সে তখন দেখে,

অদ্দঅ চিত্ত-তরুঅরহ গউ তিহুবণেঁ বিত্থার।
করুণা ফুল্লী ফল ধরই ণাউ পরত্ত উআর ॥১

সিদ্ধযোগী ভুসুকুপাদ ভবপ্রবাহের উল্টা পথে সত্যকে অনুভব করেছেন বলেই দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারেন,

আই অণুঅনা এ জগ রে ভাংতিএঁ সো পড়িহাই
রাজসাপ দেখি জো চমকিই ষারে কিং বোড়ো খাই ॥

'অধ্যাস'ময় জীবনের এই মোহ-বিভোরতার আবরণ-ভেদ-রহস্যই উপনিষদের মর্মবাণী। আত্মসমীক্ষণের এই পথেই উপনিষদের সঙ্গে চর্যাগানের কিছুটা মিল পাওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে একটি গুরুতর কথা আমরা স্মরণে রাখতে চাই। উপনিষদের নিগূঢ় ভাব-সাধনার সঙ্গে চর্যার তান্ত্রিক যোগসাধনার অনেকাংশে মিল থাকলেও একস্থানে একটি সুমহৎ পার্থক্য রয়ে গেছে। উপনিষদের অনুভূতি প্রকাশের মধ্যে একটি শান্ত, আত্মস্থ এবং অনুত্তরঙ্গ ব্যাপ্তি আছে, সব কিছুই যেন অন্তরের প্রসন্ন ক্ষমায় মধুর।

আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব
খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন
জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।২

জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটি অবিচল প্রত্যয় যেন ভাবের সমস্ত কিছু তর্ক এবং বিরোধকে অক্ষুব্ধ রেখেছে।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রয়ন্ত্যাভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তৎ ব্রহ্ম ॥৩

১ তীলপা ও সরহের দোহা, শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত চর্যাগীতি-পদাবলী' ধৃত।
২ তৈত্তিরীয়োপনিষদ।
৩ মুণ্ডকোপনিষদ।

বেদের কর্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ নির্ভরতার অভাববোধই জ্ঞানময় উপনিষদের জন্মদাতা। অথচ আত্মশ্রেষ্ঠত্বের যে শ্লাঘা এবং প্রবলতা এ রচনার লক্ষণ হতে পারত, তার কোন দর্শন উপনিষদে মেলে না। বরং শ্রেষ্ঠত্ব-চেতনার বদলে আত্মানুসন্ধানের বিভোরতাই এতে একমাত্র। রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের প্রথাগত সঙ্কীর্ণতাকে অনুমোদন না করেই মহাযানী বৌদ্ধমতের বিস্তার। আসলে, দেশের মধ্যে প্রচলিত ধর্মমতের দ্বারা উৎপীড়িত মানুষের সচেতন বিদ্রোহ এবং অব্যাহতি-কামনা থেকে বৌদ্ধবাদের জন্ম বলে এর মধ্যে প্রতি-স্পর্ধার (challenge) কণ্ঠ এত সরব। উপনিষদ কিন্তু এই প্রকার অধিকার-বঞ্চিতের নতুন মুক্তির বাণী-প্রচার নয়। ভাবুকের অধিকতর প্রাজ্ঞতাই এ অনুভূতির প্রকাশক। তাই ত্যাগ এবং বৈরাগ্যের শিক্ষা দেওয়ার কালেও উপনিষদ কেমন একটি কোমল প্রীতিপূর্ণ জীবনানুরাগ প্রকাশ করে।

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥[১]

অভাবী মানুষের পরশ্রীকাতরতা যেমন অনেক সময় ছদ্ম ঔদাসীন্যের পথ নেয়, চর্যাতেও যেন পরধর্মের প্রতি সে জাতীয় একটি গোপন আক্রোশ আছে। সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং সমালোচনা চর্যাপদের একটি মূল সুর-লক্ষণ বলেই এর প্রকাশভঙ্গি এত উত্তেজিত। এই লক্ষণ অনুসরণ করে তাই বলতে ইচ্ছে করে, চর্যায় প্রকাশিত বৈরাগ্য উপায়ান্তরহীন, বাধ্যতামূলক এবং বঞ্চনাজাত। এবং উপনিষদের বৈরাগ্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও উপলব্ধিপ্রসূত। বৈরাগ্যবাদী দর্শনের কথা হয়েও উপনিষদের শ্লোক এবং চর্যার পদ পৃথক মনোভূমি থেকে জন্ম নিয়েছে। দর্শন হলেও চর্যাপদ-জাতীয় বৌদ্ধ-দর্শনের ঐতিহ্য ঠিক উপনিষদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। অবশ্য কতকগুলি বহিরঙ্গ দিকে এ দুয়ের যে সাধর্ম্য, তা মোটামুটি ভোগবিমুখী সব দর্শনের মধ্যেই অল্প বিস্তর লক্ষ্য করা যায়। ‘বৃহদারণ্যক’ উপনিষদে ‘যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী’র কাহিনীতে মৈত্রেয়ীর বৈরাগ্য জীবন সম্বন্ধে গভীরতর বোধের দ্বারা প্রবুদ্ধ। কিন্তু চর্যাপদে যেখানে ‘ভোগ-পারিপাট্য এবং ইন্দ্রিয়-পটুতার আশা’ ত্যাগ করার নির্দেশ, সেখানেও প্রকাশের উচ্চকণ্ঠ শিক্ষাকে যতটা প্রচারধর্মী করে, ততটা আত্মজ্ঞানের শান্তিবাণী শোনায় না। মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে,

১ মুণ্ডকোপনিষদ।

প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎতন্ময়ো ভবেৎ॥

আর শবরপদের চর্যায়,

গুরুবাক পুঞ্চআ বিন্ধ ণিঅ মণে বাণেঁ
একে শরসন্ধাণেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণেঁ॥

ভুসুকুর 'হরিণ-আখটি' রূপকটি ঈষৎ ভিন্ন ভঙ্গিতে পাই। কিন্তু সমগ্র পদের মধ্যে বিপদের উদ্বেগ এবং আত্মরক্ষার আকুলতা যোগীর ধ্যানানুভবকে অকম্প আত্মপ্রত্যয় দেয়নি।

হরিণী বোলঅ হরিণা সুণ হরিআ তো
এ বণ চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো।
তরঙ্গতে হরিণার খুর ন দীসঅ
ভুসুকু ভণই মূঢ়া হিঅহি ণ পইসই॥

ধর্মশিক্ষা-প্রচারের জন্যে আলঙ্কারিক আযোজন উভযত সমজাতীয় হলেও মৌলিক ভাবধর্মে (Spirit) এদের গভীর অনৈক্য। সমুন্নত অনুভূতির আনন্দ এবং প্রত্যয় উপনিষদের প্রাণ, চর্যাপদে যার কোন পরিচয় নেই।

উল্টাসাধনার আদর্শে চর্যাপদের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় এবং মধ্য-যুগীয় ভারতের অন্যান্য ধর্মসাধনার ঐক্য কোথায়, লক্ষ্য করা যাক। কাহ্নুর চর্যাপদে পাই,

জেতই বোলী তেতবি টাল
গুরু বোব সে সীসা কাল॥

দুর্জ্ঞেয় এই ধর্মকে সঙ্কেত করতে গিয়ে ঋগ্বেদ বলেছেন,

অপাদেতি প্রথমা পদ্বতীনাং, কস্তদ্বাং মিত্রাবরুণা চিকেৎ।[১]

অথবা,

তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ।[২]

অথবা,

অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ।[৩]

১ ২।১।১৫২।৩ ঋগ্বেদ।
২ ঈশোপনিষদ্।
৩ শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ্।

প্রহেলিকা-কথার অসম্ভব লক্ষণের দ্বারা চর্যায় সহজের এবং বেদ ও উপনিষদে সর্বব্যাপ্ত এবং স্বয়ংসিদ্ধ ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করা হয়েছে।

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখার প্রয়োজন। উপনিষদ থেকে প্রহেলিকামূলক যে সব শ্লোক আমরা উদ্ধার করেছি, তাতে অসম্ভব জীব-লক্ষণের মধ্যে দিয়ে মূল বক্তব্যকে অতি-তির্যক করার কোন দুরূহ এবং সচেতন আয়াস নেই। ব্রহ্ম অথবা পুরুষ-প্রকৃতি সম্বন্ধীয় নির্গুণকে বোদ্ধা-হৃদয়ে প্রতিভাত করার উদ্দেশ্যেই উপনিষদে সগুণাত্মক উপমা-রূপাশ্রয় গৃহীত। যে উপলব্ধির মর্মবাণী 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে' সেখানে জীবনকে এমন উদ্ভট বিধানে আড়ষ্ট করে তোলার কোন উদ্যমই থাকতে পারে না। আসল কথা, উপনিষদ চর্যার মত যৌগিক ও তান্ত্রিক দেহ-সাধনা নয়। কতকগুলি কষ্টসাধ্য ব্যাযামের দ্বারা শারীর-প্রণালীকে 'উর্দ্ধস্রোতা' করাও নয়। কেবলমাত্র হৃদয় দিয়ে পার্থিব অনিত্যতা অনুভব করে জীবনকে 'আবৃত্তচক্ষুঃ' করে তোলাই উপনিষদের মূলভাব। পক্ষান্তরে, চর্যাজাতীয় বৌদ্ধ তন্ত্রাচারে হৃদয়ের এমন কোন স্বীকৃতি নেই। কেবল দেহের নিয়মকে কৃচ্ছ্রতার মধ্যে দিয়ে 'উর্দ্ধংস্রোতা' করে তোলাই একমাত্র কাম্য। তাই সামগ্রিক প্রসঙ্গ লক্ষ্য করে বলা চলে, বহিরঙ্গ বিষয়ে কয়েকক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকলেও মূলভাবের দিক থেকে এরা স্বতন্ত্র।

প্রহেলিকামূলক আরও দুটি একটি পদ আমরা চর্যা থেকে সংগ্রহ করব। ঢেণ্ঢণ-পা এর চর্যাংশ,

> বলদ বিআএল গাবিআ বাঁঝে
> পিঠা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে ॥
> জো সো বুধী সোই নিবুধী
> জো সো চৌর সোই দুষাধী ॥
> নিতে নিতে ষিআলা ষিহেঁ ষম জুঝঅ
> ঢেণ্ঢণ-পা এর গীত বিরলে বুঝই ॥

ঋগ্বেদে পাই,

> চত্বারি শৃঙ্গাত্রয়োস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।
> ত্রিধাবদ্ধো বৃষভো রোরবীতি।[১]

১ ৩।৪।৫৮।৩ ঋগ্বেদ।

অথর্ব বেদে আছে,

ঈহ ব্রবীতু য ঈয়ঙ্গ বেদাস্য বামস্য নিহিতং পদং বেঃ।
শীর্ষ্ণঃ ক্ষীবে দুহতে গাবো অস্য ববিং বসানা উদংকং পদায়ুঃ ।। ১

উক্ত চর্যাটির অনুরূপ কবীরের একটি পদ,

কৈসেঁ নগবি কবোঁ কুটয়াবী, চঞ্চল পুবিক্ষ বিচক্ষণ নাবী। টেক।
বৈল বিয়াই গাই ভঈ বাঁঝ, বছ্বা দুহৈ নিন্যুঁ সাঁঝ ।।
মকড়ী ঘরি মাক্ষী ছছিহাবী, মাস পসারি চীলহ বখবাবী ।।
মূসা খেবট নাব বিলইয়া, মীঁড়ক সোবৈ সাপ পহবইয়া ।।
নিত উঠি স্যাল সাঁহ সূঁঝুঝৈ, কহৈ কবীব কোঈ বিবলা বুঝৈ ।।২

শব্দের কূটার্থঃ নগব = কায়া ; পুরুষ = মন ; নারী = কামনা ; বৃষ = সদোষ মন ; গাভী = সাত্ত্বিক বুদ্ধি ; বাছুর = ইন্দ্রিয় (মনেব উপব নির্ভবশীল) ; মক্ষী = কামনা ; মকড়ী = মায়া ; মাস পসাবি = উপলব্ধ বিষয় ; চিল = ইন্দ্রিযেব মলিনতা ; বিড়াল = দুর্মতি ; মুসা = মন ; সাপ = সংশয় ; শিযাল = জীব ; সিংহ = কাল ;

কবীরের এ জাতীয় পদগুলিকে হিন্দীতে 'উলট্ বাঁশী' বলে। আর একটি হিন্দী পদাংশ উল্লেখমাত্র করা গেল।

নাথ বোলৈ অমৃতবাণী ববিষৈগী কঁবলী ভীজৈগা পাণী ।।
গাডি পডরবা বাঁধিলে খুঁটা, চলৈ দমাঁমাঁ বাজিলে উটা ।।৩
..............................ইত্যাদি

ভুসুকুপাদের একটি প্রহেলিকা-প্রাতিভাস চর্যা,

অকট জোইআ বে মা কর হথা লোহু।
আইস সভাবেঁ জই জগ বুঝষি তুট বাষণা তোবা ।।
মরু মবীচি গন্ধ(ব)নইবী দাপনবিম্ব জইসা
বাতাবত্তেঁ সো দিঢ় ভইআ অপেঁ পাথব জইসা ।।
বান্ধি-সুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া
বালুআতেলেঁ সসব-সিংগে আকাশ ফুলিলা ।।

১ ৯।৯।৫ অথর্ব বেদ।
২ কবীর গ্রন্থাবলী, নাগরী প্রচারিণী সভা, কাশী।
৩ পদাংশ ১৪১, হিন্দী গোরখবাণী (প্রয়াগ)।

কবীরের আর একটি 'উলট্‌ বাঁশীআঁ'র অংশ উদ্ধৃত করলাম।

হরি কে ক্ষারে বড়ে পকাযে, জিনি জারে তিনি ক্ষাযে।
জ্ঞান অচেত্‌ ফিরৈ নর লোঈ, তাথৈ জনমি জনমি ডহকায়ে ।। টেক্‌ ।।
ধোল মন্দলিয়া বৈলর রবাবী, কউয়া তাল বজাবৈ।
পহরি চোলনা গাদহ নাচৈ, ভৈঁসা নিরতি করাবৈ ।।[১]
....ইত্যাদি

শব্দের কূটার্থঃ হরি=স্রষ্টা; বড়া=মানবদেহ, মানবজীবন, সংসারী মন; জারে= সংস্কার; মাদলিয়া ধোল, ববাবী বৈল, তাল-বাজানেবালা কৌয়া, নাচনেবালে গাধে, নৃত্য-করানেবালা ভৈসাঁ=পঞ্চেন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক ব্যবহার।

আসলে, এ সব প্রহেলিকা-কথার একটি গোপন তাৎপর্য সর্বত্রই আছে। উপনিষদে প্রহেলিকাময় উদ্ভট রূপাশ্রয়ের পাশে পাশে গভীরার্থ দ্যোতনাকারী পদ পাওয়া যায়। হঠযোগ অথবা তন্ত্রযোগ সাধনার মধ্যে এমন পাশাপাশি ব্যাখ্যাধর্মী পদ নেই। কারণ, গোপনীয়তাই এ দীক্ষার একটি বড় বিষয়। ঈশোপনিষদ থেকে একটি প্রহেলিকা আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি। এখানে তারই একটি সঙ্কেতমূলক শ্লোক লিপিবদ্ধ করা গেল,

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্বস্য
তৎ সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।[২]

সরহের দোহায়,

আই ণ অন্ত ণ মজ্ঝ ণউ ণউ ভব ণউ নিব্বাণ
এহু সো পরমমহাসুহ ণউ পর ণউ অপ্পাণ ।।

শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ থেকে আমরা পূর্বে যে উদ্ভট পদটি উদ্ধৃত করেছিলাম, এখানে তারই ভাবসঙ্কেত-মূলক পূরক-পদ লিপিবদ্ধ করা হল,

অণোরণীযান্মহতো মহীযান্‌ আত্মা গুহাযাং নিহিতোহস্যজন্তোঃ।[৩]

১ কবীর গ্রন্থাবলী, নাগরী প্রচারিণী সভা, কাশী।
২ ঈশোপনিষদ্‌।
৩ শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ্‌।

পরমাত্মা এবং ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় এই প্রকার একটা পূর্বস্মৃতি বা সহস্মৃতি থাকার ফলে,

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ।[১]

উপরের শ্লোকটির আপাত-বিভ্রান্তি শেষ পর্যন্ত একটা গাঢ়তর উপলব্ধির মধ্যে আমাদের নিয়ে যায়, দুর্ভেদ্য রহস্যের কুয়াশায় হতবাক করে না। তাই বলতে হয়, উপনিষদের প্রহেলিকা-কথার রহস্য ততক্ষণই, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ অনুভবের স্তর-পরম্পরা পার হয়ে গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করছে।

ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারীভেদ প্রজ্ঞার মাত্রার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু যেহেতু তন্ত্রসাধনা মনোধর্মী নয়, সেহেতু এর রহস্য-রক্ষা শেষ পর্যন্ত একটি দৃঢ় নিয়মের মত এবং অধিকার একান্তভাবেই গুরুপরবশ।

উপনিষদের আরও একটি লক্ষণ, ব্রহ্মনির্ণয়ের পথে অপর কোন ধর্ম-সাধনার প্রতি সমালোচনামূলক কটাক্ষপাত নেই। কিন্তু মহাযানীবৌদ্ধ তন্ত্রে এবং মধ্যযুগের ভক্তিধর্ম চর্চায় এটি একটি বড় লক্ষণ।

তীল্লপার দোহায়,

দেব ম পূজহ তিত্থ ণ জাবা।
দেবপূজাহি মোক্‌খ ণ পাবা॥

কাহ্নের দোহায় আছে,

এক্কু ণ কিজ্জই মন্ত ণ তন্ত
ণিঅ ঘরিণী লই কেলি করন্ত।

অথবা

মন্ত ণ তন্ত ণ ধেঅ ণ ধারণ
সব্ববি রে বঢ় বিব্ভম কারণ॥

অনুরূপ পদ চর্যাতেও পাই,

জাহের বাণ-চিহ্ন রূব ণ জাণী
সো কইসে আগম-বেএঁ বখাণী।

১ কঠোপনিষদ্।

অথবা

জেবঁ বি লোঅর বান্ধন
তেবঁ বি জোইর মেলাণা।

মীরার ভজন-সঙ্গীত তুলনীয়,

নিত নহেন সে হরি মিলে তো জলজন্তু হোই।
ফলমূল খাকে হরি মিলে তো বাদুড় বাঁদরাই।।
তিরন্ ভখনকে হরি মিলে তো বহুত মৃগ অজা।
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে তো বহুত বহে খোজা।।
দুদ পিকে হরি মিলে তো বহুত বৎসবালা।
মিরা কহে বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলালা।।[১]

এজন্যেই সাধক-কবি বলেছেন,

পাণী বিচ মীন পিয়াসী
মোহিঁ স্থন স্থন আব্ ত হাঁসী।[২]

এ সব কারণেই তন্ত্রযোগী সরহপাদ বাইরের সন্ধান থেকে বিরত হয়ে আপন কায়ার মধ্যে সহজকে লাভ করেছেন।

পণ্ডিত সঅল সত্ত বক্‌খাণই।
দেহহিঁ বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই।।

কবীর বলেন,

পঢ়ি পঢ়ি পণ্ডিত বেদ বাষানইঁ
ভীতরি হুতি বসত ন জানইঁ।[৩]

সরহের চর্যাগানে সেই একই সুর,

উজু রে উজু ছাড়ি মা লেহু রে বঙ্ক
নিঅড়ি বোহি মা জাহু রে লাঙ্ক।।
হাথে রে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ
অপণে অপা বুঝ তু নিঅমণ।।

১ দোঁহাবলী।
২ ,,
৩ কবীর গ্রন্থাবলী।

এই কায়ার কথায় দাদূও প্রতিধ্বনি করেছেন,

কায়া মাহৈঁ সাগর সাত।
কায়া মাহৈঁ নদীয়া নীর।
কায়া মাহৈঁ গংগতরংগ
কায়া মাহৈঁ জমনাসংগ।
কায়া মাহৈঁ কাসীথান।[১]

প্রভুর পূজা আকাশে বাতাসে, নিসর্গ-প্রকৃতির মধ্যে উদ্‌গীত। আমাদের প্রাণ সে আরতির পুরোহিত,

গগন মৈ থালু রবি-চন্দ্ দীপক বনে
তারিকা মণ্ডলা জনক মোতী।
ধূপুমল আনলো পবণু চবরো করে
সগল্ বনরাই ফূলঁত জোতি॥
কৈসী আরতী হোই।
ভব খণ্ডনা তেবী আরতী।
অনহতা সবদ বাজঁত ভেবী॥[২]

সাধনার গূঢ়ত্ব প্রকাশ করে সাধক তাই বলেন,

বুঁদ্ সমানা সমুদ্রমে সো মানে সবকোয়।
সমুদ্র সমানা বুঁদ্‌মে বুঝে বিরলা কোয়॥[৩]

দেহের এই সিদ্ধ অবস্থাতেই,

নৈন্ বিন্ দেখিবা অঁগ্ বিন্ পেখিবা
রসন্ বিন্ বোলিবা ব্রহ্ম সেতী।
শ্রবন্ বিন্ সুনিবা চরণ্ বিন্ চালিবা
চিত্ত বিন্ চিত্যবা সহজ এতী॥[৪]

---

১ কায়াবেলী।
২ Anthology of Nanak. Amritsar Publication.
৩ দোঁহাবলী।
৪ দাদূ, কায়াবেলী।

গুরু নানক তাই বলেছেন,

জাকৈ অন্তর্ বসই প্রভু আপি।
নানক তে জন্ সহজি সমাতী ॥

আর সমস্ত কিছুর মূলে এবং অন্তে হল গুরুর শরণ।

ঘট সমুদ্র লখ্ না পড়ে উঠে লহব অপাব।
দিল দবিয়া সমবথ বিনা কৌন উতাবে পাব ॥১

সরহের চর্যাগানে সেই রহস্যভেদের জন্যেই গুরু-নির্ভরতা,

কাঅ ণাবড়ি-খাণ্টি মণ কেডু আল
সদ্ গুরুবঅণে ধর পতবাল ॥

মধ্যযুগের ভক্তিসাধক পরিচয়ের পর্বে আর একজন সন্তের নাম এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন। তিনি ভক্ত সুরদাস। বহিরঙ্গ সাদৃশ্যে চর্যাগানের হেঁয়ালী-কথার সঙ্গে (কবীর দাদূ ইত্যাদির পদের মত) সুরদাসের পদেরও একদিক থেকে মিল পাওয়া যায়। বক্তব্যকে কখনও অলঙ্কারে কখনও বা হেঁয়ালীতে গোপন করার লক্ষণ সুরদাসেও পাই। কিন্তু এই গোপন-ক্রিয়ার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। ভক্তিবাদী সন্ত কবি সুরদাস রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনায় যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, তার প্রচলিত নাম 'দৃষ্টিকূট' অথবা 'দৃষ্টকূট'। পর্যায়োক্ত শব্দক্রীড়ায় ছত্রগুলির মূলার্থ গোপন হয়ে আছে। বৈষ্ণবীয় অষ্টছাপ মার্গের বল্লভাচার্য গোষ্ঠীব একজন তিনি।

রাধে হরি রিপু কেঁও ন দুবাবত।
সারংগ-সুত-বাহন কী সোভা, সারংগ-সুত ন বনাবত ॥
সৈল-সুতা-পতি তাকে সুত, পতি-তাকে সুতহিঁ মনাবত।
হবি-বাহন কে মীত তাসু পতি, তা পতি তোহিঁ বুলাবত ॥২

[রাধে, কেন তুমি তোমাব মান-ভাব গোপন কব না? তাই কি তোমার চোখে কাজল শোভা পায় না? দেহে মনে তুমি বড়ই বিষন্ন বলে মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ তোমায় ডাকছেন।]

১ দোঁহাবলী।
২ সুরসাগর, নাগরী প্রচারিণী সভা, কাশী।

এবার পর্যায়োক্ত শব্দক্রীড়ার অন্বয়ার্থ লক্ষ্য করা যাক,

১ম ছত্র—হরি-রিপু (হরি=বিষ্ণু)—বিষ্ণুর রিপু=মধু=মদ=মান।

২য় ছত্র—সারংগ-সুত-বাহন (সারংগ=জল), জলের সুত=চন্দ্রমা; চন্দ্রমার বাহন>মৃগ >নেত্রশোভার প্রতীক প্রাণী>নেত্র।

— সারংগ-সুত=সারংগ=দীপক>দীপকের সুত=কাজল।

৩য় ছত্র—সৈল-সুতা-পতি তাকে সুত, পতি তাকে সুতহিঁ। সৈল-সুতা=নদী, নদীর পতি= সমুদ্র, সমুদ্রের সুত=চন্দ্রমা, চন্দ্রের পতি=সূর্য, তার সুত=শনি, এবং শনির গুণ হল 'মন্দতা'।

৪র্থ ছত্র—হরি-বাহনকে মীত তাসু পতি, তা পতি। হরি=ইন্দ্র, ইন্দ্রের বাহন>বাদল; বাদলের মিত্র>জল; জলের পতি>বরুণ; বরুণের পতি>কৃষ্ণ।

এছাড়া, সুরদাসের ভক্তিকথায় একই ভাবের অলঙ্কার-রূপ এবং দৃষ্টকূট-রূপ পাওয়া যায়, অপ্রয়োজন বোধে আমরা একটিমাত্র পদ উদ্ধৃত করলাম।

অলঙ্কার রূপ : স্বাতি সুত মালা বিরাজতি স্যাম তন ইহিঁ ভাই।
মনৌ গঙ্গা গৌরি ডর হর, লই কণ্ঠ লগাই॥১

দৃষ্টকূট রূপ : বাজীপতি অগ্রজ অম্বা তেহি, অবক-থান-সুত মালা গুঁদহিঁ।
মানহুঁ স্বর্গহিঁ তৈঁ সুরপতি-রিপু-কন্যা-সৌতি আই ঢরি সিঁদহিঁ॥২

উপরোক্ত দুই পদেরই অর্থ এক। মোতির (স্বাতি-সুতের) মালা কৃষ্ণের দেহে এমনভাবে শোভা পাচ্ছে যে, যেন মনে হয়, পার্বতীর (গৌরীর) ভয়ে হর গঙ্গাকে কণ্ঠে আলিঙ্গন করেছেন। প্রথমটি উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। দ্বিতীয়টির 'শব্দক্রীড়া' ব্যাখ্যা করা যাক।

কূটার্থ : বাজীপতি (উচ্চৈঃশ্রবার) অগ্রজ (=শঙ্খ, সমুদ্রমন্থনজাত) তার অম্বা (স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শঙ্খকে বোঝাচ্ছে); এবং স্ত্রী-শঙ্খ গ্রীবার প্রতীক উপমান। সুতরাং 'বাজীপতি অগ্রজ অম্বা' অর্থে>গ্রীবাদেশ। অবক (সূর্য) থান (সূর্যের আস্থানক্ষেত্র অর্থে, সমুদ্র) সুত (সমুদ্রসুত অর্থে মোতি)। 'মানহুঁ স্বর্গহিঁ'>যেন স্বর্গ থেকে। 'সুরপতি-রিপু-কন্যা সৌতি'>সুরপতি (ইন্দ্র) রিপু (ইন্দ্রের শত্রু অর্থে হিমালয়) কন্যা (পার্বতী) সৌতি (পার্বতীর স্বপত্নী, গঙ্গা) 'আই ঢরি সিঁদহিঁ'=সমুদ্রে নামছে।

১ পদ ১৭০ সুরসাগর। নাগরী প্রচারিণী সভা।
২ পদ ১০৭ ঐ ঐ

সুরদাসের রীতি-গ্রন্থ 'সাহিত্য-লহরী'তে আরও কয়েক প্রকারের অর্থগোপন-পদ্ধতি-পদের সন্ধান মেলে। আমরা তারই দু একটির উল্লেখমাত্র করব।

চপলা আউর বরাহ রস আখর আদ্, দেখ্ ঝাপ্টানে।[১]

এর অর্থ, এই দেখে চকোর উদ্বেল হয়ে উঠল। এখানে 'চপলা আউর বরাহ রস আখর আদ্' এই সমগ্র অংশটির অর্থ 'চকোর'।

অন্য একটি উদাহরণ,

বায়স শব্দ অজা কী মিলবন্ দীনো কাম অনুপ।[২]

এখানে 'বায়স' এবং 'অজা'র কণ্ঠস্বর থেকে অক্ষর গ্রহণ করে 'বায়স শব্দ অজা কী মিলবন্' অংশটির অর্থ দাঁড়াল, 'কাম'। সমগ্র পদটির অর্থ, 'কামনার অনুপম কর্ম সম্পাদিত'।

সুরদাসের 'সাহিত্য-লহরী' অর্থ-কুটিল কবিতারই বিচিত্র রীতি-পরীক্ষা। কৃষ্ণলীলার উপভোগ্য বর্ণনার সবটুকু রস-কৌশলের মধ্যে জীবনানুরাগই প্রধান কথা। মধ্যযুগীয় সন্ত কবির রচনার সঙ্গে চর্যাপদের রহস্য-উক্তির একটা বহিরঙ্গ মিল থাকলও অন্তরের কোন সাধর্ম্য নেই। সুরদাস-পদাবলীর রহস্য আলঙ্কারিক, চর্যাপদাবলীর রহস্য তন্ত্র-যোগাচারমূলক। গোপন-প্রবণতা একক্ষেত্রে কাব্যের রস-রীতি-নির্ভর; অন্যক্ষেত্রে দেহযোগ-সাধনার দুরবগাহ অভিপ্রায়ে কুহেলিকাময়।

দেখা গেল, উপনিষদেও যেমন, চর্যাগানেও তেমনি হেঁয়ালি-ভেল্কি জাতীয় পদছত্র রয়েছে। কিন্তু অন্তরের সুরটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, উভয়ের মধ্যে মূল প্রসঙ্গের পার্থক্য প্রচুর। উপনিষদে হৃদয়ের সাধনা, চর্যাপদে দেহের সাধনা। উল্টা পথের পথিক হয়েও উপনিষদের ভাব-রহস্য গভীরতর প্রজ্ঞা এবং অনুভূতির পথে জীবনকে আকর্ষণ করে। চর্যাপদের দেহযোগরহস্য বিপরীত ব্যায়ামের দ্বারা ভোগানুকূল কায়াকে ভোগ-নিবৃত্ত করে। উপনিষদের দীক্ষা ভাবুককে মহৎ জীবন ও জগতের অভিমুখী করে দেয়। চর্যাপদের দীক্ষা সাধককে জগৎ ও জীবনের অন্তঃ-

১ পদ সংখ্যা ৭২, সাহিত্য-লহরী।
২ পদ সংখ্যা ৬৯, সাহিত্য-লহরী।

সারশূন্যতা দেখিয়ে সব কিছু থেকে বিমুখী করে তোলে। তাই উপনিষদের বৈরাগ্য প্রীতিপ্রসন্ন এবং ক্ষমাসুন্দর, চর্যার বৈরাগ্য দ্রোহধর্মী এবং বর্জনময়। উপনিষদে আধ্যাত্মিক উত্তরণের পথনির্দেশ, চর্যায় আধিভৌতিক বিপন্মুক্তির পণ ও প্রয়াস। উপনিষদ আত্মস্থ, চর্যাপদ ত্রস্ত।

বরং চর্যা-ভাবধারার সঙ্গে কবীর দাদূ নানক সুরদাস ইত্যাদি মধ্যযুগীয় ভক্তিসাধক কবিদের ভাবধারার অনেকাংশে মিল আছে। কিন্তু এখানেও এক ক্ষেত্রে একটি গুরুতর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়ঃ

> A study of the poems of these mediaeval poets, particularly of the poems of Kabīr, decidedly the most prominent figure of the middle age, will reveal that there is a clear line of continuity from the Buddhist Sahajiyā poets to the mediaeval poets. But the difference between the earlier school and the mediaeval schools lies in the element of love and devotion, which is conspicuous by its absence in the Buddhist Sahajiyā school. This element of love and devotion was supplied profusely to the mediaeval schools by the different devotional movements as well as by Sūfī-ism. Though devotion may be recognised to be one of the characteristics of later Mahāyānic Buddhism, it is not so in the case of the Buddhist Sahajiyā cult, which was pre-eminently an esoteric yogic school.[১]

চর্যাপদের ভাবে প্রচুর পরিমাণে লোক-লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও, অন্যান্য মধ্যযুগীয় ভক্তিসাধন-কথার সঙ্গে একাধিক প্রসঙ্গে মিল থাকার পরেও, মূলগত একটি ভাবধর্মে তফাৎ দেখা যায়। তাই মধ্যযুগের ভক্তিসাধনা এই মূলসুরের দিক থেকে উপনিষদের সঙ্গে যত সাধর্ম্য রক্ষা করেছে, ততটা যেন চর্যাপদের সঙ্গে নেই। প্রবৃত্তি এবং প্রীতিবোধ জীবন থেকে উৎসাদিত ও নির্মূল করে তবে যেখানে দীক্ষার সূচনা, সেখানে এ আদর্শের দোসর অতি দুর্লভ। দার্শনিকতার একটা সাধারণ সাম্য থাকলেও মূল দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্নতা রয়েছে। বরং হঠ-তন্ত্র-যোগাচারমূলক লোকগাথা, ময়নামতী ও গোপীচাঁদের গান, গোর্খবিজয় ইত্যাদির সঙ্গে এর একটা আত্মীয়তা পাওয়া যেতে পারে। আমরা যথাস্থানে তার আলোচনা করব।

১ Appendix 'A'. Obscure Religious Cults. By Dr. S. B. Das Gupta M.A., Ph.D.

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংস্কৃত কাব্য-ঐতিহ্যের অনুগত উপমা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-বিষয়ক লোকজীবনের কথাকাব্য। বাঙলা সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এ বিষয়ে প্রথম হলেও, আমাদের আদর্শ শিক্ষার ভাষা সংস্কৃতে অনেক আগেই তার প্রকাশ ঘটেছে। কবি ভবভূতি রামায়ণের নির্বাচিত অংশ নিয়ে রামের জীবনের প্রেম-করুণ কথা (রামস্য করুণো রসঃ) কীর্তন করেছেন। কবি কালিদাস কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞান-শকুন্তল কাব্যগুলিতে স্বর্গ ও মর্তের প্রেম-রহস্য প্রকট করেছেন। সংস্কৃত কাব্যের শেষকবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে শ্রীহরির রাধা-বিলাসকলা কোমল-কান্ত পদাবলীতে প্রকাশিত। এ কাব্যগুলিকে একত্রে পাঠ করে স্বতই বোধ হবে স্বর্গ ও মর্ত-জীবনের বিশুদ্ধ প্রেম আর আবিল কাম সুপ্রচুর রূপে আমাদের কাব্যরচনার ভূমিকায় উপস্থিত। তাই বাঙলা কাব্যে প্রেমলীলার প্রথম কীর্তনীয়া বড়ু চণ্ডীদাসের পক্ষে ঐ সংস্কৃত রচনাগুলিকে আদর্শ হিসেবে অঙ্গীকার করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিশেষত কাব্য হিসেবে বাঙলা ভাষায় রচিত (বাঙলাদেশের আলো বাতাসে গড়া) কোন প্রেম-কাহিনী যখন লেখকের আদর্শ হবার জন্যে উপস্থিত নেই, এবং যখন সংস্কৃত কাব্য-শাস্ত্র-সাহিত্যের পঠন-পাঠন, অধ্যয়ন-আলোচনা সারা বাঙলাদেশের বিদ্যাচর্চায় একচ্ছত্র, সেক্ষেত্রে সংস্কৃত কাব্যরীতির নিয়ম-কানুনকে গুরু করে তোলা সে যুগের স্বাধীন কাব্য-চেষ্টায় অত্যাবশ্যক রূপেই দেখা দিয়েছিল। তার ওপর, সব চেয়ে বড় কথা হল, প্রকাশ-মাধ্যম অর্থাৎ ভাষা। চর্যাপদের পরের লেখা বাঙলা শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন। অর্থাৎ বাঙলা ভাষার আদি-মধ্যযুগ। একালে বাঙলা শব্দ-ভাণ্ডারের সঞ্চয় কিছুটা বেড়েছিল, ঋণ-করা কথা আর অধমর্ণের লজ্জা হয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে পরভৃৎ করে রাখেনি, তবু বাঙলা ভাষার গোড়ার দিকের অবদান হিসেবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে শব্দ-সঞ্চয়, তা যতটা অভিধান-গত অর্থ (dictionary meaning) দিতে পেরেছে, ব্যঞ্জনাগত সঙ্কেত তার তুলনায় অনেক কম। কবিতার যে ভাষা, তাকে যেহেতু কবির নির্জ্ঞান মন, তাঁর আত্মায় অধিষ্ঠিত নরক ও স্বর্গ, তাঁর পূর্বপুরুষের ধূসর স্মৃতিপুঞ্জ ইত্যাদির কথক হতে হয়, সেই হেতু তাকে কাজের কথার মত ইচ্ছা-প্রকাশের উপায়মাত্র হয়ে থাকলে চলে না, তার রীতিমত কবিচিন্তার এবং

কবিভাবের উৎস হয়ে ওঠা চাই। কবিতার ভাষা সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত মত এখানে উল্লেখযোগ্য :

> চিন্তা থেকে ভাষা নির্গত হয় না, ভাষাই চিন্তাকে জন্ম দেয়। স্বপ্নে আমরা যা দেখি, সেই ছবিগুলোকে বলা যায় বিশ্ব-পুরাণের চিত্রকল্প, মানবাত্মার আবেগসমষ্টির আদিরূপ; সেই ক্ষণিক চঞ্চল অসংলগ্ন চিত্রসমূহ তাদের অব্যবহিত আবেগ-সঞ্চার পরিহার করে যখন ভাষার মধ্যে স্থিরতা, স্থায়িত্ব ও স্বচ্ছতা পেল, তখনই চিন্তা নামক কাজটি সম্ভব হল মানুষের পক্ষে। তার আগে চিন্তা ছিল না, ছিল শুধু আবেগের আঘাত আর ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি। বাঘ যখন ক্ষুধার আবেগে আকুল, শুধু তখনই সে হরিণটাকে লক্ষ্য করে, অন্য সময়ে হরিণের কোন অস্তিত্বই নেই তার কাছে। কিন্তু মানুষ যখন হরিণকে আহার অথবা আদর করতে না চায়, তখনও হরিণের সত্তা তার কাছে সুস্পষ্ট, কেননা 'হরিণ' নামক শব্দটাকে সে পেয়েছে। ঐ শব্দ আছে বলেই হরিণ বিষয়ে কোন ব্যক্তিগত আবেগের অধীন না হয়েও, তাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব না করেও, ঐ জন্তুকে মনে মনে ধারণা করতে পারে সে, অর্থাৎ তার বিষয়ে চিন্তা করতে পারে।[১]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বড়ায়ি যখন 'রাধাবিরহে'র বর্ণনা করে,

> বনের হরিণী যেন তরাসিনী মনে।
> দশ দিশ দেখে রাধা চকিত নয়নে।।

তখন রাধার উদ্বেগ-পীড়া 'হরিণ' এই শব্দের সাহায্যে এক লহমায় রূপবান হয়ে ওঠে। এটি সাধারণ বাচ্যা উৎপ্রেক্ষা। তার ওপর সংস্কৃত ঐতিহ্য-অনুকরণের রঙ লেগেছে। তবু উপমাটি বাঙলা ভাষা ব্যবহারে একেবারে অনুজ্জ্বল বা নির্জীব নয়। প্রাণের একটি বেগ এতে যুক্ত হল। কিন্তু এমন উপমাও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অজস্র নয়। আর এটাই সম্ভাবিত। কেননা মনকে যথাযথ রূপ দেবার ভাষা-ভাণ্ডার যখন প্রায় রিক্ত, অথচ প্রকাশ করার আবেগ যখন কবিকে আকুল করে, তখন নিরুপায় দৃষ্টি সহজলভ্য কোন ঐতিহ্য সঞ্চয় থেকেই তার আত্মপ্রকাশের নিয়মকে অযত্নে ঋণ করে নেয়। তখনই কবিতায় আসে অনুবাদের প্রাণহীনতা। এ প্রসঙ্গে অন্য এক আধুনিক উপমা লক্ষ্য করলে বক্তব্য স্বচ্ছ হবে। রবীন্দ্রনাথের গানে পাই,

> সে কোন বনের হরিণ ছিল আমার মনে,
> কে তারে বাঁধলো অকারণে।

১ ভাষা, কবিতা ও মনুষ্যত্ব। উত্তরসূরী পত্রিকা। বুদ্ধদেব বসু।

আরও আধুনিক বাঙলা কবিতায় এই একই উপমান কত সূক্ষ্ম,

> আঁকাবাঁকা শিঙে শিঙে জঙ্গলের সরল পসরা
> ছড়িয়ে মাঠের পরে মাঠ,
> ছুটছে ওরা পার হয়ে সোনালী সূর্যের মস্ত দিন।
> সামনে দীঘি পেরুলেই নীল চাঁদ ম্লান রাজ্যপাট
> নিয়ে বসবে। থামবে ওরা নিরাকার অজস্র হরিণ।[১]

রবীন্দ্রনাথের ছত্রটি রূপক মাত্র। বাঁধন পরার বেদনা একে মানবায়িত করেছে। শেষের দৃষ্টান্তে হরিণের শরীর নেই। একটা অশরীরী মৃগ-চপলতা বাতাসের মত ফসলের মাঠে ছুটোছুটি করে। আজকের বাঙলা ভাষাভাণ্ড শূন্য হলে কবিমনের এই আকুলতা এত সূক্ষ্ম করে ধরা যেত না। উল্লিখিত আধুনিক উপমাও প্রাচীনের ঐতিহ্যবাহী, হয় সংস্কৃতের, নয় ইংরিজির। তবু ভাষার সামর্থ্য একে ইঙ্গিতের চূড়ান্ত শক্তি দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগে আমাদের বাঙলা শব্দ-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ ছিল না। তাই অনুকরণে ঐতিহ্যের অবিকল দাসত্ব দেখি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপমায় ঐতিহ্যের প্রলোভন আছে, ভাষা-ভাণ্ডারের সঞ্চয় গণনা করলে আরও বলা যাবে, এ প্রলোভন বাধ্যতামূলক, ঐচ্ছিক নয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য থেকে সংস্কৃতের ঐতিহ্য-শাসিত উপমাগুলি নিয়ে আলোচনা করব। ঐতিহ্যের শাসন উপমা-প্রয়োগের যে অংশে অতি-কঠোর, সেগুলি প্রথমেই আমাদের আলোচ্য। দেহরূপ-বর্ণনায় প্রতি প্রত্যঙ্গের বিম্ব-প্রতিবিম্ব সম্বন্ধে যেখানে উপমার প্রয়োগ, সেগুলি সর্বাপেক্ষা অনুকরণ-ক্লিষ্ট। পরিকল্পনায় কাব্য হলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন উপস্থাপনায় নাটকের মত। এ রচনায় অভিনয়-যোগ্য পাত্র-পাত্রী আছে, তাদের ভাষা কবি-বিবৃতি ছেড়ে অনেকাংশেই সংলাপে পরিণত (অবশ্য রাধাকৃষ্ণের লীলাসঙ্গী হয়ে কবিও চরিত্রের রূপে উপস্থিত আছেন), ঘটনার ক্রিয়াকাণ্ড পরবর্তী পরিস্থিতিতে কর্মফলের মত নতুন নতুন ঘটনা সৃষ্টি করেছে। এক কথায় নাটক-লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সর্বত্র। কবি বড়ু চণ্ডীদাস বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর সৃষ্ট পাত্র-পাত্রীদের কথা বলার ভার দিয়েছেন, নিজে থেকেছেন অগোচরে। তাই এ রচনার কাছে পাঠক বা দর্শকের স্বাভাবিক প্রত্যাশা হল, দেহ-বর্ণনার কথক কবি একলা না হয়ে যখন বিশেষ বিশেষ চরিত্র, তখন বর্ণনাগুলিও সেই সেই চরিত্রের

১ হাওয়ার হরিণ, উত্তরসূরী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৪, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উদ্দেশ্যে এবং মনোভাবে পূর্ণ হয়ে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশিত হবে। আর এ রচনা যখন নানান ঘটনায় চিত্র-বিচিত্র করা, তখন পরিস্থিতি অনুসারে একই রূপ-দেহের বর্ণনায় পৃথক পৃথক চিত্র, উপমা সংগ্রহ করা সমীচীন ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রায়শই তা হয়নি। তাছাড়া পুরুষ-রূপ এবং নারী-রূপবর্ণনায় দেহগত সুষমার যে পার্থক্য কবির ক্ষেত্রানুযায়ী উপমান নির্বাচনে স্পষ্ট এবং যথাযথ হবে, অচেতন অনুকরণের দোষে তা-ও কোথাও কোথাও লক্ষ্যভ্রষ্ট।

'জন্মখণ্ডে' কবি-বর্ণিত কৃষ্ণের দেহরূপ,

১ সুবেশ সুপুট নাসা নয়ন কমল।
২ কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রূহিযুগল।।
৩ ওষ্ঠ আধব যেহ্ন যমজ পোঁআর।
৪ কন্নযুগ শোভে যেহ্ন বরুণেব জাল।।
৫ ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে।
৬ করঙ্গরুবিন্দ মাল নিম্মিত কমলে।।
৭ ক্ষীণ মধ্য রামরম্ভা জংঘযুগল।।
৮ মাণিক বচিত চন্দ্রসম নখপান্তী।
৯ সজল জলদরুচি জিণি দেহকান্তী।।

'দানখণ্ডে' কৃষ্ণ-বর্ণিত রাধার দেহরূপ,

১ আঅব দেখিলোঁ নাসা গরুড় সমান।
২ গৃধিনী সদৃশ তোব দেখোঁ দুঈ কান।।
৩ কুরঙ্গ নয়ন জিণী তোহ্মার নয়নে।
৪ আধর বন্ধুলী গণ্ড মধুক সমানে।।
৫ মাণিক জিঁণিআঁ তোর দশনেব পাঁতী।
৬ কনয়া নিকষ তোর দেহেব কাঁতী।।
৭ মাঝদেশ দেখি সিংহ-মাঝাব আকার।।
৮ উরু শোভে বিপরীত রামকদলী।। ।

কবি-বর্ণিত কৃষ্ণের দেহরূপ-বর্ণনার নবম ছত্র, এবং কৃষ্ণ-বর্ণিত রাধার দেহরূপ-বর্ণনার ষষ্ঠ ছত্র যদি স্তবকদুটি থেকে যথাক্রমে বাদ দেওয়া যায়, তবে অবশিষ্ট বর্ণনাদ্বয়ের যে কোনটি ঈষৎ অদল-বদল করে কৃষ্ণ বা রাধার, যে কোন জনের রূপবর্ণনায় ব্যবহার করা যেতে পারে। উপমান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সজাগ না হলে উল্লিখিত রাধারূপ-বর্ণনার গোড়ার দিকের ছত্রগুলির মত পরুষ এবং কর্কশ উপমান নারী-লাবণ্য জাগাতে

গিয়ে হাস্যকর হয়ে উঠবে। আবার একই উপমান বা সমজাতীয় উপমান অথবা সমভাবস্তর থেকে সংগৃহীত উপমান নারী অথবা পুরুষরূপ-বর্ণনার ক্ষেত্রে নিযুক্ত হবে। যেমন হয়েছে আমাদের উদ্ধৃত স্তবকগুলিতে। রাধার উরু বিপরীত রাম-কদলী, কৃষ্ণেরও জঙ্ঘা রামরম্ভা, রাধার মধ্যদেশ সিংহাকৃতি, কৃষ্ণেরও তদনুযাযী ক্ষীণ, (বলা না থাকলেও) এ ক্ষীণতার উপমান সিংহ-কটিই হবে। অর্থাৎ অনুকরণের অন্ধতা পাত্রাপাত্র বিচার করে সঙ্গতির অপেক্ষা রাখেনি। সে কারণেই বলেছি, রূপ-রচনায় সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবিকে অতিশাসিত করে রেখেছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বিভিন্ন চরিত্রের দেহরূপ বর্ণনা কতবার, কি প্রকারের, তারই একটি পূর্ণাঙ্গ সূচী প্রস্তুত করা গেল। প্রথমে কবি-বর্ণিত রূপ-প্রসঙ্গ। জন্মখণ্ডে ও বাণখণ্ডে রাধার রূপবর্ণনা বিচ্ছিন্ন, তাম্বুলখণ্ডে পূর্ণাঙ্গ। এছাড়া কবিকৃত রাধার রতি-উপভোগ-ভঙ্গি বর্ণনা বৃন্দাবন খণ্ডে অনুভূতি প্রধান, বাণখণ্ডে ভঙ্গিপ্রধান। কবি-বর্ণিত কৃষ্ণের ও বড়ায়ির রূপ জন্মখণ্ডে পূর্ণাঙ্গ এবং নারদের রূপ জন্মখণ্ডে বিচ্ছিন্ন ভঙ্গিতে পাই। বড়ায়ি রাধার রূপদেহ বর্ণনা করেছে। তাম্বুলখণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন, রাধাবিরহে বিচ্ছিন্ন বর্ণনা। কেলিলুব্ধ কৃষ্ণের সকাম রাধারূপ-ব্যাখ্যা বহুবার এ কাব্যে পাওয়া যায়। তাম্বুলখণ্ডে একবার বিচ্ছিন্ন রূপবর্ণনা, দানখণ্ডে পাঁচবার বিচ্ছিন্ন রূপবর্ণনা, দু'বার পূর্ণাঙ্গ-বর্ণনা এবং দু'বার বিশিষ্ট রূপভঙ্গি বর্ণনা আছে। এছাড়া, নৌকাখণ্ডে বিচ্ছিন্নভাবে এবং ছত্র-ভার ও বৃন্দাবন খণ্ডে বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ-ভাবের বর্ণনাগুলি উল্লেখযোগ্য। আত্মরতির বিচিত্র লক্ষণ হিসেবে রাধাকৃত কতকগুলি বর্ণনাপদ পাই। তাম্বুল, দান, যমুনাখণ্ডে ও রাধাবিরহে বিচ্ছিন্ন-ভাবে এবং বাণখণ্ডে পূর্ণাঙ্গ রূপবিবৃতি আছে। রাধা-বর্ণিত কৃষ্ণের দেহরূপ মাত্র একবার, তাও বিচ্ছিন্নভাবে 'রাধাবিরহে' পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে দেহরূপ-বর্ণনার উপমানগুলি সর্বাপেক্ষা ঐতিহ্য-শাসিত। অবশ্য এ বর্ণনাগুলির উপস্থাপনা সর্বত্রই সমজাতীয় নয়। কোথাও কোথাও রীতি-পদ্ধতির স্বতন্ত্র পরিচয়ও আছে। যেমন কৃষ্ণ-বর্ণিত রাধা দানখণ্ডে নদীরূপা, ছত্র-ভারখণ্ডে 'সরোঅরময়ী', বৃন্দাবন-খণ্ডে 'দেখোঁ মো তোর ফুলশরীরে'। কবি-বর্ণিত রাধার রতি-উপভোগ-বর্ণনা বৃন্দাবন খণ্ডে অনুভূতি-প্রধান। শরীরী স্থূলতা, দেহের সংযোগ এবং স্পর্শের কথা অনুচ্চকণ্ঠ, ভোগের অনুভূতি এবং রসাবেশ বিশদভাবে বর্ণিত। রাধাকৃত নিজ দেহরূপ-বর্ণনা প্রায় সবক্ষেত্রেই স্বল্পবাক, সঙ্কেতকুশল, বিশেষত

উপমানের গুণ এবং স্বভাবধর্মটি যোজনায় মুখ্য হওয়ায় উপমেয়ের একটি সজীব দ্যুতি রাধাহৃদয়কে যথাযথভাবে ব্যক্ত করেছে।

স্বল্পবাক, সঙ্কেতকুশল উপমা,

এ নবযৌবন বড়াযি মযমত করী।
লাজ-আঙ্কুশেঁ তাক নিবাবিতেঁ নাবী॥

উপমানের স্বভাবধর্মের পরিচয় মুখ্য যেখানে,

গুণ বুঝি মধুকব পবিহব বন।[১]
আইস বনমাঝেঁ বিকচ নলীন॥[২]
তোহ্মে তেজীবাবে কেহ্নে কব চীত।
নাগর জনের হেন না হএ উচীত॥

পূর্বোক্ত তালিকা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে রাধার রূপের কথাই সবচেয়ে বেশি! কৃষ্ণ সব (বিচ্ছিন্ন ও পূর্ণাঙ্গ রূপ) মিলিয়ে তের বার রাধার রূপবর্ণনা করেছে। রাধা নিজরূপ বর্ণনা করেছে পাঁচ বার। বড়ায়ি-বর্ণিত রাধারূপ তিন বার, কবি-বর্ণিত রূপ ও রূপভঙ্গি সবসুদ্ধ পাঁচ বার পাই। কৃষ্ণের নিজ রূপবর্ণনা নেই, তাব শ্লাঘা-আস্ফালনগুলো অভিধা-সর্বস্ব, রূপ-বর্ণনার প্রসঙ্গে পড়ে না। উল্লেখ অলঙ্কারে বড়ায়ির দূতী-দক্ষতা সম্বন্ধে কৃষ্ণ কেবল একস্থানে ঈষৎ বর্ণনা করেছে,

বাম কাজে হনুমন্তা।
তে হেন আহ্মাব দূতা॥
ভাঁগিল নেহা পুণী যোডাইতেঁ শকতা॥
যে থানে শুঁচী না জাএ।
তথাঁ বাটিআ বহাএ॥
সেহি দূতা মোব..................... ॥

উল্লেখ অলঙ্কারে গুণগুলি যদি পরম্পরিত হয়ে শ্রেণীবদ্ধ শোভার প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে তবেই এ প্রয়োগে সৌন্দর্য দেখা দেয়। এ অলঙ্কারে

১ 'মধুকর' অর্থে কৃষ্ণ।
২ 'বনমাঝেঁ' অর্থে লীলাকুঞ্জ, 'বিকচ নলীন' অর্থে রাধা।

উপমেয়, উপমানের গুণ-সন্নিধ্য পেয়ে রসাপ্লুত হয় না, উপমান নিকটবর্তী হয়ে উপমেয়ের গুণকে অতিরঞ্জিত করে মাত্র। তাই বহু উপমানের যোজনা যদি শ্রেণীবদ্ধ না হয় তবে এতে একটি কি দুটি উপমানের দ্বারা সৌন্দর্য জাগে না। উল্লিখিত উদাহরণটিতে বড়ু চণ্ডীদাসের সীমাবদ্ধ শক্তি, এই স্বভাব-কৃপণ অলঙ্কারটিকে অনধিক উপমান প্রয়োগের দ্বারা আরও প্রভাহীন করে তুলেছে। বড়ায়ি একবার মাত্র এবং একটি ছত্রে (বংশী খণ্ড) বাঁশী-হারা কৃষ্ণের দুরবস্থার কথা রাধার কাছে বর্ণনা করেছে।

মেঘ যেহ্ন আষাঢ় শ্রাবণে।
ঝরে তার পাণী নয়নে গো ।।

সাধারণ বাচ্যা উৎপ্রেক্ষা। বাঁশী হারিয়ে কৃষ্ণের দুর্দশা সামান্য একটি চিত্রে প্রকাশিত। কবি নিজের নামে কৃষ্ণরূপ বর্ণনা করেছেন, আমরা পূর্বে তার উল্লেখ করেছি। কবিকৃত বড়ায়ির এবং নারদ মুনির যে দেহবর্ণনা জন্মখণ্ডে পাওয়া যায়, উপমা-যোজনা সেখানে অতি সাধারণ হলেও, কবির উদ্দেশ্যতীক্ষ্ণ নিপুণ দৃষ্টি এবং উপমান-ব্যবহারের মধ্যে চরিত্র-পরিচায়ক অভিপ্রায় জ্ঞাপনের শক্তি স্পষ্ট।

দেহবর্ণনা যে সব স্থানে প্রতি প্রত্যঙ্গের রূপপ্রকাশে উপমান সংগ্রহ করতে করতে একেবারে নিঃশেষিত হচ্ছে, সেখানে তা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাটকীয় ঘটনা-প্রবাহের পথে বাধা হয়ে পাঠকের মনে একটা বিরক্তিকর ভারবোধের হেতু। উল্লিখিত তালিকার পূর্ণাঙ্গ দেহবর্ণনার ক্ষেত্রগুলি এই জাতীয়। একে ঐতিহ্য অনুকরণের অন্ধবেগ, ফলত প্রাণহীনতা, তার উপর ভাষাগত দৈন্য রূপের উত্তরোত্তর লাবণ্য সৃষ্টি করতে অপারগ। এমনই এক নিরুপায় অবস্থায় পুনঃপুনঃ একই (প্রায় একই) বর্ণনারীতি যদি দীর্ঘবন্ধ পূর্ণাঙ্গ রূপ-রচনার উৎসাহ প্রকাশ করতে থাকে, তবে পাঠকের ধৈর্য পীড়িত হয়, কাব্যপাঠের কৌতূহল অলস হয়ে পড়ে। আর এই সব বর্ণনার স্থানে ব্যবহৃত উপমানগুলি প্রবাহহীন, ব্যঞ্জনাশূন্য। কেবল একটা তাৎক্ষণিক সাদৃশ্য-জ্ঞাপন করেই এদের আয়ু অবসিত। ফলে অতিকথন রচনাকে ভারাক্রান্ত করে, প্রাণকে রূপে উদ্‌ভাসিত করে না। 'বিচ্ছিন্ন রূপবর্ণনা'গুলি কিন্তু সম্পূর্ণ সে প্রকৃতির নয়। সেক্ষেত্রে অধিকাংশের উপমান যদিও লাবণ্য-প্রবাহহীন, কেবল কথার-কথা হয়ে উপস্থিত, তবু বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে এগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ঘটনাগত উদ্দেশ্যের ও চারিত্রিক গভীরতার মধ্যে ডুব দিতে

পেরেছে, এবং সেই ঘটনার গতি থেকে দীপ্তি নিয়ে নিজেদেরও কিছুটা মনস্তত্ত্বময় করেছে।

বৃন্দাবনখণ্ডে খণ্ডিতা রাধার মানভঞ্জন করতে অনুনয়-ছলে কৃষ্ণের রাধারূপ বর্ণনা এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের দশম সর্গের 'মুগ্ধ মাধব' পরিচ্ছেদে কৃষ্ণের অনুনয়-অংশ পাশাপাশি উপস্থিত করছি।

যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ
দশন রুচি তোহ্মারে।
হরে দুরুবার ভয় আন্ধকাব
সুন্দরি বাধা আহ্মাবে ॥
তোহ্মার বদন সংপুন চান্দ
আধব-আমিঅঁ৷ লোভে।
পবতেখ মোর নয়ন চকোর
যুগল নিশ্চল শোভে ॥

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হবতি দরতিমিবমতিঘোরম্।
স্ফুরদধবসীধবে তব বদন-চন্দ্রমা
বোচয়তি লোচন-চকোরম্ ॥

তোহ্মাব নযন মলিন নলিন
ধরে কোকনদ রূপে

নীল-নলিনাভমপি তন্বি তব লোচনম্
ধাবযতি কোকনদরূপম্।

এ তোর কুচ শোভে মণি (মাল)
জঘনে নাদ করউ বসনে।
বোল হৃদয়ত করোঁ মো তোহোব
থলকমল চবণে ॥

স্ফুবতু কুচকুম্ভযোরুপবি মণিমঞ্জরী
বঞ্জযতু তব হৃদযদেশম্।
বসতু বসনাপি তব ঘন-জঘন মণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথ নি[illegible]ম্ ॥
স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়বঞ্জনম্
জনিত-বতি-রঙ্গ-পবভাগম্।

মদন গবল খণ্ডন বাধা
মাথাব মণ্ডন মোবে।
চবণ-পল্লব আবোপ বাধা
মোব মাথাব উপবে ॥
পালাউ আহ্মার মদন বিকাব
সত্বরেঁ করহ আদেশে।

স্মবগবল-খণ্ডণং মম শিবসি মণ্ডনম্
দেহি পদপল্লবমুদাবম্।
জ্বলতি মযি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিত-বিকাবম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই অংশে রাধারূপ-বর্ণনায় গীতগোবিন্দের আক্ষরিক অনুবাদ স্পষ্ট। গীতগোবিন্দের ছত্রগুলিতে কিছু রূপক অলঙ্কার পাই।

এক্ষেত্রে অলঙ্কারগুলির নিরপেক্ষ সৌন্দর্য বিচার করলে গীতগোবিন্দের অন্যান্য অংশের তুলনায় এগুলি অতি সাধারণ, বোঝা যাবে। কিন্তু ছন্দের অপূর্ব মনোহারিতা সামান্য রূপ-কথাগুলিকেও অসামান্য এক রূপকথার রাজ্যে হাজির করে দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনূদিত পদগুলিরও অলঙ্কার রূপক। অনুবাদের সূত্রে সংগৃহীত হয়ে তা আরও ম্লান। কবি বড়ু চণ্ডীদাসের নিজস্ব ভাবসংস্কারের অথবা শিল্প-বোধের স্পর্শবঞ্চিত হয়ে এগুলি একান্তই নিরাভরণ, তার ওপর ভাষার দৈন্যে বাঙলা ত্রিপদী ছন্দের শক্তি ও সুষমা তখনও অনায়ত্ত। বর্ণনায় অলঙ্কার-যোজনার প্রমাণটি চাক্ষুষ, কিন্তু প্রাণটি প্রতিষ্ঠা করা হয়নি।

গীতগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনতিপূর্ববর্তী কালের কাব্য। গীত-গোবিন্দে রাধাকৃষ্ণের যে লীলা-বিলাস-ভঙ্গি দেখি, তা সংস্কৃত রীতি-আভিজাত্যের ছদ্মবেশী হলেও আমাদের অব্যবস্থিত নীতি-শিথিল গ্রাম-জীবনাচারেরই ছবি। রাজসভার কবি জয়দেব এ কাব্যকে যতই নাগরিক চতুরালিতে মার্জিত করুন না কেন, যতই না কেন হরিস্মরণে সরসিত মনে সমুন্নত ভগবৎ-ভক্তির সাড়ম্বর আয়োজন তিনি করুন, তবু এ কাব্য ছন্দের হিল্লোল এবং অলঙ্কারের বর্ণচ্ছটার আড়াল থেকে যে মানবজীবনের কথা বলে, অবিসংবাদিতভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রাধা ও কৃষ্ণের অনিশ্চিত ভাগ্যের পূর্বপুরুষ সে। পরিকল্পনায়, উপস্থাপনায়, চরিত্র-গঠনে, ঘটনা-বিন্যাসে সর্বত্রই উত্তরাধিকাব প্রাপ্তির শিলমোহর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অঙ্গে-পৃষ্ঠে। তবে গীতগোবিন্দকার রাজসভার নাগরিক শিষ্টাচার এবং মার্জনটি আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁব ছিল পূর্বসূরী সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের অর্জিত ভাষা-সম্পদ, লব্ধ ছন্দোজ্ঞান, দক্ষ অলঙ্কার-বোধ, মনোহারী সৌন্দর্য-কল্পনাশক্তি। অন্যদিকে বড়ু-চণ্ডীদাস গ্রামের কবি। বাসলী দেবীর দয়া এবং গ্রাম প্রতিবেশের দাক্ষিণ্য তাঁর মূলধন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এবং শ্রীরাধা লীলাসঙ্গিনী, এ বোধ তাঁর নীরব উপাসনালয়ের ভক্তিনত মনকে আবিষ্ট করলেও কবির রসানুভূতিকে আপ্লুত করতে পারেনি। তাই কবিতা রচনার কালে জীবনকে ঘটনাদ্বন্দ্বে এবং সমস্যাচক্রে উৎক্ষিপ্ত করে হাজির করার সময় যখন এলো, তখন ভগবৎ-সংস্কার একটি ক্ষীণ স্মৃতির মত কবির সৃষ্ট চরিত্র-গুলিকে স্পর্শ করল মাত্র, জারিত করতে পারল না। পূর্বজন্মের 'পদুমিনী' লক্ষ্মী হয়েও এ জন্মের রাধা তাই কৃষ্ণ-ভীত, কেলিকুণ্ঠ, লোক-পরিবাদ-সচেতন। আর পূর্ব-জন্মের নারায়ণ হয়েও এ জন্মের

কৃষ্ণ রাধারতি-উপভোগে আকুল, স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ, কেলিলোলুপ, অনিরূপিত মানব-ভাগ্যের এবং স্বভাবধর্মের ক্রীড়নক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভগবান এবং তার নিত্য-লীলাসঙ্গিনী কোন অনিবার্য বিশ্ববিধানের শৃঙ্খলায় পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন না। জীবধর্মের তাড়নায় ঘটনাচক্রে কখনো তারা পরস্পরের অতি সন্নিহিত, কখনো বা দূরাবস্থিত। তাই শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে কামার্তি এত উচ্চকণ্ঠ ও নগ্ন, গীতগোবিন্দে বিশ্বশৃঙ্খলার দ্বারা নম্র এবং সংসারানুকূল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সেই কারণেই মিলনের ক্ষেত্রে ব্যভিচার এবং বলপ্রয়োগ পুনঃপুনঃ ঘটেছে। গীতগোবিন্দে নর-নারীর মিলন পরকীয় হলেও তা শান্ত, পরস্পরের সম্মতি-নন্দিত এবং সৃষ্টি-অভিপ্রায়ের মঙ্গল-মণ্ডিত। কবি জয়দেব যদি গান্ধর্ব মিলনের চিত্র-কর হন, তবে কবি বড়ু চণ্ডীদাস রাক্ষস মিলনের গল্পকার।

আর একটি রাধারূপ-বর্ণনা (কৃষ্ণবর্ণিত) বৃন্দাবন খণ্ড থেকে উদ্ধৃত করব এবং গীতগোবিন্দের দশম সর্গ থেকে তারই পূর্বরূপ পাশাপাশি উপস্থিত করব।

তমাল কুসুম চিকুরগণে।
নীল কুরুবক তোর নয়নে॥
সুপুট নাসা তিল ফুলে।
দেখি তোর গণ্ড যুগ-মহুলে॥
আধর সুরঙ্গ বান্ধুলী ফুলে।
কন্নযুগ তোর এ বগহুলে॥
মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে।

বন্ধূকদ্যুতিবান্ধবোঽয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধূকচ্ছবি-
র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনম্।
নাসাভ্যেতি তিলপ্রসূণ-পদবীং কুন্দাভদন্তি প্রিয়ে
প্রায়স্ত্বন্মুখসেবয়া বিজয়তে বিশ্বং স পুষ্পায়ুধঃ॥

কুসুম-তনু রাধাকে কৃষ্ণ পুষ্পাভরণে সজ্জিতা দেখছে। উভয়ক্ষেত্রেই অলঙ্কার রূপক। উভয়ত উপমানকে রূপ-ব্যঞ্জনার অবসর না দিয়েই একটা নিরবকাশ গতি সঞ্চার করে দেওয়া হল। ফলে দুটি কাব্যের ক্ষেত্রেই উপমান যোজনা উপমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করেই শেষ। আমাদের বক্তব্য প্রতিপন্ন করতে কালিদাসের কাব্য থেকে সমজাতীয় উপমা সংগ্রহ করব।

প্রবাতনীলোৎপলনির্বিশেষমধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা।[১]

গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে সমজাতীয় উপমাছত্র,

চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনম্।

নীল কুরুবক তোর নয়নে।

১ ১ম সর্গ, কুমারসম্ভব।

অলঙ্কারগুলি কোথাও সাধারণ উপমা, কোথাও ব্যতিরেক, কোথাও রূপক। প্রতিক্ষেত্রেই উপমান নীলোৎপল, উপমেয় চক্ষু, উদ্দেশ্য নারী-রূপ সৌন্দর্য-ভূষিত করা অথবা লাবণ্যময়ী নারীর রূপ-সাদৃশ্য নিরূপণ করা। কালিদাসের বর্ণনায় উপমানের একটি বিশেষ অবস্থা আপন গুণ বা স্বভাবধর্মকে সঞ্চারিত এবং তরঙ্গিত করে উপমেয়কে মৃদুভাবে স্পর্শ করে আছে। জয়দেবের বর্ণনায় উপমান এবং উপমেয়-পক্ষের শ্রী ঈষৎ বিস্তারলাভ করেছে। বড়ু চণ্ডীদাসের বর্ণনায় রূপকের অতিসন্নিহিত রীতিতে উপমান এবং উপমেয় সংগৃহীত মাত্র। একই উপমা যতই হস্তান্তরিত হচ্ছে, ততই তাদের রূপচ্ছটা এবং ব্যঞ্জনা-মণ্ডল সঙ্কুচিত হতে হতে অর্থহীন উপমান সংগ্রহের দিকে চলেছে। একই উপমাবস্তু ব্যবহারের কোন্ গুণে বা বৈগুণ্যে এমন রূপরিক্ত এবং রসহীন হল। কবিমনের আবেগ এবং হৃদয়-যোগের অভাবের কথাটি এখানে বড়। কালিদাস সস্নেহ আবেগ এবং সোহাগভরা দৃষ্টি নিয়ে তাঁর মানস-কন্যা উমাকে দেখছেন। সার্থক মানসী প্রতিমা গ'ড়ে তুলতে হলে 'আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে, তায় ভালবাসা দিয়ে'-এ কাজ করতে হয়। কালিদাসের রূপ-রচনায় সেই হৃদয়বত্তা প্রত্যক্ষ করা যায়। আবেগের যোগ জয়দেবে যে একেবারে নেই এমন নয়। সামান্য একটু স্তবকের মধ্যেই তিনি একাধিক বার রাধাকে নানান আদর-ভরা নামে ডেকেছেন, 'মুগ্ধে', 'শশিমুখি', 'তন্বি', কখনো বা 'সুমুখি', 'চণ্ডি' ইত্যাদি। কালি-দাসের রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গেও রাম সীতাকে বিবিধ আবেগ-সম্বোধন জানিয়েছেন। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ এক, অথচ বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ তাঁর প্রণয়িনীকে একবারও এমন আবেগভরে সম্বোধন করেন নি, জয়দেবের কৃষ্ণের মুখে যা 'চটুল-চাটু-পটু-চারু মুরবৈরিণো-রাধিকা-মধিবচনজাতম্'। উপমায় হৃদয়জাত এই আবেগ-যোগের ফলাফল চিন্তা করলে অলঙ্কারের একটি বিশেষ লক্ষণ মনস্তাত্ত্বিক হয়ে ওঠে। বস্তুর রূপ বা গুণ প্রকাশ করতে উপমান আহরণ আমরা করি কেন। কারণ, ভালবাসি বলেই যা সুন্দর লেগেছে, তাকে অদ্বিতীয় করে তুলতে চাই। এই অদ্বিতীয় করার লোভ যতুকে যত তীব্র করে, ততই একে একে উপমা থেকে উৎপ্রেক্ষা, উৎপ্রেক্ষা থেকে রূপক, রূপক থেকে অতি-শয়োক্তির সৃষ্টি। এর পরেও আছে ব্যতিরেক অলঙ্কার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপমানবস্তুর অপকর্ষ দেখিয়ে উপমেয়বস্তুর উৎকর্ষ প্রতিপাদন করা হয়ে থাকে এ অলঙ্কারে। উপমানের অপকর্ষ দেখানো হয়, সে কি

উপমানের প্রতি অনাদরে অথবা অবহেলায়? আসলে এই অপকর্ষের প্রদর্শন একটা ছলনা মাত্র, কেননা রূপে বা গুণে আদর্শ বলেই উপমান সংগ্রহ করেছি। প্রয়োগকর্তার বুদ্ধি জানে, উপমানকে ছোট করা যায় না। কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু বা উপমেয়ের সঙ্গে কবিমনের মমত্বের যোগ এত নিবিড় যে, ক্ষেত্র বিশেষে তিনি তাঁর বর্ণনীয়কে ছোট করতে চান না। তাই উপমারীতি বিপরীত হয়। মা যখন খোকার কপালে টিপ হবার জন্যে আকাশের চাঁদকে ডাকেন, তখন চাঁদের অনুপম লাবণ্য তাঁর মনেই থাকে, তবু খোকার প্রতি সুগভীর মাতৃত্ব মায়ের মনকে হার মানতে দেয় না। শিশু কালকেতুকে কবি মুকুন্দরাম অপত্য স্নেহে ভালবেসেছিলেন। তাঁর কণ্ঠে শুনি,

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
জিনিয়া মাতঙ্গগতি, যেন নব রতিপতি
সবার লোচন-সুখ হেতু॥

কিশোরী উমা কালিদাসের মমতার লাবণ্যে গড়া, কালিদাসের প্রাণ থেকে উৎসারিত পিতৃস্নেহ হিমালয়ের অন্তরে ন্যস্ত।

মহীভৃতঃ পুত্রবতোঽপি দৃষ্টিস্তস্মিন্নপত্যে ন জগাম তৃপ্তিম্।
অনন্তপুষ্পস্য মধোর্হি চূতে দ্বিরেফ-মালা স-বিশেষ-সঙ্গা॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার নিয়ন্ত্রী, বড়ু চণ্ডীদাসের সৃষ্ট বড়ায়ি দূতী, ব্যতিরেক অলঙ্কারে যখন রাধারূপ কীর্তন করে,

কণক কমল রুচি বিমল বদনে।
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে॥

তখন শ্রীমতীর প্রতি স্নেহাধিক্য বশতই এমন অলঙ্কার যুক্ত হয়, কেননা,

পদুমিনী আহ্মার নাতিনী রাধানামা॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে রাধারূপ-বর্ণনার দুটি পৃথক স্তবক নীচে উদ্ধৃত করা হল। এগুলির বর্ণনায় স্বাতন্ত্র্য আছে। অল্প-স্বল্প সৌন্দর্যও উপস্থিত।

লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল।
বদন কমল শোভে আলক ভষল।।
নেত্র উতপল তোর নাসা নালদণ্ড।
গণ্ডযুগ শোভে মধুক অখণ্ড।।
সুন্দরি রাধা ল সরোঅবময়ী।
দুসহ বিবহজবে জরিলা কাহ্নাঞি।।
হাস কুমুদ তোর দশন কেশর।
ফুটিল বন্ধুলী ফুল বেকত আধার।।
বাহু তোব মৃণাল কর বাতা উতপল।
অপুরুব কুচ চক্রবাক যুগল।।
ঈষৎ ফুটিত পদ্ম তোব নাভিথানে।
কণক রচিত তোর ত্রিবলী সোপানে।।[১]

মুখ কমলে আতি শোভা কবে
খঞ্জন নয়ন দুঈ।
তহি কালসাপ যুগল তাহাত
শোভএ নিচল হোই।।

....

কব কমল বাহু মৃণাল
হেমঘট পযোভাবে।।
নাভী তার নদ ঘাট ত্রিবলী
ঘন জঘন পুলিনে।
উচিত তাহাত কলহংস সম
রএ কণক বসনে।।[২]

উদ্ধৃত অংশদুটিই কৃষ্ণ-বর্ণিত রাধারূপ। 'সরোঅরময়ী' এবং নদীরূপা রাধার 'ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি'তে ঈষৎ প্রবাহ-বেগ লেগেছে। এ দুটি রাধারূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অজস্র বর্ণনার মধ্যে কিছুটা ভাল। রাধার এ তরল লাবণ্য-কল্পনায় বড়ু চণ্ডীদাসের মৌলিকতা অবশ্য নেই, পরিকল্পনায় সংস্কৃত কবিতার ছায়া এবং ক্ষেত্র-বিশেষে আক্ষরিকতাও পাই। তবু কবি বড়ু চণ্ডীদাসের স্বকীয় ভাষার আবেগ এখানে নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়োজিত। প্রথমে আমরা উক্ত পদদুটিতে ব্যবহৃত সংস্কৃত ঐতিহ্যের সন্ধান করব।

১ ছত্র-ভারখণ্ড।

২ দানখণ্ড।

কালিদাসের রচনাতে পাই, 'সরিদ্বিহঙ্গৈরিব লীলমানৈরামুচ্যমানাভরণা চকাশে'। জয়দেব বর্ণিত কৃষ্ণের মুখমণ্ডল, 'জলনিধিমিব বিধু-মণ্ডল-দর্শন-তরলিত-তুঙ্গ-তরঙ্গম্।' কালিদাস ও জয়দেবের দৃষ্টান্তদুটিতে লাবণ্যের তরল প্রবহমানতায় রূপের যেমন ব্যাপ্তির কথাও আছে, আবার তেমনি আকুল আর্তিতে হৃদয়ের আবর্ত-গভীরতাও ফুটেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উদ্ধৃত পদদুটির কল্পনায় এই সরোবর-গভীর তরঙ্গ-ব্যাকুলতা সংস্কৃত কাব্যেরই স্মৃতিজাত পুনরুল্লেখ মাত্র। তবে সংস্কৃত কবি দেহ-বর্ণনার চূড়ান্ত পর্যায়ে রূপ-কে নদীতরল বক্ষের সামগ্রিক শোভায় মণ্ডিত করে দেখেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি সংস্কৃত কবিদের রূপচয়নগত বিশ্লেষণকেই লক্ষ্য করেছেন, তার গভীরে অন্বয়-গ্রন্থিটি অনুধাবন করতে পারেন নি। রূপ-ঐক্যের গ্রন্থি-সূত্রটিকেই তিনি স্বতন্ত্র একটি উপমা জ্ঞান করে তদনুযায়ী উপমা-চয়নে মনোযোগ দিয়েছেন, রূপ বিশ্লেষণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের প্রথম উদাহরণে ঐক্য-গ্রন্থিক একটি ছত্র আছে, 'সুন্দরী রাধা ল সরোঅরময়ী'। এটি সমগ্র পদের ভাববন্ধনী। তবু আলোচ্য দুটি পদেই উপমান-চয়ন বিক্ষিপ্ত। রূপদ্যুতি সমগ্র হয়ে দেহকে বেষ্টন করতে পারেনি, বিদ্যুৎ-চমকের মত ক্ষণস্থায়ী মাত্র। অলঙ্কারটি রূপক, লক্ষ্য করলে দেখা যায়, দেহের প্রতি অঙ্গের উৎকর্ষ জ্ঞাপন করতে আহৃত উপমানগুলির কোনটিই অন্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নয়, সকলেই পৃথক, পরস্পর নিঃসম্পর্ক। এদের মধ্যে ক্বচিৎ অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য রূপকের সন্ধান মেলে। 'ঈষৎ ফুটিত পদ্ম তোর নাভিথানে'। এ জাতীয় প্রয়োগ কিন্তু পদের বা স্তবকের সর্বাঙ্গে সেই, এখানে ওখানে ক্বচিৎ-দৃষ্ট। দীর্ঘ রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে রূপক যদি 'অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য'যুক্ত না হয়, তবে পাঠকের পক্ষে তা সহজেই ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। কবিদৃষ্টির সূক্ষ্ম নিপুণতা এসব ক্ষেত্রে পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করে রাখে। দীর্ঘ বর্ণনার ক্ষেত্রে, কবিদৃষ্টি সচেতন হলে, সাঙ্গরূপক অথবা পরম্পরিত-রূপক রচনা করে পাঠকের অবসাদ সহজেই দূর করা চলে। পরম্পরিত রূপকের সামান্য একটু উদাহরণেই কথাটি বোঝা যাবে। 'দিয়া হাস্য-সুধাচার, অঙ্গছটা আঠা তার, আঁখি-পাখী তাহাতে পড়িল।' দাশরথী রায়ের এ ছত্রটির উপমেয়-পক্ষ এবং উপমান-পক্ষ একটি মূলবস্তু অথবা ভাবের অঙ্গ হিসেবে বিশ্লিষ্ট হয়েও অন্বিত। পূর্বালোচিত সংস্কৃত কবিরা রূপবর্ণনায় অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য রূপকের ব্যবহারই করেছেন, এবং প্রত্যঙ্গবাচী গোটা বর্ণনা একটি ভাব অথবা বস্তু-বন্ধনীতে অন্বিত করে দিয়েছেন। এ কথার উল্লেখ

আমরা আগেও করেছি। কিন্তু কবি বড়ু চণ্ডীদাস এই অগোচর সংশ্লেষণ-কৌশলের কোন ধারই ধারেন নি। তাই এক একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ-বর্ণনায় কবির অসংখ্য উপমান-চয়ন সৌন্দর্যকে ঐক্যবদ্ধ করে না, উপরন্তু ক্লান্তিকর এই সব বর্ণনা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দ্রুত নাটকীয় ঘটনা-প্রবাহের পথে বাধার মত অচল হয়ে প্রত্যাশাকে পীড়িত করে। বর্ণনাগুলি প্রায়শই অতিকথিত অবান্তর-বাক্যের মত অযথা জায়গা জুড়েছে এ রচনায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পূর্ণাঙ্গ দেহ-রূপবর্ণনার ক্ষেত্র থেকে আমরা নিম্নলিখিত চরণগুলি উদ্ধৃত করছি। মূল সংস্কৃতের শ্লোক পরপর রইলো। সম্পূর্ণ কোন একটি বর্ণনাপদ উদ্ধার করা অপ্রয়োজনীয়, কেননা দীর্ঘবন্ধ পদগুলিতে হুবহু অনুবাদ কোন একটি দেহ-বর্ণনার আদ্যোপান্ত নয়, একটি কি দুটি চরণের অনুবাদগত প্রেরণা অনেক সময় পরবর্তী চরণ রচনায় কবিকে প্রবর্তিত করেছে।

এক। চরণ এবং গমন,

থলকমল জিনী তোহ্মার চরণে।
রাজহংস জিনী তোহ্মার গমনে॥

আজহ্রতুস্তচ্চরণৌ পৃথিব্যাং স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্॥
সা রাজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী গতেষু লীলাঞ্চিত-বিক্রমেষু।১

মুখরিতমণি-মঞ্জীরমুপৈহি বিধেহি মরালনিকারম্॥২

দুই। বদন ও অলক,

বদন কমল শোভে আলক ভমল।

চিন্তযামি তদাননং কুটিল-ভ্রূ কোপভরেণ।
শোণপদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ॥৩

তিন। নাভি ও উরু,

লোভেঁ নাভীতলে বসে তিনরূপ বলী।
উরু শোভে বিপরীত রামকদলী॥

১ ১ম সর্গ, কুমারসম্ভব
২ ১১শ সর্গ, গীতগোবিন্দ
৩ তৃয় সর্গ, গীতগোবিন্দ

....বলিত্রয়ং চারু বভার বালা।
আরোহণার্থং নবযৌবনেন
কামস্য সোপানমিব প্রযুক্তম ।।১

গতির্জন-মনোরমা বিজিত-রম্ভমূরুদ্বয়ম্ ।।২

চার। নয়ন, অধর ও কপোল,

কুরঙ্গনয়ন জিনী তোহ্মাব নয়নে'
আধর বান্ধুলী গণ্ড মধুক সমানে ।।

রসজলধিনিমগ্না ধ্যানলগ্না মৃগাক্ষী ।।৩

বন্ধুজীবমধুবাধব-পল্লবমুল্লসিতস্মিতশোভং৪

স্নিগ্ধো মধূকচ্ছবির্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি৫

পাঁচ। বক্ষোদেশ,

তালফল জিনিআঁ তোহ্মাব পযোভার।

তালফলাদপি গুরুমতিসবসম্।
কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলসম্ ।।৬

ছয় ললাট তিলক,

ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।

দিক্সুন্দবীবদনচন্দনবিন্দুরিন্দুঃ ।।৭

১ ১ম সর্গ, কুমারসম্ভব
২ ১০ম সর্গ, গীতগোবিন্দ
৩ ৬ষ্ঠ সর্গ, গীতগোবিন্দ
৪ ২য় সর্গ, গীতগোবিন্দ
৫ ১০ম সর্গ, গীতগোবিন্দ
৬ ৯ম সর্গ, গীতগোবিন্দ
৭ ৭ম সর্গ, গীতগোবিন্দ

সাত। দশন,

মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে ॥

মুখমম্বুজেন কুন্দেন দন্তম্‌...................১

আট। নাসা,

সুপুট নাসা তিলফুলে।

নাসাভ্যেতি তিলপ্রসূণ-পদবীং...........২

নয়। বাহু, কর, কলেবর,

বাহু মৃণাল কর রাতা উতপলা।
কণকচম্পক সম শোভে কলেবরা ॥

জিতবিসশকলে মৃদুভুজযুগলে করতলনলিনীদলে।৩

ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চন-পদ্ম-নির্মিতং মৃদু প্রকৃত্যা চ স-সারমেব চ ॥৪

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে যে সব রূপ-প্রকাশক উপমান সংগৃহীত, সেগুলিরই সমান অথবা সমগোত্রীয় উপমান শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আগাগোড়া রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানে আহৃত। বর্তমানে তারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব। প্রথম উপমাটিতে তুলনা করা হয়েছে স্থলকমলের সঙ্গে চরণের, রাজহংসের সঙ্গে গমনের। 'পদ হেমকমল' (ছত্র-ভারখণ্ড); 'চরণকমল থলকমলে' (বৃন্দাবন খণ্ড); 'চরণ যুগল থলকমল আকারে' (তাম্বুল খণ্ড); 'করিরাজ জিনী রাধা করিল গমন' (তাম্বুল খণ্ড); 'মত্ত রাজহংস জিনী চলএ বিলম্বে' (তাম্বুল খণ্ড); 'হেন বুলী রাধা, কলস লআঁ জাএ গজগড়ি ছান্দে'।

দ্বিতীয় উপমাটিতে বদন কমলের মত, অলক ভ্রমরের মত। অন্যান্য স্থানে পাই 'শরৎ উদিত চান্দ বদন-কমল।' (দানখণ্ড); 'নীল কুটিল

১ শৃঙ্গারতিলক
২ ১ম সর্গ, গীতগোবিন্দ
৩ ৭ম সর্গ, গীতগোবিন্দ
৪ ৫ম সর্গ, কুমারসম্ভব

শোভে চিকুরে।' (দানখণ্ড); 'নীল জলদ সম কুন্তলভারা।' (দানখণ্ড); 'পুনমীর চান্দ রাধা বদন তোহার।' (ভারখণ্ড); 'তোর সিহাল কুন্তল।' (ছত্রভার খণ্ড); 'বদন-কমল শোভে আলক ভষল' (ছত্রভার খণ্ড); 'তমাল কুসুম চিকুরগণে'। (বৃন্দাবন খণ্ড); 'বদন সংপুন শশধরে।' (তাম্বুল-খণ্ড); 'কনক কমল রুচি বিমল বদনে। দেখি লাজে গেলা চান্দ দুঈ লাখ যোজনে।।' (তাম্বুল খণ্ড); 'আলকেঁ শোভে, বদন তাহার, যে হেন কলঙ্ক চান্দে।' (যমুনাখণ্ড); 'ললিত খোঁপাত শোভে চম্পকের মালা। হরশিরে শোভে যেহ্ন কণক মেখলা।।' (যমুনাখণ্ড)।

তৃতীয় উপমায় নায়িকার নাভি ও ঊরুদেশের বর্ণনা, উপমান যথাক্রমে মদন-সোপান ও বিপরীত রামকদলী। আরও পাই,—'গভীর নাভি নাগেশর ফুলে।' (বৃন্দাবনখণ্ড); 'নাভি গভীর তোর প্রেয়াগ উপমা।' (দানখণ্ড); 'নাভী তার নদ, ঘাট ত্রিবলী।' (দানখণ্ড); 'ঈষৎ ফুটিত পদ্ম তোর নাভি থানে। কণক-রচিত তোর ত্রিবলী সোপানে।' (ছত্র-ভার খণ্ড); 'গরুঅ উরু নাল পদ হেম-কমল।' (ছত্রভাব খণ্ড); '......নাভি গম্ভীরে।........উরু করিকরে।' (তাম্বুল খণ্ড)।

চতুর্থ উপমায় নয়ন, অধর এবং কপোলেব বর্ণনা; উপমান যথাক্রমে কুরঙ্গ, বান্ধুলী এবং মধুক পুষ্প। আরও পাওয়া যায়, 'খঞ্জন জিনিআঁ তোর নয়ন যুগল।। আধরে বন্ধুলী রাগ শোভএ সুন্দরী।' (দানখণ্ড); 'গণ্ডস্থল শোভিত কমলদল সমা।। বিম্বফল জিনি তোর আধরের কলা। কালকূট বিষহরি জানল কটাক্ষ।' (দানখণ্ড); 'নেত্র উতপল তোব....। ·ডযুগ শোভে মধুক অখণ্ড।।' (ছত্রভারখণ্ড); 'ফুটিল বন্ধুলী ফুল বেকত আধার।।' (ছত্রভার খণ্ড): 'তোহ্মার নয়ন মলিন নলিন, ধরে কোকনদ রূপে।' (বৃন্দাবন খণ্ড)। 'নীল কুরুবক তোর নয়নে।। দেখি তোব গণ্ড যুগমহুলে।।' (বৃন্দাবন খণ্ড)। 'আলস লোচন দেখি কাজলে উজল। জলে বসি তপ করে, নীল উতপল।।' (তাম্বুল খণ্ড); 'ওষ্ঠ আধর যেহ্ন যমজ পোঁআর।' (জন্মখণ্ড); 'কমল বদনী রাধা হরিণনয়নী।......কপোল যুগল তার মহুলের ফুল। ওঠ আধর,তার বন্ধুলীর তুল।।' (তাম্বুল খণ্ড); 'নানা থানক চূম্বীল, আধরে আধব দিল, বিম্ব পোআলেঁ এক ভৈল।।' (বৃন্দাবন খণ্ড); 'নয়নত বসএ মদনে।।........পাণ্ডু গণ্ড........বিম্ব ওষ্ঠ........।।' (বাণখণ্ড); 'নীল উতপল নয়নে' (রাধাবিরহ)।

পরবর্তী উপমায় নারীর বক্ষোদেশের বর্ণনা, উপমান তালফল। অন্যান্য স্থানে পাওয়া যায়, 'ডাকর ডালিম দুঈ কুচে।' (দানখণ্ড); 'সুচক রুচক কুচের বাটুল' (দানখণ্ড); 'পাকিল শ্রীফল জিনিআঁ শোভে তোহ্মার দুঈ তনে।।' (দানখণ্ড);

'দুই কুচ তোর রাধা শম্ভুর আকার' (দানখণ্ড) ; '........কুচ কোকযুগলা' (দানখণ্ড) ; 'সোনার কটুআ দুটি মাণিকে পূরাআঁ। নেত বসন তাত ওহাড়ণ দিআঁ ।।' (দানখণ্ড) ; 'হেমঘট পয়োভারে ।।' (দানখণ্ড) ; 'তোর দুঈ কুচকুম্ভ বান্ধি নিজ গলে' (দানখণ্ড) ; 'মৃগমদ কুচমৃযুগ গগন মাঝার। তহিত নক্ষত্রগণ গজমুতী হার ।।' (নৌকাখণ্ড) ; 'অপরূব কুচ চক্রবাক যুগল ।।' (ছত্রভার খণ্ড) ; 'মুকলিত থলকমল তনে।' (বৃন্দাবন খণ্ড) ; 'কণক পদ্ম কোরক সম দুঈ তনে' (তাম্বুল খণ্ড) ; 'উচ কুচ যুগল উপরে।..........পড়ে যেন সুমেরু শিখরে ।।' (রাধা-বিরহ) ; 'কমলকলিকা সম তার পয়োভারে' (তাম্বুলখণ্ড) ; 'রাধার তন পরসে, যেহ্ন আমৃত কলসে' (বৃন্দাবন খণ্ড) ; 'কুচযুগ যুধিষ্ঠির' (বাণখণ্ড) ; 'ফুটিল কদম ফুল ভরে নোঁআইল ডাল।........কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ।' (রাধাবিরহ) ; 'মাহাকাল ফল আন্ধার তনে' (যমুনাখণ্ড)।

পরের উপমাটি ললাট-তিলকের। উপমান নব-শশিকলা। অন্যান্য স্থানে পাই, 'আনত কপাল তার আধ শশি জিনী।' (তাম্বুলখণ্ড) ; 'গন্ধ চন্দনের ফোঁটা, যেন উয়ে গগনে চান্দ গোটা ।।' (রাধাবিরহ) ; 'ললাটে তিলক চাঁদ' (বাণখণ্ড) ;

সপ্তম উপমাটি দশনের, উপমান মুকুলিত কুন্দ। অন্যান্য স্থানে পাই, 'মানিক জিঁনিআঁ তোর দশনের পাঁতী ।।' (দানখণ্ড); 'মানিক জিনিআঁ তোর দশনের যুতী। সিন্দূরে লোটাইল যেহ্ন গজমুতী ।।' (দানখণ্ড) ; 'হাস কুমুদ তোর দশন কেশর।' (ছত্রভার খণ্ড) ; 'বিম্ব ওষ্ঠ পুষ্পদন্ত সঙ্গে।' (বাণখণ্ড),

অষ্টম উপমাটি নাসিকার। উপমান তিলফুল। আরও দুই একস্থানে পাই, 'আঅর দেখিলোঁ নাসা গরুড় সমান।' (দানখণ্ড); 'নাসিকা নালিক যন্ত্র সমানে ।।' (দানখণ্ড) ; 'নাসা বিনতানন্দন' (বানখণ্ড)।

পরিশেষে নায়িকার বাহু, কর এবং কলেবরের উপমা। উপমান যথাক্রমে মৃণাল, 'রাতা উতপলা' এবং কনকচম্পক। আরও কয়েকস্থানে পাই, 'কণক নিকস সম তনুকান্তি লীলা।' (দানখণ্ড) ; 'বাহু মৃণাল কর উতপলে।' (দান-খণ্ড) ; 'কর কমল বাহু মৃণাল।' (দানখণ্ড) ; 'বিধি কৈল জঙ্গমে কণক প্রতিমা ।।' (দানখণ্ড) ; 'বাহুযুগ তোর কণক মৃণাল' (দানখণ্ড) ; 'সুন্দরী রাধা ল সরোঅরময়ী।' (ছত্রভারখণ্ড) ; 'ভুজযুগ হেমযূথিকা মালে। অশোক তবক করযুগলে ।।........কণক চম্পক কুসুম পান্তী। তোহ্মার সকল শরীর কান্তী ।।' (বৃন্দাবনখণ্ড) ; 'শিরীষ কুসুম কোঁয়লী। অদ্ভুত কণক পুতলী ।।' (জন্মখণ্ড) ; 'ভএ কাম্পো যেহ্ন নব কদলীর বালী' (দানখণ্ড)।

উপরের সংগৃহীত ছত্রগুলিতে দেহবর্ণনা ব্যাপারে মানবাঙ্গের রূপ-প্রকাশক

যে সব উপমান প্রযুক্ত, সেগুলি প্রায় সবই সংস্কৃতের অনুকরণ, কবির নতুন সৃষ্টি নয়। দেহবর্ণনার ক্ষেত্রে কবি বড়ু চণ্ডীদাসের রূপবোধ এত বেশি ঐতিহ্য-শাসিত যে, ঋণকৃত উপমানের দ্বারা প্রয়োগটিকে অন্তত নতুন করতেও কবি সাহসী হননি। তাছাড়া একই উপমান দেহের বিভিন্ন অংশের রূপপ্রকাশক হয়ে বারবার ব্যবহৃত। যেমন, 'পদ হেম কমল'; 'কণক কমল রুচি বিমল বদনে'; 'ঈষৎ ফুটিত পদ্ম তোর নাভি থানে'; 'গণ্ড স্থল শোভিত কমলদল সমা'; 'নেত্র উতপল তোর'; 'কমল কলিকা সম তার পয়োভারে'; 'কর কমল বাহু মৃণাল'। 'কমল' এই উপমানটির এতাদৃশ নির্বিচার ব্যবহারের দ্বারা এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গের বিষয়ে বারবার প্রয়োগের ফলে দেহরূপ-রচনাগুলি প্রায়শ তাদের আকর্ষণ-শক্তি হারিয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বত্রই 'কমল এবং শশধর' এই দুটি অতিপরিচিত উপমান ব্যবহৃত। একই 'কমল' হয়ত সেখানে নায়িকার বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ বর্ণনার কাজে নিযুক্ত। তবু সে সব স্থানে কবিরা উপমেয়ের স্বভাবধর্মটিকে (তার উপস্থাপনা ক্রিয়া গুণ ইত্যাদি) উপমানের পরিস্থিতি-প্রভাবিত বিচিত্র অবস্থার সঙ্গে এমনভাবে লগ্ন করেন, যাতে উপমানবস্তু এক হয়েও গুণে কর্মে স্বভাবে এবং রূপে স্বতন্ত্র সৌন্দর্যের আভাস দেয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের উপমা-প্রয়োগে অলঙ্কার আছে। কিন্তু উপমেয় অথবা উপমানের স্বভাব-কীর্তনের দ্বারা রূপসৃষ্টি করার আলঙ্কারিক কৌশল অনুপস্থিত। বড়ু চণ্ডীদাসের ব্যবহৃত অলঙ্কার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ রূপক, কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই গুণ-বিস্তার অনুক্ত (এমনকি অনভিপ্রেত) থাকায় উপমানগুলি রূপোল্লেখ মাত্র, রূপসৃষ্টি নয়। অক্ষম ভাষাভাণ্ডার এবং তজ্জাত অনুকরণের মোহাবেশ কবিকে দেহবর্ণনার ক্ষেত্রে অন্তত স্বাধীন হতে দেয়নি।

আর একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করার মত। একই উপমান বিভিন্নস্থানে বারবার উল্লিখিত হয়ে নতুন কোন মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞাপিত করতে অথবা রূপাবস্থার ইঙ্গিত দিতে পারেনি। একটি বিশেষ যোজনা-রীতিতে উপমেয় উপমান নানান জায়গায় বারবার কথিত হচ্ছে। যোজনা-পদ্ধতি অন্তত নব নব হলে হয়ত সুলভ একটি স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করা চলত, কিন্তু অনুকরণ-তন্ময় কবি সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। অবশ্য এ ব্যবহারের সমর্থনে একটি কথা বলা যেতে পারে, কৃষ্ণের কামনাটি একাধিক নয়, তার আর্তি অদ্বিতীয়। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের বার আনা অংশ জুড়ে রাধাকে ভোগ করার লোভের কথাই একমাত্র। আর দেহরূপ-বর্ণনা মোটামুটি রাধার দেহকে নিয়েই। সুতরাং কৃষ্ণের সেই একমাত্র লালসা টিকে তীক্ষ্ণ এবং সূচীমুখ করার কাজে একই উপমেয় উপমানের অবিচিত্র যোজনারীতি উপযুক্ত হয়েছে। এতো গেল কেবল মনস্তত্ত্বের কথা।

কিন্তু মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সুন্দরকেও উপস্থিত করতে হলে যোজনাকে বিচিত্র হতে হয়। যেখানে উপমেয় এবং উপমান এক, সেখানে যোজনার নতুনত্বই মনোহারিতা আনে। তাতে মনস্তত্ত্ব ক্ষুন্ন হয় না, বরং তা উদ্দিষ্টকে নিপুণভাবে পরিচিত করে। অথচ রূপাঙ্কন-ক্রিয়াটি সমগ্র হয়ে ওঠে।

পূর্বগামী আলোচনা অংশে 'সরোঅরময়ী' এবং নদীরূপা রাধার দেহরূপবর্ণনার দুটি স্তবক সন্নিবেশিত করেছি। নারী-লাবণ্য সংস্কৃত সাহিত্যে অনেকক্ষেত্রে যে জলপ্রবাহের সঙ্গে উপমিত, সে বিষয়েও আলোচনা করেছি। এখন কালিদাসের নামে প্রচলিত 'শৃঙ্গারতিলকম্' কবিতা-সঙ্কলন থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করব। দেখা যাবে, যাকে হুবহু অনুকরণ করে কবি বড়ু চণ্ডীদাস উক্ত স্তবক দুটি রচনা করেছেন।

বাহূ দ্বৌ চ মৃণালমাস্যকমলং লাবণ্য-লীলাজলং, শ্রোণীতীর্থশিলা চ নেত্র-শফবং ধম্মিল্ল-শৈবালকম্।
কান্তায়াঃ স্তনচক্রবাক-যুগলং কন্দর্পবাণানলৈর্দগ্ধানামবগাহনায বিধিনা রম্যং সরো নির্মিতম।

পূর্ণাঙ্গ রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে রূপক এবং ব্যতিরেক অলঙ্কারই প্রধান। ব্যতিরেক অলঙ্কার ব্যবহারের মনস্তত্ত্ব নিয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। কালিদাসের মেঘদূত, অভিজ্ঞানশকুন্তল, কুমারসম্ভব ইত্যাদি কাব্য নাটকেও তার যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে। কবি জয়দেবও গীতগোবিন্দে রাধারূপ-বর্ণনা করতে ব্যতিরেক অলঙ্কারকে কাজে লাগিয়েছেন। বড়ু চণ্ডীদাসেও একাধিকবার তা পাচ্ছি। কিন্তু সংস্কৃত কাব্য নাটকে এই বিশেষ অলঙ্কার-ব্যবহারের যে অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ক্ষেত্রে তা দুর্লভ। ব্যতিরেক অলঙ্কার-ব্যবহারের কালে সংস্কৃত কবিদের কেউই প্রায় একটি মাত্র উপমেয়ের জন্য একটি মাত্র উপমান সংগ্রহ করে ক্ষান্ত হননি। পক্ষান্তরে এই ব্যতিরেক অলঙ্কারের মাধ্যমে তাঁরা উপমেয় এবং উপমানের একটি ধারা-প্রবাহ স্বষ্টি করেছেন। এ বিশেষ অলঙ্কার সৌন্দর্যস্বষ্টির ব্যাপারে ঐসব কবিদের কাছে কেবল উপায়মাত্রই ছিল, অর্থাৎ শেষ লক্ষ্য ধরে নিয়ে ব্যতিরেকের মধ্যেই তাদের রূপস্বষ্টির পর্যবসান ঘটান নি। উপমেয়ের তুলনায় উপমানকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করার ছল কবিমনে তখনই আসে, যখন উপমেয়টি কবিমনের মমত্বে লালিত। সে আলোচনা পূর্বে করেছি। এ ব্যাপারের আরো একটা দিক আছে। উপমেয়ের রম্যতাবোধ যখন কবিমনে অনির্বচনীয় হয়, তখন উপমানের থেকে আদর্শ-চয়ন করেও কবিমনে একটা প্রকাশজনিত অতৃপ্তির ভঙ্গি (pretended dissatisfaction) ক্রমতা লাভ করে। এই অসন্তোষের ক্রমই উত্তরোত্তর সুন্দর সুন্দর উপমান চয়নে নিযুক্ত হয়ে এমন একটি পর্যায়ে ওঠে, যেখানে

ব্যাখ্যা স্তব্ধ হয়, মন ধীরে ধীরে সেই অনির্বচনীয়ের সামনে নত হয়ে আসে। অলঙ্কারের এই চূড়ান্ত অবস্থাটিকে পাবার জন্যেই কবিগণ ব্যতিরেক অলঙ্কারের লক্ষণগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করে তোলেন। পাঠক বা শ্রোতাকে এই অনির্বচনীয়ের স্বাদ ও সঙ্গ দেবার জন্যেই কবিমন ব্যতিরেক অলঙ্কারের কপট অতৃপ্তির পথে যাত্রা সুরু করে। তাই এ অলঙ্কার কবির উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায় মাত্র, অবসান নয়। কালিদাসের পূর্বোদ্ধৃত উপমা লক্ষ্য করা যাক।

নাগেন্দ্র হস্তাস্তুচি কর্কশত্বাদেকান্ত শৈত্যাৎ কদলী-বিশেষাঃ।
লব্ধ্বাপি লোকে পরিনাহি রূপং জাতাস্তদূর্বোরুপমানবাহ্যাঃ॥

শিরীষপুষ্পাধিক-সৌকুমার্যৌ বাহূ তদীয়াবিতি মে বিতর্কঃ।
পরাজিতেনাপি কৃতৌ হরস্য যৌ কণ্ঠপাশৌ মকরধ্বজেন॥

চন্দ্রং গতা পদ্মগুণান্ন ভুঙ্‌ক্তে পদ্মাশ্রিতা চান্দ্রমসীমভিখ্যাম্‌।
উমামুখন্তু প্রতিপদ্য লোলা দ্বিসংশ্রয়াং প্রীতিমবাপ লক্ষ্মীঃ॥

উমারূপের যোগ্য উপমান কবি কালিদাস আর পাচ্ছেন না। অনুপম সে সৌন্দর্যের কাছে সবই তুচ্ছ, অতৃপ্তির তরঙ্গ তুলে কবিকল্পনা উদ্দাম হয়েছে অনির্বচনীয়কে বাঙ্ময় করার, অধরাকে ধরার চেষ্টায়। তাই শেষ কথায় শুনি,

সা নির্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাদেকস্থ-সৌন্দর্য্য দিদৃক্ষয়েব॥

উমারূপের যোগ্য উপমান-চয়নের নিষ্ফল চেষ্টায় কবি ক্ষমা দিলেন। কেননা তা অসম্ভব। অনির্বচনীয় বচন-গোচর নয়। তাই শেষ ছত্রে চারুত্বের অমিত পরিমাণ সঙ্কেত করেই কবি বিরত হলেন। কিন্তু পূর্বগামী ছত্রগুলিতে ব্যতিরেক অলঙ্কারের তথাকথিত অপচেষ্টার আড়ালে আড়ালে তিনি পাঠকের রসবোধকে অনির্বচনীয়ের স্বাদ-লাভে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে তুলেছেন। চাক্ষুষ প্রমাণ না থাকলেও অতুলন এ সৌন্দর্যের বোধে পাঠক যে তৃপ্ত, বিবেক এ সত্যকে কবুল করে। একাধিক ব্যতিরেক অলঙ্কারের প্রবাহ সৃষ্টি করার প্রয়োজনই এইজন্যে যে, তা অলক্ষ্যে একটি রূপধারাকে বেগবান রেখে উত্তরোত্তর রমণীয়তার সঙ্কেত দেবে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও একাধিক ব্যতিরেক অলঙ্কারের সংগ্রহ আছে, কিন্তু তাদের সমবেত প্রবাহ নেই। দুটি চরণের স্তবকে তাদের বেগ সংহত। দ্বিতীয়ত অনুকরণের তন্ময়তা কবিদৃষ্টিকে

গভীরদর্শী করেনি। বড়ু চণ্ডীদাস ব্যতিরেক অলঙ্কার ব্যবহারের মানবিক উদ্দেশ্য এবং নন্দনতাত্ত্বিক (aesthetic) লক্ষণটিকে অনুভব করতে পারেন নি। তাই ব্যতিরেক অলঙ্কারের মধ্যেই তাঁর সৌন্দর্য দর্শনের পর্যবসান। কয়েকটি চরণ উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা গেল।

কণক কমল রুচি বিমল বদনে।
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে ॥

ললিত অলক পাঁতি কাঁতি দেখি লাজে।
তমাল কলিকাকুল রহে বনমাঝে ॥

....

কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে।
সত্বরে পশিলা সাগরের জলমাঝে ॥

পরস্পর-বিচ্ছিন্ন এই পঙক্তিগুলি অন্যতর কোন বার্তাকে আসন্ন করে তুলছে না, শেষ ছত্রে পাই, 'দিনে দিনে বাঢ়ে তার নহুলী যৌবন', যা সাধারণ একটি ঘটনার কথা।

সৌন্দর্যের এই উত্তরোত্তরতা আধুনিক বাঙলার একটি কবিতায় চমৎকার ফুটেছে, যদিও তা ব্যতিরেক অলঙ্কারে গড়া নয়।

যখন তোমার আঁচল দম্‌কা হাওয়ায় একা একা উড়ছিল
তখনও নয়
বিকেলের পড়ন্ত রোদে বিন্দু বিন্দু ঘাম
তোমার মুখে যখন মুক্তোর মত জ্বলছিল
তখনও নয়
কি একটা কথায় আকাশ উদ্‌ভাসিত করে
তুমি যখন হাসলে
তখনও নয়

....

....

উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিলো
যখন তোমাকে আর দেখা গেল না
তখনই
আশ্চর্য সুন্দর দেখাল তোমাকে।[১]

---

১ সুন্দর ফুল ফুটুক, সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

'আশ্চর্য সুন্দর' যা, তাকে এমন করে দেখতে হয়, অতৃপ্তি দিয়েই তার গঠন। কবির যে রূপদর্শন-কাতর মনটি প্রতীক্ষা করে থাকে, উপরের কবিতাটির সাধারণ ভাষায় সেটি ব্যক্ত। কবিতাটিকে এক-কথায় আমাদের আলোচ্য অলঙ্কারের প্রযোগ-তাৎপর্য বলা যেতে পারে।

এবার সংস্কৃতের ঐতিহ্য-শাসিত বিচ্ছিন্ন দেহরূপ-বর্ণনা নিয়ে আমাদের আলোচনা। এক্ষেত্রেও ঐতিহ্য-প্রভাব স্বল্প নয়, পরোক্ষও নয়। তথাপি বিচ্ছিন্ন এই দেহরূপ-বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাটকীয় গতি এবং কৌতূহল বাধাগ্রস্ত হয়নি। পূর্বালোচিত পূর্ণাঙ্গ বর্ণনাগুলি তাদের বিপুল কলেবর নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দ্রুতগতি ঘটনাচক্রে যে প্রাচীর রচনা করেছে, তার বাধা এক্ষেত্রে অপসারিত। অনুকরণাত্মক হলেও এ সব উপমা চকিত দ্যুতিতে কখনো ঘটনাকে কখনো চরিত্রকে উদ্‌ভাসিত করে। নাটকে যদি অলঙ্কার-জনিত কোন সমৃদ্ধির কথা স্বীকৃত হয়, তবে সম্প্রতি আলোচ্য অংশগুলি নিঃসন্দেহে মূল্যবান।

রাধারূপ-কীর্তনেই এইসব রূপবর্ণনা সংখ্যায় এবং শক্তিতে প্রধান। আমরা সেগুলি (সংস্কৃতের পূর্বরূপ সহ) যথাসম্ভব উপস্থিত করব।

মৃগমদ কুচযুগ গগন মাঝার।
তহিত নক্ষত্রগণ গজমুতীহার॥
তাত তিখ নখরেখ চান্দের আকার।
দেখিআঁ সরসচিত্ত নহিল আহ্মার॥১

ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগগগনে
মৃগমদরুচিরুষিতে।
মণিসরমমলং তারক পটলং
নখপদশশিভূষিতে॥২

পূর্বালোচিত পূর্ণাঙ্গ রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে যেখানে সংস্কৃতের অনুকরণ অবিকল, সেখানে বড়ু চণ্ডীদাসের বর্ণনা অতি আড়ষ্ট, আমরা লক্ষ্য করেছি। দাসত্ব সেক্ষেত্রে কবিকে ভাষাব্যবহারেও স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে দেয়নি। সদ্যোদ্ধৃত উদাহরণে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকারের স্বাচ্ছন্দ্য এবং আত্ম-নির্ভরতা স্পষ্ট। উভয়-ক্ষেত্রেই অলঙ্কার রূপক। কবি বড়ু চণ্ডীদাস এস্থানে রূপকের উপমেয় এবং উপমানপক্ষকে শৃঙ্খলার সঙ্গে প্রয়োগের দ্বারা (তাদের গুণ এবং ক্রিয়াটিকে ঈষৎ

১ নৌকাখণ্ড।
২ ৭ম সর্গ, গীতগোবিন্দ।

ব্যাখ্যায়) রূপপ্রকাশের সামর্থ্য দিয়েছেন। নখরেখার তির্যক আঘাত, কর্শিতা শশিকলার মত রাধার বক্ষোদেশে চিহ্নিত,—লক্ষ্যশক্তির এই নিপুণ প্রত্যক্ষতায় উপমাটি নাটকের আঁকাবাঁকা গতিপথে বেশ মানানসই। নাটকীয় পরিস্থিতি এ অংশে রাধাকৃষ্ণের কলহ-মুখরিত। অসহায়া রাধাকে একা পেয়ে কৃষ্ণ রতি-উপভোগে বদ্ধপরিকর। রাধার নিষেধ তাকে আর নিরস্ত করতে পারবে না। কৃষ্ণ বলে, 'দেখিআঁ রূপযৌবন তোহ্মার। যমুনাজলে লৈল আধিকার।।' এ হেন সুনিশ্চিত সৌভাগ্যে (sure prospect) কৃষ্ণের উপমাগত লক্ষ্যশক্তিতে সততা জাগলে তা ক্ষেত্রানুকূলই হয়। অন্য দুটি দৃষ্টান্ত,

অহোনিশি মদন মারে তারে শরে।
হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে।।
সব খন বস তোহ্মে তাহার আন্তরে
তেঁসি তোহ্মা রাখিবারে পরকার করে।।[১]

নয়ন-শলিল পড়ে বদনে তাহার।
রাহুএঁ গালিল যেন চাঁদ সুধাধার।।[২]

অবিরলনিপতিত মদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম্।
স্বহৃদয়মর্মণি বর্ম করোতি সজলনলিনীদলজালম্।।[৩]

বহতি চ বলিত-বিলোচন-জলধরমাননকমলমুদারম্।
বিধুমিব বিকটবিধুন্তুদদন্তদলনগলিতামৃতধারম্।।[৪]

প্রথম উদাহরণে বড়ায়ি কৃষ্ণের কাছে রাধাবিরহ বর্ণনা করেছে। নাগরিক চতুরালিতে শ্লিষ্ট এ উপমা বড়ু চণ্ডীদাসের নিজস্ব ভাবস্তরের নয়, প্রেমকলা-বিদগ্ধ রসবেত্তার অধিগত এ প্রয়োগ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকারের স্থানোপযোগী নিয়োগের দ্বারা তার মৌলিক উপভোগটি ক্ষুণ্ণ হয়নি। দ্বিতীয় উদাহরণের অনুবাদ দুর্বল, রূপক অলঙ্কারের মৌলিক (সংস্কৃত গীত-গোবিন্দ) সৌন্দর্য বাঙলা-রূপান্তরে দীপ্তি হারিয়েছে।

---

১ রাধাবিরহ
২ ঐ
৩ ৪র্থ সর্গ গীতগোবিন্দ
৪ ঐ ঐ

মল্লিকা কলিকা পাশে
ভ্রমর না পায় রসে

অথবা

উচিৎ কমলে ভোগ করএ ভ্রমরে।
আম্মার মুকুলে নাহিঁ পাএ মধুভরে।।

নির্মাল্যোজ্‌ঝিত-পুষ্পদাম-নিকরে
কিং ষট্‌পদানাং রতিঃ।।১

নিশা-শেষে আগত লম্পট স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এ 'কৈতব'বাদ খণ্ডিতা নারীর আক্ষেপ-মিশ্রিত হয়ে শৃঙ্গারতিলকে অলঙ্কাররূপ নিয়েছে। রতিভোগ-লোলুপ কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করার জন্যে রাধা উক্ত অলঙ্কার-বাক্য ব্যবহার করেছে। এখন প্রশ্ন এই, জীবনে প্রেমের বেসাতিতে কি পরিমাণ বৈদগ্ধ্য, অভিজ্ঞতা এবং বেদনাবোধ থাকলে শ্রীরাধার এই প্রবোধ-বাক্য তার উক্তি হিসেবে শোভন হত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যেও নায়িকা যেখানে খণ্ডিতা, প্রত্যাশা যেখানে উপেক্ষায় অপমানিত, সেখানে অনুরাগ এবং অনুশোচনা-বিজড়িত খেদ প্রিয়তমের প্রতি প্রেমের গভীরতা দিয়েই অর্জন করতে হয়। আক্ষেপানুরাগের প্রতিষ্ঠিত এই ভাবস্তর থেকে কবি বড়ু চণ্ডীদাস অলঙ্কারের এতাদৃশ প্রয়োগরীতি সংগ্রহ করেছেন এবং ভিন্ন একটি প্রসঙ্গে (context) তাকে নিযুক্ত করে রাধা-হৃদয়কে মনস্তত্ত্বময়রূপে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু আগাগোড়া শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের কাব্যভাবে (শেষাংশ ছাড়া) রাধা প্রেম-ব্যাপারে অপরিণতা, অপরিপক্কা। সে মূঢ় বালিকা মাত্র, লীলাকুণ্ঠাই তার স্বভাবের সবচেয়ে বড় লক্ষণ। এ হেন পরিস্থিতিতে (প্রসঙ্গান্তর ঘটার পরেও) রাধার জীবনের যে প্রসঙ্গে উক্ত উপমা নিযুক্ত হল, তা কি সত্যই উপযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের প্রশ্ন এই, লোলুপ কৃষ্ণকে নিরস্ত করতে রাধার উক্তিগত যে গভীর জীবনবোধ, তা কি রাধা ইতিমধ্যেই তার জীবন দিয়ে অর্জন করতে পেরেছেন, অথবা এ কেবলমাত্র আরোপিত, জীবন থেকে স্বতোৎসারিত নয়। রাধাকে হঠাৎ এত গভীর মনের মানুষ করে উপস্থিত করার মধ্যে কবিমনের ভাবদীক্ষার পরিচয় নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার এখানে ভাবকে স্থাপিত করার উপযুক্ত পরিস্থিতি এবং প্রসঙ্গ-নির্বাচন করতে

---

১ শৃঙ্গারতিলক।

পারেন নি। উপমা-বাক্যটি আপাত-বিচারে মনোরম, রাধা-হৃদয়ের গভীরতা-দর্শী, কিন্তু প্রসঙ্গটি লক্ষ্য করলে রাধার সে অধিকার কতটা ন্যায্য, তা বিচারের অপেক্ষা রাখে। পরবর্তী অংশে এ উপমা-প্রয়োগ-যোগ্যতা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করব। এখানে শেষ কথা হল এই, নিষেধাত্মক বা বারণার্থক এই অলঙ্কার-প্রয়োগ রাধাচিত্ত বিচারে অপ্রযুক্ত হয়েছে। আরও একটি উদাহরণ,

কাহ্নের উপরে শোভে সুন্দরী গোআলী।
নীল মেঘে যেহ্ন পড়এ বিজুলী।
....
সুরত সুখে কাহ্ন মুকুলিত নয়নে।
....
নিচলে বহিলা রাধা সুরতি আয়াসে।
শক্রের ধনু যেহ্ন উইল আকাশে।।

উরসি মুরারেরুপাহিতহারে
ঘন ইব তরলবলাকে।
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে
রাজসি সুকৃত-বিপাকে।।১

রতিসুখসময়-রসালসয়া দরমুকুলিত
নয়নসরোজম্।২

বিপরীত বিহারের বর্ণনা, হুবহু অনুকৃত। মনে হয়, বাৎস্যায়ন মুনির কাম-শাস্ত্রীয় বর্ণনারীতি এ সর্ব কাব্যের এ জাতীয় রূপ-কীর্তনের আদর্শ ছিল। উভয়তই অলঙ্কার বাচ্য উৎপ্রেক্ষা। আরও একটি দৃষ্টান্ত। সুসজ্জিতা রাধার সম্বন্ধে বড়ায়ির উচ্ছ্বসিত বর্ণনা,

গিএ গজমুতী হার মণি মাঝে শোভে তার
উচ কুচ যুগল উপরে।
হআঁ সমান আকারে সুরেশরী দুঈ ধারে
পড়ে যেন সুমেরু শিখরে।।

১ ৫য় সর্গ, গীতগোবিন্দ।
২ ২য় ঐ ঐ

পৃচ্ছ মনোহর-হার-বিমলজল ধারমমুং কুচকুম্ভম্।১

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপরোক্ত উপমা-চয়নে গীতগোবিন্দের পরোক্ষ প্রভাব থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুকরণ বিদ্যাপতি পদাবলীর। অন্যত্র সে বিষয় আলোচনা করব, বিদ্যাপতির পদটি এখানে উল্লিখিত রইল।

নবীন পয়োধর অপরুব সুন্দর
উপর মোতিম হার
জনি কণকাচল উপর বিমলজল
দুই বহু সুরসুরি ধার।

বিদ্যাপতির পদে পূর্বসূরী সংস্কৃত কবিদের প্রভাব থাকতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার যে বিদ্যাপতির ভাবছত্রটিকেই গ্রহণ করেছেন, তা অবিকল অনুবাদের দ্বারাই প্রমাণ হয়। অলঙ্কার সর্বত্রই উৎপ্রেক্ষা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও গীতগোবিন্দে তা প্রতীয়মানা এবং বিদ্যাপতিতে বাচ্যা।

সংস্কৃত কাব্য ঐতিহ্যের অনুকরণ-করা আরও কতকগুলি কবিতাছত্র পাওয়া যাচ্ছে, যা দেহরূপ বর্ণনার নয়। মনোভাব-রূপের বর্ণনা দিতেই এই পঙক্তিগুলির উপমা-চয়ন। এ পর্যায়ে উপমাগুলি অধিকতর মনোহারী এইজন্যেই যে, এখানে উপমান বিদেহ কোন মানব-স্বভাব অথবা বেদনার রূপদর্শী, অর্থাৎ উপমেয়-পক্ষ মানুষের অন্তরবাসী। তাছাড়া, মনোলীন উপমা মনস্তত্ত্ব প্রকাশে অনেক বেশি সমর্থ। পাত্র-পাত্রীর আশা-নৈরাশ্য, ভালোলাগা-মন্দলাগা, প্রত্যাশা-ব্যর্থতার গোপন-গভীর সুরগুলি রূপে আরোপিত হলে পাঠক বা শ্রোতা তাকে আপন প্রাণের অতি নিকট করে লাভ করতে পারেন। জীবনের উত্তাপ এবং অভিজ্ঞান ধারণ করে এ সব অমূর্ত উপমেয় মানুষের স্বীকৃতির মধ্যে বাস্তব হয়ে ওঠে। এ পর্যন্ত যে সব উপমা নিয়ে আলোচনা করেছি, সেখানে দেহ-রূপের অতিশয়তা এবং অতিরঞ্জন আনন্দ দেয় সত্যই, কিন্তু তা যতটা শিল্পরুচিগত, ততটা জীবন-বিশ্বাসগত নয়। যখন বলি, রাধার নয়নদুটি বাতাসে চঞ্চল কোকনদের মধ্যে আকুল ভ্রমরের মত, তখন এ সত্য যতটা মনন-সাপেক্ষ, ততটা বিশ্বাস-বলিষ্ঠ নয়। কিন্তু যখন বলি, কৃষ্ণের বিরহে রাধাহৃদয়ের অবস্থা,

১ গীতগোবিন্দ।

বন পোড়ে আগ, বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥১

অনির্ভিন্নো গভীরত্বাদন্তর্গূঢ় ঘনব্যথঃ।
পুটপাক-প্রতিকাশো রামস্য করুণো রসঃ ॥২

এবেঁ মোর মনেব পোড়ণী ॥
যেন উয়ে কুম্ভারের পণী ॥৩

অন্তর্গতা মদনবহ্নি শিখাবলী যা,
সা বাধতে কিমহ চন্দনপঙ্কলেপৈঃ।
যঃ কুম্ভকার পবনোপরি পঙ্কলেপস্তাপায়
কেবলমসৌ ন চ তাপ-শান্ত্যৈ ॥৪

বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা-হৃদয় কুম্ভকারের জ্বলন্ত 'পনী'র মত অন্তর্দাহী ঘন-ব্যথায় কাতর। ভবভূতির উত্তররামচরিতে সীতাহারা রামের করুণ রসে এ বেদনার মিল, কালিদাসের নামে প্রচলিত শৃঙ্গারতিলকের উদ্ধৃত শ্লোকটি এর অবিকল পূর্বরূপ। অনুকরণ হলেও রাধার খেদোক্তি মর্মস্পর্শী। সহজদৃশ্যকে উপমার দ্বারা 'aesthetic' করে তোলা এ পদ-পর্যায়ের ধর্ম নয়, পক্ষান্তরে যা অদৃশ্য, কেবল মানস-গোচর, তাকে রূপে মূর্তিমান করাই এখানকার উপমাগুলির উদ্দেশ্য।

তোহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম
আহ্মেহো ভাল গারুড়ী ॥৫

এতাবত্যতনুজ্বরে বরতনুর্জীবেন্ন কিন্তে রসাৎ
স্ববৈদ্যপ্রতিম প্রসীদসি যদি .... ॥৬

কালকূট বিষহরি জ্ঞানল কটাক্ষ ॥৭

১ বংশী খণ্ড
২ উত্তররামরচিত, ভবভূতি
৩ রাধাবিরহ
৪ শৃঙ্গারতিলক
৫ দানখণ্ড
৬ গীতগোবিন্দ
৭ দানখণ্ড

গীতগোবিন্দের এই সাদৃশ্য ছাড়াও কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলে মৃগয়ারত রাজা দুষ্যন্তের ভয়ে ভীত পলাতক হরিণের ছবি থেকে রাধার উদ্বেগপীড়িত মনের উপমান-চয়ন করা কবি বড়ু চণ্ডীদাসের পক্ষে অসম্ভব নয়।

গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে বদ্ধ-দৃষ্টিঃ
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতন-ভয়াদ্ ভূয়সা পূর্বকায়ম্ ।।

পলায়ণপর হরিণের প্রাণভয় এবং উদ্বেগের চিত্র উপমানরূপে গ্রহণ করে রাধাবিরহ-ব্যাকুলতার প্রসঙ্গে প্রয়োগ করা বড়ু চণ্ডীদাসের পক্ষে স্বভাবিক। দুটি চরণে বাঁধা স্বল্পবাক এ অলঙ্কার-কথাগুলি এক নিমেষেই রাধার অন্তর্জ্বালা প্রকাশ করল। আরও একটি কথা, কালিদাসের পূর্বোক্ত চিত্রটি উদ্বেগ-কাতরতার নিদর্শন হিসেবে অতি প্রসিদ্ধ এবং কবি বড়ু চণ্ডীদাস গ্রামলৌকিক জীবনের রূপকার হলেও তাঁর বৈদগ্ধ্য স্বীকৃত। ফলে, উপমান-চয়ন প্রত্যক্ষ না হলেও তা যে কবির স্মৃতিবাহিত, এ কথা বিশ্বাস করায় কোন ভ্রান্তি নেই।

রাধার আর্তি-চিত্রের নিদর্শন,

উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ।
কাহ্নাঞিঁ না বুঝে দৈবেঁ এ বিশেষ ।।
মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ।
বিকসিত ফুলগন্ধ বহুদূর জাএ ।।১

কথিতসময়েহপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্।
মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্ ।।২

বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায়।
স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহিহৃদয়দলনায় ।।৩

উপমানের স্বভাব-ধর্মের পরিচয় দিয়ে উপমেয়কে সঙ্কেত করার এ অলঙ্কার-কৌশল আরও দুই একটি স্থানে পাই,

---

১ রাধাবিরহ
২ গীতগোবিন্দ
৩ গীতগোবিন্দ

গুণ বুঝি মধুকর পরিহর বন।
আইস বনমাঝে বিকচ নলীন ॥১

ফুটিল কদম ফুল ভরে নোঁআইল ডাল।
এ ভোঁ গোকুলক নাইল বালগোপাল ॥২

উপমেয়কে আভাসিত মাত্র রেখে উপমান-কীর্তনের দ্বারা রাধাহৃদয় অবারিত করার শক্তি-পরিচয়ে সমগ্র 'রাধাবিরহ' চিহ্নিত। নায়িকার অন্তরের আকুলতা আরও দু একটি ছত্রে উদ্ধার করা গেল।

ডালে বসী কুইলী কাঢ়ে বাএ।
যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ ॥৩

শ্রুতিপুটযুগলে পিকরুতবিকলে
শময় চিরাদবসাদম্ ॥৪

বাঁশী বাজাইল যবেঁ কাহ্নে।
কোকিল কৈল পালি গানে ॥
আগুণি জালিল দেহে তখন দক্ষিণপবনে ॥৫

মুকুলিত আম্বসাহাবে।
মধুলোভেঁ ভ্রমর গুজবে ॥৬

উন্মীলন্মধুগন্ধলুব্ধমধুপ-ব্যাধূতচূতাঙ্কুর-
ক্রীড়ৎকোকিলকাকলী-কলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ ।৭

---

১ রাধাবিরহ
২ রাধাবিরহ
৩ রাধাবিরহ
৪ গীতগোবিন্দ
৫ রাধাবিরহ
৬ ঐ
৭ গীতগোবিন্দ

আগাগোড়া অনুকরণ হয়েও উদ্ধৃত বাঙলা ছত্রগুলি রাধার ব্যাকুলতা প্রকাশে পারদর্শী। রূপ-রচনায় পারদর্শিতার পার্থক্য লক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা-বিরহ অংশটি প্রক্ষিপ্ত বলে বোধ হওয়া স্বাভাবিক। একটি ব্যাপার এখানে স্মর্তব্য, আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে যত শ্লোক উদ্ধার করেছি, তার সবই প্রায় পূর্ববর্তী সংস্কৃত কবিতার অনুকরণে পাওয়া। দানখণ্ড, নৌকা-খণ্ড, বাণখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ডের দীর্ঘ দেহবর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকারের কোন কৃতিত্ব নেই। অনুবাদের নির্জীবতা সর্বাঙ্গে নিয়ে এ সব উপমা কবির শক্তি প্রকাশে অক্ষম। বংশী খণ্ড এবং রাধাবিরহে অনুবাদ মূলানুগ হলেও, কবি যে সংস্কৃতের মূল উপমা ব্যবহার এবং তার প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে অধিক অবহিত হয়েছেন, সে সত্য নিঃসন্দেহে প্রকাশিত। তাছাড়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আদ্যোপান্ত উপস্থাপনাটি (আগেই বলেছি) নাটকাকারে গড়া। নাটকের দ্রুতগতি সংলাপ-প্রবাহে এ জাতীয় দীর্ঘ বর্ণনা যদি উপর্যুপরি হয়ে ওঠে, তবে নাটকের গতি-রহস্য এবং ঘটনা-কৌতূহল পীড়িত হয়। আর এই কারণেই গোড়ার দিকের খণ্ডগুলির অজস্র উপমা-বর্ণনা শ্রোতৃচিত্তকে সুরভিত করতে পারেনি। অবশ্যই শেষ দুটি খণ্ডের উপমা অনুকরণ-সর্বস্ব। কিন্তু তাদের সংক্ষিপ্ত আয়তন নাটকের ঘটনা-প্রবাহে তো অবাঞ্ছিত স্থান দখল করেই নি, বরং ঈষৎ দ্যুতিময় সঙ্কেত-কথার মত নাটকের প্রবাহকে আরও ত্বরিত করে দিয়েছে। অনুবাদের সূত্রে সংগৃহীত বলেই উপমাগুলির মৌলিক সৌন্দর্য প্রত্যাশিত নয়, পরন্তু হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে অলঙ্কারের মৌলিক রূপ-বিহ্বলতা কিছু পরিমাণে জৌলুষহীন হয়ে নাটকের সংলাপ-ভাষার নিকটবর্তী হতে পেরেছে।

আরও একটি কথা, ঐতিহ্যসূত্রে সংগৃহীত হলেও অলঙ্কার ব্যবহারের একটা জাতি-পার্থক্য মানতে হয়। গোড়ার দিকের খণ্ডগুলিতে প্রায়শই উপমেয় এবং উপমান বস্তু-জগতের সামগ্রী। রাধার দেহ, কমল সুধাকর চকোর মধুকর ইত্যাদি। শেষের দুটি খণ্ডে বেশিরভাগ উপমেয় এবং উপমান বস্তু-জগতের সামগ্রী নয়। বিশেষত উপমেয়-পক্ষ মনোজগতের বিশেষ বিশেষ বোধ মাত্র। উপমেয়-উপমানের প্রয়োগক্ষেত্রে বস্তু যখন বস্তুর রূপ-প্রকাশক, তখন লক্ষ্য করার একমাত্র বিষয়, যোজনাটি কতদূর সঙ্গতিময়, প্রকাশিত ছবিটি কতটা স্পষ্ট এবং শ্রোতার বুদ্ধি কতখানি তৃপ্তিলাভ করেছে। কিন্তু বস্তু যখন মনের রূপ-প্রকাশক (অর্থাৎ বস্তু-উপমান যখন ভাব-উপমেয়ের অবস্থা প্রকাশ করে), তখন অলঙ্কারটি সঙ্গত যোজনার দ্বারা শ্রোতৃহৃদয়ের বিশ্বাস কতটা অধিগত করেছে, সেটাই লক্ষনীয়। প্রথম ক্ষেত্রে চিন্তাজাত বিচার বড়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আবেগ-জাত স্বীকৃতি বড়। শেষের প্রকৃতির একটি উপমা এখানে উদাহৃত করা হল,

পুরুষ ভ্রমর দুইহো এক মান।
নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান॥
নানা রঙ্গে রহে কাহ্নাঞিঁ আন নারী পাশে।১

অহিণঅমহুলোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং।
কমল বসইমেত্তণিব্বুদো মহুঅর বিস্মরিদোসি ণং কহং॥২

বড়ায়ির কথায় কৃষ্ণচরিত্র অপেক্ষা সাধারণভাবে পুরুষ-স্বভাবের বর্ণনাটি বড়। কৃষ্ণ প্রাসঙ্গিকভাবে সে স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত মাত্র। অভিজ্ঞানশকুন্তলে হংসপদিকার অনুশোচনায় রাজা দুষ্যন্তের প্রতি কটাক্ষ (হংসপদিকা যা নিপুণমুপালব্ধোঽস্মি ইতি) আছে, কিন্তু সাধারণভাবে প্রেম-ব্যাপারে পুরুষ-জাতির চপলতাই এখানে উদ্দিষ্ট। উপমেয় যখন কোন ভাব-বস্তু মাত্র (অর্থাৎ চাক্ষুষ-বাস্তব নয়), তখন তার গুণ প্রকাশের কাজে ব্যবহৃত উপমান বক্তব্যকে নির্বিশেষ (Impersonal) করতেই রত হয়। নির্বিশেষ হওয়ার ফলে অলঙ্কারের কাব্যগুণ বাড়ে। সেই উপমার বোধ আপন ভাষাশক্তি এবং হৃদয়বত্তা দিয়ে যতক্ষণ না কবি আয়ত্ত করতে পারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এ জাতীয় উপমা প্রয়োগ করা যাবে না। সদ্যোক্ত দৃষ্টান্তে অনুবাদ তাই অবিকল নয়, পরন্তু মূল অলঙ্কারটি কবি আপন ভাষাশক্তিতে আত্মসাৎ করেছেন। তাই গোড়ার দিকের খণ্ডগুলিতে ব্যবহৃত অলঙ্কারের থেকে শেষ দুটি খণ্ডের অলঙ্কার স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয়ত, একই উপমেয় এবং উপমান নিয়ে গঠিত অলঙ্কার ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে নানান খণ্ডে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,

রাধাবিরহে,

পাখী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাওঁ তথাঁ।
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁ বসে যথাঁ॥
(কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ জনিত)

বংশী খণ্ডে,

পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥
(কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ জনিত)

১ রাধাবিরহ
২ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্

দানখণ্ডে,

পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ।
যথাঁ সে কাহ্নাঞিঁর মুখ দেখিতেঁ না পাওঁ ॥
হেন মনে করে বিষ খাআঁ মরি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥
(কৃষ্ণের প্রতি বিরাগ জনিত)

রাধাবিরহে (কৃষ্ণ-কথিত),

এবে কেহ্নে গোআলিনী পোড়ে তোর মন।
পোটলী বান্ধিঞাঁ রাখ নহুলী যৌবন ॥
(নিবাসক্তিময)

রাধাবিরহে (বড়ায়ি-কথিত),

এবেঁ ঘুসঘুসাআঁ পোড়ে তোর মন।
পোটলী বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন ॥
(তিবস্কাবনুখ্য)

দানখণ্ডে (কৃষ্ণ-কথিত),

তোহ্মার যৌবন রাধা কৃপিণেব ধন।
পোটলি বাঁন্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন ॥
(উপদেশাত্মক)

রাধাবিরহে (রাধা-কথিত),

বিরহ সাগর মোর গহীন গম্ভীর বড়ায়ি
এহাত কেমনে হয়িব পার।
যদি কাহ্নাঞিঁ কর পার এ মোর কুচকুম্ভ ভেলা করি
হএ মোর তবেঁসি নিস্তার ॥

যমুনাখণ্ডে (কৃষ্ণ-কথিত),

আহ্মার বচনে রাধা না করিহ হেলা।
যৌবনসাগরে তোর কাহ্নাঞিঁ ভেলা ॥

তাম্বুলখণ্ডে (কৃষ্ণ-কথিত),

আহ্মার বচন ধর ল বড়ায়ি
মনে না করিহ হেলা।
দুসহ বিরহ সাগরে বড়ায়ি
তোহ্মেসি আহ্মার ভেলা॥

স্বতন্ত্র পটভূমিকায় ব্যবহৃত একই (প্রায় একই) উপমেয়-উপমানে গঠিত অলঙ্কার। যেমন,

রাধাবিরহে (বড়ায়ি-কথিত),

বুঝিতেঁ না পারো কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার চরিত।
....
ভাত না খাইলি তবেঁ তাহার কারণে।
শাকর খাইতেঁ তোহ্মে আদরাহ কেহ্নে॥

দানখণ্ডে (রাধা-কথিত),

পরদার সুরতী করিতেঁ না জুআএ।
ভাতের ভোখ কাহ্নাঞিঁ ফলেঁ না পালাএ॥

রাধাবিরহে (বড়ায়ি-কথিত),

লুণীসম দেহ তার রসের সাগরে।
সংপুন্ন যৌবনে রতি ভুঞ্জ দামোদরে॥

দানখণ্ডে (রাধা-কথিত),

লুণীর পুতলী যেহ্ন বড়ায়ি ল লো
রৌদে দাণ্ডাইলেঁ মিলাওঁ।
কেমনে কাহ্নের বোল পালিবোঁ
মোযে পরাণে ডরাওঁ॥

তাম্বুল খণ্ডে (রাধা-কথিত)

নবলী দল কোঁমল আহ্মার দেহে।
এবেঁ নাহিঁ সহে পরপুরুষের নেহে॥

রাধাবিরহে (রাধা-কথিত),

যে ডালে করো মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিঞাঁ পড়ে
নাহি হেন ডাল যাত করো বিসবাসে ।।

দানখণ্ডে (রাধা-কথিত),

সুখ ভুঞ্জিতে মো কোহো না পাইলোঁ
দুখেঁ গেল সব কালে ।।

এই জাতীয় প্রথা-প্রতিষ্ঠ (traditional) উপমা-প্রয়োগ ছাড়াও প্রবাদ-প্রবচনগত উপমা তথাকথিত স্বতন্ত্র ভাবস্তরে পাওয়া যায়। যেমন, বংশীখণ্ডে (রাধা-কথিত),

ভাদর মাসের তিথি চতুথীর রাতী।
জল মাঝেঁ দেখিলোঁ মো কি নিশাপতী ।।
পূর্ন কলসে কিবা ভরিলোঁ হাথে।
....
জলের আখর কিবা ভূমিত লেখিলোঁ ।।
....
তেকারণে বাঁশী চুরী দোষসি জগন্নাথে ।।

বাণখণ্ডে (কৃষ্ণ-কথিত),

হরিতালী চন্দ্র দেখিলোঁ ভাদ্রমাসে।
হাত ভরিলোঁ কিবা পূরিল কলসে ।।
ভূমিত আখর কিবা লিখিলোঁ জলে।
মিছা দোষে বন্ধন আহ্মার তার ফলে ।।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে গোড়ার দিকের খণ্ডগুলি এবং শেষ দুটি খণ্ডের মধ্যে উপমাগত অনেক মিল পাওয়া যায়। এ সাধর্ম্য কেবল উপমেয়-উপমানের সমজাতীয়তায় সীমাবদ্ধ নয়, ব্যবহারবিধিগত একটি ঐক্য প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই বেশ স্পষ্ট। দানখণ্ডে অথবা তাম্বুলখণ্ডে যে উপমা যেমন ভঙ্গিতে ব্যবহৃত হয়েছিল, বংশীখণ্ড অথবা রাধাবিরহে সেই উপমাই প্রায় অনুরূপ (অথবা বিপরীত) ভঙ্গিতে নিযুক্ত। এককথায় দানখণ্ড অথবা বাণখণ্ডের কবিই যেন বংশীখণ্ড অথবা রাধাবিরহের প্রণেতা। একথা অবশ্য সত্য যে, বংশী ও বিরহ খণ্ডেই কবির উপমা-ব্যবহার এবং ভাবার্তি নিছক দেহতাপকে অনেক পরিমাণে

ঊর্ধ্বায়িত (sublimate) করতে পেরেছে। তথাপি ঘনিষ্ঠ অধ্যয়নে এ সত্যও অপ্রমাণিত হবে না যে, জীবনের লৌকিক পরিচয় এবং মনোভাবগুলোও এ দুটি খণ্ডে অনায়াসে লভ্য। বংশীখণ্ড থেকে কাব্যের শেষ পর্যন্ত অংশটুক অভাবিত (unexpected) ভাবস্তরের বলে মনে হয় তখনই, যখন অধ্যয়নের যত্ন কিছু পরিমাণে অসতর্ক। আসলে, রাধাহৃদয় যে নৌকাখণ্ডের শেষাংশ থেকেই এক অলক্ষ্য পথে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে সুরু করেছে, বৃন্দাবনখণ্ড, যমুনাখণ্ড বাণখণ্ড ইত্যাদিতেও রাধাচিত্তে দেহোত্তীর্ণ প্রণয় বেদনার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, ঈষৎ মনোযোগেই তা ধরা পড়ে। এই অন্তর্লীন মনটিই কৃষ্ণের সহসা অন্তর্ধানে দ্রুত অবারিত হয়ে গেল। কাম্যধন যতক্ষণ করায়ত্ত, ততক্ষণ তার প্রতি মমত্বের বিহ্বলতা থাকে না, বরং একটা মৃদু অনবধানতাই তখন প্রত্যক্ষ। কিন্তু দৈবাৎ যদি সেই কাম্যবস্তু স্খলিত হয়, তখনই অনুশোচনার উচ্চকণ্ঠ শোনা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাহৃদয়েও সেই জাতীয় ভাবান্তর স্পষ্ট। আর এ অংশের ভাবে যে অলৌকিকতা, তা প্রধানত রাধার এবং বড়ায়ির (অংশত) উক্তিতে প্রকাশিত। এবং উক্তিগুলি যখন অলঙ্কারে গ্রথিত হয়েছে, তখনই শ্রোতা আর্ত রাধাহৃদয়ের ছবিটিকে সম্যক পেয়েছেন। এ স্থানে প্রযুক্ত অলঙ্কারের উপমেয়-পক্ষ যেহেতু পার্থিব বস্তু নয়, কেবল হৃদয়ভাববস্তু, তখন এর প্রয়োগফল যে মর্মময় হবেই, তা বলা বাহুল্য। যেহেতু রস-উপভোগের পক্ষে বিরহের মত এমন স্বাদু ব্যাপার আর নেই, সেজন্যেই এ অংশটিকে ভাবে স্বতন্ত্র মনে করা স্বাভাবিক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রথাস্মৃত উপমা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংস্কৃত ঐতিহ্যের শাসন অতিপ্রধান হলেও একমাত্র নয়। কবি বড়ু চণ্ডীদাস কোথাও কোথাও আত্মশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ঐতিহ্যের মুক্তি ঘটেনি, তবু অনুকরণের শরণাগতি কবিকে সর্বত্র আজ্ঞাবহ করে রাখেনি।

ডমরু সদৃশ মধ্য নাভি গম্ভীবে ।।১

মধ্যেন সা বেদিবিলগ্নমধ্যা বলিত্রয়ং চারু বভার বালা ।২

কবি বর্ণনা করলেন, রাধার মধ্যদেশ ডমরু বাদ্যের মত ক্ষীণ। কালিদাস উমারূপ বর্ণনায় বলেছেন, যজ্ঞবেদীর মত নায়িকার মধ্যদেশ ক্ষীণ। মধ্যদেশের কৃশতা-কল্পনায় কালিদাসের উপমান যজ্ঞবেদী, বড়ু চণ্ডীদাসের উপমান ডমরু বাদ্য। ডমরু এবং যজ্ঞবেদী, এ দুটি উপমানের আকারেই নারী-শরীরের মধ্যদেশের কৃশতা সূচিত। রূপলোক রচনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার কবির মনে কালিদাসীয় চিত্র-স্মৃতি আছে, কিন্তু সমকালীন জীবনের ছায়াছবি দিয়েই সে রূপটি গড়া। কালিদাসের ছত্র এখানে রূপের আদর্শ, কিন্তু রূপের আদেশ স্বতন্ত্র। কালিদাসের চিন্তায় তপোবন একটি বড় সত্য। পরবর্তী সর্গে অপর্ণা উমার তপস্যা-মূর্তি সমগ্র কাব্যের একটি মূল্যবান ঘটনাবস্তুও বটে। তাই, প্রথম সর্গের উমারূপ-বর্ণনায় যজ্ঞবেদীর উপমান একদিকে যেমন উমা-ভাগ্যের পূর্বাভাস, অন্যদিকে তেমনি কালিদাসীয় মানসের কল্পনানুকূল। বড়ু চণ্ডীদাস গ্রামের কবি, তাঁর নায়িকা গ্রামেরই মেয়ে, কবির নিজস্ব ভাবজগৎ এবং রূপলোক এই গ্রামলৌকিক আচার আচরণে গড়া। রাধার কৃশ মধ্যদেশ বর্ণনা করতে গ্রামের বাদ্যযন্ত্র ডমরুর উপমান কবিমনে অনায়াসেই এসেছে।

গীতগোবিন্দের প্রভাব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রবল। কৃষ্ণের কামমত্ততা প্রকাশ করতে বড়ু চণ্ডীদাস, গীতগোবিন্দে কেশবের বৈভব-গুণান্বিত বিশেষণ-গুলির অতি-সংহত বক্তব্যকে অলঙ্কার গঠনে বিশদ করেছেন। অনুসরণের অবিকল সাদৃশ্য হয়ত নেই, কিন্তু সঙ্কেতিত অর্থ হুবহু এক।

---

১ তাম্বুলখণ্ড

২ কুমারসম্ভব

যে বোল বুলিলোঁ মনে না ধরিলেঁ
উলটিআঁ দিলেঁ পিঠী।
সুচক রুচক কুচের বাটুল
তাতা পড়ি গেল দিঠী ॥১

সাকূত-স্মিতমাকুলাকুল-গলদ্ধম্মিল্লমুল্লাসিত
ভ্রূবল্লীকমলীক-দর্শিতভুজামূলার্দ্ধ দৃষ্টস্তনম্।২

গীতগোবিন্দের বর্ণনায় কৃষ্ণের রাধানুরাগ বর্ণিত। অংশটি অলঙ্কারশূন্য, কৃষ্ণের গুণজ্ঞাপক অভিধাবাক্য মাত্র। কিন্তু এই ছবিটিকেই বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণের কামার্ত অন্তরের রূপ-প্রকাশক উপমারূপে ব্যবহার করেছেন। গীতগোবিন্দের ছবি এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অলঙ্কার-কথা প্রকাশভঙ্গি এবং নিয়োগধর্মে এক নয়, কিন্তু আদর্শের প্রভাব তির্যক্ হয়ে বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-মনোভাবকে অনুরূপ ভাবাষঙ্গে স্থাপন করেছে।

জন্ম খণ্ডে কবি নবজাতা রাধার রূপবর্ণনা করতে গিয়ে তাকে এক আশ্চর্য 'স্বর্ণপুত্তলী' বলে বিস্মিত হয়েছেন। কুমারসম্ভবে নবজাতা উমার রূপ-লাবণ্য বর্ণনা করতে কালিদাস যে উপমান সংগ্রহ করেছেন, সৌন্দর্য-বস্তু হিসেবে তা হয়ত ভিন্ন, কিন্তু রূপলোক ও ভাব-সঙ্কেত সৃষ্টিতে তা নির্ভুলভাবে এক।

অদভুত কণক পুতলী ॥
দিনে দিনে বাঢ়ে তনুলীলা।
পুবিল যেহেন চন্দ্রকলা ॥

বিদূরভূমির্ণবমেঘশব্দাদুদ্ভিন্নয়া রত্নশলাকয়েব ॥
দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্ জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি ॥৩

পরোক্ষ হলেও প্রভাব যে নিঃসন্দেহ, তার প্রমাণ ক্ষেত্রান্তরেও সুলভ। কালিদাস একাধিকবার কমলের সঙ্গে উমারূপের তুলনা করতে গিয়ে একস্থানে বলেছেন যে, উমা-সৌন্দর্যের লাবণ্য-কমল কেবল পেলব এবং ভঙ্গুর দলে রচিত

---

১ দানখণ্ড
২ গীতগোবিন্দ
৩ কুমারসম্ভব

নয়, স্বর্ণের কঠিনতা এবং ঔজ্জ্বল্যে সে রূপ কনককমল। লাবণ্যময়ী উমার তপস্যাকালীন কঠোরতা দর্শনে কালিদাসের এ উক্তি মনস্তত্ত্ব-সম্মত। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনকার কবি রাধার দেহ-বর্ণনায় কনককমলের উপমান একাধিকবার ব্যবহার করেছেন, কিন্তু অনতিসম্পন্ন কবি-সামর্থ্যে উক্ত প্রয়োগ মনস্তত্ত্বে মানবিক হয়ে ওঠেনি। তথাপি প্রভাব যে সুনিশ্চিত, তা বলা বাহুল্য।

কণক পদ্ম কোবক সম দুঈ তনে।[১]

বাহুযুগ তোব কণক মৃণাল[২]

ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চন-পদ্ম-নির্মিতং মৃদু প্রকৃত্যা চ স সাবমেব চ।[৩]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ডে রাধারূপ-বর্ণনায় কবি রাধার দশন-শ্রেণীকে সিন্দূররঞ্জিত গজমুক্তার সঙ্গে উপমিত করেছেন। কুমারসম্ভবে দুর্গম হিমালয় বর্ণনায় কালিদাস কিরাতের শিকাব-কৌশলের একটি চিত্র দিয়েছেন। অতিখ্যাত কালিদাসের এ বর্ণনাটি কবি বড়ু চণ্ডীদাসকে রাধাদশনের উপমান-চয়নে প্রলুব্ধ করেছিল বলেই বোধ হয়। কালিদাসের উপমা-ব্যবহাব নয়, চিত্ররচনার ভঙ্গি থেকে বড়ু চণ্ডীদাস উপমান-চয়ন করেছেন, তাই এস্থানে সাধর্ম্য ঈষৎ দূরবর্তী।

মাণিক.জিনিআঁ তোব দশনের যুতী।
সিন্দুরে লোটাইল যেহ্ন গজমুতী ॥[৪]

পদং তুষার-স্রুতি-ধৌতরক্তং যস্মিন্নদৃষ্ট্বাপি যতদ্বিপানাম্।
বিদন্তি মার্গং নখরন্ধ্রমুক্তৈর্মুক্তাফলৈঃ কেসরিণাং কিরাতাঃ ॥[৫]

প্রথম ক্ষেত্রে গজমুক্তা সিন্দূরচর্চিত, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রক্তরঞ্জিত। প্রথম ক্ষেত্রে যা উপমান-পক্ষ, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা-ই অভিধাগত চিত্র-কথা মাত্র।

---

১ তাম্বুলখণ্ড
২ দানখণ্ড
৩ কুমারসম্ভব
৪ দানখণ্ড
৫ কুমারসম্ভব

এ তো গেল 'অনুরাগাত্মক' অলঙ্কারের কথা। এ আখ্যায় উপমেয় এবং উপমান কেবলমাত্র তাদের বহিরঙ্গ সাধর্ম্য জ্ঞাপন করেই নিরস্ত হয় না। কবি-মনের আগ্রহ-আসক্তিগত মনোভাব উপমেয়ে আরোপিত হয়ে তদনুযায়ী উপমান চয়নের দ্বারা যে সামগ্রিক অভিপ্রায় প্রকাশ পায়, তারই বিচারে উপমার ব্যবহার 'অনুরাগাত্মক' অথবা 'বিরাগাত্মক'। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে দুটি উপমা সন্নিবেশিত হল। প্রথমটি বিরাগাত্মক, দ্বিতীয়টি অনুরাগাত্মক।

তিরীর যৌবন বাতির সপন
যেহ্ন নদীকের বানে।
আপন পুনে উত্তম জনে
হাথে তুলিআঁ দেহ দানে।।১

যাহার যৌবন নব উপভোগে
সেহি সে নাগরী ভালী।
ভ্রমর যদ্দন পাইলেঁ শোভএ
যেহ্ন বিকশিত মাল্লী।।২

প্রথম দৃষ্টান্তে যৌবন (উপমেয়) ক্ষণস্থায়ী এবং বিনশ্বর। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে যৌবন (উপমেয়) মল্লিকা কুসুমের (মাল্লী) মত মনোহারী। প্রথম দৃষ্টান্তে উপমান চয়ন (রাতির সপন) পুলক-বাধিত, অলীক মায়াকৈবল্য মাত্র। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে উপমান-চয়ন (মাল্লী) পুলক-চকিত, উপভোগ-ধন্য। কবির বিশিষ্ট দৃষ্টভঙ্গিতেই রূপ কোথাও বন্ধন-শাসনে জীবনের নৈরাশ্যকে দেখায়, কোথায় বা উপভোগ-তন্ময়তায় জীবনের আশা সূচনা করে।

আচার্য শঙ্কর এই জগৎ ও জীবনকে 'মায়ামাত্র বিলাসো হি' বলে বোধ করেছিলেন। পজ্ঝটিকা ছন্দে ষোলটি শ্লোকে বিরচিত 'মোহমুদ্গর' শিষ্যোপদেশ গ্রন্থ। শঙ্করাচার্যের এই দর্শনবাদের প্রভাব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কাকতালীয় পদ্ধতিতে সংক্রামিত। বলা বাহুল্য, মোহনাশের উদ্দেশ্যে রচিত শঙ্কর-শ্লোক-গুলিতে রূপের কথা প্রায় অনুচ্চারিত, অলঙ্কার-ব্যবহার দু একটি ক্ষেত্রে যা পাওয়া যায়, তা প্রায়শই রূপরিক্ত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'মোহমুদ্গরে'র অলঙ্কারগত প্রভাব থাকলেও আসল প্রভাব ভাবগত ক্ষেত্রে। অলঙ্কারগত প্রভাব-ক্ষেত্রটি প্রথমে উল্লেখ করি,

১ দানখণ্ড
২ দানখণ্ড

তোমার নেহ সকল কমলিনী-দল-জল
চঞ্চল দুঈহো পড়িহাসে ।১

নলিনী-দলগত জলমতিতরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্ ।।২

উপরের দৃষ্টান্তে অলঙ্কার-প্রয়োগ অবিকল এক। 'মোহমুদ্গরে' জীবনের বৈরাগ্য-শিক্ষার কথা, তাই নলিনী-দলগত জলবিন্দুর মত ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপমা এখানে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মানিনী নায়িকার কপট বৈরাগ্য, শুধু প্রসঙ্গটি (Context) স্বতন্ত্র। তাই কৃষ্ণের প্রণয়ের গভীরতা সম্বন্ধে নায়িকার সংশয়।

কেবল প্রসঙ্গগত স্বাতন্ত্র্যই নয়, প্রসঙ্গগত বৈপরীত্যও এই প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।

আহ্মার বচনে রাধা না করিহ হেলা।
যৌবন সাগবে তোব কাহ্নাঞিঁ ভেলা ।। ৩

ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণব-তবণে নৌকা ।।৪

মোহমুদ্গরের সদ্যোক্ত শ্লোকটির প্রভাব আছে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পট-ভূমিকায় বিপরীত প্রসঙ্গে স্থাপিত হয়ে কবিবোধের আসক্তি প্রকাশ করছে।

শঙ্কর-কৃত মোহমুদ্গরের মূলভাবটি হল,

তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে
পরিহর চিন্তাং নশ্বর-বিত্তে ।।
....
সর্ব-পরিগ্রহ-ভোগ-ত্যাগঃ
কস্য সুখং ন করোতি বিবাগঃ ।।৫

এই মূলভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত কতকগুলি কবিতাছত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের উক্তিতে পাই, যেখানে অবাধ্য নায়িকাকে বশীভূত করার কালে জীবন ও

১ বৃন্দাবন খণ্ড।
২ মোহমুদ্গার।
৩ যমুনাখণ্ড।
৪ মোহমুদ্গার।
৫ ঐ

যৌবনের ক্ষণস্থিতিমূলক কতকগুলি উপমান কৃষ্ণ চয়ন করেছে। কাব্যভাবের চূড়ান্ত অভিপ্রায়টি ভোগবাদী, রাধাকে বশীভূত করার কৌশল হিসেবে এ জাতীয় ছদ্ম বৈরাগ্যের উপমা ব্যবহৃত।

তোহ্মার যৌবন রাধা কৃপিণের ধন।
পোটলি বাঁধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন ॥[১]

অথবা

তোহ্মাব যৌবন রাধে পাণিব ফোটা।
চিবকাল না রহিবে থাকি যাইবে খোঁটা ॥[২]

অথবা

নানা তরুয়ব যে ফল ফলে
আপনে তাক না ভখে
সংসাব আসাব পব উপকাব
করিলে কিরীত থাকে ॥[৩]

কালিদাসের নামে প্রচলিত 'শৃঙ্গারতিলকম্' শ্লোক-সঙ্কলনে উক্ত ভাবাধিবাসিত একটি ছত্র পাওয়া যায়।

এতৎ পয়োধরযুগং পতিতং নিরীক্ষ্য খেদং বৃথা বহসি কিং কমলায়তাক্ষি।
যস্মাৎ সহস্রকিরণো জলতাপকারী অত্যুন্নতঃ প্রপততীতি কিমত্র চিত্রম্ ॥

আর একটি উপমা। প্রভাব-সাদৃশ্য নেই, কিন্তু উপমানের ত্বরিত রূপ-সঙ্কেতের শক্তিতে নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাদুটির মধ্যে একটা মিল পাওয়া যায়।

শেত চামব সম কেশে।[৪]

....শ্লথলম্বিনীর্জটাঃ কপোলদেশে কমলাগ্রপিঙ্গলাঃ ॥[৫]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়ায়ি দূতীর রূপবর্ণনা। কুমারসম্ভবে তপস্বিনী উমার বর্ণনা। উপমান উভয়তই উপমেয়ের অদূরবর্তী ভাবস্তর থেকে গৃহীত, উভয়ক্ষেত্রেই উপমানের তাৎক্ষণিক সঙ্কেত-শক্তি চোখে পড়ে।

---

১ দানখণ্ড।
২ ঐ
৩ ঐ
৪ জন্মখণ্ড।
৫ কুমারসম্ভব।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে লোক-জীবনের উপমা

এ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপমা আলোচনায় লক্ষ্য করা গেল, উচ্চতর ভাবভূমি থেকে গৃহীত হয়ে উপমান উপমেয়ের তীব্র নৈকট্য-জ্ঞাপনে কিছুটা শিথিল। সৌন্দর্য-উপভোগ আছে, আনন্দ-বিস্ময়ও অনুপস্থিত নয়, কিন্তু সুশৃঙ্খল বিচার-ধারায় মননক্রিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত তুষ্ট সম্মতিলাভ না করে, ততক্ষণ উপমার রূপ পূর্ণবিকশিত হতে পারে না। এর মূল কারণ, উপমেয়ের ভাবস্তর থেকে উপমানের ভাবস্তরের সুদূরতা। এ জাতীয় একটি উপমা,

হংসে যেহ্ন সরোবর বিগুতিল বডাযি ল
তেহ্ন রাধা বিগুতিলে কাহ্নে ॥১

রাধা-রতি-সম্ভোগের সংবাদ এটি। উপমেয় রাধাকৃষ্ণ, উপমান সরোবর-হংস : বলা হয়েছে, রাধা সরোবর-রূপা। অথচ প্রত্যক্ষত সরোবরের আকার আয়তনের সঙ্গে রাধার আকার আয়তনের কোন মিলই নেই। বোঝা গেল, রূপগত মিল এখানে বক্তব্য নয়। সুতরাং সূক্ষ্ম মননক্রিয়ার দ্বারা এটির গুণ-সাধর্ম্য অনুসরণ করতে হবে। সরোবরের তরল লাবণ্যই রাধার নারী-দেহের উপমান। কৃষ্ণ-রূপ হংসের লীলাস্থল এই সরোবর। এমন সূক্ষ্ম ভাবনাকে ভিত্তি করেই উপমায় রাধার রতি-সম্ভোগ-কথা সঙ্কেতিত। আর এ জাতীয় উপমার ব্যাখ্যান বিদগ্ধ শ্রোতার শিল্পবোধ যতটা তৃপ্তি পায়, নিকট-সুলভ বস্তু পরিচয়ে জীবন-বোধ এবং বস্তু-জ্ঞান ততটা প্রবর্তিত হয় না। অতি নিকটের উপমেয় সুদূরবর্তী উপমানের আকর্ষণে আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত বস্তুলোকের সীমানা পার হয়ে যায়।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে এ ধরনের প্রথা-বদ্ধ উপমা অজস্র হলেও প্রধানত তা অনুকরণের সূত্রে আগত। কবির নিজস্ব উদ্ভাবন-দক্ষতা এ জাতীয় অলঙ্কার ব্যবহারে প্রায় দুর্লভ। এর কারণ স্পষ্ট। কবি বড়ু চণ্ডীদাস গ্রামের কবি, তাঁর শিল্পবোধ এবং কবিধর্ম গ্রাম সংস্কৃতির প্রভাবে গড়া। উপমার দৃষ্টিকোণে মননমূলক কাব্যরুচি আয়ত্ত করার যে প্রতিবেশ অথবা চিত্ত-প্রস্তুতি, সে ভাগ্যে তিনি বঞ্চিত। কবির ব্যক্তিগত জ্ঞানস্পৃহা ঐতিহ্যের প্রতি তাঁকে প্রলুব্ধ করেছিল, কিন্তু পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় এ উৎসাহের ইন্ধন ছিল না। তাই অনুকরণ অথবা অনুবাদ সূত্রে পাওয়া

---

১ দানখণ্ড

অসংখ্য ঐতিহ্যবাহী উপমায় কবিমনের আপন আনন্দের দোলা লাগেনি। দূরের ভাবস্তরে অবস্থিত উপমান নিয়ে অলোকসামান্য অলঙ্কার সৃষ্টি করা তাই তাঁর পক্ষে সহজ হয়নি। নারীরূপের সঙ্গে আকাশের চাঁদের তুলনা অতি পরিচিত। কিন্তু এ উপমাও বড়ু চণ্ডীদাসের মনে অনায়াসে স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করেনি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ভোগলোলুপ কৃষ্ণকে প্রবোধদান-রতা রাধার উক্তি,

পরার নারী আকাশের চান্দ
তাহাক কেমনে পাইবেঁ।।১

এতে জ্ঞানহীন শিশুর আকাশের চাঁদ চাওয়ার কথা কবির মনে হয়েছে। পরনারীর অপ্রাপনীয়তার উপমান 'আকাশের চান্দ', সাধারণ নারীর নয়। দূরাবস্থিত চাঁদের উপমান কবির নিজস্ব ভাবনাক্ষেত্রে নেই। কবি নিজে যে সব উপমান চয়ন করেছেন, তা তাঁর পরিচিত জীবন-ভূমির এলাকা থেকেই। সম্প্রতি আমাদের আলোচনা-ক্ষেত্র এটি। উপমেয় এবং উপমান একই কামনাস্তর থেকে গৃহীত হয়ে রূপের যেমন একটা তৎক্ষণ-সুলভ স্পষ্টতা আনে, তেমনি অন্যদিকে একটা ত্বরান্বিত প্রয়োজন-সিদ্ধিও করে থাকে। রূপ-কে অপার্থিব করা নয়, পরন্তু অতিপার্থিব স্পষ্টতা এবং স্বচ্ছতা দেওয়াই বড়ু চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব।

শেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে।।
ভ্রূহি চুণ রেখ যেহ্ন দেখি।
কোটর বাঁটুল দুই আখি।।
নাহা পুটনাসা দণ্ডহীনে।
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে।।
বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিণী।।
কাঠী সম বাহু যুগলে।
নাভিমূলে দুঈ কুচ লুলে।।
কুটিল গমন ঘন কাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।।২

---

১ ভারখণ্ড
২ জন্মখণ্ড

কবি-বর্ণিত বৃদ্ধা বড়ায়ি দূতীর রূপ। রূপ অর্থাৎ রিক্ত রূপ। উপমা ব্যবহার প্রতিছত্রে নেই। সাধারণ অভিধা-বাক্যের মধ্যে মধ্যে রূপ-প্রকাশক উপমা। উপমানগুলিতে পরিহাস-কটাক্ষ স্পষ্ট। 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' নয়, সাদা চামরের মত। ভ্রূদুটি চূণের রেখার মত সাদা, চোখের কোটর বাঁটুলের মত শিকার-সন্ধানী; তাও আবার 'ভ্রূহি কামধনু নয়ন বাণে'র সগোত্র নয়। ওষ্ঠাধরে বিম্ব-প্রবালের দ্যুতি নেই, উটের আকৃতির মত বেমানান উচ্চতায় কুৎসিত। 'শিরীষ সৌকুমার্যৌ বাহূ' নয়, কাঠির মত শীর্ণ এবং শুষ্ক। কাশরোগগ্রস্ত গমন-কুটিল কপট-স্বভাব দন্তুর এই কুট্টনী-রূপ যথোপযুক্ত উপমানের দ্বারা প্রকাশিত। 'নাভিমূলে দুঈ কুচ লুলে',—এ বর্ণনায় বড়ু চণ্ডী-দাসের নিপুণ লক্ষ্যশক্তির পরিচয়, বৃদ্ধার বার্দ্ধক্য এবং বিনগ্নতা পরিস্ফুট। এই নারীই যে সমগ্র ঘটনা জুড়ে একটি অসামাজিক স্বেচ্ছাচারী প্রণয-ব্যাপারে পৃষ্ঠ-পোষকতা করবে, তার আভাস উক্ত রূপবর্ণনাতেই পাওয়া যায়। ওষ্ঠাধরের রূপগত উপমান 'উট' নয়, বাহুযুগলের রূপগত উপমান 'কাঠি' নয়। উটের কুশ্রীতা এবং কাঠির রসহীন শীর্ণতা এখানে উদ্দিষ্ট। ভ্রূযুগলের চূণ রেখা এবং কেশের শ্বেত চামর রূপ তার বার্দ্ধক্যের সূচক। রূপাঙ্কনে এ বার্দ্ধক্য করুণ অথবা শ্রদ্ধান্বিত নয়, পরন্তু পরিহাসময়। শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গারে বার্দ্ধক্যের রূপ-বর্ণনা আছে,

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দন্তবিহীনং যাতং তুণ্ডম্।
করধৃত কম্পিত শোভিত দণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্॥

একই কামনাস্তর থেকে গৃহীত হয়ে উপমেয়-উপমানের অতিসন্নিহিত অবস্থা রূপ-কে এক লহমায় চাক্ষুষ করায়। আখ্যানের ত্বরিত নাটকীয় গতির পথে ঘটনাকে আড়াল করে না, বরং পরবর্তী সম্ভাবনাগুলিকে পূর্বাভাসিত করে রাখে।

কংসবধের নিমিত্ত কৃষ্ণের জন্ম-সম্ভাবনায় দেবর্ষি নারদের চিত্র কবি এঁকেছেন। নারদের প্রতিষ্ঠিত দেবসম্ভ্রম এবং সাধন-মাহাত্ম্য এক নিমেষে অপসারিত করে কবি লোকায়ত ভাবনায় তাকে মণ্ডিত করলেন। স্বর্গের অধিবাসী নারদমুনির রূপ উপমা দিয়ে গড়তে হলে এই মলিন মর্ত্য-ভূমি থেকে উপমান-চয়ন অনুপযুক্ত হয়। বর্ণনীয়-বস্তু থেকে দূরবর্তী ভাব-ভূমির উপমান-চয়ন করতে হয়। কিন্তু সে প্রকাশরীতি কবির নিজস্ব ভাব-

জগতের বহির্ভূত। বড়ু চণ্ডীদাসের নারদ গ্রামের সাধারণ জীবনাচার থেকে গৃহীত উপমানের আলোয় সামান্য, কিন্তু অত্যন্ত কাছের মানুষ।

নাচএ নারদ ভেকের গতী
বিকৃত বদন উমত মতী ॥
....
....
মেলে ঘন ঘন জীহেব আগ।
রাঅ কাঢে যেন বোকা ছাগ ॥[১]

ভেকের মত নৃত্যভঙ্গি এবং বোকা ছাগের মত হর্ষধ্বনি যার, কবির লৌকিক চেতনা তার দেহ-মন থেকে সকল প্রকার দেবাভরণ এক মুহূর্তে অপসারিত করেছে। দৈব-সংস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের প্রতি এমন দ্বিধাহীন অস্বীকার কেবল লোক-সংস্কারের দ্বারা মণ্ডিত হলেই সম্ভব, বড়ু চণ্ডীদাসে সেটিই লক্ষনীয়। বাঙলাদেশের লোক-কাব্যে, পাঁচালিতে, গ্রাম্য বোধ-বিশ্বাসের মধ্যে ঐতিহ্যানুক্ত নারদের যে নবরূপ-পরিচয়, বড়ু চণ্ডীদাসের কবিতা-ছত্রে আমরা তাকেই পাই। কুমারসম্ভবে ঋষিগণ সমভিব্যাহারে মহর্ষির আকাশ-যাত্রার ছবি,

গগনাদবতীর্ণা সা যথাবৃদ্ধপুরঃসরা।
তোযান্তর্ভাস্করালীব রেজে মুনিপরম্পরা ॥

তপোধন এই মহর্ষি-রূপের স্থান শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কোথাও নেই।

রাধার যৌবন-প্রকাশক কতকগুলি উপমা এবার পরীক্ষা করা যাক

দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে।
আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে ॥[২]

নহলী যৌবন কাঁচ শিবিফল
তাহাক কেহ নাহি খাএ ॥[৩]

১ জন্মখণ্ড
২ দানখণ্ড
৩ দানখণ্ড

কথাঁ না দেখিল বাঁওন হাথে
তাল তরুফল পাএ।১

ডালিম সদৃশ তন তোহ্মারে।
তাহাতে মজিল মন আহ্মাবে।।২

মাহাকাল ফল আহ্মার তনে।
দেখিতেঁ ভাল ভখিতেঁ মরণে।।৩

তোর রূপ দেখি সব জন মোহে
মঞ্জুরে সুখান কাঠে।।৪

উপমাগুলির সর্বত্রই গ্রাম্য প্রতিবেশের মুদ্রণ। কেবলমাত্র উপমাগুলিই পল্লী-ভাবজাত নয়, উপমার প্রয়োগ গ্রামের অমার্জিত সরলতায় এমনই ঋজু, অকপট আত্মপ্রকাশে ঈষৎ কঠিন, এমনভাবেই তা নগরের সুশিক্ষিত চতুরালিমুক্ত যে. এক লহমায় লোক-জীবনের হৃদয়-বিশুদ্ধির স্পর্শ পাওয়া যায়।

তোহ্মার যৌবন বাধে কৃপিণের ধন।
পোটসি বাঁন্ধিআঁ রাখ নহলী যৌবন।।৫

হেনস্ যৌবন বাধা সব আলপাউ।
যৌবন গড়িলেঁ তোর তনু হইবে লাউ।।৬

তোহ্মার যৌবন বাধে পাণির ফোটা।
চিরকাল না রহিবে থাকি যাইবে খোঁটা।।৭

তিরীর যৌবন রাতির সপন
যেহ্ন নদীকের বাণে।৮

---

১ ভারখণ্ড
২ যমুনাখণ্ড
৩ যমুনাখণ্ড
৪ দানখণ্ড
৫ দানখণ্ড
৬ দানখণ্ড
৭ দানখণ্ড
৮ দানখণ্ড

উপমাগুলির প্রতিক্ষেত্রে অলঙ্কার-সৃষ্টির তাগিদ জোরালো নয়, সংলাপের সহচর হয়ে যেন এ সমস্ত উপমা ব্যবহৃত। কথা বলার প্রলোভন এখানে প্রধান, উপমাগুলি যেন সেই বলা কথাকেই আরও শক্তিমান করার কাজে নিযুক্ত।

উপমা সর্বোচ্চকণ্ঠ নয় বলেই কবির ঋজু অভিধাবাক্য মুহূর্তে শ্রোতৃচিত্তে বক্তব্যের বোধ ঘটিয়ে দেয়। আর সংলাপের দ্বারা উপমা যখন আচ্ছন্ন, তখন তার রূপ-গুণ-বর্ণনাশক্তি বারিত থাকে। এখানকার উপমাগুলি ভাবধর্মী নয়, বস্তুধর্মী। ভাবকে তা বিশদ করার কাজে নিযুক্ত নয়, বস্তু এবং বিষয়কে গোচর করাতেই তার সার্থকতা। লোকজীবন-নির্ভর উপমায় প্রায়শই এ জাতীয় নাটক-লক্ষণ দেখা যাবে, কাব্যের উপমায় যেখানে অলঙ্করণের উৎসাহ বিষয়কে কিছু পরিমাণে গৌণ করে।

এ বোল বুলিতেঁ তোর মনে বড় সুখ।
পরধর পইসে যেহ্ন চোর পাটাবুক ॥১

পোএর মুখে পরবত টলে।
গুরুপাপে বেঢ়িলের আলপ কালে ॥২

আউ থাকিতে কাহ্নাঞিঁ মরণ ইছসি।
সাপের মুখেতে কেহ্নে আঙ্গল দেসী ॥৩

চূণ বিহনে যেহ্ন তাম্বূল তিতা।
আলপ বএসে তেহ্ন বিরহের চিন্তা ॥৪

তাম্বূল দিআঁ মোরে কি বোলসী।
খুদ বড়সিএঁ রুহী বান্ধসী ॥৫

এথাঁসি সুন্দরী রাধা কর কাঠদাপ।
তথাঁ গেলেঁ হইবি যেহ্ন বাদিআর সাপ ॥৬

১ দানখণ্ড
২ দানখণ্ড
৩ ভারখণ্ড
৪ ভারখণ্ড
৫ যমুনাখণ্ড
৬ দানখণ্ড

দধি দুধ খাআঁ মোর ভাঁগিলেক ভাণ্ডে।
খণ্ড নঠ করে যেহ্ন উদাওঁ সাণ্ডে॥[১]

উপমাগুলি এক একটি মনোভাবের পরিচায়ক। কামার্ত কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রবোধমূলক ভর্ৎসনা। প্রতিক্ষেত্রেই দুটি চরণের স্তবকে ভাব বিন্যস্ত। এর মধ্যে একটি পঙক্তি কুশীলব-কথা, অন্যটি অনুগত অলঙ্কার-বাক্য। এখানে উপমায় বক্তার অভিপ্রেত-কথা সঙ্কেতিত নয়, কেবল তারই সমর্থক হিসেবে প্রান্তদেশে স্থাপিত। কবিকথার দ্বারা রচিত অলঙ্কারগুলি তাই ভূষণ-চকিত (decorative) নয়, সংলাপ-শাণিত (dramatic)। কাব্যোপমা (poetic imagery) না হয়ে এগুলি নাট্যোপমা (dramatic imagery)।

কাহ্নাঞিঁ বিহনে মোর সকল সংসার ভৈল
দশদিক লাগে মোর শূন।
আঞ্চলের সোনা মোর কে না হরি লআঁ গেল
কিবা তার কৈলোঁ অগুণ॥[২]

নান্দের নন্দন কাহ্ন আড়বাঁশী বাএ
যেন রএ পাঞ্জরের শুআ।[৩]

একেঁ দহদহ ঘসির আগুণ
আর কে না জালে ফুকে।
ভিড়ি আলিঙ্গন দিতেঁ না পাইলোঁ
এ শাল থাকিল বুকে॥[৪]

কাহ্ন বিণী সব খন পোড়এ পরাণী।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী।[৫]

দুখ সুখ পাঁচ কথা কহিতেঁ না পাইল।
ঝালিআর জল যেন তখনে পালাইল॥[৬]

১ নৌকাখণ্ড
২ বংশীখণ্ড
৩ বংশীখণ্ড
৪ রাধাবিরহ
৫ রাধাবিরহ
৬ রাধাবিরহ

আসল কথা,

কাহ্ন সমে ভালেঁ রস ভুঞ্জিতেঁ না পাইল।

অংশগুলি বিরহিনী রাধার বেদনা-বাণী। উপমেয়কে রূপমণ্ডিত করতে গিয়ে উপমানগুলির জাতি-গোত্র বদল করার প্রয়োজন হয়নি। উপমেয়রই সমস্তরবর্তী বস্তু-ভাব নিয়ে এগুলি নির্মিত। কামার্ত কৃষ্ণকে নিরস্ত করতে রাধার ক্রোধান্ধ উক্তির উপমান, অবাধ্য রাধাকে বশীভূত করতে কৃষ্ণের ছদ্ম-বিরাগমূলক উপমান, রাধার যৌবন-স্বরূপ প্রকাশ করতে আহৃত উপমান এবং রাধার বিরহ-বেদনা প্রকাশ করতে সংগৃহীত উপমান, এ সব ক্ষেত্রেই উপমান-চয়ন সমোচ্চ ভাবস্তরের এবং তা উপমেয়ের ভাবভূমির অতিসন্নিহিত।

বড়ায়ির উক্তি,

বুঝিতেঁ না পারো কাহাঞিঁ তোহ্মার চরিত।
ভাত না খাইলি তবেঁ তাহার কারণে।
শাকর খাইতেঁ তোহ্মে আদরাহ কেহ্নে ॥১

কৃষ্ণের প্রত্যুত্তর,

রাধিকা লাগিআঁ মোক না কর শকতী ॥
কাটিল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত।
তোহ্মার বিদিত মোরে রাধা বুইল যত ॥২

ভাই,

সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ
জুড়িএ আগুণতাপে।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ
জুড়িএ কাহার বাপে ॥৩

---

১ রাধাবিরহ
২ রাধাবিরহ
৩ রাধাবিরহ

বড়ায়ির প্রত্যুত্তর,

ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী।
উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী॥
যে পুণি আধম জন আন্তরে কপট।
তাহার সে নেহা যেহু মাটির ঘট॥১

উপরোক্ত অংশে পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশাত্মক নীতিকথার বিতণ্ডা। কিন্তু প্রয়োগের দিক থেকে উপমাগুলি লোক-জীবনের স্বাদে গন্ধে এতই স্বতন্ত্র, যাতে আর তাদের প্রভাবিত বলে বোধ করা যায় না। 'পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলে জুড়িএ কাহার বাপে', নীতির এ জাতীয় challenge অথবা দর্পিত উক্তি উপমায় অবিনম্র হলেও নাটকীয় ঘটনাকে দ্রুত এগিয়ে দিতে তৎপর। তাছাড়া অলঙ্কারের অনতিসামর্থ্য সৌন্দর্যে তন্ময় হওয়ার বদলে প্রতিপক্ষের মানসিক প্রতিক্রিয়াটুকু ত্বরিতে প্রকাশ করে দিয়েছে।

লোকজীবননির্ভর উপমাগুলির আলোচনা এখানেই শেষ। হয়তো দু এক ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের পরোক্ষ অনুকরণ অথবা তির্যক ছায়া থাকতে পারে। কিন্তু উপমা-ব্যবহারের নিজস্বতা কবির কৃতিত্ব অবশ্যই। উপমা-প্রয়োগ মৌলিক হওয়ার ফলেই একটি নতুন স্বাদুতা এখানে সুলভ। আরও একটি বিষয়, কবির 'বানসালোক' যেখানে আপন ভাবজগতের সীমানায় উদ্দীপ্ত, সেখানে অলঙ্কার-কর্মে যে সব উপমান-চয়ন, তা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বিশিষ্ট খণ্ডগুলির মধ্যে কোন আকস্মিক ভাবস্তর-চ্যুতির অবস্থাকে স্পষ্ট করে না। অর্থাৎ এ জাতীয় উপমা আলোচনার আলোকে বংশী অথবা বিরহ খণ্ডান্তর্গত উপমান, জাতি-গোত্র পরিচয়ে পূর্বগামী দান, নৌকা, যমুনা, ভার ইত্যাদি খণ্ডান্তর্গত উপমানের থেকে পৃথক নয়। আসলে উপমানগুলি বিশেষ বিশেষ খণ্ডের ভাবগঠনের নিজস্ব প্রয়োজনে পৃথকীকৃত, জাতিতে পৃথক নয়। লোকজীবন-সম্ভূত উপমা-প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটিই বড় সত্য, উপমান-পক্ষে কবিমনের ঈষৎ অমনোযোগ এবং উপমেয়-পক্ষে প্রাধান্যদান।

---

১ রাধাবিরহ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনীগত ভাবরূপ

তিনটি জীবনের অংশ-কথা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গল্প। কৃষ্ণ ও রাধা প্রধান পাত্র-পাত্রী, বড়ায়ি অপ্রধান পার্শ্ব চরিত্র। জীবনের রঙ্গমঞ্চ প্রথমে বৃন্দাবন, পরে মথুরা। রাধা কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃন্দাবনেই বিরহ-নির্বাসিত। সমগ্র রচনার গল্প-ভাবে তিনটি স্তর। প্রথমে পরিচয়-সম্ভাষণ, মধ্যে মিলন (পরস্পর-সম্মত না হলেও একপক্ষীয় ছল-বল-কৌশলে অবশ্যই), অন্তে বিচ্ছেদ ও বিরহ-কাতরতা। কংসবধরূপ পৃথিবীর ভারহরণ মানসে দৈবানুরোধে বিষ্ণুর নবরূপে কৃষ্ণ অবতার, শ্রীমদ্‌ভাগবত-বিধি অনুযায়ী। 'পদ্মিনী লক্ষ্মী' নিত্যলীলাসঙ্গিনী, তাই রাধারূপে তাঁরও অবতার-স্বীকৃতি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ঘটনাক্ষেত্রে উভয়েরই দায়িত্ব এবং সত্তা-বিস্মৃতি। কৃষ্ণ বর্তমানে যশোদা-দুলাল, অলস রাখালিয়া বৃত্তিতে তার তরুণ বয়সটি অবহেলায় বাঁধা। গ্রাম সুবাদে সে রাধার 'ভাগিনা'। রাধা সম্প্রতি নাবালিকা গোপবালা, 'আইহন' গোপের ঘরণী, মথুরার হাটে ননী ছানা বিক্রয়ের কুলকর্মে নিযুক্ত। একে অপ্রাপ্তবয়স্কা, তায় রতিদীক্ষাহীনা (কারণ স্বামী 'আইহন' নপুংসক, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বলা না থাকলেও পুরাণ-সংস্কার এখানে সহায়ক)। কুলবধূ রাধার পক্ষে অল্প বয়সেই অভিজ্ঞা হবার সুযোগ ঘটেনি। এ হেন দুটি দূরাবস্থিত পাত্র-পাত্রীর সংযোগ-সাধনে বড়ায়ি নাম্নী কোন গ্রাম-বৃদ্ধা (গ্রাম সুবাদে সকলের মাতামহী) নিযুক্ত; বড়ায়ি উভয় পক্ষেরই দূতী, রুচি এবং রীতিতে সে যেন—

> সন্তানের যৌবনের তাপে রোদ্দুর পোহায় পিতা
> তরুণী নাৎনির তাতে মাতামহী হাত সেঁকে নেন ;[১]

এই বৃদ্ধা বড়ায়ি আইহন পরিবারে বিশেষভাবে বিশ্বস্তা। আইহন-জননী এ বৃদ্ধার সঙ্গে আপন কুলবধূকে মথুরার হাটে দুধ দধি বিক্রয় করতে যেতে দেন, আইহনেরও এতে কোন অমত নেই।

এমনই এক পরিবেশের ইঙ্গিত নিয়ে তাম্বুলখণ্ডের সূচনা। শ্রীরাধার অনুরাগ এবং সম্মতি পাবার আশায় বড়ায়ির মারফতে তাম্বূল প্রেরণ দিয়ে যোগাযোগের সুরু। রাধা কুলবধূ-চর্যা জানে, তার ওপর সে বড় বাড়ির ঝি ও বউ বলে একটা বংশ-মর্যাদাবোধও আছে, কৃষ্ণের 'মাউলানী' হয়ে এ জাতীয় একটা

---

১. শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর । শ্রীবুদ্ধদেব বসু।

পরকীয় প্রণয়ের প্রস্তাব তার কাছে ঘৃণ্য, বিশেষত তা যখন কলঙ্ক এবং পরিবাদ-জনয়িতা। বড় কথা, রাধা রতিভোগে অপরিণত আপন অল্প বয়সের সীমা জানে। এতগুলি চিন্তার যোগফল ঘটল তার সরোষ প্রত্যাখ্যানে। ঘরে বাইরে বাঁধন-শিথিল কৃষ্ণের যৌবন এ প্রত্যাখ্যানে দুর্বার হল। লাভ করার রাজপথটা যখন রুদ্ধ, তখন অনিয়মের মেঠোপথই একমাত্র ভরসা। পরবর্তী দানখণ্ড নৌকাখণ্ড ভারখণ্ড ছত্রখণ্ড বৃন্দাবনখণ্ড যমুনাখণ্ড ইত্যাদি অধ্যায় ধরে কৃষ্ণ রাধার অপরিণত যৌবন ভোগ করে চলল, কৌশলে এবং বলে। ছলনাময়ী বৃদ্ধা বড়ায়ি কৃষ্ণ-সহায়। কৃষ্ণের কবলে রাধার তীব্র অসম্মতি, যথাশক্তি বাধাদান. প্রবোধ-প্রযুক্তি-কটূক্তি কিছুই কার্যকরী হল না। সুযোগের পৌনঃপুনিক এবং পরম্পরিত কাল ধরে কৃষ্ণের আশা বলবতী হল, অবশেষে সে রাধার মন পাবে। রতিবিজ্ঞানে বিদগ্ধা এবং রতিলিপ্সায় ক্রমোত্তরা হলেও এতকাল পর্যন্ত রাধা তার লীলাসঙ্গী হিসেবে কৃষ্ণকে মনোনীত করেনি। তাই অগত্যা কৃষ্ণকে বাণখণ্ডে কামশরের সাহায্য নিতে হল। এখন রাধাচিত্তে বৈধী সমাজ-নিয়ম গৌণ, কৃষ্ণের দীর্ঘকালীন পরকীয় প্রণয়-নিবেদনের মাহাত্ম্য এবং মাধুর্যবোধ তার ঘটল। নারী অধিকার (Possession) চায়। চপল কৃষ্ণকে নিজস্ব করার বাসনায় রাধা তার বাঁশি চুরি করে রাখল। কৃষ্ণ ব্যাকুল। অনেক অনুনয়ে এবং রাধার প্রতি নিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিতে সে বাঁশিটি ফিরে পেয়েছে। এরপর অকস্মাৎ কৃষ্ণের মথুরা পলায়ন। রাধার সদ্যজাগ্রত চিত্তের বিরহ-বিলাপ এবং পরিসমাপ্তি।

শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন-কল্পে ভগবান বিষ্ণুর যে প্রতিশ্রুতি, তা আমাদের আলোচ্য কাহিনী-কালের এলাকায় বিন্দুমাত্রও পালিত হয়নি। অধ্যাত্ম-প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যে যে দৃঢ় চরিত্র-বল এবং ইচ্ছাশক্তির দরকার, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গ্রাম্যকৃষ্ণে তার কোন লক্ষণই নেই। নগ্ন কামার্তি এবং তন্ময় ইন্দ্রিয়চর্চার মধ্যেই তার সকল আকাঙ্ক্ষার অবসান। অবশ্য তার এই কাহিনীগত জীবনের অধ্যায়ে সমর্থনযোগ্য একটি সৎকর্মের দৃষ্টান্ত মেলে। কালীয়নাগ দমনের দ্বারা গ্রামের পানীয় জলসত্র রক্ষা। জন্মখণ্ডের সূচনায় পাঠক কবির কাছে কৃষ্ণের যে মহৎ কর্মের প্রতিশ্রুতি পায়, শেষ পর্যন্ত সমস্তখণ্ডগুলির মধ্যে তার তিলমাত্র উদ্যম-আয়োজন চোখে পড়ে না। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম-একাদশ অধ্যায়েই কেবল গোপীগণের সঙ্গে লীলানিরত মধুর কৃষ্ণকে পাই, তাছাড়া বিপুল সে গ্রন্থের সর্বত্র দুষ্টের দমনে অবতীর্ণ ঈশ্বর কৃষ্ণের একাধিপত্য। জয়-দেবের গীতগোবিন্দে রাধা-মাধবের অভিসার-অভিমান-মিলনের কতকগুলি ভাব-অধ্যায় রচিত আছে। সেখানে কাহিনী-সূত্র অতি ক্ষীণ। ভাববিকাশের

পর্বগুলিকে যথাবিন্যস্ত করবার জন্যেই ঘটনার একটা অবিনাযত্ন আভাস আছে মাত্র। আর প্রথম সর্গে (সামোদ-দামোদব) কবি দশাবতার ভগবানের মাহাত্ম্য এবং বৈভব স্মরণ করে স্তবপাঠ করেছেন, বর্ণিতব্য কোন বিষয়ের সূচী-নির্দেশ করেন নি। সুতরাং গীতগোবিন্দেব প্রথম সর্গটি মাধবের ইতিকর্তব্যের বিজ্ঞাপন নয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্মখণ্ডে কবিমনে বিষ্ণুব অবতাব-ভাবনা কুত্রাপি কাহিনীর সূচী-নির্দেশ করে না। আসলে কবি বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর এই কৃষ্ণ-কাহিনী কোন আর্য সংস্কৃতি থেকে সংগ্রহ করেন নি, হয়ত তা অধুনালুপ্ত কোন লোক-পুরাণেরই অংশ। জন্মখণ্ডের কৃষ্ণ-পবিচয় থেকে কবির কাহিনী-খ্যাপনের প্রতিপাদ্য বিষয়টি আহবণ করা যাবে না। কারণ ঘটনাকারে বলা থাকলেও এ অংশটি কবিমনে পুবাণ-বাহিত একটা সশ্রদ্ধ কীর্তিস্মৃতি মাত্র। কৃষ্ণের কর্তব্য ও কর্মের মুখবন্ধ নয়। আরও একটি কথা। কবি কাব্যের মধ্যে কোথাও তাঁর কাহিনী বর্ণনার প্রতিপাদ্য বিষয়টি কি, তা ব্যক্ত করেন নি। সুতরাং কাহিনীতে নায়কেব সর্বপ্রধান জীবনচেষ্টা রূপে যে অভিপ্রায় তীব্রভাবে জেগে আছে, তাকেই কবির ভাব-প্রতিপাদ্য বলে ধরতে হয়। অনিশ্চিত-মতি গ্রাম-যুবকের কামাসক্তি, কামতর্পণের প্রযত্ন এবং সিদ্ধিব যথাসম্ভব আয়োজন-পরম্পরা যদি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনী-চুম্বক হয়, তবে লৌকিক জীবনের সম্ভোগ-ত্বরার ছবিটিই কবির প্রতিপাদ্য বা প্রদর্শনের বিষয়। বুদ্ধি যেখানে আবেগকে ধীর-গতিতে বিচারের পথ দেখায় না, সেখানে মনোবেগের একমুখী প্রকৃতিই সমস্ত কর্মের প্রেরণা। আলোচ্য কাহিনীতে কৃষ্ণেব সেই একমুখী মনোবেগেরই ক্ষিপ্র সিদ্ধি-সন্ধান লক্ষ্য কবা যায়। কৃষ্ণ যদি ঈশ্বর-শক্তি ..যে দেখা দিত, তবে ইচ্ছাময়ের সর্বশক্তিমত্তায় পরনারী রাধাকে ভোগ করা তার পক্ষে সুকঠিন চেষ্টাব বিষয় হত না। আসলে আমাদেব কৃষ্ণ সামান্য মানব-ভাগ্যেবই অংশীদার।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাহিনীর প্রতিপাদ্য বিষয়টি জানার পর পরবর্তী জ্ঞাতব্য হল, এ কাহিনী প্রধানত কাব্যধর্মী অথবা নাট্যধর্মী। সে বিচারে অগ্রসর হওয়ার আগে একটি বিষয় স্পষ্ট জানার প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে উপমা-প্রয়োগ প্রধানত কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পাই, এবং সে প্রয়োগের দ্বারা কোন্ কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। মোটামুটি দেখা যায়, দেহরূপ-বর্ণনার ক্ষেত্রে, আত্মভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে এবং বিতর্কমূলক সংলাপে আত্মপক্ষ সমর্থনের ক্ষেত্রে এ রচনায় উপমা-প্রয়োগ মুখ্যস্থানীয়। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। নিসর্গ-বর্ণনার ক্ষেত্র এ রচনায় অনুপস্থিত। নিসর্গ প্রসঙ্গে যৎসামান্য যা পাই,

তা কেবল একটি বিষণ্ণ অথবা প্রসন্ন প্রাণেরই ভাবচ্ছায়া মাত্র। বিস্ময়ের ব্যাপার, এমন একটি বিস্তৃত পরকীয় প্রণয়-আয়োজনে নিসর্গ-প্রকৃতির সহায়তা একেবারে উহ্য।

প্রথমে দেহবর্ণনার ক্ষেত্র। অধিকাংশ স্থানেই দেহবর্ণনাকে গূঢ় কোন না কোন প্রয়োজন-সাধনের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়েছে। রাধাকে ভোগ করার অদ্বিতীয় প্রস্তাবই কৃষ্ণের একমাত্র কথা। রূপবর্ণনার দ্বারা সন্তোষ বিধান করে রাধাহৃদয়ের সম্মতি লাভের জন্যে কৃষ্ণ আকুল। যেখানে প্রতিপক্ষকে আপন ইচ্ছার অনুকূলে আনার জন্যেই রূপ-প্রশস্তি, সেখানে প্রশস্তির মধ্যে পাঠকের (ও লেখকের) হৃদয়যোগ প্রায়ই ঘটে না। কৃষ্ণ কর্তৃক রাধারূপ বর্ণনায় এমনই এক তরান্বিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির দায়মোচন-চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

নীল জলদ সম কুন্তলভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা।।
শিশত শোভএ তার কামসিন্দূর।
প্রভাত সময়ে যেন উয়ি গেল সূর।।
ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।
....
গণ্ডস্থল শোভিত কমলদল সমা।।
বিম্বফল জিণী তোর আধরের কলা।
মাণিক জিণিআঁ তোর দশন উজলা।।
কণ্ঠ কম্বুসম কুচ কোকযুগলা।
বাহু মৃণাল কর রাতা উতপলা।।
কনক চম্পক সম শোভে কলেবরা।
..................................ইত্যাদি ইত্যাদি।[১]

এই রূপবর্ণনার অতিসন্নিহিত দুটি সংস্কৃত শ্লোকে বড়ু চণ্ডীদাস একটি পাদ-প্রদীপ দিয়েছেন,

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং।।

১. দানখণ্ড

এবং এ জাতীয় কবি-কটাক্ষ রূপবর্ণনার অগ্র পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে একাধিক। এখন উক্ত বর্ণনাপদের উপমা-প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাক। নীল-জলদের মত কুন্তলভার (উপমা); চম্পকমালা ব্যক্ত বিজলী (রূপক); মাথার সিঁদুর যেন প্রভাত সূর্য (উৎপ্রেক্ষা); ললাট যেন নবশশিকলা (উৎপ্রেক্ষা); অধর ও দশন যথাক্রমে বিম্বফল ও মানিককে জয় করে (ব্যতিরেক); কণ্ঠ, কুচ, বাহু এবং কর যথাক্রমে কম্বু কোকযুগল মৃণাল এবং রাতা উৎপলের মত (উপমা)। দশটি ছত্রে এগারটি উপমেয়পদ এবং তাদের প্রয়োজনীয় এগারটি উপমানপদ আহৃত। নবম ও দশম ছত্রে চারটি উপমেয়পদ এবং চারটি উপমানপদ (মোট আটটি উপমাবস্তু) মাত্র দুটি ছত্রের মধ্যে অবরুদ্ধ। এত অল্প পরিসর ক্ষেত্রে এই পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রত্যঙ্গ-বর্ণনা (যা অন্য ক্ষেত্রেও সর্বত্র পাই) কবির সৌন্দর্যমুগ্ধতার স্মারক অথবা উদ্দীপক কিছুই হতে পারে না। বলা বাহুল্য, পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং দ্রুত হওয়ার ফলেই দেহের সৌন্দর্য-সংস্থানগুলি সঞ্চারশক্তি লাভ করেনি। আসলে রাধাকে আপন অভিপ্রায়ের অনুকূলে পাওয়ার জন্যে তার তুষ্টি-সম্পাদক এ সব উপমা-প্রয়োগ। নায়কের মনস্তত্ত্ব বিচার করলে এ দেহবর্ণনাগুলি কেবল প্রথম ভাব-নিবেদনে ভব্যতার আবরণ-রক্ষা মাত্র। কৃষ্ণের ঐ অভিপ্রায়ের পোষ্টা কবি বড়ু চণ্ডীদাস স্বয়ং, কেননা তিনিই এবম্প্রকার কৃষ্ণকথার কীর্তনীয়া। আর পাদ-প্রদীপের সংস্কৃত শ্লোক-ছত্র আমাদের ধারণার সমর্থক। সহজেই বোঝা যাচ্ছে রাধার অলোক-সামান্য শরীরশোভা বড়ু চণ্ডীদাসকে বিষয়-বিস্মৃত করেনি। কোন রকমে উপমা-প্রয়োগগত কাব্য-নিয়ম স্বীকার এবং অতিক্রম করে রচনাকে সক্রিয় এবং পরিস্থিতিকে চরিত্র-নিয়ন্ত্রিত পথে হাজির করে দিয়েছেন তিনি। রাধার দেহরূপ-বর্ণনার উপমায় কবিমনে একটা অতিদ্রুত রূপ-নিষ্পত্তির বাসনা লক্ষ্য করা যায়।

বড়ু চণ্ডীদাস নায়িকাদেহের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলঙ্কারিক রূপ-পরিচয় দিয়েছেন। অনেকক্ষেত্রে এক একটি প্রত্যঙ্গের বর্ণনায় একাধিক উপমান সংগ্রহ করেছেন। মিথিলার কবি বিদ্যাপতির নায়িকাবর্ণনায় রূপের তন্ময়তা দেখা যায়। তবু তাঁর এমনও দু একটি বর্ণনা ইতস্তত মেলে, যার মধ্যে একই উপমেয় বর্ণনার জন্যে একাধিক উপমান আহৃত এবং নায়িকার সর্বাঙ্গ রুদ্ধশ্বাস গতিতে চিত্রিত করার ব্যগ্রতা লক্ষিত। এমন হতে পারে, বিদ্যাপতির এ জাতীয় নায়িকাবর্ণনা বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ষোল পঙক্তির দীর্ঘ বর্ণনা উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই। নমুনা হিসেবে কেবল চারটি পঙক্তি এখানে লিপিবদ্ধ করা গেল।

করিবর রাজ- হংস জিনি গামিনি
চললিহুঁ সঙ্কেতগেহা।
অমলা তড়িত- দণ্ড হেমমঞ্জরি
জিনি অতি সুন্দর দেহা।।
জলধব তিমিব চামব জিনি কুন্তল
অলকা ভৃঙ্গ শৈবালে।
ভাঙু লতাধনু ভ্রমব ভুজঙ্গিনি
জিনি আধ বিধুবব ভালে।।১

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে উপমারীতির বিচার প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃত কবি কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট, জয়দেব ইত্যাদি এবং কবি বিদ্যাপতির পদাংশ উদ্ধৃত করেছি। উক্ত উল্লেখ এবং উদাহরণের অর্থ এই নয় যে সংস্কৃত কবিদের কবিভাবভূমি এবং কল্পনা-পদ্ধতি বড়ু চণ্ডীদাসের অনুভূতিতে উত্তরাধিকার সূত্রে আয়ত্ত। বরং পূর্ববর্তী আলোচনায় এ কথাই স্পষ্ট যে, লৌকিক জীবন-চেতনাকে ক্রিয়াশীল রূপে উপস্থাপিত করতেই রচয়িতা তাঁর সমগ্র পরিকল্পনা নাটিকাকাবে বিন্যস্ত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শেষ দুই খণ্ডে (বংশী ও রাধাবিরহ) নায়িকার বিরহতাপ বর্ণনায় কিছুটা ভাব-গৌরব লক্ষ্য করা যায়, অবশিষ্ট অংশে আবিল আদিরসের উপমা একমাত্র। তবু কেবল তুলনার প্রয়োজনেই আলোচনায় উক্ত সংস্কৃত এবং অন্যান্য কবির রচনাংশ গৃহীত। অভিজাত কাব্যের মর্যাদায় প্রকাশ ও মনোভঙ্গি বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার গোড়ার দিকে অন্তত ছিল না। লিখতে লিখতে (লেখকের অনেকটা অজ্ঞাতসারেই) বিষয়-মহিমা ও পৌরাণিক চেতনা কবিচিত্তকে অধিকার করেছে। বড়ায়ি বুড়ি ও নারদমুনির ব্যঙ্গচিত্র কবির প্রাকৃত মনোভাবের নির্দেশক। দ্বিতীয়ত কলহপ্রিয়া, প্রণয়বিমুখা, আত্মশ্লাঘাপরায়ণা রাধা কৃষ্ণের সম্মোহন-বাণের মত কবি-সহানুভূতির ইন্দ্রজাল শরে বিদ্ধ হয়ে যেন অতর্কিতভাবে শাশ্বত নায়িকায় রূপান্তরিত। কাজেই রচনাশৈলীর মৌলিক পার্থক্যের জন্যেই উপমা-প্রয়োগের পার্থক্য। বড়ু চণ্ডীদাস নায়িকার রূপবর্ণনা-পদ্ধতির খোলসটি ধার করেছিলেন, সৌন্দর্যপূজারী রূপতন্ময় কবির আত্মা তাঁর ছিল না। কবিয়ালের হাতে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার সুলভ সংস্করণের মত বড়ুর হাতেও এর একটা প্রাকৃত জনসুলভ লঘুতা ঘটেছিল। যার ফলে রূপের আজানু-লম্বিত রাজবেশ আলোচ্য উপমাপ্রয়োগের ক্ষেত্রে কটিবাসে সংক্ষেপিত।

১ রূপাভিসার, শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

উপাদান এক, কিন্তু বিন্যাসরুচি ভিন্ন। আমাদের দৃষ্টান্ত উদ্ধারের প্রয়োজন সাদৃশ্য জ্ঞাপনার্থে নয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপমা-প্রয়োগের যথাযোগ্য সৌন্দর্য সংস্থানটি নির্ণয় করার জন্যে।

কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য থেকে দুএকটি শ্লোক উদ্ধার করব। কালিদাসও উমার দেহরূপ বর্ণনা করেছেন,

প্রবাতনীলোৎপলনির্বিশেষমধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা।

উমানয়নের অধীরতা এক মুহূর্তে সমস্ত আকাশ বাতাসকে সংবেদনশীল করে তোলে। এখানে উপমেয় আঁখি, উপমান নীলোৎপল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছত্রে সমবস্তুই পাই, 'নীল কুরুবক তোর নয়নে'। কালিদাসের রচনাতে 'প্রভূত সমীরণে একান্ত চঞ্চল নীলোৎপল' যেন এক পরিপূর্ণ নিসর্গ-বিশ্বের রূপ-নির্যাস। 'আয়তনয়নার সেই অধীর দৃষ্টি', যেন যুগান্তরশায়ী মানবহৃদয়ের অনির্বাণ প্রতীক্ষা-ব্যাকুলতা। একটি পরিপূর্ণ নিসর্গ-বিশ্ব সমগ্র মানব-জীবনের অনুভববৃন্তে মৃদুভাবে অর্পিত।

চন্দ্রং গতা পদ্মগুণান্ন ভুঙক্তে পদ্মাশ্রিতা চান্দ্রমসীমভিখ্যাম্‌॥
উমামুখন্তু প্রতিপদ্য লোলা দ্বিসংশ্রয়াং প্রীতিমবাপ লক্ষ্মীঃ॥

উমামুখের দুর্লভ মাধুর্য লাভ করতে কমলার কত শত প্রয়াস এবং উদ্বেগ। কমলা-মানসের সমস্ত ভাবনা-মণ্ডলটির মাধ্যমে উমার রূপ-প্রদর্শন করতে গিয়ে কবি স্বভাব-বিরোধী কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। কারণ চন্দ্র ও পদ্মের একত্র বাস ঘটে না। দ্বিতীয়ত আহৃত উপমানগুলি প্রথাসিদ্ধ। একটা চেষ্টাকৃত উদ্যোগ যদিও এ উপমার বড় কথা, তবু সৌন্দর্য-বর্ণনা করতে বসে কাহিনীর বিষয়-শরণ পাবার জন্যে কবিমনে ব্যস্ততার চিহ্নটুকু পর্যন্ত নেই। প্রয়োগে সফল অথবা বিফল, কবি যাই হোন না কেন, রসের স্বাদে মশ্‌গুল একটি রম্য আবেশ রচনার যে প্রাথমিক শিল্প-আয়োজন, সেটুকু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোথাও দেখি না। ঘটনার ঘর্ষণ এবং সংলাপের উত্তাপে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কাব্যের ছায়াশীতলতাটুকু মুহূর্তে বাষ্প হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

কালিদাসের কুমারসম্ভবে গল্প নাই। যেটুকু আছে সে সূত্রটি অতি সূক্ষ্ম এবং প্রচ্ছন্ন এবং তাহাও অসমাপ্ত। দেবতারা দৈত্যহস্ত হইতে কোন উপায়ে পরিত্রাণ পাইলেন কি না পাইলেন, সে সম্বন্ধে কবির কিছুমাত্র ঔৎসুক্য দেখিতে পাই না; তাঁহাকে তাড়া দিবার লোকও কেহ নাই।........সকলেই যেন বলিতেছেন, গল্প থাক্‌, এখন এ বর্ণনাটাই চলুক।[১]

---

১ প্রাচীন সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকারের রচনায় অবকাশ বিনোদনের সেই রসালস রাজকীয়তা কৈ। কামাতুর ব্যক্তির মত কামকল্পনাতুর কবিও দ্রুত তৃপ্তির সংক্ষিপ্ততম পথ ধরেছেন। সৌন্দর্যের পদ্মে পা ফেলে দ্রুত কামনা-সাগর পার হতে যে চায়, পদ্মাসীন হবার সাধনা তার নয়।

রাধাবর্ণিত আত্মদেহরূপ বর্ণনার কয়েকটি পদ। তাম্বূল, দান, যমুনা, বাণ ইত্যাদি খণ্ডে এ জাতীয় বর্ণনা প্রায়ই বিচ্ছিন্ন, কৃষ্ণের দৌরাত্ম্য-প্রতিষেধের জন্যে, এবং দু একটি ক্ষেত্রে আত্মরূপ-মহার্ঘতা প্রতিপাদনের দ্বারা কৃষ্ণকে অনুপযুক্ত প্রমাণ করতে ব্যবহৃত। দু একটি উদাহরণ,

> রূপস শরীব মোর কিছু নাহিঁ কাজ।
> কেতকী কুসুম যেন ধুলীএঁ সাজ ॥১

কৃষ্ণের দৌরাত্ম্য-প্রতিষেধের জন্যে প্রযুক্ত।

> খোঁপা পবতেখ মোব ত্রিদশ ঈশ্বব হব
> কেশপাশে নীল বিদ্যমানে।
> সিসেব সিন্দূব সূব ললাটে তিলক চাঁদ
> নযনত বসএ মদনে ॥

বড়ায়ির প্রতি,

> বোল গিআঁ গোবিন্দক বাতে।২

কৃষ্ণকে অনপযুক্ত প্রমাণ করার উদ্দেশ্য প্রযুক্ত।

> ফুটিল কদম ফুল ভরে নোঁআইল ডাল।
> এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল ॥
> কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ।
> নিদয় হৃদয় কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ ॥৩

শ্রীরাধার আত্মরূপ বর্ণনায় আরও একটি উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়। সম্ভোগ-বঞ্চনা এ জাতীয় ভাবপ্রকাশের মূল। রাধা এখানে আপনাকে কদম্ব পুষ্পভারাবনত নম্র শাখার সঙ্গে তুলনা করেছে, যৌবনানুভূতি এ ছত্র কয়টির প্রধান কথা।

---

১ দানখণ্ড
২ বাণখণ্ড
৩ রাধাবিরহ

বড়ায়ি-বর্ণিত রাধার দেহরূপ-চিত্র অসংখ্য নয় এবং তা কৃষ্ণকে প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত।

কবি কর্তৃক রাধারূপের বর্ণনা সমগ্র কাব্যে কেবলমাত্র একস্থানে ঈষৎ উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ মনে হয়, অবশ্য প্রাথমিক বিচারে। বলা প্রয়োজন, এই রূপবর্ণনা আমরা তাম্বূলখণ্ডের শেষ পদ হিসেবে পাচ্ছি, যার পরেই দানখণ্ডের সুরু। তাম্বূলখণ্ডের রুষ্টা নায়িকা দানখণ্ডে যে কৃষ্ণভোগ্যা হয়ে উঠবেন, তারই ঘটনাপ্রস্তুতি হিসেবে এ বর্ণনার প্রযোজন হল। বড়ু চণ্ডীদাস এস্থানে যে দুটি 'কপালটুকি' শ্লোক দিয়েছেন, রাধার এই আলঙ্কারিক বর্ণনা তাদের মধ্যবর্তী পদ। সংস্কৃত পদের প্রথমটি,

কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য জরতী কপটে পটুঃ।
অভিমন্যুপ্রসূং প্রাহ রাধায়া মথুরাগতিম্ ॥

এবার রূপবর্ণনা-পদ থেকে কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত করব।

অনুমতী লআঁ রাধা সাসুড়ীর থানে।
মথুরা চলিলী রাধা বড়ায়ির সঙ্গে।
....

এবং এরপরেই,

কমলবদনী রাধা হরিণনয়নী।
আনত কপাল তার আধ শশি জিণী ॥
....
তিলফুল জিণী নাসা কম্বু সম গলে।
....
কমলকলিকা সম তার পযোভারে।
ডমরু সদৃশ্য মধ্য নাভি গম্ভীরে ॥
গুরু জঘন নিতম্ব উরু করিকরে।
....
করিবাজ জিণী রাধা করিল গমনে।[১]

---

১ তাম্বুলখণ্ড

অতঃপর কবি-প্রদত্ত সংস্কৃত শ্লোকের 'কপালটুকি' দিয়ে দানখণ্ডের সুরু,

অত্রান্তরে তত্র কলিন্দকন্যা
তটোপকণ্ঠং সরণৌ নিষণ্ণঃ।
চিরায় রাধামধুবাধরোষ্ঠে
কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো জরতীঞ্জগাদ ॥

আলোচ্য বর্ণনাপদের কথা ধরা যাক। রাধাদেহকে কৃষ্ণলোভন করার জন্যেই এ পদে উপমা সন্নিবেশিত। কাহিনীকে গ্রন্থিবদ্ধ করাও অন্যতম উদ্দেশ্য। এবং এই স্বল্পায়তনে অনেকগুলি উপমেয় উপমান ব্যবহার করে কবি ঘটনাগত উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ সুগম করে দিয়েছেন। কাব্যরচনার আকাঙ্ক্ষা মুখ্য নয়, বিষয়ের বেগ এবং পরিস্থিতির ইতিকর্তব্য-চিন্তাই মূলকথা। এছাড়া কবি-বর্ণিত যে সব রূপবর্ণনা পাই, সেগুলি প্রায়ই রাধাকৃষ্ণের রতি-উপভোগ-ভঙ্গির ব্যাপার।

কবি-বর্ণিত আর একটি দেহবর্ণনার উদ্দেশ্য আলোচনা করে আমরা দেহ-রূপ-বর্ণনায় উপমার নিয়োগফলের প্রসঙ্গ শেষ করব। কবি-বর্ণিত বড়ায়ির দেহরূপ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উপস্থিত করেছি। সুতরাং পুনরুদ্ধার নিষ্প্রয়োজন। কবির বস্তু-আশ্রয়ী এবং সম্ভোগধর্মী কথাবস্তুর পুরোভাগে একটি সূক্ষ্ম ভাবসূচী-নির্দেশের মত এ রূপ (বড়ায়ি) স্থাপিত। সমস্ত কাহিনী-কীর্তন যে ভাবাশ্রয়ী না হয়ে বস্তু-আশ্রয়ী হবে, তা উক্ত বর্ণনাপদে উপমাগত বিরোধ, ব্যঙ্গ-কুটিলতা এবং হাস্যকরতায় রূপবান।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপমা-প্রয়োগে আত্মভাব প্রকাশের ক্ষেত্র আমাদের সম্প্রতি আলোচ্য বিষয়। এই স্তরের উপমাগুলি যেমন দেহবর্ণনার চতুর অভিষন্ধি থেকে মুক্ত, তেমনি আবার সংলাপে তপ্ত বিতণ্ডারও এলাকা-বহির্ভূত। বংশী ও বিরহ খণ্ডের উপমায় আত্মভাব প্রকাশের আরও একটি দিক আছে। বিশুদ্ধ বিরহ-বেদনা। লক্ষ্য করার বিষয়, এ পর্বে বর্ণিত উপমা নাট্যগুণে কিছুটা গৌণ হয়ে (অর্থাৎ ঘটনাবস্তু এবং সক্রিয়তার কিঞ্চিৎ দূরবর্তী) কাব্যের বিভোরতা বাড়িয়েছে। অবশ্য এই বিভোরতা বিশুদ্ধ ভাবের এবং ভাবুকতার নয়। বিষয়ের এবং বস্তুর স্মৃতিকেন্দ্রিক এর উপমা। তবে প্রায়ই আমিত্বে মগ্ন হওয়ার ফলে উপমাবাক্যগুলি বেশ মনস্তাত্ত্বিক। দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক,

দুখ সুখ পাঁচ কথা কহিতেঁ না পাইল।
ঝালিআর জল যেহ্ন তখনে পালাইল ॥

কাহ্ন সমে ভালেঁ রস ভুঞ্জিতেঁ না পাইল।
তে কারণে মোর মনোরথ না পুরিল ॥[১]

রাধিকা লাগিআঁ মোক না কর শকতী ॥
কাটিল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত।
তোহ্মার বিদিত মোরে রাধা বুইল যত ॥[২]

সম্ভোগ ক্ষুন্ন হওয়ায় নায়িকা ক্ষুব্ধ। কৃষ্ণকথিত ছত্রগুলি নায়কের বিরাগ-বাসিত। মথুরায় অপেক্ষিত কোন মধুরতর আকর্ষণেই (অথবা পূর্ব-অপমানের স্মৃতি) কৃষ্ণের এবম্প্রকার নায়িকা-বৈরাগ্য।

ছার তিরী জরম শিরীষ কুসুম মন
বড় মানে তিল উপকার ॥
তোহ্মার নেহ সকল কমলিনী-দল জল
চঞ্চল দুঈহো পড়িহাসে।
এডহ আহ্মার আশে................................... ...[৩]

কৃষ্ণ এবং তার ভালবাসাকে সামান্য সাব্যস্ত করে নায়িকা আপন অনুরাগের অসামান্যতা সম্বন্ধে গরবিনী। নারী-হৃদয়ের কোমল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে পুরুষের চলচ্চিত্ততার পার্থক্য বা বিরোধ, এ আক্ষেপের কথাবস্তু।

শুণ বুঝি মধুকর পরিহর বন।
আইস বনমাঝেঁ বিকচ নলীন ॥
তোহ্মে তেজিবারে কেহ্নে কর চীত।
নাগর জনের হেন না হএ উচীত ॥[৪]

রাধা কৃষ্ণকে আপন যৌবন-বনের অনুপম মনোহারিতা সম্বন্ধে সনির্বন্ধ উপদেশ করছে।

ভুখিল হইলে কাহ্নাঞিঁ দুই হাথে না খাইএ ॥[৫]

দানখণ্ডে রাধা কৃষ্ণকে তার অশোভন কামনা এবং আপন অপরিণত যৌবন বিষয়ে ধৈর্য শিক্ষা দিয়েছে।

---

১ রাধাবিরহ
২ ঐ
৩ বৃন্দাবনখণ্ড
৪ রাধাবিরহ
৫ দানখণ্ড

যাহার যৌবন নর উপভোগে
সেহি সে নাগরী ভালী।
ভ্রমর সঙ্গম পাইলেঁ শোভএ
যেহ্ন বিকসিত মাল্লী ।।১

ভোগেই যৌবনের সার্থকতা, কথাটি কৃষ্ণ রাধাকে সম্যক বুঝিয়ে দিতে চায়। এটি জ্ঞানী কৃষ্ণের কথা। এ অংশে কৃষ্ণ অহঙ্কৃত।

এছাড়াও আত্মভাব-প্রকাশের ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ অন্তরের বেদনাজাত কতকগুলি পদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শেষাংশে পাই। এগুলি কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কথিত নয়।

যে ডালে করো মো ভবে সে ডাল ভাঙ্গিঞাঁ পড়ে
নাহি হেন ডাল যাত করো বিসরামে।২

এ উক্তি আপন হৃদয়জ্বালার স্বগত-ভাষণের মত কিছুটা অন্য-নিরপেক্ষ।

একেঁ দহদহ ঘসির আগুণ
আরে কে না জালে ফুকে।
ভিড়ি আলিঙ্গন দিতেঁ না পাইলোঁ
এ শাল থাকিল বুকে ।।৩

আপন মন্দভাগ্যের জন্যে নায়িকার খেদ।

জেঠ মাস গেল আষাঢ় পবেবেশ।
সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ ।।
এভোঁ নাইল নিঠুব সে নান্দেব নন্দন।৪

নিসর্গের করুণ স্পর্শে নায়িকার পরিতাপ-ঘন হৃদয়।

মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী ।।৫

প্রকৃতি-প্রতিবেশে রাধার ব্যাকুলতা আরও স্পর্শাতুর। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, মাত্র দুটি একটি ক্ষেত্র ছাড়া এ জাতীয় নিসর্গসান্নিধ্য সমগ্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নেই।

---

১ দানখণ্ড
২ রাধাবিরহ
৩ ঐ
৪ ঐ
৫ ঐ

আত্মভাব-প্রকাশের এই প্রকার পরিচয় সমগ্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্যাংশ। যদিও এসব কবিতা-বাক্যের বক্তা কবিকল্পিত পাত্র অথবা পাত্রী, স্বয়ং কবি নন। নিখিল বিরহী হৃদয়ের আর্তি এই ছত্রগুলির সুরে কিছুটা ধরা পড়ে। 'আজিও কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটীরে'। তবু প্রথমাংশের বিতণ্ডাময় অসিযুদ্ধের সতেজ স্মৃতি পরবর্তী ভাবপঙক্তির মধ্যে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়নি। নায়িকা রাধা শাশ্বত বিরহিনী হলেও তার তর্জনশীল, কলহপাংশু রূপটা আমরা ভুলতে পারি না। নাট্যছায়া প্রক্ষিপ্ত হয়ে এখানকার উপমাগুলি যতই ভাল হোক, যেন পূর্বজন্মের পাপস্পৃষ্ট। বড়ু চণ্ডীদাসের স্রষ্টা-হৃদয় এতই প্রবলভাবে নাট্যময় এবং রচনার নাট্যমুহূর্তগুলি সংলাপ ও সক্রিয়তায় এতই উত্তপ্ত যে, ক্বচিদ্দৃষ্ট কাব্যাবকাশের ছায়াশীলতাটুকুকেও তা মুক্তি দেয়নি, অনায়াসেই উষ্ণ করে তুলেছে। উপমার শক্তি বিচার করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাট্যময়তার লক্ষণ এখানেও পরোক্ষভাবে প্রকাশিত।

আত্মভাব-প্রকাশের ক্ষেত্রে উপমা-প্রয়োগ অসংখ্য নয়। লেখক যখন ঘটনা-পরিস্থিতি এবং চরিত্র-জটিলতা থেকে একটু দূরবর্তী হয়ে মানব-হৃদয়ের বার্তা ব্যক্ত করবার প্রয়াস করেছেন, তখনই উপমা তালিকাসজ্জা ছেড়ে আপন আত্মপ্রকাশের বিরল এবং নিভৃত স্থান লাভ করেছে। বিশেষত রাধা-হৃদয়ের বিরহবোধক উপমা যেগুলি, সেখানে এ প্রমাণ নিঃসন্দেহ।

বিতর্কমূলক সংলাপে আত্মপক্ষ সমর্থনের ক্ষেত্রটি এবার আলোচনার বিষয়। সংলাপ যেখানে বিতর্ক বা বিতণ্ডামাত্র, এবং মীমাংসার পরিবর্তে বিসংবাদ যার পরিণাম, বাক্য সেখানে বোধাত্মক না হয়ে ভেদাত্মক হবেই। রূপমোহের বদলে তীক্ষ্ণ আঘাতশক্তি এক্ষেত্রে কাম্য। উপমা-ব্যবহার তদনুযায়ী করতে হলে উপমেয় উপমানের ভাবাকাশকে অতিসন্নিহিত হতে হবে, দীপ্তি এবং স্পষ্টতার খাতিরে। উপমা সংগ্রহটিও পরিচয়-জীর্ণ মর্তলোক থেকেই করা চাই। কৃষ্ণের আকস্মিক ভোগবৈরাগ্য দেখে বড়ায়ি বলছে,

> ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী।
> উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী
> যে পুনি আধম জন আন্তরে কপট।
> তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট ।।১

১ রাধাবিরহ

কৃষ্ণের উত্তর,

সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ
জুড়িএ আগুণ তাপে।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ
জুড়িএ কাহার বাপে ।।১

উভয়তই অলঙ্কার আছে, কিন্তু তর্কে নিয়োজিত হয়ে তা চারু ভাবাষঙ্গের এলাকাচ্যুত।

কৃষ্ণ কর্তৃক প্রণয় নিবেদনের প্রাথমিক উদ্যোগ,

যে বোল বুলিলোঁ মনে না ধরিলেঁ
উলটিআঁ দিলেঁ পিঠী।
সুচক রুচক কুচেব বাটুল
তাতা পড়ি গেল দিঠী ।।২

রাধার উত্তর,

চাঁপাকুঁটী দেখিতে রূপসে।
তাত নাহি গন্ধেব পরশে ।।
বিকসিলেঁ মোহে মুনিমনে।
হেন সব নারীব যৌবনে ।।৩

উপমান বক্তার অভিপ্রেত বাক্যকে স্পষ্ট এবং শাণিত করেছে। উপমেযেব নিকট-ভাবস্তর থেকে সংগৃহীত হওয়ায় উপমানগুলির রূপগত তুচ্ছতা চোখে পড়ে।

কৃষ্ণের কাতর মিনতি,

বিবহে পুড়িআঁ কাহ্ন হাকল বিকল।
জকআ দেখিআঁ যেহ্ন রুচক আম্বল ।।৪

১ রাধাবিরহ
২ দানখণ্ড
৩ ঐ
৪ ঐ

রাধার উত্তর,

এ বোল বুলিতেঁ তোর মনে বড় সুখ।
পরঘর পৈসে যেহ্ন চোর পাটাবুক ॥১

তাই,

যদি গাঙ্গ উজান বহে।
তভোহোঁ তোহ্মার বোল নহে ॥২

প্রার্থনা এবং প্রত্যাখ্যানের পরিচিত বাকচেষ্টায় উপমা অতিশাসিত।

রাধার নিকট কৃষ্ণের রূপার্তি,

তোর দুঈ কুচকুম্ভ বান্ধি নিজ গলে।
বোল রাধা পৈসোঁ মো লাবণ্য-গঙ্গাজলে ॥৩

রাধার প্রত্যুত্তর,

কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী।
আপনার মাসেঁ হরিণী জগতের বৈরী ॥৪

কিন্তু 'রাধাবিরহে' অনুতপ্তা রাধা আবার একই সুরে আর্তনাদ করেছে,

যদি কাহ্নাঞিঁ কর পার এ মোর কুচকুম্ভ ভেলা করি
হএ মোর তবেঁসি নিস্তার ॥

এতক্ষণ পর্যন্ত রাধার প্রত্যাখ্যানের উগ্রতা দেখলাম। একই অস্ত্রের দ্বারা আঘাত-প্রত্যাঘাতের অতিক্ষিপ্র সংলাপ এবার দেখা যাক।

আহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম
ছুইলেঁ খাইলেঁ মরী ॥৫

১ দানখণ্ড
২ ঐ
৩ ঐ
৪ ঐ
৫ ঐ

কৃষ্ণ সেই একই উপমা-অস্ত্রে প্রত্যাঘাত করেছে,

তোহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম
আহ্মোহো ভাল গারুড়ী ।।১

যমুনাখণ্ডে কৃষ্ণের লালসার আর একটি ছবি,

ডালিম সদৃশ তন তোহ্মারে।
তাহাতে মজিল মন আহ্মারে ।।

রাধার ত্বরিত উত্তর,

মাহাকাল ফল আহ্মার তনে।
দেখিতেঁ ভাল ভখিতেঁ মরণে।

প্রত্যুক্তির ত্বরা প্রতিপক্ষকে নতুন উপমাস্ত্র সন্ধান করার সময় দেয়নি।

এছাড়া আরও কতকগুলি সংলাপমূলক বিতণ্ডা-ছত্র পাই, যেখানে বাক্যে বৈরাগ্যের ছলনা, উক্তির আড়ালে উদ্দিষ্টকে প্রণোদিত করার গভীর প্রত্যাশা। কৃষ্ণ চরিত্রের আদ্যোপান্ত লোভ-লালসার ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে বড়ু চণ্ডীদাস এমন কতকগুলি সহসা-বিপরীত উপমা ব্যবহার করেছেন, যাতে প্রথম-দর্শনে সেগুলি কিছুটা অপ্রত্যাশিত মনে হয়। কিন্তু বক্তার উদ্দেশ্য এমন কুটিল পথে প্রকাশিত যে, তা এক মুহূর্তেই চরিত্রের জটিলতা এবং অভিসন্ধিপ্রিয়তা প্রত্যক্ষ করায় এবং রচয়িতাকে দক্ষ নাট্যকার রূপে প্রমাণ করে। দানখণ্ডে কৃষ্ণের উক্তি,

তিরীর যৌবন রাতির সপন
যেহ্ন নদীকের বানে।
....
নানা তরুবর যে ফল ফলে
আপনা তাক না ভখে।
....ইত্যাদি।

রাধার প্রত্যুত্তরও তেমনি নিষেধের তীব্রতা-বর্জিত। কৃষ্ণের উক্তির অনুযায়ী একটা সাধারণ দার্শনিক অথবা কোন প্রাকৃত সত্যের পরিচয় নিয়ে তা প্রকাশিত।

ফুলের নাল কাহ্নাঞিঁ নাহি সহে ভরা।
তাবত রস নাহিঁ ডালিম ডাকরে।
ডালমতেঁ যাবত নাহি পাকএ ভিতরে ।।
....ইত্যাদি।

---

১ দানখণ্ড

এ সব উপমায় নাটকীয় সক্রিয়তা অল্প হলেও ব্যক্তিবিশেষের অন্তরের অভিপ্রায় সঙ্কেতিত হওয়ায় নাটকের জটিল চরিত্রসৃষ্টি সার্থক হয়েছে।

এ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপমা-প্রয়োগক্ষেত্রে তিনটি বিষয় আলোচিত হল। দেহরূপ-বর্ণনা, আত্মভাব প্রকাশ এবং বিতর্কমূলক সংলাপে আত্মপক্ষ-সমর্থন। প্রথম ক্ষেত্রে দেখা গেল, বর্ণনার অতি দ্রুত রীতি রচয়িতাকে বিষয়ান্তরে মনোযোগী করেছে। রূপবর্ণনার মধ্যে কাব্যে শিল্পকর্মের যে সুযোগ, বড়ু চণ্ডীদাস অন্যতর বিষয়ের আকর্ষণে সচেতনভাবে তা অবহেলা করেছেন। ঘটনার নব নব সম্ভাবনা এবং উদ্ভাবনায় তাঁর সমস্ত শক্তি এবং চিন্তা নিযুক্ত। রূপের অতি-ধীর উন্মোচনের (unfurling) দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই, কেবল কোনপ্রকারে রূপ-রচনার নিষ্পত্তি করে বিপুল ঘটনা এবং বিচিত্র পরিস্থিতির অনুগত হওয়াতেই তাঁর স্বস্তি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখা যায়, উপমা চরিত্রের আত্মচিন্তায় লীন হওয়ার ফলে যত বেশি মনস্তত্ত্বধর্মী, তত রূপনির্ণায়ক নয়। আগাগোড়া সংলাপে তৈরী শ্রীকৃষ্ণকীর্তন উপমার মধ্যে দিয়ে মনস্তত্ত্ব-নিপুণতার যে পরিচয় দেয়, তাতে কাব্যের ভাবপুষ্টির চেয়ে চরিত্রের স্বচ্ছ নির্মাণশক্তিই বড়। তৃতীয় ক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য, উভয়পক্ষের বিতর্কতাপে উপমা নাটকের সক্রিয়তাধর্মকে একমাত্র করে হাজির করেছে। উপমা প্রয়োগের দ্বারা কাহিনীর নাট্যরূপ সর্বত্র সমর্থিত এবং ঘনীভূত। কাব্যরস কোথাও গাঢ় হতে পারেনি এই কারণেই যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বহমান গল্পধারা এবং সবেগ চরিত্রচেষ্টার পাশ কাটিয়ে এ রস আস্বাদন করা যায় না। তার ওপর নিসর্গ-বর্ণনার ক্ষেত্র এ রচনায় অতি সঙ্কুচিত থাকায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কাব্যমুহূর্ত প্রায় দুর্লক্ষ্য। এই সব কারণে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপমা কাব্য-কাহিনীর ভাবরূপ-সমর্থন ও ঘনীভবনের কাজে সার্থক হয়নি, বরং এর নাট্যরীতিই রচয়িতার আনুকূল্যে পুষ্টি লাভ করেছে।

উল্লেখ করেছি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কাব্যমুহূর্ত প্রায় দুর্লক্ষ্য। মোটা তুলির কতকগুলি অযত্নের আঁচড়ে এ রচনার রূপশিল্প উজ্জ্বল। একই উপমেয়-উপমান পৃথক একটি শৈলীগঠনের উপাদান হওয়ার ফলে কালিদাস বিদ্যাপতি জয়দেব ইত্যাদির কবি-পুরুষানুক্রম এ কাব্যে অস্বীকৃত। অথচ একথা তো অস্বীকার করা যায় না যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে নাটকের দৃষ্টিকোণে বিচার করলে এ রচনার ভিন্ন ভিন্ন উপাদান-বিন্যাস কত যথাযথ। উপমাগুলি ভাবুকতা-রহিত, ছন্দ সংলাপের শক্তিবাহী, গল্পকাহিনীর বিচিত্রতা এবং রহস্য প্রতি মুহূর্তেই রোমাঞ্চকর, পরিস্থিতির জটিল ভঙ্গি চিত্তাকর্ষক, চরিত্রের সংঘাত বিশ্বাস্য।

কালিদাসের কুমারসম্ভবে গল্প আছে, রঘুবংশে ইতিহাস-বিবৃতি। কিন্তু গল্প

বা ইতিহাসের যে বৈষয়িক ভূমিকা, তা কবিমনের রূপ এবং রসোল্লাসে মুহূর্তেই যে হারিয়ে যায়, তার প্রমাণ কালিদাসের কবি-স্বভাব এবং উপমা-প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য। রাবণবধ করে রাম পুষ্পক-রথে সীতার সঙ্গে অযোধ্যায় ফিরছেন।

বৈদেহি! পশ্যামলযাদ্ বিভক্তং মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃত চারুতারম্ ॥১

রামসীতার সমুদ্রদর্শন। সমগ্র আকাশ-শোভা উপমানরূপে সমুদ্র-রূপের সঙ্গে লগ্ন। দুটি স্বতন্ত্র বিশ্ব যেন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা সুমহৎ পরিবেশ রচনা করেছে। অলঙ্কারের স্তর-বিচারে সামান্য উপমা এটি। কিন্তু উৎকর্ষের বিচারে এ শ্লোকের ব্যঞ্জনা-বহনশক্তি অনন্ত। আকাশ এবং সমুদ্র পরস্পরের প্রতিফলক হয়ে 'স্পর্ধিত্ব-রমণীয়' সুন্দর।

তং কর্ণমূলমাগত্য রামে শ্রীর্ন্যস্যতামিতি।
কৈকেয়ীশঙ্কয়েবাহ পলিতচ্ছদ্মনা জরা ॥২

ইতিহাসের ধারাকীর্তনে রাজা দশরথের বার্ধক্য এবং রামের অভিষেকের সংকল্প বর্ণনা করতে কালিদাস দাম্পত্য মাধুর্যের সূক্ষ্ম তত্ত্বটিকে কত নিপুণ উপায়ে উপমানরূপে ব্যবহার করেছেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত উপমায় চরিত্রদর্শী মনস্তত্ত্ব আছে, কিন্তু তা তীক্ষ্ণভাবে বুদ্ধিদীপ্ত। কালিদাসের উপমায় চাতুর্য দেখি, কিন্তু তা কমনীয় কবিভাবনায় রসানুকূল। ইতিহাস বিবৃতির অনুক্রমে রাজা দশরথের পর রামের রাজ্যাভিষেকের সংবাদে উপমাটি কত সার্থকভাবে সঙ্কেতধর্মী। ঘটনা এবং বিষয়বস্তু সবই আছে, কিন্তু রসাস্বাদনের মাঝখানে তার স্থূল দৌরাত্ম্য নেই। একটি উপমা-শিল্পের আনন্দরস যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণে সঞ্চারিত হতে না পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী কথার কলতান স্তব্ধ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

---

১ রঘুবংশ। কালিদাস।
২ ঐ ঐ

কালিদাসের কাব্য ঠিক স্রোতের মত সর্বাঙ্গ দিয়া চলে না। তাহার প্রত্যেক শ্লোক আপনাতে আপনি সমাপ্ত..........প্রত্যেক শ্লোকটি স্বতন্ত্র হীরকখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল, এবং সমস্ত কাব্যটি হীরক হারের ন্যায় সুন্দর, কিন্তু নদীর ন্যায় তাহার অখণ্ড কলধ্বনি এবং অবিচ্ছিন্ন ধারা নাই।........ময়ূরপুচ্ছ নির্মিত এমন অনেক সুন্দর ব্যজন আছে যাহাতে ভাল বাতাস হয় না, কিন্তু বাতাস করিবার উপলক্ষ্য মাত্র লইয়া রাজসভায় কেবল তাহা শোভার জন্য সঞ্চালন করা হয়। রাজসভার সংস্কৃত কাব্যগুলিও ঘটনাবিন্যাসের জন্য তত অধিক ব্যগ্র হয় না। তাহার বাগ্‌বিস্তার উপমা-কৌশল বর্ণনানৈপুণ্য রাজসভাকে প্রত্যেক পদক্ষেপে চমৎকৃত করিতে থাকে।[১]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনারীতি এ আলোকের বিপরীত। সেখানে বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করে বিষয়কে দ্রুত অগ্রসর করে দেওয়ার অভিরুচি পদে পদে।

আর একটি বিষয় এখানে লক্ষনীয়। শুধু কালিদাস নন, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সর্বত্রই উপমা-প্রয়োগে বিস্তৃত ভাবাষঙ্গ (wider atmosphere) -সৃষ্টির এমনই একটি নিয়ম দেখি, যা নির্বিশেষ রূপলোকের অথবা হৃদয়রাজ্যের সংবাদ বহন করে। বর্ণিতব্য ঘটনা অথবা চরিত্রকে উদ্দেশ্যের একটি বিশেষ বর্ণে চিহ্নিত করেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অলঙ্কার গঠিত। তাই উপমা থাকা সত্ত্বেও এ রচনার মধ্যে একটি আশ্চর্য নিরাভরণতা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার দেহরূপ-বর্ণনা অজস্র। আর, নায়িকার দেহরূপ-বর্ণনার ক্ষেত্র কবিদের পক্ষে কালে কালে কাব্য করার অত্যুৎকৃষ্ট সুযোগ বলে বিবেচিত। সংস্কৃত কবিদের মধ্যে এ রীতি প্রায় প্রথার মত, আর বড়ু চণ্ডীদাস সে সব কাব্যের অনিষ্ট পাঠক এবং অবধারক। এর পর·· দেহবর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে উপমার শোভা জাগলো না কেন, সেটাই প্রশ্ন।

কুচযুগ পর চিকুর ফুজি পসরল
তা অরুঝায়ল হারা।
জনি সুমেরু উপর মিলি উগল
চাঁদ বিহিন সব তারা॥

মেরু উপর দুই কমল ফুলায়ল
নাল বিনা রুচি পাঈ।
মণিময় হার ধার বহু সুরসুরি
তেঁ নহি কমল সুখাঈ॥

---

১ প্রাচীন সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পীণ পয়োধর অপরুব সুন্দর
উপর মোতিম হার।
জনি কণকাচল উপর বিমলজল
দুই বহ সুরসুরি ধার॥

বয়ঃসন্ধির নায়িকা, তারই বক্ষোদেশের বর্ণনা।[১] প্রতিক্ষেত্রেই উপমেয় উপমান এক। কুচযুগ, হার—উপমেয় ; সুমেরু, কমল, তারাপঙক্তি, সুরসরিৎ—উপমান। একই নায়িকা-প্রত্যঙ্গ নিয়ে বিদ্যাপতি একই উপমার দ্বারা নব নব রূপমোহ সৃষ্টি করেছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের রচনাতেও নায়িকার বক্ষোদেশ পুনঃপুনঃ বর্ণিত, আহৃত উপমানগুলি সেখানে নব নব ভাবলোক থেকে নেওয়া, তবু এমন অপূর্ব রূপোল্লাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নেই। সৃষ্ট চরিত্রের অভিসন্ধি গোচর করতে রূপখ্যাপনার যেটুকু প্রয়োজন, ঘটনার আকর্ষণ বাড়াতে যৌবনতাপের যেটুকু অংশ আবশ্যকীয়, রচয়িতা তাঁর উপমার নিরাভরণ ভাষায় সেইটুকু চাহিদা মিটিয়েছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা যদি কাব্যের ক্ষেত্র না হয়, তবে তাঁর ব্যবহৃত উপমা ভাবুকতাবর্জিত বলে অপকৃষ্ট নয়। আর এ রচনা যদি নাট্যকথা-কীর্তন হয়, তবে উপমাগুলি তাদের রূপগোচর-শক্তির নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়ে এ লেখার ভাবগৌরব বাড়িয়েছে বলতে হবে।

আমাদের আলোচনা শেষ হল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাহিনীর ভাবরূপ নাট্যাশ্রয়ী। কাব্যাশ্রয়ী হলে উপমার প্রয়োগ-ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তিরস্কারের পাত্র হয়। কিন্তু মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে এমন একটিও রচনা নির্ভীক দক্ষতায় এবং অকপট প্রাণশক্তিতে প্রকাশিত হয়নি। তাই কেবল ত্রুটির অপবাদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বেমানান। এ রচনায় উপমার প্রয়োগফল তখনই সাদু, যখন নাটক-কথা হিসেবে একে আদর করতে পারি।

---

১ বর্ণনাগুলি বিদ্যাপতি-রচিত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সামগ্রিক রুচি

বড়ু চণ্ডীদাসের আকাঙ্ক্ষায় ঐতিহ্যের প্রলোভন ছিল, কিন্তু ক্ষমতায় সে ঐতিহ্যের প্রকৃত দীক্ষালাভ ঘটেনি। তাঁর কবিপ্রকৃতিই স্বতন্ত্র ধরনের। তাই হস্তান্তরিত সম্পদের মত এ রচনার প্রথাবদ্ধ উপমা আপন ব্যক্তিত্বের দৃঢ় স্বাক্ষরে বঞ্চিত। ধর্মবোধ বা ভক্তিবাদ এ কাব্য-প্রেরণার উদ্দীপক নয়। দ্বিতীয়ত পূর্বসূরীদের কাব্যসংস্কারও এ কবির অনায়ত্ত। তবে বড়ু চণ্ডীদাসের স্বকীয় কবিত্বের চিহ্ন কোথায়। এ কাব্যের যে অংশ আপাত-বিচারে অশ্লীল এবং গ্রাম্য, তার মধ্যেই সে পরিচয় স্পষ্ট।

ভাস্কর্যশিল্পে প্রস্তরমূর্তির নগ্নরূপ আমরা দেখেছি। তার প্রতি প্রত্যঙ্গের নিয়মিত উপস্থাপনা আমাদের মনে মানবদেহ-গঠনের একটি সুষমাবোধ জাগায়। শিল্পী যদি শ্লীলতার অনুরোধে অথবা সভ্যতার খাতিরে সেই নগ্ন মূর্তির পায়ে পাদুকা এবং মাথায় উষ্ণীষ সন্নিবেশিত করে দেন, তবে কি সে নগ্নরূপ আর মানবদেহের অবয়ব-সংস্থানগত বিশুদ্ধতা, শ্রী এবং স্বাস্থ্যকে অনায়াসে প্রকাশ করতে পারবে। তখন শ্লীলতার এবং সভ্যতার পরিচয়-চিহ্ন ঐ পাদুকা এবং উষ্ণীষ, সৌন্দর্যের মধ্যে কুৎসিতের ইঙ্গিতবহ হয়ে দাঁড়াবে। সৌন্দর্যতত্ত্বের দিক থেকে ভাস্কর্যের এই রূপান্তরিত আবির্ভাবকে আমরা অশ্লীল বলব। কেননা নগ্নমূর্তির প্রাথমিক আবির্ভাবে প্রকাশের যে একসুর তা রূপান্তরিত দ্বিতীয় আবির্ভাবে বিচলিত। যোজনা যখন এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের সুষমা বা সঙ্গতি পায় না, তখন দর্শকের দৃষ্টি ঐক্যানুভূতির ইচ্ছেটি হারায়। দর্শক সর্বাঙ্গসৌষ্ঠব না দেখে প্রত্যঙ্গবাচী হয়ে পড়ে, নিরপেক্ষ রূপাগ্রহ তখন প্রখর দেহ-সচেতনতা নিয়ে কতকগুলি কুশ্রী কৌতূহলের উদ্দীপক। শ্লীলতার সূচক এই পাগড়ী আর পাদুকাই রূপের ঐক্য নষ্ট করে অসঙ্গতির সৃষ্টি করে, এই সভ্য বস্তুদুটিই এক্ষেত্রে আমাদের মনকে নিরাবিল থাকতে দেয় না।

এ মানদণ্ডে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য বিচার করলে হয়ত আমরা আপাত ধারণাজাত অশ্লীলতাটুকু নিতান্ত নগণ্য করেই দেখতে পাবো। কাব্যের সূচনায় 'জন্মখণ্ড' থেকে কবি-ব্যবহৃত সর্ব প্রথম উপমাটি উদ্ধৃত করছি, কংস বধের দ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করতে কৃষ্ণের আবির্ভাব-সংবাদে উল্লসিত নারদমুনির ছবি,

> নাচএ নারদ ভেকের গতী
> বিকৃত বদন উমত মতী ॥
>
> ....

> মেলে ঘন ঘন জীহের আগ।
> রাজ কাছে যেন বোকা ছাগ॥
> দেখিয়া কংসেত উপজিল হাস।
> ....

এবার কাব্যের উপসংহারে 'রাধাবিরহ' থেকে কবির সর্বশেষ উপমাটি সংগ্রহ করি। রাধার প্রতি সম্প্রতি নিরাসক্ত কৃষ্ণ বড়ায়িকে বলছে,

> বাধিকা লাগিআঁ মোক না কব শকতী॥
> কাটিল ঘাঅত লেবুবস দেহ কত।
> তোহ্মাব বিদিত মোব বাধা বুইল যত॥

প্রথম উপমাটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ঋষি নারদের পৌরাণিক আভিজাত্য অস্বীকার করে, তপঃসিদ্ধ মুনির মানসম্ভ্রমটুকু জলাঞ্জলি দিয়ে বড়ু চণ্ডীদাস তাঁকে এক গ্রাম্য বাউল-ফকিরের রূপে উপস্থিত করেছেন। 'ভেকের গতি'তে 'বোকা ছাগে'র মত যার হর্ষ-প্রকাশের রীতি বীভৎস, আর যাই হোক না কেন, স্থূল রুচিহীনতা তার সর্বদেহেমনে। দেবোপম কোন চরিত্র-চেষ্টা এখানে যে উপস্থিত নেই, নিঃসংশয়ে সে কথা বলা চলে। গ্রাম্যমানসের দ্বারা গৃহীত নারদমুনির এই যে রূপান্তর, তার মধ্যে চরিত্রের হাস্যকর চপলতা এক লহমায় উজ্জ্বল।

এরপর রাধাপ্রেম-বিতৃষ্ণ কৃষ্ণ-কথিত উপমা বিচার করা যাক। 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে', বাক্‌ভঙ্গিটি বাঙলাদেশে বহুকাল প্রতিষ্ঠিত একটি প্রয়োগ-বাক্য। কৃষ্ণ রাধার আচরণে কতটা বিবক্ত ও মর্মাহত হয়েছেন, উপমাব দ্বারা সেই কথাটাই খুব ঋজু ও প্রত্যক্ষ উপায়ে বুঝিয়ে দেওয়া হল। উপমানের অতিপরিচিত ইঙ্গিত সরাসরি রেখাকারে পাঠকেব প্রাণে কৃষ্ণের অভিপ্রায়ের মর্মবোধ ঘটিয়ে দিল।

বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ-কথাকীর্তনের প্রেরণা দেববোধজাত ভক্তিভাব অথবা কবিকর্মগত শিল্পবোধ, কোন কিছুই নয়। এ কাব্যের প্রাপ্ত অংশের সূচনা এবং সমাপ্তিই তার প্রমাণ এবং এ দুটির মধ্যবর্তী ধারাটিও এই জাতীয় ভাবরুচিতে গড়া। এখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য থেকে যদি সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণ অংশটুকু বাদ দেওয়া যায়, এবং অবশিষ্ট রচনাংশটি যদি কবির স্ব-ভাব-রচিত ধরে নিয়ে আমাদের পূর্বোক্ত উপমাদুটির সঙ্গে সঙ্গতি দেখান যায়, আর এই সামগ্রিক সঙ্গতি যদি অকারণ এবং আকস্মিক রীতি-

ব্যভিচার না ঘটায়, তবে এ কাব্যকে উপস্থাপনার বিচারে গ্রাম্য বলা চলবে, কিন্তু অশ্লীলতার অপবাদ অকাতরে দেওয়া যাবে না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একখানি লোককাব্য এবং বড়ু চণ্ডীদাস লোকজীবনের কবি। কাব্যে যেখানে কবির নিজস্ব ভাবরুচির স্বাক্ষর, সেখানে প্রতিটি চিত্র, বিবিধ বর্ণনা, বিচিত্র মানবকথা, সব রকমের উপমা-অলঙ্কার আমাদেরই অব্যবস্থিত এবং শিল্পহীন জীবনের আটপৌরে কাহিনীকে রূপদান করে। তার উপর, কবির স্বরচনার ক্ষেত্রটি নাটকাকারে কল্পিত হওয়ায় চরিত্রের তাৎক্ষণিক আচার-আচরণ অথবা বাক্‌বিতণ্ডার বোধ দর্শকের চিত্তে অবিলম্বে ঋজুরেখায় প্রবেশক্ষম।

কাব্যের মধ্যে নাটকীয় উক্তি-প্রত্যুক্তির খরতর গতি সঞ্চার করতে হলে, জীবনাবেগকে সংলাপে চরিত্রবান করে তুলতে হলে, রচনার ভাষাকে এমন একটি প্রসারণশীলতার (Elasticity) অধিকার দিতে হবে, যা আমাদের সংসারের দৈনিক চেষ্টাগুলি রূপবান করে কাব্যের রমনীয়তা বাড়ায়। জীবনে ঘটনার নাটককে চরিত্রময় করে উপস্থিত করার কালে রচয়িতা যদি তাকে কবিতার ভাষায় মূর্ত করতে চান, তা হলে ভাষাকে পক্ষ-সঞ্চারের আকাশ-বাসনা ত্যাগ করে পদব্রজে চলতে হয়। দর্শন করতে করতে দর্শক অথবা শ্রবণ করতে করতে শ্রোতা যেন এ জাতীয় রচনার মধ্যে কেবলমাত্র সেই সব উপমা-অলঙ্কার, প্রবাদ-প্রয়োগ, চিত্ররূপ ইত্যাদি লাভ করতে পারেন, যার দ্বারা তাঁদের সাধারণ জীবনযাত্রার সঙ্গী আচরণগুলি সমর্থন পায়। সে ভাষাকে সতর্ক পদক্ষেপে চলতে হবে, যাতে ব্যবহারিক ভাষার সঙ্গে রচনার ভাষার একটা উৎকট পার্থক্য প্রকাশিত হয়ে দর্শকের বা শ্রোতার আবিষ্ট চিত্তে এ রচনাকে সন্দেহজনক না করে তোলে। কবিতার ভাষায় রচিত হলেও কবিভাবের প্রবলতা এক্ষেত্রে বর্জনীয়। কেবল-মাত্র একটি রুচিময় সংযম-সঞ্চারের কাজে, গভীর মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিপাতের প্রয়োজনে, এবং চরিত্রের অগোচর প্রসাধনে কবিভাবটুকু এই রূপদেহের রক্ষী। এ পদ্ধতিতে নাট্যকাব্যের ভাষা-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হলে রচনার আবেদন শ্রোতা বা দর্শকের মনে অচেতনভাবে একটি বোধের ঐক্যে মিলিত হবে।

> The chief effect of style and rhythm in dramatic speech, whether in prose or verse, should be unconscious.[১]

বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে আমরা এই নিপুণতার পরিচয় পাই। এ রচনার যে অংশ কবির নিজস্ব উদ্‌ভাবন, তার আদ্যোপান্ত কবিভাবের

---

১ The Poetry and the Drama. T. S. Elliot.

আবেশ থেকে মুক্ত হয়ে দ্বন্দ্বময় গতিশীলতায় চিহ্নিত। উপমা-প্রয়োগের স্থূল রীতি, অব্যবস্থিত জীবনের স্বভাবরূপ, রচয়িতার দৃষ্টিশক্তিরই পরিচয় দেয়। যেখানে গ্রামের স্খলিত জীবন-ব্যবস্থা নগ্ন সংলাপে দুর্বার, পাত্রপাত্রীর ইচ্ছা-অভিসন্ধি উপমায় রূপকে আরও তির্যক, সেখানেই বড়ু চণ্ডীদাসের কীর্তি অনুপম।

এবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করব,

আহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম
ছুইলেঁ খাইলেঁ মরী ॥

....

তোহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম
আহ্মেহো ভাল গারুড়ী ॥

ডালিম সদৃশ তন তোহ্মারে।
তাহাতে মজিল মন আহ্মারে ॥
মাহাকাল ফল আহ্মার তনে।
দেখিতেঁ ভাল ভখিতেঁ মরণে ॥

গুণ বুঝি মধুকর পরিহর বন।
আইস বন মাঝে বিকচ নলীন ॥
তোহ্মে তেজীবারে কেহ্নে কর চীত।
নাগর জনের হেন (না হএ) উচীত ॥

....

নিদয়হৃদয় কাহ্ন দয়া কর মোরে।[১]

উদ্ধৃত অংশগুলি যথাক্রমে দানখণ্ড, যমুনাখণ্ড, রাধাবিরহ থেকে নেওয়া। উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলি উপমা-রূপকে বক্তার হৃদয় ব্যক্ত করেছে। আরও দ্রষ্টব্য, কোন উপমাই কবিমনের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য-যোজনার কাজে আহৃত হয়নি। উপমানগুলি হয় আমাদের অতিপরিচিত ব্যবহারিক সংসারসীমা থেকে গৃহীত, নতুবা ক্ষেত্রবিশেষে এগুলি প্রথাপ্রতিষ্ঠ (Traditional) উপমানগোষ্ঠী থেকে গৃহীত। এতে আমাদেরই সাংসারিক জীবনের কতকগুলি অতিগোচর ইচ্ছা-অনিচ্ছা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। কবির সচেতন মনে রাধাকৃষ্ণের ঐশ্বরিকতা

---

১ সমস্ত উদ্ধৃতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে নেওয়া।

প্রবল থাকলেও সংলাপের উপমা-রূপকগত প্রয়োগে রাধা ও কৃষ্ণ সামান্য মানুষ হিসেবেই উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সাধারণ মানুষের ঘরগড়া আশা-স্বপ্নের বিশ্বাস্য ছবি, যা বর্ণনায় রূপের কথা, সংলাপে সক্রিয়তার বেগ, উপমা-রূপকের তির্যক কটাক্ষে মনোভাব ইত্যাদি প্রকাশ করে।

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলি নিয়ে একটু অন্তরঙ্গ পরীক্ষা করা যাক। প্রথম উদ্ধৃতিতে দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণের কামতপ্ত প্রণয়-নিবেদনের সামনে রাধা নিতান্ত কুণ্ঠিতা। কিন্তু কৃষ্ণ অবাধ্য। রাধার অনিচ্ছার যুক্তিকে কৃষ্ণ তার শাণিত উত্তরে বিবর্ণ করে দেয়। উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাস পাত্রপাত্রীর প্রবল মনোবেগের এমন নাটকীয় তন্ময়তা সৃষ্টি করেছেন, যেখানে উপমান-বস্তু (যথা 'কালভুজঙ্গম', 'ভাল গারুড়ী' ইত্যাদি) স্বতন্ত্র ক্ষেত্র থেকে আহৃত হয়েও তার স্বভাব-শক্তি প্রকাশ করার পূর্ণ অবকাশ পায়নি। উপমেয়ের পরিচয়-পরিধি প্রসারিত করার যে শিল্পদক্ষতা উপমানের থাকে, কবি তার একটি লক্ষণকে রচনায় মুক্তি দিয়েছেন, যাকে বলি মানব মনস্তত্ত্বের গভীরতা প্রদর্শনের লক্ষণ। উপমেয়ের অভিপ্রায় স্পষ্ট করাই শুধু নয়, কাব্য-মনোরম করাও উপমানের অন্যতম দায়িত্ব। উপমানের সে দিক কবির প্রয়োগভঙ্গিতে অনুপস্থিত। কথোপকথনের উষ্ণ নাটকীয় আবেগ এমনই প্রবলভাবে শ্রোতার মনকে তন্ময় করে, যেখানে উপমারস আস্বাদন করার মত বিন্দুমাত্রও মন্থরতা নেই। দুটি চরিত্রের ইচ্ছার দ্বৈবথ দ্রুতগতিতে দর্শকের মনকে পরবর্তী ঘটনায় চালিত করে দেয়। উপমার ব্যবহার পাত্রপাত্রীর ইচ্ছার অব্যর্থ যুক্তির মত কেবল সংলাপের দীপ্তি বাড়িয়েছে। কবিমনের কোন আনন্দ-বিস্ময় এ সব উপমাকে সৌন্দর্য-চকিত করেনি। শরের পিছনে পুচ্ছপালকের মত ইচ্ছা প্রকাশের পিছনে এই উপমার সংযোগ তার আবেদনকে আরও ঋজুগতি ও অভ্রান্তলক্ষ্য করেছে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতেও সেই একই ভাব-লক্ষণ প্রকাশিত। উত্তরদানের শাণিত এবং ত্বরিত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে সংলাপ এমনই চমকপ্রদ যে, সাময়িক-ভাবে দর্শক ভুলে যায়, কেবলমাত্র নাটক ছাড়াও এ রচনার মধ্যে তার আরও কিছু প্রাপ্য থাকতে পারে। প্রত্যুত্তর দেবার সময় নায়ক বা নায়িকা কোন নতুন উপমার কথা ভাবতে পারেনি। তাদের উত্তেজিত, বাসনা-বিবশ মনোভাব একই অস্ত্রকে প্রত্যাঘাতরূপে ব্যবহার করেছে। একের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র অন্যের উদ্দেশ্য-সাধনের কাজে নিযুক্ত। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে দেখা যায়, উপমার মনস্তত্ত্ব-প্রকাশক শক্তি। কুণ্ঠিত কৃষ্ণকে আপন ইচ্ছার অনুগামী করতে রাধা কৃষ্ণ-মিলনের আবেগে একথা বলছে। 'পোটলী বান্ধিআ রাখ নহুলী যৌবন',—এই উক্তিতে কৃষ্ণ রাধাকে ধিক্কার দেওয়ার পর রাধা উপমা-চিত্রে আপন যৌবন-

পরিপূর্ণতার ভোগলগ্ন সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে দিচ্ছে। 'নাগর জনের' উচিত্যবোধের ব্যাপার কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার সদ্য পূর্ণতাপ্রাপ্ত যৌবনের দিকে আকৃষ্ট করছে। যেখানে উপমান কতকটা উচ্চতর ভাবভূমি থেকে সংগৃহীত হয়, সেখানে উপমেয়ের তীব্র নাটকীয় নৈকট্যবোধ খানিকটা শিথিল থাকে। কিন্তু যেখানে উপমান এবং উপমেয় একই কামনান্তর থেকে গৃহীত ও যেখানে উপমা-প্রয়োগের মধ্যে একটা দ্রুত প্রয়োজন-সিদ্ধির তাগিদ থাকে, সেখানে খুব আঁট খাপে তলোয়ারের মত এই বঙ্কিম আকৃতিই স্ফুটতর হয়ে ওঠে। রাধার অভিলাষ একান্ত করার কাজে, তার বাক্যকে বোধময় করায় এবং তার গোপনতম বক্তব্য সঙ্কেতে ব্যক্ত করায়--এ জাতীয় উপমার মূল্য অনস্বীকার্য।

রাধাকৃষ্ণের বাসনাতে তাপসঞ্চার করার ব্যাপারে যদি এই পরোক্ষ-ভাষণ যথোপযুক্ত বলে বিবেচনা করি, তবে আমরা এ রচনার মধ্যে মানুষের লৌকিক জীবনাচারের প্রতি কবিমনের গভীর সন্ধানপরতাই প্রত্যক্ষ করতে পারব।

> But if our verse is to have so wide a range that it can say anything that has to be said, it follows that it will not be 'poetry' all the time. It will only be 'poetry' when the dramatic situation has reached such a point of intensity that poetry becomes the natural utterance, because then it is the only language in which the emotions can be expressed at all.[১]

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংলাপ-ভাষা তাই কবিত্বময় নয়, গ্রামের গৃহস্থ-জীবনের চিত্রপরিচয়ে তা গ্রাম্য, এবং গ্রামজীবনের স্থূল আকাঙ্ক্ষার বাহক এর উপমারীতি সেজন্যেই স্থূলের লক্ষণক্রান্ত।

> ......besause of the handicap under which Verse-drama suffers, ...that we should aim at a form of verse in which everything can be said that has to be said, and that when we find some situation which is intractable in verse, it is merely that our form of verse is inelastic.[২]

এ কাব্যের ভাষা ছন্দে পরিকল্পিত। কিন্তু উপস্থাপনার (Presentation) পদ্ধতি নাটকীয় আদর্শে ওতপ্রোত। এ রচনাকে মূলত নাটক বললে অত্যুক্তি হয় না। ঘটনা এবং চরিত্র-প্রকাশের ভাষা, গদ্যের বদলে ছন্দে ব্যবহৃত হয়েও এমন পর্যাপ্ত প্রসারণশীলতা (Elasticity) বজায় রেখেছে,

---

১ The Poetry and the Drama. T. S. Eliot.
২ Do Do Do

যা নাটকের গতিবেগ এবং সংঘর্ষ জ্ঞাপন করেও কাব্যের স্বল্পতম রমনীয়তা হারায় নি। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য তাই লোককাহিনীর সরল আবেদন ও মাধুর্য রক্ষা করেও নাট্যকাব্যও বটে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রসে এবং রুচিতে স্থূল হওয়ার আরও কতকগুলি সঙ্গত কারণ আছে। আমরা পূর্বে এ কাব্যে দেবভাব-নিঃসম্পর্কতা এবং সূক্ষ্ম কবিভাব-বিরলতার কথা উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া, এ কাব্যে যে কয়টি মানব চরিত্র পাওয়া গেছে, তাদের বায়ুমণ্ডল গ্রাম্য রক্ষণশীলতা এবং সংস্কারের দ্বারা রচিত। গ্রাম-বাঙলার অনুন্নত গোপালককুলের জীবনে যে নীতিশৈথিল্য এবং আদর্শদৈন্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব কবি অতিরঞ্জনমুক্ত নির্মোহ মন নিয়ে তার যথার্থ রূপ-পরিচয় দিয়েছেন। রুচিব কৌলীন্য সমাজে বহুতর সুযোগ-লাভের দ্বারা যেখানে বিকশিত হয়, সেখানে যারা শিক্ষায় নিরক্ষর, অর্থে অধমর্ণ, বর্ণে অপাঙক্তেয়, তাদের কাছে অভিজাত রুচির আশা করা দুরাশা মাত্র। বড়ু চণ্ডীদাস এ সমাজতথ্যের অপলাপ ঘটান নি। কিন্তু যেখানে সমাজতথ্যের উপরে মানব-জীবনসত্য উজ্জ্বল, সেখানে,

> তাম্বুলখণ্ডে যে 'চন্দ্রাবলী রাধী'র সহিত প্রথম পরিচয় হইল, সে সংসারানভিজ্ঞা, রূঢ় অথচ সত্যভাষিনী, অশিক্ষিতা গোপবালিকা। কিন্তু কবি প্রত্যেক ঘটনার অসামান্য কৌশলে এই মূঢ় বালিকা-চিত্তের উন্মেষ ও জাগরণ দেখাইয়া যখন পাঠককে শেষ পালায় লইয়া আসিলেন, তখন দেখি, সেই গোপকন্যা কখন যে শাশ্বত রসিকচিত্তবল্লভীর প্রৌঢ় পারাবতী শ্রীরাধায় পরিণত হইয়াছেন, তাহা জানিতেও পারি নাই।[১]

এ কাব্য যে অংশে কবির স্বরচিত, অর্থাৎ সংস্কৃত কাব্য নাটকের অনুকরণ বা অনুসরণ নয়, সেখানে কবির পরিকল্পনা, ঘটনা বিবৃতি, সংলাপ সৃষ্টি, ভাষা-ব্যবহার, ছন্দ-নীতি, পরিস্থিতি গঠন এবং চরিত্র-পরিচয় পরস্পরের সঙ্গে নিয়মিত একটি সঙ্গতির মধ্যে ব্যক্ত। বড়ু চণ্ডীদাসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই এ রচনার সৌন্দর্য, সৃষ্টি এখানে মানব স্বভাব এবং সহজ রূপের মধ্যেই ধন্য। রচয়িতার অদম্য মানব-কৌতূহল এবং জীবন-ঔৎসুক্যই এ কীর্তন-শ্রবণের আনন্দ।

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। শ্রীসুকুমার সেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বৈষ্ণব কবিতায় উপমার অবকাশ

মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যসাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীই প্রথম যেখানে ব্যাপকভাবে ভূমির সঙ্গে ভূমার, উপাসকের সঙ্গে ঈশ্বরের মিলন। পদাবলীর বিশাল আয়োজনে মানুষের নতশির অদৃষ্ট প্রথম মাথা তুলতে পেরেছে। এই ভাবপর্যায়ে ঈশ্বর আর আকাশের অদৃশ্য অধিবাসী রইলেন না। নিষ্ঠুর নিয়তির মত পদে পদে তিনি আপন খেয়ালে মানুষকে অসহায় করলেন না। বরং জীবন-সাধক মানুষের গৃহাঙ্গনে তাঁর মরমী লীলা দেখা গেল। যেখানে তিনি কখনো প্রভু, কখনো সখা, কখনো পুত্র অথবা প্রিয়। বিভুস্পর্শ মানুষের জীবন-মান বাড়িয়ে দিল। যে কণ্ঠ এতকাল নিয়তি-মূর্তি দেবতার কঠোর দণ্ডে হতবাক ছিল, এ সাধন-পর্যায়ে তা-ই ভাবের কথায় অজস্র হল। পরশ পাথরের গুণ যেমন নতুন সোনায় মাখামাখি থাকে, তেমনি বৈষ্ণব ভাবচর্যায় জাগ্রত নতুন জীবনে ভগবৎ-স্পর্শটিও মাখামাখি হয়ে আছে। অলৌকিক স্পর্শমণি কৃষ্ণের নৈকট্য মানুষকে নতুন এক ভগবানের ভাবনায় নিযুক্ত করেছে। আমরা এখানে বৈষ্ণবীয় ঈশ্বরচিন্তার একটি ঐতিহাসিক বিতর্ক-কৌতুক উপস্থিত করছি। শরৎকালীয় মহারাস বর্ণনায় শ্রীশ্রী পদকল্পতরু-কার শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটি পদ উদ্ধৃত করেছেন,

> অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো
> মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা।
> ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগো
> বেণুনা সংজগৌ দেবকী-নন্দনঃ।।

এই ভাগবতীয় শ্লোকের শ্রীধরস্বামি-কৃত ব্যাখ্যার আভাসে বোঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া দ্বারা যুগপৎ বহু মূর্তি পরিগ্রহ করে এ লীলা-কার্য সাধন করেছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণলীলার বিশেষদর্শী সনাতন গোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী শ্রীকৃষ্ণের মধুর ভাবাত্মক ব্রজলীলায় ঐশ্বর্যপ্রকাশ অযৌক্তিক মনে করে ব্যাখ্যা করেছেন যে, বস্তুত একই কৃষ্ণ নৃত্যপটুতায় একই সময়ে সকল গোপীদের নিকটে আছেন বলে অনুভূত হয়েছিলেন। আসলে মতবিরোধটি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য-রসের ব্যাখ্যা নিয়ে। কিন্তু প্রণিধান করলে এ বিতর্কের বিশেষ কোন সার্থকতা দেখা যায় না। কারণ নৃত্যকুশলতা অলৌকিক না হলে একই নৃত্যশিল্পীর

পক্ষে বহুরূপে প্রতীত হওয়া সম্ভব নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় ভাবনাও প্রকারান্তরে কৃষ্ণের অতিপ্রাকৃত পরিচয়কে স্বীকার করে। আমাদের বক্তব্য, সনাতন গোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ইত্যাদি গৌড়ীয় বৈষ্ণব তাত্ত্বিকদের ভগবৎ-ভাবনা-ভঙ্গি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে মানবভাব-মণ্ডিত করে তুলতে উক্ত দার্শনিকরা যে কি গভীরভাবে আগ্রহী, তার নিদর্শন এ দৃষ্টান্তে মেলে। আর এই কৃষ্ণকেই জীবনে আরাধ্যরূপে অঙ্গীকার করে মানুষ নিজের এক নতুন ভাবজীবন গড়ে তুলেছে। রাধাকৃষ্ণের ভাবসুবলিত মানবজীবন-কথাই বৈষ্ণবপদ।

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি।।

কয়েক শত পদকর্তা এবং কয়েক সহস্র পদাবলী নিয়ে বৈষ্ণব ভাবাকাশ তৈরী। এই হাজার হাজার পদাবলীতে এমন একটিমাত্র পদ পাওয়াও দুর্লভ হবে, যা জীবনের দৈনিক তুচ্ছতাব কথায় অতিপরিচিত। অর্থাৎ জীবনের আটপৌরে আচারের পাঁচপাঁচি সুর এর কোথাও নেই। রাধাকৃষ্ণের লীলা-মাধ্যমে যে জীবন-পরিচয় এতে মেলে, তা সর্বাংশেই জীবনের অসাধারণ অধ্যায়ের, অলোকসামান্য মনের কথা। সঙ্কেতকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের যে নিভৃত মিলন, তা-ও যেন পদকর্তার ভাবোল্লাসে বহু জীবনের যোগে কলমুখরিত। শেখর রায়ের একটি পদ,

দুহুঁ দোহাঁ মীলই বাহু পসারি।
দুহুঁ-সুখে মাতল সব কুল-নারি।।
দুহুঁ লই বৈঠলি বকুলক ছায়।
অগোব চন্দন কেহো দেয দুহুঁ-গায়।।
দুহুঁ-পদপঙ্কজে কেহো দেই নীব।
কেহো কেহো বীজই শিতল সমীব।।
....
দুহুঁ মেলি বৈঠল নিভৃত নিকুঞ্জে।
দুহুঁ-গুণ গায়ত মধুকব-পুঞ্জে।।

লক্ষ্য করার বিষয়, যে দু'জনের মিলনসুখে 'সব কুল-নারি' মত্ত সে দু'জনেই 'নিভৃত নিকুঞ্জে'র প্রত্যাশী। আপাতবিরোধী মনে হলেও আসলে কিন্তু কবি-ভাবের উৎসবানুকূলতাই এ পদের মর্ম। এ ভাবমঞ্চের নায়ক, নায়িকা, সখি, সঙ্গ,

পরিবেশ, সঙ্কেতস্থল, আকাশ-বাতাশ, বিপিন-পুলিন, বেশ-ভূষণ,--সব কিছুই জীবনের শ্লাঘ্যতম অথবা উন্নততম মুহূর্তের রূপাঙ্কন। শুধু মিলনেই নয় করুণ বিরহ-লগ্নও কবির উচ্ছল প্রকাশভঙ্গিতে যেন সমারোহময়।

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
....
....
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ কত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি যায়ত ছাতিয়া॥

নির্জন শয়নে অসহায়া বিরহিণী যখন ভবিষ্যৎ সুখের স্বপ্নবয়ন করে, তখনও আপন প্রিয়তমকে স্বাগত জানাবার আয়োজন এবং সেই সঙ্গে আপন নিবেদনের দেবতাকে তুষ্ট করার কত শত অনুরাগ নায়িকার মনে ভ্রমরের গুন্-গুন্ আনন্দের বৃত্ত রচনা করে। বিদ্যাপতি গেয়েছেন,

পিয়া জব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল জতহুঁ করব নিজ দেহে॥
....
....
বেদি বনাব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
কদলি রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র পল্লব তাহে কিঙ্কিণি সুঝম্প॥
নিশি দিশি আনব কামিনি ঠাট।
চৌদিগে পসারব চাঁদকি হাট॥

আবার দীর্ঘ বিরহের শেষে যখন মিলনের লগ্ন আসে, তখনও নায়িকার কণ্ঠে পূর্ব-বেদনার চিহ্নটুকুও থাকে না,

আজু রজনি হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়ামুখ-চন্দা।

সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥

এইসঙ্গে একটু প্রতিবেশ-পরিচয় দিই,

বিকশিত কুবলয় কমল-কদম্ব।
মাধবী-মালতী মিলি তরু লম্ব॥
কাঁহা কাঁহা সারস হংসনিসান।
কাহা কাহা দাদুরী উনমত গান॥
কাহা কাহা চাতক পিউ পিউ ফুর।
কাহা কাঁহা উনমত নাচয়ে ময়ূর॥
গোবিন্দদাস কহ অপরূপ ভাতি।
চৌদিকে বেঢল কুসুমক পাঁতি॥[১]

এ তো গেল নায়ক নায়িকা সখি পরিবেশ ইত্যাদি প্রসঙ্গ। এমনকি কবির কথা, ভাষা ভাব ছন্দ অলঙ্কার, ব্যঞ্জনা সমস্তই জীবনের কাঙ্ক্ষিত আদর্শের আলোয় উজ্জ্বল।

কথা ও ভাষা,

ভ্রমর গাওত মাতিয়া।
কুহরে কোকিল সতত কুহু কুহু
কুহুলিয়া উঠে ছাতিয়া॥

নিম্নরেখ শব্দটির যাদুশক্তিতে ভাবের সবটুকু নীরবতা যেন এক মুহূর্তেই দূর হয়ে যায়। অথচ এটি দ্বাদশ মাসিক বিরহের পদাংশ।

হরি ডরে হরিণী-
হরি-হিয়ে ডোল॥[২]

---

১ গোবিন্দদাস পদাবলী। (বসুমতী সং)।
২ মিলন। বিদ্যাপতি (সাহিত্য পরিষৎ সং)।

প্রথম মিলনের ভীরু শিহরণ রাধার চিত্তকে কি প্রবলভাবে আন্দোলিত করছে, ছন্দের দোলায় এবং শব্দালঙ্কারের নিপুণতায় সে ছবি অত্যন্ত সার্থক।

তাপনি-তীর-তীর তরু-তরু-তল
তরল-তরলতর ছায়।
তরুণ তমাল তরকি তোহে তরখিত
তরুণি তোহারি পথ চায়॥

প্রেমের প্রথমাবস্থা মিলনকে সুনিশ্চিত করে না, অথচ উৎসাহটি বিরহ-ভয়ে ম্লান। প্রিয়তমের পথ চাওয়াতে তরুণী-মনের আশঙ্কার দ্বারাই তার অন্বেষণ-ভঙ্গি এমন ছিন্ন ছিন্ন। প্রথম প্রেমের এ জটিল মনস্তত্ত্ব রাধার নয়নেই প্রতি-ফলিত। আর তারই সামগ্রিক আবেদন শব্দধ্বনির আঘাতে উৎক্ষিপ্ত।

নৃসিংহদেবের পদে ছন্দের সমারোহ,

সংস্কৃত ঘেঁসা

পদ-নূপুর বাজত পঞ্চ-শবং।
কব-বাদন নর্তন গীত ববং॥

বাঙলা রীতি

পদ-নূপুর বাজত পঞ্চবসে।
কিবা বেণু বেয়াপিত দীগ দশে॥

শঙ্করাচার্যের 'মোহমুদ্গরে' ব্যবহৃত ছন্দের অনুরূপ। শেখরের রচনাংশ থেকে আরও একটি উদাহরণ,

কুসুমিত কুঞ্জে। অলিকুল গুঞ্জে॥
মলয়-সমীরে। বহে ধিবে ধীবে॥
রসবতি সঙ্গে। রসময় বঙ্গে॥
ধনি কবি বুকে শূতলি সুখে॥

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' ব্যবহৃত ছন্দের অনুরূপ।
অপর একটি উদাহরণ,

যতনহিঁ নিঃসরু নগর দুরন্তা।
শেখর অভরণ ভেল বহন্তা॥

সদুক্তিকর্ণামৃতে ধৃত প্রাকৃত ছন্দ 'সো মহ কন্তা দূর দিগন্তা........ ইত্যাদির অনুরূপ।

এবার শব্দালঙ্কারের দৃষ্টান্ত,

কুন্দন-কনক-কলিত কব-কঙ্কণ
কালিন্দি-কূল-বিহাবি।
কুঞ্চিত-কচ কেশর-কুসুমাকুল
কুল-কামিনি-কব-ধাবি ॥

শব্দগত ধ্বনিঝঙ্কার ছাড়া অলঙ্কারেব রূপব্যঞ্জনা বৈষ্ণবপদকে গভীর ভাব-মহিমা দিয়েছে,

দেখ সখি ইহ পুন নহ জল কেলি।
শীকব-নিকবহি ঘুমল মদন পব
শব বরিখয়ে দুহুঁ মেলি ॥

ঘনশ্যামদাসের এ পদ জলক্রীড়ার অভিনব ব্যঞ্জনায় মনোহারী, তবু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সেখানেও এমন দুটি একটি মধুব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে ব্রজবুলীর অনন্য গীতিময়তা শতগুণে বর্ধিত। যেমন—'ঘুমল মদন পব'। আমাদের বক্তব্য 'ঘুমল' শব্দটির বিশেষ প্রয়োগ সম্বন্ধে।

ততহু সয়ঁ হঠ হটি মো আনল
ধএল চবণন বাখি।
মধুপ মাতল উডএ ন পাবএ
তইঅও পসাবএ পাঁখি ॥১

একদিকে অনুরাগের লজ্জা, অন্যদিকে প্রিয়-রূপদর্শনের ব্যাকুলতা। হঠদৃষ্টি-রূপ মধুকরকে কৃষ্ণদর্শন-রূপ মধুর লোভ থেকে সরিয়ে এনে রাধা পদতলে বদ্ধ করেছেন। অবাধ্য মধুকর উড়তে পারে না, কেবল শাসন-অসহিষ্ণু পক্ষদুটি (নেত্রপক্ষ্ম) বিধূনিত করে। একদিকে সমাজের বৈধী জীবন-সংস্কার, অন্যদিকে স্বভাবের আত্মমনোরম প্রত্যাশা,—এ ভাবদুটির দ্বন্দ্ব কবি রাধার চোখে ভ্রমরের রূপে এঁকে দিলেন। এখানে নায়িকা অসামান্যা বলেই কবির রূপ-কৌতূহল অসামান্য আবিষ্কারের শ্রম স্বীকার কবেছে।

এইভাবে প্রকাশভঙ্গির প্রথম ধাপ থেকে সুরু করে শেষ ধাপ পর্যন্ত কথাকে শোভন ও রমনীয় মূর্তি দেওয়ার দিকে পদকর্তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। কেননা

১ পূর্বরাগ। বিদ্যাপতি (সাহিত্য-পরিষৎ সং)।

সর্বোপরি ছিল নবলব্ধ এ ভগবত্তাকে রূপবান করার তীব্র কবি-আবেগ। এ যেন জীবনের এক অভিনব উৎসব-লগ্ন, প্রাত্যহিক মন্থরতার বারোমাসী জীবন-যাপন নয়। জীবনের সাফল্যকে অনুভব করার অনুষ্ঠানই উৎসব। ভাগ্যের কৃপণ কবল থেকে যে মানবশক্তি সার্থকতাকে হরণ করে আনলো, তা দিয়েই এর আয়োজন। বৈষ্ণবীয় বায়ুমণ্ডলে বাঙলাদেশ যখন প্রাণের পুনর্জন্ম পেয়েছে, তখনই তার এই পদাবলী-উৎসবের সময়। এরই জন্যে উৎসবমঞ্চ পুষ্পে-পল্লবে সাজানো, বেশ-ভূষায় রত্নমণির কাঞ্চনছটা, আলাপে আচরণে অসামান্য আবেগের শক্তি, মানুষে মানুষে হার্দ্য সখ্যের উত্তাপ,—জীবনের সবটুকু সীমা ও সামান্যতাকে আড়াল করে এক মোহময় উচ্ছলতার জীবনরূপ। বৈষ্ণব পদাবলীর অনিবিষ্ট পাঠকের লক্ষ্য এড়াবে না, যখন বিরহিণী নায়িকাব কণ্ঠ মিলন-জনিত আক্ষেপে শীর্ণ,

শুনইতে অনুখণ যছু তব গুণগণ
শ্রবণ নয়ন ভৈ গেলা।
দরশনে তাকব এহেন লোব ঝব
নয়ন শ্রবণ সম ভেলা ॥
হবি হবি কি ভেল দারুণ কাজ।

তখনও তা এমনই বিশিষ্টভাবে এক অসাধারণ বেদনার কথা বলে যার গভীরতা ও ব্যাপকতার সঙ্গে সাধারণ বিরহের কোন মিল পাওয়া যায় না। প্রথম পদটিতে অনুরাগ এবং আক্ষেপের অতিশয়িত উক্তি, প্রত্যাশা ও কাতরতা এতই গভীররূপে সম্মিলিত যে সমগ্র রাধাহৃদয় আবেগ-মাধ্যমে কবির আপন হৃদয় হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত বলি, বৈষ্ণবপদ পড়তে পড়তে স্বতঃই মনে হয়, চৈতন্যদেব যেমন ভক্তিচর্চার মধ্যে দিয়ে রাধাভাব অঙ্গীকার করেছিলেন, বৈষ্ণবপদকর্তারাও তেমনি রূপ-শিল্পচর্চার মধ্যে দিয়ে রাধাভাব অঙ্গীকার করেছিলেন। অর্থাৎ বৈষ্ণব সাধনায় মহাপ্রভু যেমন রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত, বৈষ্ণব শিল্পকর্মে কবিরাও ঠিক তেমনই রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত।

বলা বাহুল্য, নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের পারিভাষিক অর্থে আমরা সদ্যোক্ত বাক্য উচ্চারণ করিনি। আসলে, লীলারস-ভাবনার তীব্র আকর্ষণে বৈষ্ণবকবি বর্ণনীয় নায়ক-নায়িকার কেলি-বিলাসের সঙ্গে শাস্ত্রোক্ত 'সাধারণীকরণের' বলে একীভূত হয়েছিলেন, আপন রূপানুভূতির মধ্যে। বৈষ্ণবকবি রাধা-কৃষ্ণের সখীস্থানীয় লীলাসঙ্গি ও লীলাসাক্ষী,—এ কবিপদবী মনে রেখে উপরোক্ত মন্তব্য করার অর্থই হল, কবিরা গাঢ় উপলব্ধির দ্বারা কত গভীরভাবে লীলা-

তদ্গত হতে পেরেছিলেন। সুতরাং মন্তব্যের দ্বারা কৃত 'বৈষ্ণবাপরাধ' আপাত-মাত্র, প্রকৃত নয়।

নায়িকার কণ্ঠ যখন বিরহের বেদনায় মন্থর,

মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহানল
হেরি নব নীরদ-পাঁতি।
নীরদ-মুরতি নয়নে যব লাগয়ে
নিঝরে ঝরয়ে দিন রাতি।।

কবি গোবিন্দদাসের দ্বাদশ মাসিক বিরহের পদ। রাধাহৃদয়ের করুণ দুঃখ-বর্ণনায় কবি নায়িকার অনুভবে অতুলন এক সংশয় উপস্থিত করেছেন। নীরদ-পঙক্তি (মেঘ) অথবা নীরদমূর্তি (কৃষ্ণ), কোন্‌টির যথার্থ দর্শন রাধাহৃদয়ের দ্রাবক। এ কি দর্শনজনিত বিরহিণীর অশ্রুপাত অথবা আষাঢ় মাসের স্বাভাবিক বর্ষা। প্রকৃতি আর মানুষে, নিয়মে আর অনুরাগে এমন মাখামাখি কবিভাবনার দরদ এইভাবেই প্রকাশ পেতে পারে। পদকল্প-তরুর সম্পাদক শ্রীসতীশচন্দ্র রায় বলেছেন, 'আমাদিগের বিশ্বাস, এই একটিমাত্র পদই গোবিন্দদাসকে জগতে মহাকবি বলিয়া প্রমাণিত করিতে পারিবে'।[১] এককথায় পদাবলী-চিত্রে বিফল মানুষটিও মনের এমন মহত্ত্ব ও মমতা দিয়ে গড়া, যাকে সহজেই জীবনে ভাগ্যহত বাছপড়াদের দলে ফেলা যায় না। রাখালিয়া খেলায় অনল-যৌবন কৃষ্ণের আচরণ পাঠকের মনে অশ্রদ্ধা জাগাতে পারতো। সনাতন গোস্বামীর পদাংশ উদ্ধার করে,

কুটিলং মাধব- লোক্য নবাম্বুজ-
মুপরি চুচুম্ব স বঙ্গী।
তেন হঠাদহ- মভবং বেপথু-
মণ্ডল-সঙ্কুলদঙ্গী।।
....
....

দাড়িম-লতিকা- মনু নিস্তল-ফল-
নমিতাং স দধে হস্তম্।
তদনুভবান্মম ধর্মোজ্জ্বলমপি
ধৈর্য্য-ধনং গতমস্তম্।।

১ টীকা। শ্রীশ্রীপদকল্পতরু।

কিন্তু বদলে যে ভাবটি স্থায়ী, তা একান্তভাবেই বিভুপরবশ। এছাড়া বৈষ্ণব কবি হিসেবে তৃণের মত নম্রতা এবং তরুর মত সহিষ্ণুতার ভাবদীক্ষা থাকা সত্ত্বেও কবি বৃন্দাবনদাস যখন চৈতন্য-ভাগবতের পদে পদে বলেন, 'তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে,' তখনও পাঠক সে কবিকে দীক্ষাভ্রষ্ট অনধিকারী ভেবে অবহেলা করে না, বরং তাঁর বৈষ্ণব-উন্মাদনার মনটিকেই প্রশংসা করে থাকে। এ সব কথা বলার অর্থই এই যে, এক অসাধারণ জীবনপুলক মানবমনের দেবভক্তিকে আশ্রয় করে বৈষ্ণবযুগে প্রকাশিত হয়েছিল। আর সেই অসাধারণ মানসক্রিয়ার প্রকাশ পূর্ণাঙ্গ করতে বৈষ্ণবকবি যে সব উপাদান গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর সেই অতিশয়িত আবেগ এবং অতিরিক্ত ব্যাকুলতার রূপবহ হতে যে সব শিল্পবস্তু নিযুক্ত ছিল, তাদের মধ্যে প্রথমেই উপমাশিল্পের নাম করতে হয়।

বৈষ্ণব পদাবলীতে অক্ষরসজ্জা, শব্দগঠন এবং ভঙ্গিপ্রণয়ন, এক কথায় ভাষাব্যবহার বাঙলা থেকে স্বতন্ত্র। যে ছন্দ মূলত এ সব রচনাকে কবিতার শরীর দিয়েছে, তা-ও চলতি বাঙলা-ছন্দ থেকে আলাদা। কবিদের প্রকাশভঙ্গি এমনই প্রবল এবং অবিরত যে তার পরিচয় অন্য কোন জাতীয় রচনায় দুর্লভ। কবিকণ্ঠের আবেগ এবং হৃদয়াকুলতা এতই জীবন্ত যে, সামান্য কথাটুকুও এ রচনায় মহামূল্য। কবিদের অনুভূত বিষয়বস্তু ও ভাবভিত্তি ধর্মভীরু বাঙালী সমাজ জীবনে এত অভিনব যে, সময় সময় তা বিদ্রোহাত্মক বলে মনে হয়। উপমা-অলঙ্কার ব্যবহারেও এমন একটি দীপ্তি এবং রসময়তা এসেছে, যা অতি সহজেই অন্তরে এক নতুন আনন্দলোকের সন্ধান দেয়। এবং সর্বোপরি এর ফলশ্রুতি মহত্ত্ব দিয়ে আমণ্ডিত। এককথায় পদাবলীর রূপকর্ম ও ভাবকর্ম সর্বব্যাপী একটি নবীনতা লাভ করেছে। এমন অজস্র অবিরল কথা কওয়ার আনন্দ, একই চিন্তাকে এমন বিচিত্র করে ভাবার ভাবুকতা, একই জীবনের মধ্যে এত অসংখ্য রহস্য সন্ধানের শ্রমস্বীকার এবং সব কিছুর মধ্যে মৃদু একটি মমতার ভাবকে সদা সঞ্চারিত রাখা,—এ বিপুল প্রাণের পরিচয় শুধু উজ্জীবন-পর্বেই সম্ভব। বৈষ্ণবপদাবলীর সর্বত্রই একটি সবেগ বেদনা বয়ে চলেছে, তা সুখের হোক, তা দুঃখের হোক। আমরা তাই এ রচনাকে উৎসব মুখর কাব্য বলেছি। উৎসবে যেমন প্রয়োজনের চেয়ে প্রচুরের দিকে নজর বেশি, পরিমিতের চেয়ে অতিরিক্তের, সহজের চেয়ে সাজসজ্জার, সাধারণ প্রাত্যহিকতার চেয়ে বিশিষ্ট নৈপুণ্যের, বৈষ্ণবপদে তার যথার্থ প্রকাশ। আমাদের আলোচনা উপমা নিয়ে, যা এই সুমহৎ আয়োজনের একটি মূল্যবান অঙ্গ।

মানুষের মুখের ভাষা মানে দিয়ে বাঁধাধরা। তার বিস্তার নেই, সঞ্চার নেই।

গভীরকে জ্ঞাপন করার শক্তি তার নেই। বিশেষত ভাবুকমনের অনুভূতি প্রকাশ করার প্রয়োজন যখন হয় প্রচলিত কথা-কওয়ার রীতিকে তখন নতুন চালে চলতে হয়। তখন আর গদ্যে পদাতিক হওয়া নয়, ছন্দে অশ্বারোহী হওয়ার দরকার। আবার ছন্দের সুষম তরঙ্গ ভাবগভীরতার একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত আলোকিত করতে পারে, তারপরে সে অপারগ। সেখানে ছন্দের সঙ্গে অন্য কোন ব্যবস্থাকে বহাল করতে হয়, তা উপমা। যে ভাব শুধু কথায় ফুটলো না, উপমার সাহায্য নিয়ে তাকেই আমরা ফোটাই। আমাদের বাক্যবন্ধে দৈনিক এ নিয়ম দেখছি। কবিতার ক্ষেত্রে কথাকে শুধু স্পষ্ট করাই নয়, সুন্দর করাও দরকার। কবিতার প্রকাশভঙ্গিতে সুন্দরের সম্পূর্ণতা আনে উপমা। বৈষ্ণব কবিতায় এর প্রয়োগ অগণিত। অপারগ মুখের ভাষার সীমা প্রকাশ-ব্যাকুল কবিকে নিত্যই পীড়া দেয়, কবিও উপমার আশ্রয়ে তাঁর অসংখ্য ব্যথা-বেদনার রূপমূর্তি গড়তে চেষ্টা করেন, রূপ সুন্দরকে জাগিয়ে দিয়ে পাঠকের বিশ্বাস কাড়ে, আনন্দ দিয়ে যায়। বৈষ্ণব ভাবাকাশে মানুষ তার হৃত জীবন-প্রত্যয় নতুন করে ফিরে পেয়েছে। দেবতার রোষে এতদিন যে কণ্ঠ নির্বাক ছিল, তা হঠাৎ কলমুখর হয়ে উঠলো। অনেক দুঃখে দীর্ঘকাল মৌন থাকার পর নতুন পাওয়া সুখের কথাটি যেমন হাজারবার বলেও ফুরোয় না, বলার ব্যাকুল আগ্রহ যেমন একমাত্র হয়ে ওঠে, বৈষ্ণব কবিদের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার ঘটেছে। সেই অফুরন্ত আবেগ আর অনর্গল বাক্‌চেষ্টার তাগিদেই অসংখ্য উপমা এল, কবিমনের মমতায় গড়া মর্মটুকু স্পষ্টরূপে সুন্দরের রূপে জাগিয়ে দিতে। বৈষ্ণবপদের ছত্রে ছত্রে উপমার এই যে আতিশয্য, এ কেবল দীর্ঘনিরুদ্ধ প্রাণে হঠাৎ-মুক্তির ব্যাকুলতা মাত্র। গোবিন্দদাস গেয়েছেন,

কুঞ্চিত-কেশিনি নিরুপম-বেশিনি
রস-আবেশিনি ভঙ্গিনি রে।
অধর-সুরঙ্গিণি অঙ্গ-তরঙ্গিণি
সঙ্গিনি নব নব রঙ্গিণি রে।।

উক্ত পদে কেবলমাত্র রাধার রূপাভিসার-কথাই পাই না, সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবীয় শিল্প-ভাবুকতারও রূপাভিসার দেখি।

আমাদের দেশ ভক্তিবাদী। কিন্তু ভক্তিচর্চার পথে দীক্ষিত মনের জ্ঞান-ক্রিয়াই এতকাল আধিপত্য করেছে। তত্ত্ব ও দর্শনের সূক্ষ্ম তর্কের জালে মানুষের প্রাণ রসহীন জ্ঞানবাদকেই ভক্তির ভিত্তি বলে জেনেছে। এমনকি অন্ত্যজ মানুষের ভাবচর্চার মধ্যেও এক অপ্রকাশ্য জ্ঞানের অভিমান (চর্যাপদ

স্মর্তব্য) বড় হয়ে উঠেছিল। এই পণ্ডিতী ভক্তির চাপে মানুষের সহজ আবেগ প্রতিমুহূর্তেই হতাশ হচ্ছিল। কিন্তু ভাগ্য চিরকালই এক খাতে বয় না। দেশীয় চিন্তায় ভাবান্তর এল। আমাদের পূর্বতন ভক্তিচর্চায় জীবনের রূপস্পর্শ ঘটে গেল। এতকাল যে ভক্তি অশরীর চিন্ময়মাত্রের উদ্দেশ্যে অর্পিত হচ্ছিল, রাধাকৃষ্ণের মানবীয় এবং শরীরী প্রকাশই এ পদপর্যায়ে সে ভক্তির ভাজন হয়ে উঠলো। ভক্তির পাত্রকে যখন আকারে অবয়বে পাওয়া যায়, তাদের লীলা যখন মানব জীবনের অনুরূপ বলে অনুভূত হয়, তখনই অন্তরের অর্গলিত আবেগ আপন স্বভাবের প্রবাহপথ পেতে পারে। এ প্রসঙ্গে উদ্ধবদাসের একটি পদ স্মরণ করি। স্বরূপশক্তি বিভু-কৃষ্ণ একদিকে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা, অন্যদিকে তিনি মা যশোদার স্নেহের দুলাল। জননীর স্নেহদৃষ্টিতে বৎস-কৃষ্ণই একমাত্র সত্য, তার বিশ্বরূপ-বিভূতি মায়ের চোখে প্রহেলিকার মত।

বদন মেলিয়া গোপাল বাণী পানে চায়।
মুখ মাঝে অপরূপ দেখিবারে পায়॥
এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দ ভুবন।
সুরলোক নাগলোক নরলোকগণ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গোলোক আদি যত ধাম।
মুখের ভিতর সব দেখে নিরমাণ॥

কিন্তু এই অনন্তদর্শনে জননী-তৃষ্ণার স্নেহাশ্বাস কৈ,

দেখি নন্দ ব্রজেশ্বরী বচন না স্ফুরে।
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিলুঁ হেন মনে করে॥
নিজ প্রেমে পরিপূর্ণ কিছুই না মানে।
আপন তনয় কৃষ্ণ প্রাণ মাত্র জানে॥
ডাকিয়া কহয়ে নন্দে আশ্চর্য বিধান।
পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে কর দান॥

সীমাবদ্ধ মানুষের বিচিত্র মমতার মধ্যে নিরাকার সচ্চিদানন্দ এমন করেই রূপবদ্ধ হলেন। জ্ঞানক্রিয়ার জটিল যুক্তিতর্ক ক্রমে অপসারিত হয়ে এক সাকার বিগ্রহ গড়ে উঠলো, ভক্তের ভগবান রাধাকৃষ্ণের মধ্যে। অপার্থিবের রূপকর্মে মানব-ভাষা তার ভক্তি ও আত্মনিবেদনে উপমার শরণ নিল। বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব ও রস-শাস্ত্রে কৃষ্ণের প্রণয়-বিকৃতি-রূপ হলাদিনী এবং আরাধিকা-শক্তিই শ্রীরাধা। এ লীলা নিত্যকালীন হয়েও (তত্ত্বের দৃষ্টিতে) মানব-ব্যবহার-বিধির সীমার মধ্যে ধরা দিয়েছে। লীলারস-পর্যায়ে তা কখনো অনুরাগ কখনো আক্ষেপ,

কোথাও কোপ কোথাও মান, এবং বিরহ অথবা মিলন। আমরা এখানে গোবিন্দ-দাসের একটি পদ উদ্ধৃত করব, যার মধ্যে উক্ত তত্ত্বচিন্তারই জীবনরূপ-ভাষ্য স্পষ্ট।

নখ-পদ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জলত হামারি॥
অধরহিঁ কাজর তোর।
বদন মলিন ভেল মোর॥
হাম উজাগরি রাতি।
তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি॥
কাহে মিনতি করু কান।
তুহুঁ হাম একই পরাণ॥
হামারি রোদন-অভিলাষ।
তুহুঁ কহ গদগদ ভাষ॥
সবে নহ তনু তনু সঙ্গ।
হাম গোরি তুহুঁ শ্যাম-অঙ্গ॥[১]

কেবল লীলার প্রয়োজনে দেহভেদ মাত্র, মূলে দুজনেই অভিন্ন-প্রাণ। তাই এক-জনের দেহস্থিত কারণে অন্যজনের দেহে সেই কারণের নিয়মিত ফল উৎপন্ন হয়েছে। এটি অসঙ্গতি অলঙ্কার। অবশ্য এ পদে জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দে'র একটি পদাংশের ছায়া আছে,

দশনপদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদম্।
কথয়তি কথমধুনাপি ময়া সহ তব বপুরেতদভেদম্॥

এই বপু-ভেদ ও অভিন্নহৃদয়ত্ব প্রাক্‌চৈতন্য চিন্তায় থাকলেও এ সম্বন্ধে এক পরিপূর্ণ মানবরূপকল্পনা বৈষ্ণব ভাবাকাশেই সমগ্র হয়েছে। জ্ঞানগৌণ এই সাকার এবং মানবীয় বৈষ্ণবভক্তি-চর্চায় উপমার অবকাশ তাই অজস্র। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত বৈষ্ণব ভাবাকাশেই লেখা জীবনীগ্রন্থ। অথচ পদাবলীর মত রূপশিল্পনিপুণতা এতে নেই। পদাবলীর চৈতন্যবিষয়ক পদে ছোট কবিদের লেখায় যতটুকু শিল্পকর্ম, ততটুকুও যেন চৈতন্যচরিতামৃতে নেই। আর যৎসামান্য যেটুকু মেলে, তার উপমা-গঠনপদ্ধতি, রূপব্যঞ্জনা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের। চৈতন্যচরিতামৃত বৈষ্ণব-বিভাবিত হলেও মূলে দার্শনিক

১ সবগুলি বৈষ্ণবপদ শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত শ্রীশ্রীপদকল্পতরু সঙ্কলন-গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

গ্রন্থ। জ্ঞানক্রিয়াই সেখানে মানব-চৈতন্যকে ঈশ্বর এবং চিন্মাত্র-চৈতন্যে রূপান্তরিত করেছে। তাই সেখানকার যৎকিঞ্চিৎ উপমাচেষ্টায় রূপের বদলে যুক্তি বড়, সুন্দরের চেয়ে দার্শনিক তর্কের যথার্থতা লাভই একমাত্র। ঐশী ভক্তি যখনই সাকার মানবীয় রূপের অবলম্বন পায়, তখনই তা রসরিক্ত জ্ঞানচর্চার পথ ছেড়ে আবেগ প্রবল রূপনির্মাণের পথ নেয়। পদাবলীর ভক্তিযোগ মূলত রাধাকৃষ্ণের মানবীকৃত রূপকল্পনায় মত্ত এবং চৈতন্যের মর্তলীলার প্রত্যক্ষদর্শী। ভক্তির দ্বারা উদ্রিক্ত হৃদয়াবেগ বৈষ্ণবপর্বে আলঙ্কারিক রূপকর্মের প্রসাদপুষ্ট।

বৈষ্ণব উপমায় নিসর্গ প্রকৃতি

কবির ভাবকল্পনাকে রূপময় করতেই কালে কালে উপমা অলঙ্কারের ব্যবহার। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যেও যেমন, প্রাচীনকাল থেকে সুরু করে আধুনিক বাঙলা কাব্য পর্যন্ত তার নিয়ম অপরিবর্তিত। আবার শুধু সংস্কৃত-প্রাকৃত-বাঙলা কাব্যেই নয়, দেশী বিদেশী সকল কালের সব ভাষাতে এই একই পদ্ধতি। কিন্তু উপমা ব্যবহারের বিশিষ্টতা এক এক কালে ভিন্ন ভিন্ন ভাবভূমিতে স্বতন্ত্র। অর্থাৎ, সংস্কৃত কাব্যে উপমা-প্রয়োগ যেমন, বৈষ্ণবকাব্যে ঠিক তেমন নয়। আমাদের এ পর্যায়ের আলোচনা উপমায় নিসর্গ প্রকৃতির অবস্থান-ভঙ্গি নিয়ে। সংস্কৃত কাব্য, বিশেষত কালিদাসের রচনা এ পর্যায়ে বিশেষ ভাবে স্মর্তব্য এ কারণেই যে, কালিদাসের সংস্কৃত উপমার উপাদান-বস্তুগুলির সঙ্গে বৈষ্ণবীয় উপমার উপাদান-বস্তুগুলি অনেকাংশে এক। উপমাক্রিয়ায় উপমেয়-পক্ষ এবং উপমান-পক্ষ যে সব রূপ-সাদৃশ্যে সংস্কৃত কাব্যকে চমৎকৃত করেছে, সেই সব উপমেয় উপমানই পদাবলীকাব্যে ব্যবহৃত। আমাদের বক্তব্য, বস্তুগত দিক থেকে উপমায় প্রথানুসরণ আছে, কিন্তু প্রয়োগের স্বকীয়তা সেই পুরোনো প্রথাকেই এক নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছে। আলোচনার প্রথমেই একটি কথা স্মরণে রাখতে চাই। বৈষ্ণব পদাবলীতে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন কেবল নিসর্গ প্রকৃতির উপমাশ্রয়ী রূপবর্ণনা নেই, যা অনুকূল পরিবেশ এবং আবহ রচনায় দক্ষ। পদাবলীর নায়ক-নায়িকা-সখি ইত্যাদি পাত্র-পাত্রীদের ভাব-কলা এতই মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীল, এবং কবিরা চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিকারগুলির রহস্য উদ্ধারে এমনই গভীরভাবে সন্ধানপর যে, তাঁদের পরিপূর্ণ মনোযোগের অতি সামান্য অংশমাত্র তাঁরা নিসর্গ প্রকৃতি সম্বন্ধে অবশিষ্ট রাখতে পেরেছেন। প্রায় সর্বত্রই দেখা যাবে, রাধা কৃষ্ণ অথবা সখির একক কিম্বা পারস্পরিক ভাবাকুলতায় নিসর্গ প্রকৃতি সুখ-দুঃখের প্রতি-ফলক হয়ে আছে।

খেনে খেনে সকল কুসুম-মন তোষয়ে
নিশি রহু কমলিনি সঙ্গে।
চম্পক এক যদপি নাহি চুম্বই
ইথে লাগি নিন্দহ ভৃঙ্গে।।

অতিশয়োক্তিমূলক সমাসোক্তি অলঙ্কারে গড়া পদটিতে নায়ক-নায়িকার লীলা-

বিলাস কত সূক্ষ্মভাবে ভৃঙ্গ-কুসুমের চেষ্টা-বর্ণনার মধ্যে প্রতিফলিত। কালি-দাসের কাব্যে নিসর্গ প্রকৃতির প্রয়োগ কিন্তু অন্য ধরনের।

তং স্বসা নাগ-রাজস্য কুমুদস্য কুমুদ্বতী।
অন্বগাৎ কুমুদানন্দং শশাঙ্কমিব কৌমুদী ॥১

স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে, দুটি পৃথক বাক্যে উপমেয়-পক্ষ এবং উপমান-পক্ষকে স্থাপন করে সাদৃশ্য বর্ণনা করা হচ্ছে।

অথ মদনবধূরুপপ্লবান্তং ব্যসনকৃশা পরিপালয়াম্বভূব।
শশিন ইব দিবাতনস্য লেখা কিরণ-পরিক্ষয়-ধূসরা প্রদোষম্ ॥২

এখানেও সেই একই উপমা-প্রক্রিয়া। উপমেয়-পক্ষের রূপ-নির্মিতি এমনই সম্পূর্ণ যে, উপমান-পক্ষ থেকে আদর্শ-প্রত্যাশার ইচ্ছে যেন মোটেই জোরালো নয়। উপমেয়-পক্ষ এবং উপমান-পক্ষ যেন আপন আপন রূপে-গুণে-মাধুর্যে এক একটি নিজস্ব রূপলোক রচনা করে রয়েছে। প্রস্তুত সেই পক্ষ দুটি দৈবক্রমে যেন কবির অন্বয়-দক্ষতায় পরস্পরের সঙ্গে মৃদুভাবে লগ্ন, এবং পরস্পর-স্পর্ধী দুটি সৌন্দর্য-বিশ্ব যেন সুমহৎ এক ভাবাকাশ নির্মাণ করে বর্তমান। বর্ণিতব্য উপমেয়ের আত্যন্তিক প্রয়োজনে (রূপ-প্রকটনে) উপমানের প্রতীক্ষা অথবা প্রত্যাশা যেন এতে নেই। কালিদাসের কাব্যে উপমান যেন উপমেয়ের-সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতেই (to add to the initial beauty) উপস্থিত, সৌন্দর্য সম্পাদন করতে নয়। এর থেকেই একটি চিন্তা সহজে আসে, কালিদাসের কাব্যে নিসর্গ প্রকৃতি উপমা-প্রক্রিয়ায় কিছুটা নির্লিপ্ত। কিন্তু বৈষ্ণব উপমায় নিসর্গ প্রকৃতির প্রয়োগ স্বতন্ত্র। সেখানে উপমেয়ের রূপগঠনের একান্ত প্রয়োজনে নির্বাচিত উপমান কবিমনে গভীরভাবে প্রত্যাশিত।

অন্তরে আওয়ে আষাঢ়।
বিরহিণি-বেদন বাঢ় ॥

....

নয়ন কমল অতি নিরমল
তাহে কাজরের রেখা।
যমুনা-কিনারে মেঘের ধারাটি
যেন বা দিয়াছে দেখা ॥

১ ১৭শ সর্গ, রঘুবংশ, কালিদাস।
২ ৪র্থ সর্গ, কুমারসম্ভব, ঐ

নিসর্গ প্রকৃতি কি গভীর আবেশে মানবসত্তায় বিজড়িত। বৈষ্ণবীয় উপমার উপমান-পক্ষ আপনার স্বতন্ত্র রূপলোক নিয়ে কেবল ক্ষীণভাবে উপমেয়-পক্ষের সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকে না, কবিমনের আবেগে তা ঘনিষ্ঠভাবে উপমেয়ের মধ্যে মগ্ন হয়ে যায়।

মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহানল
হেরি নব নীরদ-পাঁতি।
নীরদ-যুবতি নয়নে যব লাগয়ে
নিঝরে ঝরয়ে দিন রাতি॥

কালিদাসের উপমায় উপমান-পক্ষও যেন উপমেয়-পক্ষের মত প্রস্তুত এবং নির্ধারিত। প্রবল ধর্মচেতনা এবং ভক্তিবন্যা কালিদাসের কাব্যের কারণ নয়, পক্ষান্তরে শিল্পচেতনাই সেখানে রূপসৃষ্টির নিয়ামক। কুশলী কবির কৃতনিশ্চয়তার তৃপ্তি সে রচনার ছত্রে ছত্রে। অন্যদিকে বৈষ্ণবকবি ভক্তিরসে ও ধর্মভাবাবেগে কবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত। তাই ধার্মিকের ধর্মানুভূতি কবির রূপকর্মদক্ষতায় সঠিক প্রতিফলিত হচ্ছে কি না, তারই অনিশ্চয়তা এবং আকুলতা একাব্যের উপমান-চয়নগুলিকে উপমেয়ের সঙ্গে এত দৃঢ়পিনদ্ধ করে তুলেছে।

কোমল চরণ চলত অতি মন্থর
উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি-পঙ্কজ
দুহুঁ পাদুক করি নেল॥

ধার্মিক মনের কাব্যবেদনা এমনই। এবার নিম্নলিখিত পদটি দেখা যাক,

মোহই মাধবি-মাস।
চৌদিশে কুসুম বিকাশ॥
বিকাশ-হাস বিলাস-সুললিত
কমলিনী-রস জিম্ভিতা।
মধুপান-চঞ্চল চঞ্চরী-কুল
পদুমিনী-মুখ চুম্বিতা॥

পদ্মিনী এবং ভ্রমরের আচরণে পদ্মিনী নায়িকা ও ভ্রমররূপী নায়কের রূপ স্ফুট হওয়ায় সমাসোক্তি অলঙ্কার হল। এ পদ-পর্বের প্রকৃতিবিষয়ক উপমানগুলি নির্লিপ্ত নয়, কবিমনের স্পৃহা সংক্রামিত হয়ে উপমেয়ে উপমানে একাকার

অলঙ্কারগুলিতে একটি মাদকতা এনেছে। এখানে উপমেয়ের অনুল্লেখে যা আপাতদৃষ্টিতে প্রকৃতি-প্রতিবেশ, তা-ই কবির আগ্রহাতিশয্যে এক অনির্দিষ্ট ব্যঞ্জনায় উপমানরূপে বিলম্বিত আত্মপ্রকাশ করেছে। জ্ঞানদাসের একটি পদ,

দিনকর বঁধু কমল সব জানয়ে
জল তোহি জীবন হোয়।
পঙ্কবিহীন তনু ভানু শুখায়ত
জলহি পচায়ত সোয়॥
মানিনি, হাম কহিযে তুয়া লাগি॥

মানিনী নায়িকাকে সখীর উপদেশ। পঙ্কবিহীন হলে পদ্ম আর সূর্যের সখ্য পায় না, অথবা জলও জীবনরূপে তার পক্ষপাতী হয় না। পদ্মের পক্ষে পঙ্কের মত প্রেমিকার পক্ষে অনুরাগই একমাত্র নির্ভর। নিসর্গ-স্বভাবের একটি রূপ-কে উপমান করে কবি রাধার কথাই বলেছেন। অথচ রাধার কথা অনুক্ত থাকলেও কবির রূপস্পৃহা সে উপমেয়কে প্রবল বেগে আকর্ষণ করছে। চিত্রের চেয়ে চিত্রমর্মই এখানে বড় কথা। কবিচিত্তের রূপস্পৃহায় নিসর্গ আর পৃথক থাকলো না। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষনীয়। বৈষ্ণবপদাবলীতে প্রকৃতিবিষয়ক উপমায় উপমেয়-পক্ষ এবং উপমান-পক্ষ অতিবিবৃত নয়। তারা সংক্ষিপ্ত সঙ্কেতে রূপ-কে চকিতদর্শন করে তোলে। বিদ্যাপতি বলেছেন,

লোচন-লোর তটিনি নিরমাণ।
ততহিঁ কমল-মুখি করত সিনান॥

শ্রীরাধার মুখ-পদ্ম নয়নজলে ভাসছে আর পদ্মলতার মত তার দেহ-যষ্টি তাতে স্নাত হচ্ছে। অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের এ প্রকাশভঙ্গিতে রূপবোধ অনেক গাঢ় এবং ঘন। তথাপি অলঙ্কারের আজানুলম্বিত রাজবেশ ভাবাবেগের ত্বরিত গতিকে মন্থর করে না। বৈষ্ণব পদাবলীতে অলঙ্কার অতিবিবৃত উপমার (simile) বদলে রূপক-অতিশয়োক্তির দ্বারাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রকাশিত। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কালিদাসের কাব্যে উপমার (simile) ব্যবহার যত, তুলনায় রূপক ইত্যাদির ব্যবহার তত বেশি নয়। উপমা-প্রক্রিয়ায় উপমেয়-উপমানের স্বতন্ত্র রূপবিস্তার অথবা বিস্তারাভাস কাব্যকে মন্থরগামী করে। কালিদাসের আর একটি উপমা,

নেপথ্যদর্শিনশ্ছায়া তস্যাদর্শে হিরন্ময়ে।
বিররাজোদিতে সূর্যে মেরৌ কল্পতরোরিব ॥১

উপমা-প্রকাশের এই ত্বরাহীন প্রশান্তি কবির সিদ্ধ শক্তির যতটা পরিচয় দেয়, ততখানি সাধ্য উদ্যমের কথা বলে না।

প্রকৃতিবিষয়ক উপমানে কালিদাসের এবং বৈষ্ণবীয় প্রয়োগের পার্থক্য দেখাতে আর একটি কথা আসে। বৈষ্ণবপদাবলীতে নিসর্গ প্রকৃতি ঠিক নির্জীব প্রচ্ছদের মত অথবা উদ্ভিজ্জ পটভূমির মত দূরে অবস্থিত নয়। অলঙ্কারে অর্পিত হয়ে পদাবলীর নিসর্গ, রাধা কৃষ্ণ দূতী ইত্যাদির মত মানব চরিত্রের রূপলাভ করেছে। বস্তুত উপমা-প্রক্রিয়ায় উপমান-পক্ষ যদি অতিসন্নিহিত-রূপে সঙ্কেতময় এবং সংক্ষিপ্ত হয়, তাহলে তা আপন ধর্ম অনেকাংশে বর্জন করে উপমেয়গত মানবধর্মের বর্ণ পায়। চণ্ডীদাসের একটি পদ,

গুরুজন-জ্বালা জলের শিহালা
পড়সী-জীয়ল-মাছে।
কুল-পানিফল- কাঁটায় সকল
সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক-পানায় সদা লাগে গায়
ছানিয়া খাইনুঁ যদি।
অন্তরে বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি॥

বৈষ্ণবীয় উপমায়, আগেই বলেছি, নিসর্গ প্রকৃতি মানবজীবনের সহচর। এবং বেশিরভাগ উপমাই রূপক-অতিশয়োক্তির সাঙ্কেতিক পদ্ধতিতে তৈরী। ফলে উপমান-পক্ষে নিসর্গের নিজস্ব গুণ অপেক্ষা উপমেয়-পক্ষের মানবগুণ বেশি করে আরোপিত হতে বাধ্য। এবং এই কারণেই নিসর্গের মধ্যে মানব-লক্ষণ প্রবল।

সঙ্কেতস্থল, যমুনাপুলিন, কদম্বতলা, রাধার পারিবারিক আবহাওয়া, লোকাপবাদ ইত্যাদি এক একটি চরিত্রের মত উপমার মধ্যে দিয়ে নায়ক-নায়িকার আশেপাশে উপস্থিত। কৃষ্ণ-মিলনে অক্ষমা রাধার আক্ষেপে যে পরিবেশ-মূর্তি দেখি, তাতেই নিসর্গের সজীব চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। কবিভাবের যে উত্তাপ পরমাত্মার চিন্মাত্র স্বরূপকে মানবলীলায় অবতীর্ণ করিয়েছে, সেই উত্তাপেই মৌন নিসর্গ প্রকৃতি সঞ্জীবিত। সাঙ্গরূপকাশ্রিত গোবিন্দদাসের একটি পদ,

---

১ ১৭শ সর্গ, রঘুবংশ।

মাধব মনমথ ফিরত অহেরা
একলি নিকুঞ্জে ধনি ফুল-শরে জর জব
পন্থ নেহারত তেরা ॥
উজোর শশধর দীপ পজারল
অলিকুল ঘাঘর-রোল।
হনইতে হরিণি- নয়নি দরশায়ই
ওহি ওহি পিকু বোল ॥

রাধাকৃষ্ণের লীলাদর্শনে জনস্থান শ্রীবৃন্দাবন কিভাবে ভক্তের সাত্ত্বিকভাব প্রকাশ করছে, তার পরিচয় নিম্নোক্ত পদটিতে পাই। প্রকাশভঙ্গিতে Conceitএর অবকাশও দুর্লক্ষ্য নয়।

শ্রীবৃন্দাবন নিরুপম-শোভন
আনন্দে ফুল ছলে হাস ॥
কোকিল শবদে গভির গদগদ রব
কপোত-শবদে সিতকাব।
মুকুল পুলককুল আসব ঝর ঝর
জনু লোচনে জল-ধার ॥[১]

বৈষ্ণবপদে নিসর্গ প্রকৃতি জীবনের ক্ষেত্রে উদাসীনের ভূমিকা পায়নি। আমাদের বক্তব্য, সংস্কৃতে ব্যবহৃত একই উপমেয়-উপমান নিসর্গের রূপাঙ্কনে বৈষ্ণবপদে নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও নতুন প্রয়োগভঙ্গিতে তা পৃথক এক তাৎপর্যে মণ্ডিত। স্বতন্ত্র ভাবাষঙ্গে প্রথার এই নবায়ন বৈষ্ণবপদের উপমায় উল্লেখযোগ্য।

১ সবগুলি বৈষ্ণবপদ শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত শ্রীশ্রীপদকল্পতরু গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

বৈষ্ণব কবিতায় রূপের প্রবাহ

বৈষ্ণব পদাবলীর উপমা-প্রয়োগের একটি বৈশিষ্ট্য, রূপের প্রবহমানতা। পদের মধ্যে প্রায়ই যে সকল অলঙ্কার দেখা যায়, তা সংক্ষিপ্ত আয়তনেই শেষ। অর্থাৎ, কোন ক্ষেত্রে একটিমাত্র ছত্রে, ক্ষেত্রবিশেষে দুটি ছত্রেই সীমাবদ্ধ। নতুন রূপবিন্যাসের দ্বারা তৃতীয় ছত্রে পৃথক একটি অলঙ্কারের আয়োজন। অর্থাৎ চতুর্দশ ছত্রের (বেশিরভাগ পদ চতুর্দশ ছত্রে লেখা) মধ্যে অন্তত চার পাঁচটি অলঙ্কার থাকেই।

যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনু-জোতি।
তাহাঁ তাহাঁ বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাহাঁ যাহাঁ অরুণ চরণ চল চলই।
তাহাঁ তাহাঁ থল-কমলদল খলই॥

....

....

যাহাঁ যাহাঁ ভঙ্গুর ভাঙু বিলোল।
তাহাঁ তাহাঁ উছলই কালিন্দি-হিলোল॥
যাহাঁ যাহাঁ তরল বিলোচন পড়ই।
তাহাঁ তাহাঁ নিল-উতপল বন ভরই॥
যাহাঁ যাহাঁ হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাহাঁ তাহাঁ কুন্দ কুমুদ পবকাশ॥

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, সবগুলি অলঙ্কার একটিমাত্র ভাবনাক্রমে সন্নিবেশিত হয়ে রূপের এক পারম্পর্য এবং প্রবাহ সৃষ্টি করে। এতো গেল বহির্লক্ষণ-গত রূপপ্রবাহ। কিন্তু এর একটি গভীরতর অন্তর্লক্ষণও আছে। আমাদের আলোচনায় সেটুকুই বেশি মূল্যবান। এমন পদও আছে, যেখানে উপমা একটিমাত্র এবং রীতিমত স্বল্পায়তন।

দরসনে লোচন দীঘর ধাব।
দিনমণি তেজি কমল জনি জাব॥[১]

দর্শনের জন্য লোচন দীর্ঘদূর পর্যন্ত ধাবিত হল; যেন দিনমণি কমলকে ত্যাগ করে যাচ্ছে। উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার দুটিমাত্র চরণে বদ্ধ থেকে সমগ্র পদকে রূপে

১ প্রেমবৈচিত্ত্য, বিদ্যাপতি (সাহিত্য পরিষদ্ সং)।

আলোকিত করেছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে আর্তির তীব্রতা বিদ্যাপতির গোটা পদ ব্যাপ্ত করে আছে।

দেখ রাধামাধব রঙ্গে।
হেম-কমলিনি সঞে নীল-কমল জনু
ভাসই যমুনা-তরঙ্গে ॥

দীর্ঘ এ পদের অতি সামান্য অংশ জুড়ে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার বর্তমান। অথচ এই বিন্দুবৎ সুন্দরের পুলকছটা লেগে সমগ্র পদটি উদ্‌ভাসিত। উপমেয়-উপমান-পক্ষের রূপবিবৃতির বদলে ক্ষিপ্র সাঙ্কেতিক উপায়েই তাদের চকিত দ্যুতিটুকু মাত্র প্রকাশিত। কিন্তু সেক্ষেত্রেও রূপের প্রবহমানতা লক্ষ্য করা যাবে।

সজনি, ভাল করি পেখি না ভেল।
মেঘ মাল সঞে তড়িত-লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥

অন্য একটি পদে,

কাঞ্চন-কমল পবনে উলটায়ল
ঐছন বদন সঞ্চারি।
সববস লেই পালটি পুন বিন্ধলি
রঙ্গিণি বঙ্ক নেহারি।

বিদ্যাপতির পদে রাধার শরীরী রূপকথা নেই, রূপের একটি লাবণ্য-কুহক যেন এক লহমায় কৃষ্ণের মনকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। 'ভাল করি পেখি না গেল'। দ্বিতীয় পদটিতে গোবিন্দদাস বলছেন, 'নয়নক সাধ, আধ নাহি পূরল, পালটি না হেরলুঁ রাধা'। এ যেন রূপ নয়, দ্রুত সঞ্চরমান এক রূপবিভ্রম। এ প্রবহমানতা অবশ্যই সংখ্যার পরম্পরিত ক্রম দিয়ে তৈরী নয়, উপমার অন্তরেই এমন এক বেগ নিহিত, যার ফলে এর মধ্যে গতি জেগেছে। ঐ বেগের ব্যাখ্যা করলে কয়েকটি বস্তুগত কারণ এবং কয়েকটি ভাবগত বিষয় লক্ষনীয় হয়ে ওঠে। প্রথমেই বক্তব্য, বৈষ্ণব পদাবলীতে যে ভাষা ব্যবহৃত, তা চলতি বাঙলা বুলির থেকে স্বতন্ত্র। ব্রজবুলির বীজ অর্বাচীন অবহট্‌ঠ বা 'লৌকিক'এর, অঙ্কুরোদ্গম মিথিলায় এবং প্রতিরোপণ বাঙলায়। লৌকিকে সাহিত্যরচনা বাঙলাদেশে ব্যাপক না হলেও চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে এবং তার পরেও মিথিলায় চলেছিল। তার দ এক টকরো নিদর্শনের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ-লীলাপদও মেলে।

গঙ্গাদাসের রচনাংশ,

রাঈ দোহড়ী পঢ়ণ সুণি হসিউ কাহ্নু গোআল।
বৃন্দাবন-ঘণ-কুঞ্জ-ঘর চলিউ কমণ বসাল॥

পুরোনো মৈথিলের (উমাপতি-বিদ্যাপতির গীতিকবিতা) ভিত্তি আর ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ব্রজভাষার অল্পস্বল্প প্রভাব,—এই দুইএ মিলিয়ে ব্রজবুলির গঠন। এবং এরই একান্ত বঙ্গজ রূপ আমাদের বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা। মিথিলাবাসী বিদ্যাপতির স্থানিক ভাষার সঙ্গে বাঙলার মিশ্রণে এর জন্ম, ঈশ্বর-গুপ্তের দেওয়া নাম ব্রজবুলি। ব্রজবুলি অথবা ব্রজবুলির সগোত্র যে ভাষা-ব্যবহারে আমরা বাঙলায় বৈষ্ণব পদাবলী পাই, তার প্রধান লক্ষণ, তৎসম শব্দ (ছন্দ মাত্রা-মূলক, পদান্ত অ-কার অলুপ্ত, ফলে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার যথেচ্ছ) এবং অর্ধতৎসম শব্দের (লৌকিক-মূলকতার ফলে) অজস্র প্রয়োগ, শব্দে যুক্ত অথবা যুগ্ম-অক্ষর প্রায় বর্জিত, স্বরভক্তির বহুল প্রযোগ, নামধাতুর ব্যবহার (অনুমানল, পরলাপসি, সিতকারই ইত্যাদি), অন্তঃস্থ য় এবং অন্তঃস্থ ব যোগে শব্দোচ্চারণের হ্রস্ব-দীর্ঘত্ব সৃষ্টি; ফলে ধ্বনিপ্রধান ছন্দের গঠনগত হিল্লোলে এই ব্রজবুলি ভাষা সহযোগী হয়েছে। শব্দগঠন যেমন, ছন্দনিয়োগেও তেমনি কবিমনের আকুলতা সঞ্চারিত।

কবরী ভযে চা-　　মরি গিরি-কন্দরে
মুখ-ভযে চান্দ অকাশ।
হরিণি নয়ন-ভযে　　স্বর-ভয়ে কোকিল
গতি-ভযে গজ বন-বাস॥
সুন্দরি কাহে মোহে সম্ভাষি না যাসি।

মাত্রাবৃত্তের দোলায় কমনীয় শব্দগুলি অভিনব প্রসারণশীলতা (clasticity) পেয়েছে। ব্রজবুলির ছন্দ মৈথিল পদাবলীর ছন্দের অনুসরণ। উমাপতি-বিদ্যাপতির ছন্দ অপভ্রংশ থেকে আগত। আবার, গীতগোবিন্দের গীতগুলি অপভ্রংশ ছন্দে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও ধ্বনি-সৌকর্যে সিদ্ধ জয়দেবের স্বকীয়তাও তাতে প্রচুর। গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দের ভিত্তি বিদ্যাপতিতে, অঙ্গসজ্জা জয়দেবে। কেবল প্রাচীন প্রথাগত ছন্দের আদর্শেই নয়, অনেকাংশে সঙ্গীতের সুরাদর্শেও বৈষ্ণবপদের ছন্দ নির্মিত। মনে রাখা দরকার, বৈষ্ণবপদ মূলত বৈষ্ণবগান। এখানে আমরা একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করি।

বিদ্যাপতি,

১ ১১ ১২১ | ১১১ ২১১ | ২
এ সখি হামারি | দুখের নাহিক | ওর

১ ১১ ২১১ | ২১ ২১১ | ২১ ২১১ | ২
এ ভরা বাদর | মাহ ভাদর | শূন্য মন্দির | মোর

রায় শেখর,

১১১ ১১১১ | ২১ ২১১ | ১১১ ২১১ | ১১১২
গগনে অবঘন | মেহ দারুণ | সঘন দামিনী | ঝলকই

জয়দেব,

২১ ২১১ | ২১২ ১১ | ২১২১১ | ২২
দেহি সুন্দরি | দর্শনং মম | মন্মথেন দু | নোমি

এই সাত মাত্রার চালের ছন্দ সংস্কৃত ছন্দোগ্রন্থে নেই, পৈঙ্গলে নেই, চর্যাপদে নেই। সঙ্গীতের ক্ষেত্র থেকে সোজাসুজি বাঙলা কবিতায় এসেছে। রবীন্দ্র-নাথেও এ প্রয়োগ আছে, 'খাঁচার পাখি ছিল', 'বেলা যে পড়ে এল' ইত্যাদি। এই সপ্তমাত্রিক গঠনটির সাঙ্গীতিক নাম 'রূপকতাল'।[১] এ ছাড়া, পূর্বের আলোচনায় আমরা এমন অনেক ছন্দের দৃষ্টান্ত দিয়েছি, যেগুলো জয়দেবের প্রাকৃত অপভ্রংশের ছন্দের অনুরূপ। এখানে তাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বৈষ্ণবপদাবলী রচিত হওয়ার পূর্বে এবং পরবর্তী কালেও অক্ষরবৃত্ত ছন্দই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙলা কাব্যের নিজস্ব ছন্দরূপে গণ্য ছিল। মাত্রাবৃত্তই বৈষ্ণবপদে প্রথম ব্যবহৃত ছন্দ, যার আশ্রয়ে কবির অনুক্ত ভাববেদনা ব্যক্ত হতে পেল। এতো গেল প্রত্যক্ষগম্য প্রবহমানতার দিক, ভাষা ও ছন্দ যার বাহন।

এছাড়া, ভাবগম্য একটি দিক আছে, যা কবির অনুপ্রাণনামূলক। আগেই বলেছি, এদেশের বহমান ভক্তিচর্চায় বৈষ্ণববাদ এমনই এক বিশিষ্ট অনুভবের, যেখানে ঈশ্বর নিরাকার, নির্গুণ, চিন্মাত্রসম্ভব এবং ধ্যানকল্প নয়, সাকার সগুণ শরীরী এবং মানবীয় লীলার মধ্যে তিনি আত্মীয়রূপে একান্ত আপন জন।

---

১ অলঙ্কার-চন্দ্রিকা। শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী।

সুন্দরি, হরি অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে গোরী ভেল শ্যামরী
কুহূ-যামিনী-ভয় ভাগি॥
নীল অলকাকুল অলিক হিলোলিত
নীল তিমিরে চলু গোই।
নীলনলিনী জনু শ্যামসিন্ধুবসে
লখই না পাবই কোই॥১

যে নবানুরাগে 'গোরী' 'শ্যামরী'-রূপ লাভ করে, সে অনুরাগ কবির মানব-বাসনা থেকে সঞ্চারিত। শ্যামসিন্ধুর চঞ্চল তরঙ্গভঙ্গে একটি প্রস্ফুট নীলকমলের মত হিল্লোলিত রাধারূপ। এ আঁধার আলোর অধিক বলেই রাধার তামসী-প্রতিমা রূপপ্রবাহকে নিষেধ করে না। দুর্লভকে যখন সহসা করায়ত্ত বলে মনে হয়, দুর্জ্ঞেয় প্রতিমুহূর্তেই যখন মানুষের পরিচয়-সীমায় প্রকাশিত, তখন মানবকণ্ঠে এক অপরূপ আত্মনির্ভরতা জেগে ওঠে। বৈষ্ণবকাব্য সেই আত্মনির্ভর মানুষের প্রবল ভাবাবেগের প্রতিরূপ।

আজু রসে বাদর নিশি।
প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবন-বাসী॥
শ্যাম-ঘন বরিখয়ে কবত রস-ধার।
কোরে রঙ্গিণি রাধা বিজুরিসঞ্চার॥
ভাবে পিছল পথ গমন সুবঙ্ক।
মৃগমদ-চন্দন-পরিমল পঙ্ক॥
দীগ বিদিগ নাহি প্রেমের পাথার।
ডুবল নরোত্তম না জানে সাঁতার॥

সেই দৃপ্ত মানববলের বেগ বৈষ্ণবীয় আত্মপ্রকাশের সকল উপাদানের মধ্যে মাখা-মাখি হয়ে আছে। জীবনের গতানুগতিক এবং নিরুত্তেজ ভাবানুভূতি থেকে এই কৃষ্ণলীলার জন্ম হলে নবনির্মিত ব্রজবুলি ভাষায় অথবা নবনিযুক্ত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে প্রাণের প্রবলতা জাগতো না।

বরণি না হয় রূপ বরণ চিকণিয়া।
কিয়ে ঘন-পুঞ্জ কিয়ে কুবলয়-দল
কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনিল-মণিয়া॥
অঙ্গদ বলয় হার মণি-কুণ্ডল
চরণে নূপুর কটি কিঙ্কিণি কলনা
অভরণ-বরণ-কিরণে অঙ্গ ঢর ঢর
কালিন্দি-জলে যৈছে চান্দকি চলনা॥

১ তিমিরাভিসার, গোবিন্দদাসের পদাবলী (বসুমতি সং)।

কবির স্থির ধারণা-শক্তির মধ্যে রূপ ধরা দেয় না, কেননা কোন স্থির দেহে লগ্ন স্থানু-রূপ এতো নয়। কৃষ্ণের অঙ্গাভরণ যেন কালো যমুনাপ্রবাহে জ্যোৎস্নার চলোর্মিমালা। রসাপ্লুত হৃদয়ে কবি কৃষ্ণরূপের লাবণ্য প্রবাহ দর্শন করছেন।

নয়ান কোণের বাণে হিয়ার মাঝারে হানে
কিবা দুটি ভুরুর নাচনি॥
আই আই মলুঁ মলুঁ কি রূপ দেখিয়া আইলুঁ
কালা-অঙ্গে পড়িছে বিজলি।

কৃষ্ণরূপ-দর্শনে কবিপ্রাণে কি গভীর কাতরতা। কেবল অনুরাগে পূর্বরাগে অথবা মিলনেই নয়, মাথুর-বিরহের ক্ষুব্ধা নায়িকাও তার স্বপ্নসুখকে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত করেনি।

যাহাঁ পহুঁ অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাহাঁ তাহাঁ ধরণি হইয়ে মঝু গাত॥
যো সবোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ॥
যাহাঁ পহুঁ ভরমই জলধর-শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছুঁ ঠাম॥

কবি কত গভীর আবেগে বিরহিণী রাধার প্রেমার্তি প্রকাশ করেছেন। আপন আকার বিশ্বে ব্যাপ্ত করে প্রিয়তমকে প্রতিটি পলকে লাভ করার যে অনুরাগ এ চিত্র সেই রূপেরই উদ্বোধন করে। দশ-দশায় বিরহিণীর যে মৃতকল্প রূপ সেখানেও কবির আবেগ-কল্পনা শীর্ণ নয়।

উচ কুচ উপব রহত মুখ-মণ্ডলে
সো এক অপরুপ ভাতি।
কনয়া-শিখবে জনু উয়ল শশধব
প্রাতর ধূসর-কাঁতি॥
থোবি অলকাবলি আপন কর তুলি
পুন পুন পরশই নাসা।
বিকচ-কমল সঞে নব কিশলয় কিযে
হেরইতে ঐছে প্রকাশা॥

রাধার নিকুঞ্জ-শয়নের রূপ কবিকে আকুল করে।

রাজহংসী যেন নদীতে শয়ন
তরঙ্গে চালয়ে ঘন।
রতন-পালঙ্কে শুতিয়াছে রঙ্গে
হিলোলে এ দু নয়ন॥

কবির এই নবলব্ধ আত্মপ্রত্যয় উপমার মধ্যে সঞ্চারিত। ভাষা ও ছন্দের শক্তিতে সেই প্রত্যয় পুষ্ট। দুর্লভ আপনজনের কথায় পঞ্চমুখ কবির উপমাগুলি তাই সপ্রশংস গুণকীর্তনে যেমন ধন্য (admiration), তেমনি একই কালে নিবিড় দরদে (intimacy) অনুবাসিত।

কুঞ্চিত-কেশিনি নিরুপম-বেশিনি
রস-আবেশিনি ভঙ্গিনি রে
অধর সুরঙ্গিণি অঙ্গ তরঙ্গিণি
সঙ্গিনি নব নব রঙ্গিণি রে ॥
সুন্দরী রাধে আওয়ে বনী ॥
ব্রজ রমণীগণ-মুকুট-মণি ॥

একদিকে গুণধন্য প্রশংসা, অন্যদিকে নিবিড়তা, দুইযে মিলে কবি গোবিন্দদাসের অপরূপ হৃদয়াবেগ অলঙ্কারে অর্পিত। তাই একটি পদে উপমা-ব্যবহার একটিমাত্র এবং সংক্ষিপ্ত হলেও তার তরঙ্গিত লাবণ্য দীর্ঘস্থায়ী রেখাপাত করে। উপমার এমন প্রাণময় প্রয়োগ মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যে আর নেই। জীবনের সামগ্রিক জাগরণ এবং ভাবোন্মাদনাই উপমাগত এ লাবণ্য প্রবাহের কারণ।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় স্মরণীয়। রাধাকৃষ্ণের রূপাঙ্কনে চৈতন্যচিন্তা। নরলীলাই ভগবান কৃষ্ণের সর্বোত্তম লীলা, এবং নরবপু-ধারণেই তার চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা।

গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা প্রেম-রস-সীমা
জগতে জানাইত কে ॥
মধুর বৃন্দা- বিপিন-মাধুরি-
প্রবেশ চাতুরি-সার।
বরজ-যুবতি- ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার ॥

চৈতন্যোত্তর ভক্তিসাধনায়, কি কাব্যে কি দর্শনে, এ ভাবনাসূত্রটিই একমাত্র অবলম্বন। চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গী এবং লীলাসাক্ষী বহু পারিষদ তাঁর দিব্য ভাবোন্মাদনায় অনুপ্রাণিত হয়ে লেখনী ধরেছিলেন। অথবা সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শী অনেক ভক্ত মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদনার জীবন্ত কাহিনী শিষ্যে-

প্রশিষ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। ভক্ত শিষ্যের কল্পনানেত্রে তার রূপ ফুটেছিল, প্রত্যক্ষ দর্শনের ফলশ্রুতি প্রত্যক্ষদর্শনেই রূপান্তরিত হয়েছিল তাঁদের বেদনার মধ্যে।

নীরদ-নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চূয়ত
বিকসিত ভাব-কদম্ব॥
কি পেখলুঁ নটবব গৌব কিশোব।
অভিনব হেম- কল্প-তরু সঞ্চরু
সুবধুনি-তীবে উজোব॥

চৈতন্যোত্তর যুগে এমনভাবেই ভক্তের ভাবগর্ভে কবির জন্ম হল। পূত-প্রবাহিনী গঙ্গার উদার তটে উন্নতদর্শন গৌরতনু মহাপ্রভুর সেই উজ্জ্বল রসলীলার ভুবন-মোহন দৃশ্য ভক্তের প্রাণে কবিভাবের উদ্বোধন করেছিল। বিলোল চাঁচর কেশ, লুণ্ঠিত ফুলমালা, বিবশ উত্তরীয়, সারাদেহে পুলক-রোমাঞ্চ,[১] চক্ষে বিগলিত অশ্রুধারা, মুখে উচ্চস্বরের কৃষ্ণকাতরতা,—সঞ্চরমান ব্যাকুলতার এমন এক বিভোর রূপ নিয়ত প্রবহমান উদার গঙ্গার কূলে চিরকালের এক মহিমা-চিত্র এঁকে রেখেছে। চৈতন্য মহাপ্রভুর সেই রূপ দর্শন অথবা ধ্যানের মধ্যে দিয়ে কবিভাবনার প্রতিটি প্রণালীতে সঞ্চারিত হয়ে গেছে।

রাই-অঙ্গ-ছটায় উদিত ভেল দশদিশ
শ্যাম ভেল গৌর-আকার।
গৌব ভেল সখীগণ গৌব নিকুঞ্জ বন
রাই রূপে চৌদিগে পাথাব॥
....
নরোত্তম দাস কয় অপরূপ রূপ নয়
দহুঁ তনু একই মিলিত॥

এ 'রাই-রূপ' গৌরাঙ্গ ধ্যানের দ্বারা উদ্দীপ্ত। সমগ্র চৈতন্যলীলার মধ্যে দিয়েই ভক্তকবি 'রাধাভাবদ্যুতি'র পূর্ণ পরিচয় লাভ করেছিলেন। তাই

১ কদম্ব ফুলের মত পুলক-রোমাঞ্চের এ উপমা কালিদাসের 'স্ফুরদ্‌বালকদম্বকল্পা' শৈলসুতা উমার বর্ণনায় এবং ভবভূতির 'কদম্বযষ্টিঃ স্ফুটকোরকেব' সীতার বর্ণনায় পাই।

চৈতন্যকালীন অথবা চৈতন্যপর বৈষ্ণব কবিতায় এই সজীব জীবনবেগ রাধাকৃষ্ণের রূপ-নির্মাণে নিযুক্ত হয়েছে।

চণ্ডীদাসে কয় মুরুতি এ নয়
বধিতে নাগর জনে।
অমিয়া ছানিয়া যতন করিয়া
গঢ়িল সে অনুমানে॥

'সই, রূপ-কে চাহিতে পারে',—নিরবধি এ রাধারূপের কোন শরীরী উৎকর্ষের কথা এখানে নেই। কেবল দর্শনজনিত আবেগে মুগ্ধ কবির বাক্-ব্যাকুলতা মাত্র। কল্প-বৃন্দাবনের এই নিত্য-নায়িকার রূপ কবি মানব-চৈতন্যের মধ্যে দর্শন অথবা ধ্যান করেছিলেন বলেই এমন অপরূপ লাবণ্যময়তা দেখা দিল।

আব শুন্যাছ্ আলো সই
গোবা-ভাবেব কথা।
কোণের ভিতর কুল-বধূ
কান্দ্যা আকুল তথা॥
হলদি বাঁটিতে গোবী
বসিল যতনে
হলদি-ববণ গোবাচাঁদ
পড়্যা গেল মনে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে রাধা গৃহ-কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছিলেন। 'বাঁশীর শবদে মো আউলাইল রান্ধন।' লোচনদাস উক্ত পদে গৌরাঙ্গ-লাবণ্যের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, 'কি বলিব আর, হয় নাই হবার নয় গোরা অবতার॥' কবির স্মৃতিধৃত অথবা কল্পনালব্ধ এই চৈতন্যমূর্তি তার রূপলাবণ্যের সবটুকু হিল্লোল নিয়ে রাধাকৃষ্ণের দেহরূপে এবং ভাবভঙ্গিতে নব-কলেবর ধারণ করেছে।

চিকণ কালাব রূপে আকুল করিল গো
ধরণে না যায় মোব হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া মুখানি মাজিল গো
যদু কহে কত সুধা দিয়া॥

বাঙালী হৃদয়ের মন্থনজাত অমৃতমূর্তি চৈতন্যদেব কবির ধ্যানাশ্রয়ী রাধাভাবনার মধ্যে প্রকাশিত,

অমিয়া মথিয়া কেবা লবনি তুলিল গো
তাহাতে গড়িল গোরা-দেহ।
জগত ছানিয়া কেবা রস নিঙ্গারিল গো
এক কৈল সুধই সুলেহ ॥
অখণ্ড পিয়ুষ-ধাবা কেবা আউটিল গো
সোণাব বরণে হৈল চিনি।
সে চিনি মাবিয়া কেবা ফেনি তুলিল গো
হেন বাসি গোবা অঙ্গখানি ॥

কবিমনের আকুল মমতা যে চৈতন্যমূর্তির শিল্পী, সেই মমতাতেই রাধাকৃষ্ণ-রূপভাব আমণ্ডিত। বিশেষত রাধাহৃদয়ের প্রতিটি বেদনার সংকল্প-মূর্তি এই রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত গৌরাঙ্গ মাহাপ্রভু। পূর্বরাগ, অভিসার, আক্ষেপানুরাগ, রূপোল্লাস ইত্যাদি যে কোন ভাব-বিভাগের সূচনায় যে গৌরবন্দনা পাই, সে রূপ অথবা ভঙ্গি-প্রকাশের যথাযথ চিত্রটি অনুসারী রাধারূপ অথবা ভঙ্গি প্রকাশে অবিকল ভাবে নিযুক্ত। চৈতন্যলীলা-দর্শনের প্রত্যক্ষতা অথবা লীলাধ্যানের স্পষ্টতা কবির রাধাকৃষ্ণ রূপাঙ্কনকে তাই এত প্রাণময় এবং জীবন্ত করে তুলেছে। আর, কাব্যক্রিযার সর্বাঙ্গে যেহেতু এই চৈতন্য-উদ্দীপ্তি সঞ্চরমান, সেজন্যেই কাব্যের আবশ্যকীয় অঙ্গ উপমার প্রয়োগেও সেই বিলোল হিল্লোল।

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গেব লাবণি
অবনী বহিয়া যায।
ঈসত হাসিব তবঙ্গ-হিলোলে
মদন মূরুছা পায ॥

সেই একই কবির গৌরবিষয়ক পদ,

ঢল ঢল কাঁচা সোণাব ববণ
লাবণি জলেতে ভাসে।
যুবতী উমতি আউদড়-কেশে
বহই পবশ আশে ॥

সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীতে একটি বিশেষ বিষয় লক্ষনীয়। রাধাবিষয়ক পদরচনাই সংখ্যায় এবং উৎকর্ষে প্রথম। যে ভক্তিধর্মের লক্ষ্য মোক্ষ এবং আরাধ্য একমাত্র কৃষ্ণ, তাঁর কীর্তন পরিমাণে এবং উৎকর্ষে অনেক কম। আসল কথা, এই ভক্তিতন্ত্রে স্বরূপের সাধনার চেয়ে হ্লাদিনীর লীলারূপ-কীর্তনই অনেক বড়। সে কারণেই শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমাকথাই পদাবলীতে প্রধান। আর,

সেই রাধা-প্রণয়-মহিমার অনুভূতি 'চৈতন্যাখ্য' একটি মানব-কলেবরে চাক্ষুষ। চৈতন্য নিজে রাধাভাব অঙ্গীকার করেছিলেন, ভক্ত পদকর্তা রাধাভাবরূপ রচনায় চৈতন্যচিত্র অবলম্বন করেছিলেন। উপমার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের রূপোচ্ছলতার যে পরিচয়, তার সবটুকুই চৈতন্যাখ্য। উপমার এই যে প্রাণবেগ, তাতে আছে চৈতন্য-স্পর্শমণির ছোঁয়া। চৈতন্যকালীন এবং পরবর্তী পদাবলীতে রূপ-লাবণ্যের রহস্য এই।

এখন প্রশ্ন, তা হলে বিদ্যাপতি ইত্যাদি চৈতন্যপূর্ব কাব্যে উপমার অনুরূপ লাবণ্য এবং সর্বাধিক রাধা-বর্ণনার পদ দেখা গেল কি করে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয়, চৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্বে বৈষ্ণবীয় ভাবসাধনা ঠিক গোষ্ঠিগত সমাজবৃত হয়ে ওঠেনি। সুপ্রাচীন রাধাকৃষ্ণ লীলাতত্ত্বই কবিদের বিশিষ্ট ভাবনাভঙ্গি অনুসারে তাঁদের রূপকল্পনায় মূর্তিলাভ করেছিল। দূরস্মৃত কৃষ্ণভক্তিবাদ এবং তৎকাল-প্রচলিত লৌকিক রাধাকৃষ্ণকীর্তন-কাহিনী কবিকল্পনার উপজীব্য হয়ে যতটা শিল্পপ্রেরণা দিয়েছে, ততটা ধর্মভক্তি-প্রেরণা দেয়নি। বিশেষত চৈতন্যপূর্ব কালে সমগ্রভাবে সমাজ-মানুষের মনে কৃষ্ণপ্রাণতা জাগেনি। কৃষ্ণের রাখালিয়া জীবন এবং গোপবৃত্তে রাধার পরকীয় প্রণয়ের লোকমধুর রুচিতেই তখনকার কবিমানস রোমাঞ্চিত।

> কোঽয়ং দ্বাবি হরিঃ প্রযাহ্যপবনং শাখামৃগেণাত্র কিং
> কৃষ্ণোঽহং দয়িতে বিভেমি সুতরাং কৃষ্ণঃ কথং বানরঃ।
> মুগ্ধেঽহং মধুসূদনো ব্রজ লতাং তামেব পুষ্পাসবাম্
> ইত্থং নির্বচনীকৃতো দয়িতয়া হ্রীণো হরিঃ পাতু বঃ ॥[১]

চৈতন্যোত্তর কবি ঘনশ্যামদাসকে এ বক্রোক্তি-জীবিত পদটি প্রলুব্ধ করেছিল। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবাকাশেই এর ভাবচ্ছায়ায় পদ রচনা করেছেন,

> কো ইহ পুন পুন করত হুঙ্কার।
> হরি হাম জানি না কর পরচার॥
> পরিহরি সো গিরি-কন্দর মাঝ।
> মন্দিরে কাহে আওব মৃগ-রাজ॥
> ....ইত্যাদি

উন্নততর আদর্শ থাকা সত্ত্বেও প্রাচীন রাধাকৃষ্ণ-কথাকৌতুক যদি গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিকেই আকৃষ্ট করে থাকে, তাহলে প্রাকচৈতন্য কালে রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী-

---

১ শুভঙ্করের নামে সদুক্তিকর্ণামৃতে প্রাপ্ত, শ্রীসুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, ২য় সং) ধৃত।

ভাবনায় এ জাতীয় লোকমধুর রুচি প্রবল থাকা স্বাভাবিক। অধ্যাত্ম ভাবনার স্পর্শ তখনও এ প্রণয়-কাহিনীতে লাগেনি। তবে জয়দেব-বিদ্যাপতির কবিতায় যে অধ্যাত্মবোধ, তা তাঁদের ব্যক্তিগত ধর্মবোধেরই অনুলেপন। বিশেষত কৃষ্ণের বিষ্ণুস্বরূপ সম্বন্ধীয় (উক্ত কবিদের) যে অধ্যাত্মবোধ, তা শান্তরসাশ্রিত ঐশ্বর্যবুদ্ধি-প্রধান, মধুর রসের নয়। জয়দেবের 'প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং' এবং বিদ্যাপতির 'কত চতুরানন মরি মরি যাওত' ইত্যাদি পদেই তার প্রমাণ। বড় কথা হল, তাঁদের লীলাকীর্তনে শিল্পের উৎকর্ষ। রাজসভাশ্রিত কাব্যক্রিয়ায় নারীনির্ভর পরকীয়া প্রণয়কথা প্রশংসার মূল্য পাবেই। জয়দেবে আছে,

লক্ষ্মীকেলিভুজঙ্গ জঙ্গমহবে সংকল্পকল্পদ্রুম
শ্রেয়ঃসাধকসঙ্গ সঙ্গরকলাগাঙ্গেয় বঙ্গপ্রিয়।
গৌড়েন্দ্র প্রতিরাজরাজক সভালঙ্কার কারাপিত-
প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল পালক সতাং দৃষ্টোহসি তুষ্টা বয়ম্ ।।১

গীতগোবিন্দে না হলেও সদুক্তিকর্ণামৃতের প্রক্ষিপ্ত একাধিক শ্লোকে গৌড়েন্দ্র-প্রতিরাজ-রাজকের প্রশস্তি রয়েছে। এই জয়দেব কবিই বিলাসকলা কুতূহলী রসিকজনের উদ্দেশ্যে কোমলকান্ত পদাবলী রচনা করেছিলেন।

বিগলিতবসনং পরিহৃতবসনং ঘটয় জঘনমপিধানম্।
কিশলয়শয়নে পঙ্কজনয়নে নিধিমিব হর্ষনিধানম্ ।।

জয়দেব যদি সভাকবি না-ও হন, তবু রাজসভার একটা পরোক্ষ স্মৃতিকে উদ্দেশ করে তিনি এই বিলাসকলা-পদ রচনা করেছিলেন, একথা স্বীকার করতে হয়। বিদ্যাপতির পদেও নায়িকারূপ-বর্ণনায় সভাসুলভ চতুরালি ফুটেছে।

ততহু সয়ঁ হঠ হটি মো আনিল
ধএল চরনন রাখি।
মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ
তইঅও পসরএ পাঁখি ।।
....
....
ভন বিদ্যাপতি কম্পিত কর হো
বোলল বোল ন জায়।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাজন
সামসুন্দর কায় ।।২

১ জয়দেব রচিত সদুক্তিকর্ণামৃতের শ্লোক, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ' গ্রন্থের ভূমিকা।

২ শ্রীরাধার পূর্বরাগ, বিদ্যাপতি, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত।

বিদ্যাপতির শিষ্য গোবিন্দদাস হয়ত প্রত্যক্ষত রাজ-সভাকবি ছিলেন না, এবং বিদ্যাপতির অনেক অপূর্ণ পদ পূরণের খাতিরে অনেক সময় হয়ত তাঁকে সভাসুলভ ভঙ্গি স্বীকার করতে হয়েছিল, তবু এদেশীয় ছোটখাট ভূম্যধিকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা তিনি পেয়েছিলেন।[১]

লোচন-খঞ্জন-জগ-অনুরঞ্জন।
কুলবতি-যুবতি-বরত-ভয়-ভঞ্জন ।।
গোবিন্দদাস ভণ রসিক-রসায়ণ।
রসয়তু ভূপতি রূপনারায়ণ ।।

তাঁরই রাধাকৃষ্ণ বর্ণনাপদে রাজসভাপ্রিয় চপলতা দেখি,

নীরদ নীল নয়ন নিন্দি নীরজ
নীকে নেহারণি ছন্দ
নিরখিতে নিয়ড়ে নিতম্বিনি নীচল
নিকসত নীবি-নিবন্ধ ।।

রস সম্পর্কে দণ্ডী প্রভৃতির সঙ্গে বাৎস্যায়নের অনুগত বিদ্যাপতির কাব্য-প্রকাশভঙ্গি কিছুটা তরল, রূপ গোস্বামীর অনুগত গোবিন্দদাস সান্দ্র।[২] কিন্তু সভারঞ্জনের লক্ষ্য দুই কবিরই ছিল। বেশি কথা কি, 'প্রেমবিলাসবিবর্ত' ভাবের পদে যে কবি রায় রামানন্দ লিখেছেন,

না সো রমন, না হাম রমনী।
দুহুঁ মন মনোভাব পেষল জানি ।।

তিনিই রাজসভা-স্মৃতিতে লিখেছেন,

হেলা-তরলিত-মধুর-বিলোচন-
জনিত-বধূ-জন-লোভম্ ।।
গজপতিরুদ্র-নরাধিপ-চেতসি
জনয়তু মুদমনুবারম্।
রামানন্দরায়-কবি-ভণিতং
মধুরিপু-রূপমুদারম্ ।।[৩]

---

১ বৈষ্ণব পদাবলী (সাহিত্য আকাদেমী)। শ্রীসুকুমার সেন।
২ অলঙ্কার-চন্দ্রিকা। শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী।
৩ সবগুলি বৈষ্ণবপদ শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত শ্রীশ্রীপদকল্পতরু গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

ধর্মের চেয়ে শিল্প যেখানে বড়, ভক্তির রূপান্তনের চেয়ে রাজসভার মনস্তুষ্টি যে কবির লক্ষ্য সেখানে প্রণয়ের কুটিল-বঙ্কিম মতিগতির ছবিই একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বিষয়। জয়দেব-বিদ্যাপতিতে উপমা-লাবণ্যের কারণ এই যে, মিষ্টভাষায় নতুন ছন্দে কবির কুশলী সৃজনশক্তি প্রেরণা লাভ করেছে। রাধা-বর্ণনায় বহুলতা জেগেছে বিশিষ্ট এক পরিবেশ এবং মানসচেতনার খাতিরে। এ প্রসঙ্গের শেষ কথা, জয়দেব-বিদ্যাপতির কাব্য শিল্পরসের সূক্ষ্মতায় ধাপে ধাপে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' আনন্দের অধ্যাত্ম-আকাশ ছুঁয়েছে, অধ্যাত্ম প্রেরণায় বিভাবিত হয়ে কবি-কল্পলোক স্পর্শ করেনি। পরবর্তী বৈষ্ণব পদকর্তারা এমনকি স্বয়ং চৈতন্য জয়দেব-বিদ্যাপতির কাব্য শ্রবণ অধ্যয়ন করতেন। বলা বাহুল্য, উক্ত দুজন কবির কাব্যশিষ্য হিসেবেও চৈতন্যকালীন এবং পরবর্তী দু একজন বড় বৈষ্ণবকবির খ্যাতি আছে। সুতরাং, যদি মনে করা যায়, প্রতিষ্ঠিত চৈতন্যবাদের আদর্শে যে সব পদাবলী মিলতে লাগলো, তাদের প্রাথমিক প্রেরণারূপে জয়দেব-বিদ্যাপতির কাব্য আদর্শ ছিল, তা হলে হয়ত ভুল বলা হবে না।

বৈষ্ণব পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

বৈষ্ণবপদের উপমা আলোচনা করতে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের উপমারীতির কথা আসে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রণয়কথা। সেখানকার নায়ক-নায়িকা, দূতীর বৃত্তি, পরিবেশ-প্রসঙ্গ, কামকলা, বিরহ-মিলনের প্রণালী, সবই পদাবলীর মত। পার্থক্য আছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একটি গল্পকাহিনীর প্রবাহ, বৈষ্ণবপদ মানবচেষ্টার ছিন্ন ছিন্ন ভাবরূপ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঘটনা ও চরিত্রের পরিকল্পিত বিকাশ এবং পরিণতি, পদাবলীতে নায়ক নায়িকার হৃদয়-ভাবানুসারে আন্তর-রূপায়ণ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লৌকিক জীবনাচার-সর্বস্ব, মাঝে মাঝে ভাগবত-অভিমানের প্রকাশেই তার অধ্যাত্ম-পরিচয় সীমাবদ্ধ, পদাবলীতে লৌকিক জীবনাচারই কবির গভীর অধ্যাত্ম-অনুভূতির স্পর্শে অলৌকিক মানবতায় উত্তীর্ণ। গ্রামজীবনে নারী-পুরুষের সহজ ভালোবাসার অর্ধগোপন সম্পর্কের কথাকেই বড়ু চণ্ডীদাস একটি কাব্যকাহিনীতে বেঁধেছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপমায় প্রণয়কলার যে ছবি অথবা দেহবর্ণনার সুযোগে ঈষৎ যে রূপদ্যুতি, তাতে ঠিক কবিমনের শিল্পকাতরতা অথবা উন্নত ভাবচিত্রণের তাগিদ বিশেষ নেই। জোরালো ভঙ্গিতে সরস একটি গল্প-গড়ার আগ্রহই রচয়িতার মনেব একমাত্র কথা। গল্পের আকর্ষণ আবিভাজ্য করে তুলতেই বড়ু চণ্ডীদাস উপমা ব্যবহার করেছেন। প্রবল গল্পের গতিধর্মে সঞ্জীবিত চরিত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে নাটকাভাস দেয়, উপমাগুলি তার পক্ষে একান্ত উপযুক্ত। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর কাব্যপ্রেরণা ঈশ্বর-শরণ এবং মানব-নির্ভরতার জোড়কলমে বাঁধা। তাই উপমায় দেহরূপের তুচ্ছ পরিচয় দেবার কালেও পদকর্তা মুহূর্তের জন্যেও বিস্মৃত হননি যে ঈশ্বর তাঁর শরণ্য।

কাননে কুসুম তোড়সি কাহে গোরি।
কুসুমহিঁ নিরমিত সব তনু তোরি॥
আনন হেম-সরোরুহ-ভাস।
সৌরভে শ্যাম-ভ্রমর মিলু পাশ॥
নয়নযুগল নিল উতপল জোর।
সহজে শোহায়ল শ্রবণক ওর॥
অপরূপ তিল-ফুল সুললিত নাস।
পরিমলে জিতল অমর-তরু-বাস॥

বান্ধুলি-মিলিত অধর যাহাঁ হাস।
মুকুলিত কুন্দ-কুমুদ পরকাশ ॥
সব তনু ফুটল চম্পক-গোর।
পাণিক তল থল-কমল উজোর ॥
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমান।
পূজহ পশুপতি নিজ তনু দান।

কুসুমময়ী রাধারূপের এ বর্ণনা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে, কিন্তু পদাবলীর এ পদ শ্লিষ্ট প্রয়োগে এমনই চমকপ্রদ যে, শরীরী রূপের স্থূলতার চেয়ে কুসুমের সূক্ষ্ম লাবণ্য যেন অনেক বেশি।

এর পর আর একটি বৈষ্ণবপদ,

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোব।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোব ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥

দেহরূপের তৃষ্ণা আছে, কিন্তু তাকে গৌণ করে পিরীতির তৃষ্ণা আরও ঘন।

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নৌতুন হোয় ॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহাবলুঁ
নয়ন না তিবপিত ভেল।

....

....

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিযে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল ॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।

অনুরাগের বোধ সীমাবদ্ধ নয়, প্রতিমুহূর্তেই তা বর্ধমান এবং আকুলতার নামান্তর মাত্র, এ কথাই কবিবল্লভ বলেছেন।

দুহু দিশে দারু-দহনে যৈছে দগধই
আকুল কীট-পরাণ।
ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখি
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥

এ উপমাপদের মূলানুভব—'অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে, সুন্দরি ভেলি মাধাই।' কৃষ্ণসত্তায় ওতপ্রোত হয়ে যাওয়ার এই যে হ্লাদিনী-বিলাস, এর একদিকে রূপলাবণ্য, অন্যদিকে অরূপ-দ্যোতনা।

যাব অনুভব সেই সে জানযে
না পায় আনে উদ্দেশে।।১

দেবে-মানবে মেশামেশি হয়ে উপমার রূপাঙ্কনে ইন্দ্রিয় চেতনার সঙ্গে অতীন্দ্রিয় চিন্তা মিলেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সেটি কোনক্রমেই ঘটেনি। তাই সেখানকার উপমা যত বেশি দেহরূপ-নিপুণ, ততই তা ঘরোয়া পরিচয়-গণ্ডীর মধ্যে অতিনিকট। পদাবলীর রচয়িতা প্রাণে-মনে যে সুমহৎ আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত, তার স্বাক্ষর শ্রীরাধার রূপে ভাবে ব্যথায় বেদনায়। পরমাত্মা স্বরূপশক্তিরই অংশকলা যে শ্রীরাধা হ্লাদিনী-লীলায় অবতীর্ণা, সে যে সামান্যা নায়িকা নয়, এই মূলভাবটি ভক্তিসূত্রে কবিমনে অঙ্গীকৃত এবং পদাবলীর আদ্যোপান্ত উপমা ব্যবহারে সেই অসামান্যার প্রণয়কলা এবং রূপচ্ছবি। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নায়িকা যেন আমাদেরই চেনাজানা জীবনের জনৈকা। তার রূপ হাবভাব আবেগ উদ্বেগ যেন আর পাঁচজন নায়িকার মত স্বাভাবিক। মানুষগুলি সামান্য ব্যক্তিত্বে প্রতিবেশীর মত নিকট বলে তাদের রূপাবেদন শ্রোতার মনের শৈল্পিক বিস্ময় উদ্বোধিত করে না। কিন্তু পদাবলীর রাধা কৃষ্ণ সখি আচার-আচরণে সহস্রবার প্রাকৃত হলেও কবির শুচি চিন্তায় তারা সহজেই এত পবিত্র এবং মহৎ, উন্নত আদর্শবাদের দ্বারা অনুশীলিত যে, কোন মালিন্য তাদের তিলমাত্র স্পর্শ করেনি। হৃদয়ের ভক্তিপূজিত ভাববেদি থেকেই পদাবলীর পাত্রপাত্রী পৃথিবীতে লীলায় অবতীর্ণ। তাই তাদের চিত্র-রচনা সামান্য মানবীয়তার মধ্যে এমন অনায়াসে অলোকসামান্য হয়ে উঠেছে। পদাবলীর উপমা কবিমনের প্রসারিত ভাবভূমিতে লালিত পালিত হযে দেবতার রূপে এমন মানব-ব্যঞ্জনা দিতে পারলো। অন্যদিকে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপমা পরিচিত মানব আদর্শে প্রস্তুত হয়ে মানবকে মানব আকারেই বদ্ধ করলো। পদাবলী এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন উভয় ক্ষেত্রেই উপমা প্রয়োগ অনেকাংশে সংস্কৃতের প্রথানুসারী। কিন্তু স্বতন্ত্র কবিবাসনার প্রভাবে এক ক্ষেত্রে জীবনের ব্যঞ্জনাময় প্রতিরূপ, অন্যক্ষেত্রে জীবনের অভিধাময় প্রতিরূপ দর্শন করা যায়।

১ সবগুলি বৈষ্ণবপদ শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত শ্রীশ্রীপদকল্পতরু গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

বৈষ্ণবপদে প্রকাশের আর্তি ও অভাববোধ

সুন্দরের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> মানুষের মনে ঈশ্বরের মত অসীম আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু ঈশ্বরের মত অসীম ক্ষমতা নেই।......তাই আকাঙ্ক্ষার রাজ্যে বসেই অর্ধ-নিরাশ্বাস ভাবে কল্পনা-পুত্তলী গড়িয়ে তাকে পূজো করছে।........সে আর্টিষ্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা।

এই আকাঙ্ক্ষা এবং ক্ষমতার প্রকৃতি বর্ণনা করে অন্যত্র তিনি বলেছেন,

> আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন অসহিষ্ণু স্বেচ্ছাবিহারপ্রিয় পুরুষ এবং গৃহবাসিনী অবরুদ্ধা রমনী দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। একজন সমগ্র জগতের নূতন নূতন দেশ ঘটনা অবস্থার মধ্যে নব নব রসাস্বাদ করিয়া আপন অমর শক্তিকে বিচিত্র বিপুলভাবে পুরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল, আর একজন শত সহস্র অভ্যাসে বন্ধনে প্রথায় আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন এবং পরিবেষ্টিত। একজন বাহিরের দিকে লইয়া যায়, আর একজন গৃহের দিকে টানে। একজন বনের পাখী, আর একজন খাঁচার পাখী। এই খাঁচার পাখীটাই বেশি গান গাহিয়া থাকে, কিন্তু ইহার গানের মধ্যে অসীম স্বাধীনতার জন্য একটি ব্যাকুলতা, একটি অভ্রভেদী ক্রন্দন বিবিধভাবে ও বিচিত্র রাগিণীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।[১]

রবীন্দ্রনাথের ধারণা অনুসারে, 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান' নয়।

> দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
> প্রিয়জনে--প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
> তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা?
> দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

সুন্দর হল, অসম্পূর্ণ real এবং পরিপূর্ণ ideal এর মিলন। অনুরাগের centripetal force মনকে কেন্দ্রের দিকে টানছে, কল্পনার centrifugal force মনকে বাইরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ দুয়ের সামঞ্জস্যই সুন্দর।

কবিতায় উপমা প্রয়োগের রহস্য খুঁজতে গিয়ে এই সত্যই আগে আলোচ্য। সাহিত্যশিল্প-চেষ্টাতে কবিমনের দুটো ভাগ, অসম্পূর্ণ real এবং পরিপূর্ণ ideal; অর্থাৎ অসম্পূর্ণ উপমেয় এবং পরিপূর্ণ উপমান। এ দুয়ের 'পরস্পর-স্পর্ধিত্ব-রমণীয়' সামঞ্জস্যই সার্থক অলঙ্কারের সৃষ্টি। পরিচিত বাস্তবের সৌন্দর্যে আনন্দের সীমা থাকে। একে নিয়ে অতৃপ্তিও যেমন উপমার কারণ, তেমনি একে

---

১ আধুনিক সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অতিক্রম করে (উত্তীর্ণ করে) পরিপূর্ণ করাও উপমার কারণ। অতৃপ্তি মৌলিক কারণ, আকাঙ্ক্ষার দ্বারা পরিপূর্ণ করার চেষ্টা অনুগত কারণ। উপমাসৃষ্টির ক্ষেত্রে মূলের এই অতৃপ্তিকে আমরা কবিমনের অভাববোধ বলব। বলা বাহুল্য, এ অভাববোধ পার্থিব বস্তুর নয়, শিল্পের প্রকাশভঙ্গিগত। 'মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে।' একটি অনিন্দ্যসুন্দর মুখদর্শন করে মনের মধ্যে যে রূপমোহ ঘনায়, তাকে প্রকাশ করার বাসনা মানবমনে স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকাশের যে মাধ্যম, তার অনেক সীমা। তার সঞ্চার নেই, বিস্তার নেই, আনন্দ আর অনুরাগকে রূপময় করার সামর্থ্য তার নেই। অথচ কবির হাতে রূপ অথবা ভাব প্রকাশের উপায় এই একটাই, সে ভাষা। কিন্তু কেবল ভাষা দরিদ্র। তাই নিরলঙ্কার ভাষাতে 'সুন্দর মুখ' এর প্রকাশটি অসম্পূর্ণ real। ঠিক এই কারণেই কবির মনে পরিপূর্ণ ideal টিকে পাবার কামনা জাগে। মুখের অসম্পূর্ণ real চাঁদের পরিপূর্ণ ideal কে (উপমানকে) পেতে চায়। ideal এর সঙ্গে যোজনা করে real কে বা উপমেয়কে আদর্শায়িত বাস্তব (idealised real) করে তোলাই অলঙ্কার-ক্রিয়া।

উপমেয়-বিষয়ে কবিমনে যে অভাববোধ, তা শিল্পের প্রকাশভঙ্গিগত, পার্থিব বস্তু-সম্বন্ধীয় নয়। আনন্দের পূর্ণতা-বিধান অলঙ্কার-ক্রিয়ার শেষকথা অবশ্যই, কিন্তু মূলে অসম্পূর্ণ বলেই কবিমনে এই সম্পূর্ণতা বিধানের তাগিদ, এও সত্যকথা।

> কো কহে অপরূপ প্রেম-সুধানিধি
> কোই কহত রস-মেহ।
> কোই কহত ইহ সোই কল্পতরু
> মঝু মনে হোত সন্দেহ॥
> পেখলুঁ গৌরচান্দ অনুপম।

এইভাবে উপমানে মাটির স্পর্শ লাগে, উপমেয়ে স্বর্গীয় আদর্শের আশীর্বাদ নামে। 'গৌরচান্দ' আর ঠিক পরিচিত মানব 'গৌরচান্দ' থাকেন না, 'প্রেম-সুধানিধি', 'রস-মেহ' 'কল্পতরু' ইত্যাদিও তাই, কবি তাদের সদৃশ সৌন্দর্যটুকু ছানিয়ে নিয়ে এক নতুন বাস্তবের সৃষ্টি করেন, যাকে বলি poetic reality।

বৈষ্ণবপদ আবেগ-সর্বস্ব। ভগবানকে ভালোবাসবার, আপন করে পাবার ব্যাকুলতা দিয়েই এর ভাবরূপকর্ম। বৈষ্ণব ভাবসাধনায় গৌরাঙ্গ যেমন বৃন্দাবন রসমাধুরীর প্রবেশ-উপায়, বৈষ্ণব রূপসাধনায় উপমাও তেমনি 'মধুর বৃন্দাবিপিন-মাধুরি প্রবেশ চাতুরি-সার।' যে রসবোধে অধিকারী-ভেদ আছে এবং যা কেবল সুগভীর অনুভূতির বিষয়, সেখানে রূপানুরক্ত

হতে হলে অলঙ্কারের সূক্ষ্ম চতুরালির সাহায্য নিতেই হয়। রাধাকৃষ্ণের অনুপম লীলাবিলাস কবিভাবনাকে বিস্মিত করেছিল বলেই কবি সুলভ প্রকাশ-উপাদানের মধ্যে অভাব এবং অতৃপ্তি দেখেছিলেন। কবি গোবিন্দদাস যখন রাধার তরুণ বয়সের লাবণ্য দেখলেন, তখন ভাবাতিশয্যে সে রূপে কেবল নিখিল রসিকচিত্ত প্লাবিত করার শক্তিকেই অনুভব করলেন।

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গেব লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।

কিন্তু তার যোগ্য উপমান চয়ন করার কথাটি তখন কবির মনেও পড়ল না। অনুভূতির আলঙ্কারিক অভিব্যক্তি হয়ত এখানে নেই, কিন্তু বলার কি অপরূপ ব্যাকুলতা! কোন সাদৃশ্য-সন্ধানী আলঙ্কারিক বুদ্ধিতে স্বীকার করবেন না যে, রাধার কাঁচা অঙ্গের লাবণ্য সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বহে চলেছে। কিন্তু উক্ত পদের থেকে এও বোঝা যায় যে, কবিমনে অনুভূত রাধার ঈদৃশ মূর্তি অন্য কোন সাকার উপমানের দ্বারা এমন মরমী হতে পারতো না। এখানে যেন উপমেয় (রাধারূপ) যে কোন সম্ভাব্য উপমানকে ছাড়িয়ে গেছে। রাধার রূপপ্রকাশে কবি উপযুক্ত উপমানই পাননি। রূপকুশলী গোবিন্দদাস তাই আপন অনুরাগের তীব্রতা দিয়ে রাধার লাবণ্য-পরিচয় রচনা করলেন। রাধার মত অলোক-সামান্যার দর্শন যখন অনেক ভাগ্যে ক্বচিৎ মেলে, তখন বড় কবিকেও এমন এক শিল্প-অতৃপ্তির মুখোমুখি হতে হয়। এই মৌলিক অথচ মৃদু অতৃপ্তি থেকেই প্রকাশ-জনিত ব্যাকুলতার জন্ম।

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নৌতুন হোয়॥

প্রতিক্ষণে বর্ধমান এ নব নব ভাবের কোন সাদৃশ্য তাই নেই। 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ, নয়ন না তিরপিত ভেল'। রূপের যথাযোগ্য উপমান যোজনা করে কবিবল্লভ আলঙ্কারিকের কর্তব্য সমাপন করেন নি। নিরলঙ্কার ভাবের কথায় সে অনন্ত রূপের ইঙ্গিতমাত্র দিয়েই আপন দৈন্যটুকু সবিনয়ে স্বীকার করেছেন।

কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।

'নয়ন না তিরপিত ভেল।' ধারণার অতীত যে রূপ, তার যুগ-যুগ-দর্শনেও তৃপ্তি মেলে না। অথচ রূপ-নির্মাণই Artistএর মুখ্য কাজ। শিল্পগত এ মৌলিক অতৃপ্তি কবিমনে আছে বলেই, অনুভূতির স্তর এবং অভিব্যক্তির স্তর পৃথক বলেই, কবির তীব্র ভাবাবেগ সে শূন্যকে পূরণ করে।

তনু তনু অতনু- যূথ কিয়ে সেবই
কিয়ে রূপ আপহি সেব।
কিয়ে সুমনোহব কান্তি-রূপ ধব
কিয়ে বব-রস-অধিদেব॥

রূপের বহুমুখী মনোহারিত্বের স্বরূপ-নির্ণয়। কৃষ্ণের প্রতি অঙ্গে এ রূপের সেবক কি অতনুবৃন্দ অথবা এ রূপ আত্মমূর্ছিত। কবি যেন ভাবনার কোন কূল পান না। অথচ এই একই কবি একই উপমেয়ের (কৃষ্ণের) রূপরচনায় অন্যত্র অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন।

কত কোটি শরদ-চাঁদ জিনি শোভিত
ঢল ঢল বিমল বয়ান॥
পদ-তল অরুণ-কমল জিনি উজব
মুনি-মানস মুবছান।

গভীরতম রূপানুভূতির কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ উপমানের প্রয়োগও যথেষ্ট হয় না। 'তনু তনু অতনু' ইত্যাদি পদটিতে দেখা যাচ্ছে, অলঙ্কার গড়ার একটা অস্ফুট প্রয়াস কবির আছে, কিন্তু উপমানের অনুপযুক্ততা সে চেষ্টায় নিষেধের মত। শুধু উপমেয়ের প্রকাশ-চেষ্টাতেই নয়, কবির রূপলোকে উপমান চয়নের চেষ্টাতেও একটা অতৃপ্তিবোধ কখনো কখনো দেখা যায়। এই দুই অতৃপ্তি একই কারণজাত। রূপের বহুরেখা-বিচ্ছুরিত প্রকাশকে উপমানের একটিমাত্র জালে ধরা যায় না বলেই না নির্বাচনে কবির এত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব!

প্রতিষ্ঠিত অলঙ্কার ব্যতিরেক অপহ্নুতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই সত্যটিই উপমানকে গৌণ করার কাজে নিযুক্ত।

তুমি মোব নিধি রাই তুমি মোব নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিবমিল বিধি॥
....
....
নীরস দরপণ দূরে পবিহরি।
কি ছার কমলের ফুল বটেক না কবি॥
ছি ছি কি শরদের চাঁদ ভিতবে কালিমা
কি দিয়া করিব তোমাব মুখের উপমা॥

কিন্তু সেজন্যে কবিমনে উপমা সন্ধানের শ্রান্তি নেই। অতৃপ্তি এবং অভাব-বোধ যেন ক্ষণে ক্ষণে কবির উৎসাহকে উদ্দীপ্ত করে দিচ্ছে, কবি নব নব চেষ্টার দ্বারা উপমার নিপুণতা বৃদ্ধি করতে তৎপর।

কি কাল কাজর কালিন্দীর জল
কাল উতপল-দাম।
নীল নব ঘন নহে নিরুপম
বরণ চিকণ শ্যাম॥

অথবা,

চণ্ডীদাসে কয় মুরুতি এ নয়
বধিতে নাগর জনে।
অমিয়া ছানিয়া যতন করিয়া
গঢ়িল সে অনুমানে॥

অথবা,

হার নহোঁ পিয়া গলায় পরযে
চন্দন নহোঁ মাখে গায়।
অনেক যতনে রতন পাইয়া
থুইতে সোয়াস্ত না পায়॥

অথবা,

সই লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম জলদ না হেরি গো
তেজিয়াছি কাজরের সাধ॥
যমুনা সিনানে যাই আঁখি মেলি নাহি চাই
তরুয়া কদম্বতলা পানে।

উদ্ধৃতিগুচ্ছে কবিমনে আবেগের ক্রম লক্ষ্য করা যায়। প্রিয় উপমেয় কৃষ্ণের উপমান কবির দৃষ্টিতে দুর্লভ। তাই ব্যবহার-জীর্ণ উপমানগুলি, আলঙ্কারিক কুশলতায় নয়, প্রকাশের অনুরাগে উপমেয়-রূপের (কৃষ্ণের) শ্রেষ্ঠত্ব সঙ্কেত করে। প্রথাভাণ্ডার থেকে উপমান-উদ্ধারে অসন্তুষ্ট কবিচিত্ত আপন আবেগের ঘন প্রলেপ দিয়ে যথালভ্য তৃপ্তির প্রত্যাশা করেছে। উপমেয়-রূপে (কৃষ্ণ) কবিচিত্ত যতই মুগ্ধ, উপমান-ভাণ্ডারের তুচ্ছ সম্বল ততই কবির পক্ষে অভাববোধ-জনিত অতৃপ্তির কারণ। আর এই অতৃপ্তির দাহে কবি-বেদনার বেগ রূপের

অসংখ্য প্রকাশে ছিন্ন ছিন্ন। পূর্বস্থাপিত প্রথা যখন অসন্তুষ্ট রূপকারের মানস-নিয়ামক হয়, তখন কাব্যে আশানুরূপ শিল্প-সফলতা না মিললেও আবেগের প্লাবন দশদিক ব্যাপ্ত করে আসে। এ আবেগ হয়ত রূপশিল্পদর্শী নয়, কিন্তু তা নির্ভুলভাবে কবিহৃদয়দর্শী। অগণিত বৈষ্ণবপদের অলঙ্কার-কর্মে এমনই একটি রূপানুরাগী হৃদয় ধরা পড়েছে, যার কথা অজস্র, আবেগ অনিরুদ্ধ।

এতো গেল এক জাতীয় অভাববোধ, যেখানে কবিশক্তি প্রথার দাসত্ব করে। কিন্তু আর এক প্রকৃতির অভাববোধও আছে, যা দৃষ্ট অথবা অনুভূত সুন্দরকে রূপবান করার কাজে যথোপযুক্ত মানব-ভাষা পায় না। রূপদক্ষের কল্পনায় দৈন্য নেই, কিন্তু কল্পনা প্রকাশের যে উপায় ভাষা, তা একান্তভাবে নির্দিষ্ট। প্রকাশের এ সীমা কবির একই রূপদর্শনকে নব নব চিত্রে বিচিত্র করে তবেই কথঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করে। রূপপ্রকাশের এই অভাববোধই কবির আর্তিকে তীব্র করে তোলে, আর চিত্রান্বেষণের সাধনায় কবি আপন রূপানুভূতিকে পূর্ণতা দেবার নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করেন। এখানে আমরা বিদ্যাপতির কয়েকটি পদাংশ উদ্ধার করব, যা রাধাদেহের একটি বিশেষ অবয়ব-সংস্থানকে রূপাঙ্কিত করবার জন্যে নতুন নতুন ছবিতে বৃত্তের পর বৃত্ত রচনা করেছে।

গিবিবর গরুঅ পয়োধব-পবসিত
গিম গজ-মোতিক হারা।
কাম কম্বু ভবি কনক-সম্ভু-পবি
ঢাবত সুবধুনি ধারা।।

কুচ-জুগ পর চিকুর ফুজি পসরল
তা অরুঝায়ল হাবা।।
জনি সুমেরু উপর মিলি উগল
চাঁদ বিহিন সব তারা।।

মেরু উপর দুই কমল ফুলায়ল
নাল বিনা রুচি পাঈ।
মণিময় হার ধার বহু সুরসুবি
তেঁ নহি কমল সুখাঈ।।[১]

১ তিনটি পদাংশই শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি' থেকে গৃহীত।

শ্রীরাধার পয়োধর-শোভা আরও কত অভিনব চিত্রে বিদ্যাপতি অন্যত্র অঙ্কিত করেছেন। আমরা উপরোক্ত তিনটি দৃষ্টান্তে একই উপমেয়-যুগলকে (পয়োধর ও মণিহার) দেখেছি, অথচ তাদেরই শোভা-প্রকাশক স্বতন্ত্র তিনটি ছবি পেলাম। এমন হয়, যখন কবির প্রকাশের সুন্দর তাঁর দর্শনের (দৃষ্ট) সুন্দরকে পরিপূর্ণভাবে রূপায়ত্ত করতে পারে না। হৃদয়ে অনুভূত রূপোল্লাসের পূর্ণতা-বিধান করতেই কবির এ নব নব চিত্র-উদ্‌ভাবনা। এখানেও হয়ত প্রথা আছে, তা শুধু স্বীকৃতিমূলক, কবির প্রয়োগকলার নব নব পরীক্ষায় অলঙ্কারগুলি সজীব।

পদাবলীর রূপাঙ্কনে কবিচিত্তে অনুভূত অভাববোধ দুটি সত্যের প্রকাশক। এক, প্রথার শাসন কবিচিত্তে রূপের বিকল্পরূপে হৃদয়াবেগকে অবারিত করেছে। দুই, প্রথাকে স্বীকার করেও কবির বিচিত্র প্রয়োগ ও পরীক্ষা রূপ-কে মণি-কোণের হাজারো ছটায় উদ্‌ভাসিত করেছে। অভাববোধ একদিকে জাগিয়েছে ভাবের বন্যা, অন্যদিকে জাগিয়েছে রূপরচনার অতন্দ্র উৎসাহ। একদিকে ভাবোল্লাস, অন্যদিকে রূপোল্লাস,—কবিচিত্তে অনুভূত এ অভাববোধ এই দুটি সত্যের জন্মদাতা।

আবার অনেকক্ষেত্রে কবি কখনও অনুপ্রাসে, শব্দের ধ্বনি-ঝঙ্কারে, কখনও ছন্দে এই আকাঙ্ক্ষা-পূরণের প্রয়াস করেছেন,

কুহরে কোকিল সতত কুহুকুহু
কুহুলিয়া উঠে ছাতিয়া ॥

রাধাবিরহের অপরূপ কাতরতা 'কুহুলিয়া' এই শব্দের ঝঙ্কারে প্রকাশিত।

এখন তখন করি দিবস গোঙায়লুঁ
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়লুঁ
ছোড়লুঁ জিবনক আশা ॥
বরিখ বরিখ করি......................

বিরহিণী-হৃদয়ে প্রতীক্ষার বেদনা প্রকাশভঙ্গির প্রলম্বিত রূপে স্ফুট।

ছন্দে অনুপ্রাসের ঝঙ্কার,

চিক্কণ চাঁচর চিকুরে চুম্বিত
চারু চন্দ্রক পাঁতি।
চপল চমকিত চকিত চাহনি
চিত চোরক ভাতি ॥

ঝাম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভবি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুণ কাম দারুণ সঘন খবশর হন্তিয়া॥

অতৃপ্তির আরও একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এ আলোচনা শেষ করব।

কনক-কেতকি-চম্পা-তডিত-ববণী।
ইন্দিবব-নিলমণি-জলদ-বসনী॥
মৃগজ-পঙ্কজ-মিন-খঞ্জন-নয়নী॥
কাম-ধনু ভ্রমব-পংক্তি ভুরু-ভুজঙ্গিণী॥
নাসা তিলফুল-খগ-চম্প-কলি জিতা।[1]

নতুন অনুভূতির শিখা এ উপমান-তালিকার আড়াল থেকে ঝলক দেয় না সত্যি, কিন্তু রাধার এক একটি অবয়বের জন্যে উপমানেব শ্রেণী সজ্জিত করার মধ্যে কবিহৃদয়ের ব্যাকুলতা ধরা পড়ে। রূপময়ী রাধার প্রতি প্রত্যঙ্গের উপমান চয়ন করতে গিয়ে কবি একটিতে তুষ্ট হননি। এক একটি প্রত্যঙ্গের জন্যে প্রতিক্ষেত্রেই একাধিক উপমান চয়ন করেছেন। অনেকগুলি উপমানের যোগফলে যে বহুগুণিত রূপদ্যুতি, তাতেই কবিমন কিছুটা তৃপ্ত। স্বল্প-শক্তিমান কবি[2] প্রথাবদ্ধ প্রয়োগের সনাতন রীতি বদল করেননি। অর্থাৎ, শিল্পের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চতুরালি হয়ত তাঁর নেই, কিন্তু প্রকাশভঙ্গিগত একটা অভাববোধ যে আছে, তা একাধিক উপমান-ব্যবহারেই বোঝা যায়।

আসল কথা, কবির বর্ণনীয় বস্তুতে প্রকাশভঙ্গিগত একটা অভাববোধ এবং তজ্জনিত অতৃপ্তি আছে। আর তারই তীব্র তাডনায় কবির মন কখনো ভাষায়, কখনো ছন্দে, কখনো অলঙ্কারে আপন বর্ণনীযের (বা উপমেয়ের) পূর্ণতা চাইছে। সুন্দরকে প্রকাশ করার শৈল্পিক বেদনাতেই সৃষ্টি সম্ভব হয়। মনেব আবেগ কবিকে তার প্রিয় বাস্তবের যোগ্য আদর্শ সন্ধানে নিযুক্ত করে দেয়। রবীন্দ্রনাথের উক্তি পুনরুদ্ধার করি, 'এই খাঁচাব পাখীনাই বেশি গান গাহিয়া থাকে। কিন্তু ইহার গানের মধ্যে অসীম স্বাধীনতার জন্য একটি ব্যাকুলতা, একটি অভ্রভেদী ক্রন্দন বিবিধভাবে ও বিচিত্র রাগিণীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।' উপমা-প্রক্রিয়ায় এমন একটি ব্যাকুলতা, একটি অভ্রভেদী ক্রন্দন আছে বলেই কবির আলঙ্কারিক রসসৃষ্টি পরিণামে পূর্ণতা-বিধায়ক।

১ সবগুলি বৈষ্ণবপদ শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত শ্রীশ্রীপদকল্পতরু গ্রন্থ থেকে গৃহীত।
২ সালবেগ। শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (চতুর্থ খণ্ড)।

বৈষ্ণবপদে লৌকিক রূপ

কাব্য পরিণামে অলৌকিক। অথচ সূচনায় সেই কাব্যেরই বস্তু-অবলম্বন পৃথিবীর লৌকিক অভিজ্ঞানগুলি। পার্থিব অভিজ্ঞান দিয়েই উত্তীর্ণ কাব্যের স্বর্গীয়তাকে আমরা আপন করে পাই। বৈষ্ণবপদের এক কোটিতে ভাবরসের অলঙ্ঘ্য সমুন্নতি, অন্য কোটিতে বস্তুরূপের সীমায়িত পরিচয়। এ আলোচনায় আমরা সেই লৌকিক বস্তু-চিহ্নগুলির অলঙ্কৃত রূপ লক্ষ্য করতে পারব।

দূব সঞে হেরি নাগর-রাজ।
তুরিতে আওল ধেনু-সমাজ।।
রাই-রূপ হেরি বিভোর হইয়া।
দোহনের ছান্দ পড়ে আউলাঞা।।

শ্রীরাধার রূপে বিমুগ্ধ নায়ক। রাধাকৃষ্ণের প্রেম যতই অনন্ত মহিমার রঙে রঞ্জিত হোক না কেন, তাদেরও যে একটা আটপৌরে সমাজ-পরিচয় আছে, শ্রোতা হিসেবে সেই সত্যটাই আমাদের প্রথম আশ্বাসের বিষয়। শিল্পের মাধ্যমে কবি পাঠকচিত্তে যেমন একদিকে অলৌকিক সৌন্দর্যবোধ জাগিয়ে দেবেন, তেমনি জীবন-অন্তরঙ্গতার মাধ্যমে গভীর অনুরাগ জাগিয়ে দেওয়াও তাঁর কর্তব্য। সাহিত্যে মানব-বিশ্বাস কেবল তখনই সম্ভব, যখন নিত্যসুন্দরকে নিত্য অনুরাগের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

নিতাইব বরণ কনক-চাঁপা।
বিধি দিল রূপ অঞ্জলি-মাপা।।

নিত্যানন্দ প্রভুর বিধিদত্ত যে স্বর্গীয় রূপ, তার ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের প্রদান-ভঙ্গিটিকে কবি কত অনুরাগের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন, '........দিল রূপ অঞ্জলি-মাপা।।' এমন পরিপূর্ণ করে দেওয়ার শ্রদ্ধা একান্তভাবেই আমাদের দেশীয় ভাব-সংস্কারগত। কবি রাধাবল্লভ একযোগে চম্পকবর্ণ নিত্যানন্দের সৌন্দর্য এবং প্রীতিপুষ্ট মাধুর্য প্রকাশ করলেন। আমাদের আপন জন এমন করেই সুন্দর হল।

চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।

শ্রীরাধার সিক্ত নীল শাড়ি আর নায়কের আপ্লুত হৃদয় যেন অভিন্ন। স্নানান্তে বসনের নিষ্পেষণে যেন নায়কের অপূর্ণকাম হৃদয় নিষ্পেষিত হচ্ছে। নায়কের

আর্তি একাধারে সৌন্দর্যবোধ এবং আমাদেরই পরিচিত কোন স্নানার্থিনীর নম্র মাধুর্য প্রকাশ করে। একদিকে আসক্তিময় মধুরতা, অন্যদিকে রসের নিরপেক্ষ সৌন্দর্য।

যদি বা না কহ লোকের লাজে।
মরমি জনার মরমে বাজে॥
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখী॥

গাঁঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই
এত দিনে পেখলুঁ আঁখি॥

সখির রসিকতায় রাধাহৃদয়ের পরিচয় ব্যক্ত। অথচ একান্ত ঘরোয়া লৌকিক উপমানে নায়িকার আনন্দের একটা আটপৌরে প্রতিরূপ দেখা গেল। এই-ভাবেই সুন্দরের সঙ্গে অনুরাগ যুক্ত হয়।

কোন বিধি সিরজিলে সোতের শেহলি।
এমন বেথিত নাই ডাকে রাধা বলি॥

স্রোতে ভাসমান শ্যাওলার মত রাধার বঞ্চিত জীবনের প্রতি সব মানুষের অবহেলার কথা। লৌকিক উপমানে রাধার সমবেদনা-বঞ্চিত অন্তরের ব্যথা কত সুষ্ঠু হতে পেল।

সখি হে—কি ভেল এ বর-নারী।
করহুঁ কপোল থকিত বহু ঝামরি
জনু ধন-হারি জুয়ারি॥

জুয়াখেলায় পরাজিতের আক্ষেপ দিয়ে রাধা-ভাবরূপ গঠিত। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ের কুটিল গতি যে জুয়াখেলার মতই আঁকা বাঁকা, সে কথা এখানে স্পষ্ট।

বৃষভানু-নন্দিনিতে মন-মোহন
কেমন লাগি বসি।
পাণ খাওত পিক গীমতে চরকত
ঝলক জেঙ যাবক-সিসি॥

গ্রীবাদেশে বিগলিত পানের পিক যেন উল্টানো আলতার শিশি। এ ছবিতে অলঙ্কারের বিশেষ কোন কৌশল নেই, কেবল সাদৃশ্যযোগে আমাদেরই ঘরগড়া অসাবধানতার পরিচিত বিভ্রাটকে নিবিড় (intimate) করে দেখার চেষ্টা।

নন্দরাজ ঘরে নবনী খাইয়া
হৈয়াছ উমাদ ষাঁড়া ॥

কৃষ্ণের কামুকতার প্রতি রাধার তিরস্কার-বাণী। কিন্তু নিষেধের কী প্রবল মনোবেগ এবং শাসনের চকিত সংলাপময়তা। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কথা স্মরণ করায়।

বাসুদেব ঘোষ কহে ডাকাত্যা পিরিতি গো
তিলে তিলে বন্ধুরে হারাই ॥

রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রণয় ডাকাতের প্রেম যেন, সর্বস্ব লুণ্ঠনকারী এবং পলায়নপর। আমাদের পরিচিত অভিজ্ঞতাকে এ প্রণয়ের উপমান করার ফলে উপমাটি কত স্পষ্ট।

কার পূর্ণ ঘট মুঞি ভাঙ্গিলুঁ বাম পায়।
পদাঘাত কৈলুঁ কোন ভুজঙ্গ-মাথায় ॥
না জানিয়া মুঞি কোন দেবেরে নিন্দিল।
কে মোর হিয়ার ধন লইতে আইল ॥[১] জ্ঞা:

রাধাচিত্তের এ আশঙ্কা আমাদের ঘরেরই কুবধূ-সংস্কারে গড়া। বণিক চন্দ্রধরের অভিমান এবং শাস্তির স্মৃতি রাধাহৃদয়কে সংস্কার-ভীত করে তুলেছে।

এ সব লৌকিক ভাবসংস্কারগত উপমানের দ্বারাই কেবল জীবনের নৈকট্য-নির্ণয় সম্ভব। কালিদাসের উপমা,

উপেক্ষতে যঃ শ্লথলম্বিনীর্জটাঃ কপোলদেশে কমলাগ্রপিঙ্গলাঃ ॥[২]

ছদ্মবেশী শঙ্করের বর্ণনায় উমার অপর্ণা-রূপ। কালিদাস কমলা-প্রসাদপুষ্ট ভারতবর্ষের কৃষিশ্রী-সংস্কারকে উপমানরূপে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু এর ভাবপট এতই ব্যাপক যে নৈকট্য-জ্ঞাপনের বদলে তা জীবনকে শিল্পময় করে প্রকাশ করেছে। অন্য আর একটি উপমা,

নির্বৃত্ত-পর্জন্যজলাভিষেকা প্রফুল্লকাশা বসুধেব রেজে ॥[৩]

---

১ সবগুলি বৈষ্ণবপদ শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত শ্রীশ্রীপদকল্পতরু গ্রন্থ থেকে গৃহীত।
২ কুমারসম্ভব, কালিদাস।
৩ ঐ ঐ

তপোত্তীর্ণা শুভ্রবসনা উমার এ রূপ আমাদের পরিচিত নিসর্গ-সংস্কার থেকেই গৃহীত। কিন্তু সর্বংসহা বসুমতীর সাদৃশ্য এ দেশজ শোভাকে কালোত্তীর্ণ মহিমা দিয়েছে।

তং কর্ণমূলমাগত্য রামে শ্রীর্ন্যস্যতামিতি।
কৈকেয়ীশঙ্কয়েবাহ পলিতছদ্মনা জরা ॥১

বার্ধক্যের লক্ষণ পলিত কেশ। কবি সেই বার্ধক্যের সংস্কারটিকে কত সূক্ষ্ম উপায়ে উপমানরূপে ব্যবহার করেছেন। অনুরাগ উদ্দীপ্ত করে কাব্যভাবনার মধ্যে পাঠককে মগ্ন করা নয়, সতর্কতার সঙ্গে অমূল্য শিল্পকলাকে দূরে স্থাপিত করে পাঠকের চিত্তে পরিচিত রূপের যাদুস্পর্শ বুলিয়ে দেওয়া,—এ রচনার লক্ষ্য। রাজা দশরথের জরা যেমন কৈকেয়ী সম্বন্ধে সাবধান, কালিদাসের অভিজাত শিল্পকর্ম তেমনি (পাঠকচিত্তের) লৌকিক ভাবাবলেপ সম্বন্ধে সাবধান।

লৌকিক উপমান চয়নেও কালিদাসীয় মানস বৈষ্ণবীয় মানস থেকে স্বতন্ত্র। কালিদাস Artist, নির্লিপ্তিই তাঁর বড় অবলম্বন। বৈষ্ণবকবি জীবনরসিক, শিল্পের নির্লিপ্তি ও অনুরাগের আবেশ, এ দুই-ই তাঁর কাছে সমান মূল্যের। দর্শনে রূপানন্দ এবং আত্মীয়তায় সুখ-দুঃখের ভাগ নেওয়া, কৃষ্ণের কাছে ভক্তের এই দুটি প্রার্থনা।

১ রঘুবংশ, কালিদাস।

বৈষ্ণবপদে রূপের আবেশ

রূপ নির্ণয় এবং রূপ অনুভব, বৈষ্ণব পদসাহিত্যে কবিকৃতির এ দুটি দিক। প্রথম ক্ষেত্রে দেহের অন্ধি সন্ধি ঘিরে কবিমনের উৎসুক সন্ধান। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হৃদয়ের সান্দ্র অনুভূতি-পটে রূপের সম্মোহ। একদিকে রূপের মান ও মাত্রা, অন্যদিকে মোহ ও মন্ত্র। কবি আরোপদক্ষতায় স্থিরলক্ষ্য অথচ আবেশময়তায় রোমাঞ্চিত। শ্রীরাধার পূর্বরাগ,

কমল জুগল পব চাঁদক মাল।
তাপর উপজল তরুণ তমাল॥
তাপর বেঢ়লি বিজুরি লতা।
কালিন্দি-তীর ধীর চলি জাতা॥
সাখা শিখব সুধাকব পাঁতি।
তাহি নব পল্লব অরুণক ভাঁতি॥
বিমল বিম্বফল জুগল বিকাশ।
তাপব কীব থীব করু বাস॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন-জোর।
তাপর সাপিনি ঝাঁপল মোর॥

এবং শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি,

হেবইতে মঝু জিউ তুল ধুঁড়ল গেল।
মুবতি রহল তহি থাড়ি।
তিরি জগ ভরমি উপমা নহি পাইঅ
পুন জিউ মুবতে সঞ্চাবি॥
তৈখনে দেখল সমাধল সিনান
চলব করত অনুমানি॥

প্রথম পদে বিদ্যাপতি উপমানের তুলিতে দেহের ধারাচিত্র রচনা করেছেন। পদতলের নখকান্তি থেকে মাথার শিখিপুচ্ছ-শোভা পর্যন্ত প্রতিটি অবয়ব ও তদুপযুক্ত ভূষণ যোজনায় রূপসন্ধানী কবি নিবিষ্ট। দেহদ্যুতিকে সৌন্দর্যে চিহ্নিত করতে প্রকৃতির রূপভাণ্ডার উজাড় করার যে উদ্যম, তাতেই কবির রূপোল্লাস। রূপকাতিশয়োক্তিমূলক অসঙ্গতি অলঙ্কারে গড়া পদটি নিছক দেহ-প্রসাধনের কথাই বলে। দেহের প্রতিটি উপমেয় প্রতিটি উপমানের সঙ্গে খাপে খাপে মানানসই মাত্র, ধ্বনি-ব্যঞ্জনায় তা সঞ্চরমান নয়। রূপের স্পন্দনের চেয়েও যাথার্থ্য-নিরূপণই এখানে বড় কথা।

দ্বিতীয় পদটিতে রাধার স্নানরত দেহশোভা দর্শন করে কৃষ্ণ সখাকে বলেছে, তার কটাক্ষে চঞ্চল রূপ দেখে আমার প্রাণ সমতুল্য কার সন্ধানে গেল, মূর্তি আমার সেইখানেই স্থির হয়ে রইল। ত্রিজগৎ ভ্রমণ করে সে মূর্তির উপমা না পাওয়ায় পুনরায় সে মূর্তিতে জীবন সঞ্চারিত হল। স্নানসায়র বৈষ্ণব কবির রসতীর্থ। এখানে অলঙ্কারের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি কৈ। রূপনির্ণয় করার কোন অশান্ত সন্ধান এখানে নেই। কেবল মোহকে স্থির অনুভূতির মধ্যে ধারণ করে এ এক নিভৃত রস-চর্বণা। কোন প্রত্যক্ষ উপমান রাধা-তনুকে চিহ্নিত করেনি, অথচ কল্পনার একটা অসীম আকাশ রইল এ রূপাবয়ব ঘিরে। চোখ দিয়ে দেখা রূপে বস্তুর (উপমানের) সাদৃশ্যযোগ ঘটে, সেখানে অলঙ্কারের বিধানই বড় কথা। কিন্তু হৃদয় দিয়ে দেখা রূপে বস্তুযোগ বড় কম, সেখানে আবেগের প্রবাহই মূল কথা। পূর্বের মন্তব্য স্মরণ করি, আরোপ এবং আবেশ,—এ দুটি পথেই বৈষ্ণবীয় রূপকবিতা ভক্তিপথিক।

প্রথমে আমরা অলঙ্কার-সর্বস্ব বৈষ্ণব রূপকবিতার আলোচনা করব, যাকে পূর্বে 'রূপ-নির্ণয়' বলে উল্লেখ করেছি। সহজেই দেখা যাবে, তনুরূপ নির্মাণ-বিধির এখানে দুটি দিক। একটি হল, প্রত্যঙ্গের একক ও বিচ্ছিন্ন রূপসংস্থান। অন্যটি, প্রত্যঙ্গের যৌগিক ও সমন্বিত রূপসংস্থান। কয়েকটি উদাহরণ

রতি রস চরমে   শ্যাম-হিয়ে শুতলি
শরদ-ইন্দুমুখী বালা ॥

শ্রবণ-মকর গীম   কম্বু বিরাজ।

উর পর কুচযুগ সাজে
কনক কুম্ভ জনু   উলটি রৈসায়ল ॥

গতি গজরাজ, চরণ অরবিন্দ ॥

নবঘন-কিরণ-   বরণ নবনাগর
মন্দিরে আওল মোর ॥

রাধার বদন 'শরদ-ইন্দু', কৃষ্ণের গ্রীবাদেশ 'কম্বু', রাধার কুচযুগ 'কনককুম্ভ', নায়ক নায়িকার গতি 'গজরাজ' ও চরণ 'অরবিন্দ', নাগরের দেহবর্ণ 'নবঘন-কিরণ'। উপাঙ্গের এই বিচ্ছিন্ন উপমানে সৌন্দর্যের সঞ্চার নেই। অলঙ্কার এখানে বস্তুচয়ন করেছে মাত্র। দেখা যায়, আলঙ্কারিক রূপনির্ণয়ের ক্ষেত্রে উপমান যখন আলাদাভাবে দেহের একটি একটি প্রত্যঙ্গের পরিচয় দেয়, তখন আহৃত উপমানের কোন প্রাণময় ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায় না।

কিন্তু প্রত্যঙ্গের যৌগিক ও সমন্বিত রূপসংস্থানে উপমা যেখানে একটি শারীরক্রিয়ার প্রকাশক, সেখানে রূপবিস্তারের কিছুটা শক্তি চোখে পড়ে।

সিনিঞা উঠিতে নিতম্ব তটিতে
পড়্যাছে চিকুর রাশি।
কান্দিয়া আন্ধার কনক চান্দার
শরণ লইল আসি॥

মেরু উপর দুই কমল ফুলায়ল
নাল বিনা রুচি পাঈ।
মণিময় হার ধার বহু সুরসরি
তেঁ নহি কমল সুখাঈ॥

চিকুর গরএ জলধারা।
জনি মুখসসি ভয় রোঅএ অঁধারা॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিঅ কুল মিলিঅ আনি কোন দেবা॥
তেঁ সঙ্কাএ ভুজ-পাসে।
বাঁধি ধএল উড়ি জাএত অকাসে॥

চঞ্চল লোচন বঙ্ক নিহারএ
অঞ্জন সোভা পাএ।
জনি ইন্দীবর পবন পেলল
অলিভরে উলটাএ।

প্রতি পদেই কবি সমবেত উপাঙ্গের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট শারীরক্রিয়ার রূপ প্রকাশ করেছেন। যেমন, সদ্যস্নাত চিকুররাশি থেকে বিগলিত জলধারা নিতম্বতটে ঝরছে, যেন কনকচাঁদের শরণার্থী হয়ে আঁধারের অসহায় কান্না। উন্নত বক্ষমেরুর উপর অ-নাল দুটি কুচকমল, মণিময় হার সুরধুনীর মত স্তনতটে বহমান; তাই নালহীন হলেও কুচপদ্ম নিত্য রসপুষ্ট। কুচযুগ যেন সুন্দর দুটি চকোর, কিন্তু পলায়নপর; তাই বক্ষে আবদ্ধ হাতদুটি যেন তাদের পাশবন্ধন। চঞ্চল চোখ কটাক্ষ-কুটিল, তাতে কালো কাজলের শোভা; যেন নীলপদ্মের মধুপানে বিভোর ভ্রমর বাতাসের বেগে তাড়িত হচ্ছে। আহৃত উপমানগুলিতে প্রাণের লক্ষণ প্রতিফলিত হওয়ায় উপমেয়ের জড় শোভাই কেবল সূচিত হয়নি, পক্ষান্তরে তারা বিশ্ববস্তুর কাছ থেকে একটা জীবৎ-প্রেরণা (animation) পেয়েছে। অলঙ্কারগুলির স্বাদুতা এখানেই।

কিন্তু এ সবই আলঙ্কারিক রূপনির্ণয়ের উত্তরণ-ক্রম মাত্র। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সাদৃশ্য প্রথম ধাপ থেকে রূপের দূরবাহী স্পন্দন পর্যন্ত বিস্তৃত। তবু এ সবই চোখ দিয়ে দেখা ছবি।

এত অজস্র কবি এত বিপুল আবেগে প্রচুর সংখ্যক কবিতা লিখলেও শিল্প-সিদ্ধির পরিমাণ সে তুলনায় অত্যন্ত কম। আসল ব্যাপার এই, বৈষ্ণব-গোষ্ঠি তাদের নিত্য ভাবানুভূতির গুরুত্বে অভিভূত হয়ে, তারা যে মহান অধ্যাত্ম-সত্য প্রকাশ করছে, এ সম্বন্ধে অতি সচেতন থেকে, তাদের মনোবীণার তার খুব উঁচু সুরে বেঁধে নিত এবং স্খলিত বচনে, শব্দের দ্বিত্বে, অনুপ্রাস-বাহুল্যে, উপমার অতিশয়িত নির্বাচনহীন প্রয়োগে তাদের সেই ভাবোদ্বেলতাকে মুক্তি দিতে চাইত। চড়া সুর যে সকল গায়কের কণ্ঠে মানায় না, বসন ভূষণের চড়া চটক যে সর্বদাই বাঞ্ছনীয় নয়, কারু কারু পক্ষে গুঞ্জন-গীতিই যে বেশি মানানসই, এ শিল্পসত্য তাদের ভাবোন্মত্ততার মাঝে প্রতিভাত হত না। কাজেই রচনার বহুক্ষেত্রে অসঙ্গতি রয়ে গেছে। ভগবানের জপ করতে গেলে ধ্যানাসনে বসতেই হয়, কিন্তু সকলেই কি ধ্যানতন্ময় হতে পারে। ধূপধূনার সুগন্ধ, ঘৃতদীপের স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতা কি সব সময় মন্দিরের অন্তরশুচিতা প্রতিফলিত করতে পারে। বৈষ্ণব কবির অনেকেই হয়ত অজ্ঞাতসারে, কেননা জ্ঞাতসারে তাদের ভক্তি অকৃত্রিমই ছিল, এই ধ্যানতন্ময়তার কল্পনা করেছেন, তাতে আত্মমগ্ন হতে পারেন নি। তাই উৎসবের বিপুল আয়োজন হয়ত হয়েছে, কিন্তু বিপুলতর অপচয়ও সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে। সব ভক্তই শ্রেষ্ঠ কবি-শিল্পী নয়, সব ভক্তির উচ্ছ্বাসই অনবদ্য কাব্যরূপ পায়নি।

তবু কিছু কথা আরও বলার থাকে। পূর্বোক্ত মন্তব্য সমস্ত বৈষ্ণবপদের পক্ষে সত্য নয়। কিছু সংখ্যক বৈষ্ণবপদ আছে, যেখানে ভক্তিপ্রেরণা ও অধ্যাত্ম ভাবাবেশের সঙ্গে শিল্পীর কঠোর কলাসংযম ও কবির রহস্যভেদী অনুভূতি এবং প্রকাশ-চারুতার মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটেছে। অলঙ্কার-প্রয়োগের প্রান্ত সীমা থেকে আমাদের এ কথার সুরু, যার পর উপমানের তাৎক্ষণিক সাদৃশ্য দিয়ে শিল্পকে আর ধরা যায় না।

নয়ন কমল অতি নিরমল
তাহে কাজরের রেখা।
যমুনা-কিনারে মেঘের ধারাটি
যেন বা দিয়াছে দেখা॥

রাধার রূপ। স্পষ্টতই উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। কিন্তু কেবল সাদৃশ্য-স্থাপনেই কি এ বর্ণনার শেষ। এ অলঙ্কারের ব্যাকরণ সঠিক হলেও এ কবিতার ধ্বনি

দুরবগাহ। নয়নে কাজল-রেখা যেন যমুনাকূলে কালো মেঘের শোভা। নদী-ধারার দূর প্রান্তে মেঘরেখা, আকাশ-মাটির এমন নিবিড় মিতালি তার সমস্ত মেদুর শোভা নিয়ে রাধার দৃষ্টিকে আশ্রয় করেছে। রাধার গভীর চাহনি যেন নীল যমুনার প্রবাহ, যে যমুনা কৃষ্ণ-রূপে মাখামাখি হয়ে কালিন্দী নামে ভক্তের ভাবনাপটে যুগে যুগে বহমান। এ যমুনা ভক্তের মনে ভাব-বৃন্দাবনের এক অপরূপ স্মৃতিপট। তন্ময় একটি বিশ্বাস কালে কালে সঞ্চিত হয়ে গাঢ় সংস্কারের আকারে বাঙলাদেশের আকাশে বাতাসে মিশে আছে। তাই কবি যখন বলেন,

> সখি সঙ্গে যদি জলেরে যাই
> সে কথা কহিল নয়।
> যমুনাব জল মুকত কববী (?)
> ইথে কি পরাণ বয়॥

যমুনা-প্রবাহের সঙ্গে কৃষ্ণানুরাগ বিজড়িত হয়ে এমনই এক মিশ্র স্মৃতি প্রাণকে আকুল করে, যার সান্ত্বনা কেবল রাধার ঐ যমুনা-দৃষ্টিতেই লাভ করা যায়। বির-হিণী নায়িকা তাই কৃষ্ণদর্শনের বিকল্প ধ্যান করে,

> নীল ঘনশ্যাম যে দেখি সম্মুখে
> তাহাই দেখিয়া বই।
> আকাশের গায যে কালো ববণ
> তা দেখি বাঁচিয়া বই॥
> ....
> তোমাব বরণ না দেখি যখন
> এ চিত রাখিয়ে তায়॥

রাধা তাই,

> সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
> না চলে নয়ান তারা।

আর,

> ফুয়ল কবরী উরহি লোটায়ত
> কোরে করু তুয়া ভানে।

যমুনার ধারারূপ, তার নিভৃত তীরে ভাব-বৃন্দাবনে প্রণয়লীলার সবটুকু স্মৃতি রাধাদৃষ্টির ঐ রহস্যে ধরা আছে। তাই সে চোখে যমুনার উপমান সার্থক।

এখানে একটি বিষয় স্মরণযোগ্য। উপমা কোন পর্যায়ে স্মৃতি-উদ্দীপক হয়। 'উপক্রম' অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গের আলোচনা করেছি। এখানে শুধু বলি, Poetic myth যেমন, অনেকটা তেমনই বৃন্দাবনলীলার স্মৃতি-ঐতিহ্য বাঙলা-বাসীর প্রাণে একটা আবেগ-সংস্কারের মত তার মগ্নচৈতন্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সামান্য ইঙ্গিতে সে আবরণ যদি ঈষৎ অপসারিত হয়, তবে সত্তার মধ্যে স্থিত বাসনালোক জাগ্রত হয়ে ওঠে। বাসনালোকের এই যে স্মৃতি-উদ্দীপক শক্তি (evocative power)[১] এর দ্বারাই উপমা ইমেজের স্তরে পৌঁছায়। আমাদের আলোচ্য প্রথম পদটিতে সেই ব্যাপারই ঘটেছে। তাই রাধা যখন বলে,

> বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী আমি
> রূপসী তোমার রূপে ॥

তখন উদ্দীপ্ত স্মৃতির বলে নায়িকার উক্তির সত্যটুকু বুঝতে দেরি হয় না।

অন্য একটি পদ,

> রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
> যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥
> ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
> অন্তরে বিদরে হিয়া ফুকরে পরাণ ॥

রাধার প্রেমার্তি। অলঙ্কারের জৌলুষ ক্ষীণ। অরূপরতনের আশায় রাধা রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছে। কিন্তু মনের নিশ্চয়তা কৈ। দিশাহারা মন যৌবনবনে অসহায়। অপরিচিত যৌবনের ঐশ্বর্যে মন একদিকে সহসা বিহ্বল, অন্যদিকে নিবেদনের দেবতা দুর্লভ। তাই দুঃসাহসের অভিযান-স্বপ্নে কুলবধূর ঘরে ফেরার বৈধ পথটুকু আর ফুরোতে চায় না। চেনা পথের তুচ্ছ দূরত্ব জীবনের কোন বিশেষ লগ্নে কখনো কখনো এমন দুর্গম হয়ে ওঠে। সমাজের গড়া বৈধ জীবনে আগলভাঙার ডাক যখন আসে, তখন এইভাবেই অভ্যস্ত গতির মধ্যে জড়তার জন্ম হয়।

> কিবা সে মোহনরূপ মোর মন বাঁধে।
> মুখেতে না সরে বাণী দুটি আঁখি কাঁদে
> জ্ঞানদাস কহে সখি এই সে করিব।
> কানুর পিরীতি লাগি যমুনা পশিব ॥

১ Poetic Image, C. Day Lewis.

'দুটি আঁখির' কান্নায় দেহের রূপচ্ছবি। কিন্তু প্রেমের যে আর্তি নয়নে অশ্রু ঝরায়, তারই ফলে নায়িকার প্রাণে অটল সিদ্ধান্ত জাগে, কৃষ্ণ সঙ্গলাভের বিকল্প-টুকু যমুনা-প্রবেশেই পেতে চাই। এ কি যমুনার জলে জীবন বিসর্জন করার কথা, অথবা যমুনাকান্তি কৃষ্ণলাভের কথা। 'যমুনা' কথাটি এখানে কি শুধুই কথার কথা, অথবা প্রতীক-মূর্তি।

শ্রীরাধা যমুনায় জল ভরতে চলেছেন,

কেনে গেলাম জল ভরিবারে।
যাইতে যমুনা ঘাটে,
সেখানে ভুলিনু বাটে,
তিমিরে গরাসিল মোবে॥

কুলবধূ ঘর থেকে ঘাটের পথ কখন ভোলে। জীবনে তারও এক বিশেষ ক্ষণ আছে। রাধাকে তিমিরে গ্রাস করল, সখীর কাছে প্রিয়মিলনে প্রীতা রাধার এ উক্তি শ্লিষ্ট। তিমির এখানে চোখে-দেখা অন্ধকার নয়, এ সেই তিমিরমূর্তি কৃষ্ণের কথা। রাধার এ দ্বিধা-চকিত মনের কিনারা মিলল অতঃপর,

স্রোত-বিথার জলে এ তনু ভাসাইয়াছি
কি করিবে কুলের কুকুরে॥

এ কি যমুনার জলস্রোত অথবা কৃষ্ণপ্রেমের পুলক-প্রবাহ। এ সব পদে হতাশের আত্মহত্যার কথা নেই, মিলনের দৃঢ় সঙ্কল্পে পুলকিত আত্ম-সমর্পণের ইঙ্গিতই আসল। রাধার শেষকথা শুনি,

সই লো, পিরীতি দোসব ধাতা।
বিধিব বিধান সব কবে আন
না শুনে ধরম-কথা॥

কুলধর্ম এবং সমাজবিধির পথত্যাগিনী পরকীয়া নায়িকার মুখেই এমন কথা যথার্থ। নির্ভয় প্রেমে আত্মবল আছে, কিন্তু প্রগল্‌ভের অসংযম-চিহ্ন নেই।

এবার নায়িকার বসন ভূষণ সংক্রান্ত পদের আলোচনা করব।

চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিতে মোর॥

স্নানান্তে নায়িকা গৃহে চলেছে, নায়ক অন্তরাল থেকে সে স্নানশোভা দর্শন করেছে। এ রূপচ্ছবির অন্তর্ধানপটে নায়কের কাতরতা হৃদয়স্পর্শী। নীল বসনের প্রান্ত নিঙড়ে রাধা আপন চলার ছন্দ সুগম করছে। এটি স্নানরীতির স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা। কিন্তু এর ফলে কৃষ্ণের প্রাণ পর্যন্ত মথিত। বসনের অতিরিক্ত জল-ধারা রাধার গমনপথের বিঘ্ন। জলধারার প্রতি এমন তুচ্ছতা যেন কৃষ্ণের প্রাণে বহমান প্রেমফল্গুর প্রতি অবহেলা। নিষ্পেষিত হৃদয়ের এই ব্যথা সামান্য একটি কর্মক্রম থেকে জাগলো। প্রেম যখন দুটি মনকে নিকট করে, তখন এক পক্ষের তুচ্ছাতিতুচ্ছ গতিবিধি অপরপক্ষের মনোবিকারের গূঢ় কারণ।

তনু সঞে মিলি গেও সজল নিলাম্বর
বিন্দু বিন্দু ঝরু বারি।
রোয়ত সাটী মোহে ধনি তেজব
পহিরব আনহি সাড়ি॥

রাধার সিক্ত বসনের বিন্দু বিন্দু বারিধারা যেন কৃষ্ণেরই প্রেমিক-হৃদয়ের বিন্দু বিন্দু রূপ। অঙ্গসঙ্গ বঞ্চিত হওয়ার বেদনা শাড়ির সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণমনে সঙ্ক্রামিত। তনুসঙ্গ লাভের লাজুক বাসনা কত বঙ্কিম পথে প্রকাশ পেল। কবির কলাসংযম কৃষ্ণের হৃদয়দর্শী। আর একটি পদ,

চলু সব সখিজন ইঙ্গিত জানি।
করতল নাহ ধরল ধনি পাণি॥
রূঠে বলয় কিএ ঝন ঝন বাজ।
বালা কিছুই ন কহ ভয়-লাজ॥
কত কত সখিজন করয় উপাই।
ধনি মুখ চন্দ কবহু ন দেখাই॥

অনভিজ্ঞার প্রথম মিলনের আশঙ্কা। কৃষ্ণের অশোভন আলিঙ্গনের প্রতি বাহু-বলয়ের রুষ্ট প্রতিবাদ। ভয়ে আর লজ্জায় নায়িকা কিছু বলে না, অথচ বলয় বিবাদী। আগ্রহ এবং আশঙ্কায় দ্বিধাগ্রস্ত রাধাচিত্তের অপ্রীত সম্মতি কত তির্যক উপায়ে কবি শিল্পরূপে রচনা করেছেন। বসন-ভূষণের জড় বস্তু-পদার্থ কবির যাদুমন্ত্রে এমন করেই প্রাণের দূত হয়ে ওঠে। মাথুর-বিরহের একটি পদ,

যাহাঁ পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাহাঁ তাহাঁ ধরণী হইয়ে মঝু গাত।
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হই তথি মাহ॥

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

মিলনে নিখিলহারা
বিরহে নিখিলময়।

এ পদে তারই পরিচয়। প্রিয়ের চলার পথে রাধা ধরণীরূপে পাদস্পর্শ পেতে চায়। প্রিয়তমের স্নানসায়রে জলরাশি হয়ে সর্বদেহেমনে তাকে আবেষ্টন করে থাকতে চায়। বিশ্বের তাবৎ বস্তুর অণুকণায় আপন সত্তা প্রসারিত করে প্রিয়তমকে নিয়ত পাওয়ার এই যে বাসনা, তার দ্বারাই রাধা নিখিল প্রণয়িনীর চিরন্তন প্রতিষ্ঠাপদ লাভ করেছে। বিরহের একটি পদ,

লোচন নীর তটিনি নিরমানে।
করএ কমলমুখি তথিহি সনানে॥
সরস মৃণাল করই জপমালী॥
অহনিস জপ হরি নাম তোহারী॥
বৃন্দাবন কান্হু ধনি তপ করই।
হৃদয় বেদি মদনানল বরই॥
জিব কর সমিধ সমুর কর আগী।
করতি হোম বধ হোএবহ ভাগী॥

রাধার তাপসী মূর্তি। হৃদয়বেদিতে প্রজ্জ্বলিত মদনানল। জীবনকে ইন্ধন করে স্মৃতির দাহে সে আত্মাহুতি দান করছে। প্রেমের রাজ্যে প্রথমে প্রসাধনকলা, প্রান্তে সাধনবেগ। রাধার এ রূপসৃষ্টি ভক্তের উপলব্ধি থেকে জাত। অন্যত্র এ বাসনারই প্রতিধ্বনি,

পিয়া জব আওব ই মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
....
....

এই প্রকারে প্রেমের সাধনায় যে বরলাভ ঘটে, তার স্বরূপ--

জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
....
....

লাখ লাখ জুগ হিয় হিয় রাখল
তইও হিয় জুড়ন ন গেল॥[১]

১ সবগুলি বৈষ্ণবপদ শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত শ্রীশ্রীপদকল্পতরু গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

প্রেমের দাহ অনির্বাণ, এ তৃষ্ণা চির-অতৃপ্ত। বৈষ্ণব পদাবলীতে রূপ নির্ণয়ের এত উদ্যম একটি প্রশ্নে বিমূঢ় হয় 'সখি, রূপ কে চাহিতে পারে।' কেননা তা 'অনুখন নৌতুন হোয়'। হৃদয় দিয়ে অনুভব করা রূপের অবধি নেই। অসংখ্য বৈষ্ণব কবিতার সামান্যই সেই নিরবধি প্রেমে অসীম রূপের ইঙ্গিত মাত্র দিতে পেরেছে।

বৈষ্ণবীয় রূপকবিতা ও রসশাস্ত্র

আলোচনার প্রথমেই একটি স্মৃতিপদ উদ্ধার করি,

আরে মোর শ্রীরূপ গোসাঞি।
গৌরাঙ্গচাঁদের ভাব প্রচার করিয়া সব
জানাইতে হেন আর নাই।।

....

জীবে দিলা প্রেম-চিন্তামণি।।
রাধাকৃষ্ণ-রস-কেলি নাট্য-গীত পদ্যাবলি
শুদ্ধ পরকীয়া মত করি।

রাধাকৃষ্ণের অবৈধ কেলিকলা রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের স্বীকৃতি পেয়েছিল। শ্রীরূপ গোস্বামীর শক্তি ও সাধনা এ সফলতার মূল। শোভন বৈদগ্ধ্য একদিকে, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক কৌলিন্য, এই দুই'র মিলনে পদাবলীর মানোন্নয়ন হল বটে, কিন্তু প্রসারিত কালে স্ফূর্ত কবি-আবেগের মধ্যে সীমা দেখা দিল। গতানুগতিকতার নিয়ন্ত্রণ কবির রূপ-নির্মাণ এবং রসস্থাপনাকে কয়েকটি স্থির নির্দেশের আজ্ঞাবহ করে তুলল। গোস্বামী-প্রভাব পদাবলীর কাহিনীকে কুলীন করেছে বটে, কিন্তু রূপ-কে অনেকক্ষেত্রেই ক্লান্ত পুনরাবৃত্তির পথে অবশ. করেছে, এও সত্যি। গৌরাঙ্গ-বন্দনা দিয়ে সুরু করি।

শ্রীনবদ্বীপ-নগর-গিরি-কন্দরে
উয়ল কেশবি-রাজ।।
সংকীর্তন-রণ হুঙ্কৃতি শুনইতে
দুরিত দীপি-গণ ভাগি।

....

বলরাম দাস কহ অতয়ে সে জগ মাহ
হরি-ধনি শবদ খেয়াতি।।

রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটকের নিম্নলিখিত শ্লোক উক্ত ভাবপদের প্রণেতা,

হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিঃ কদম্বসন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।।

একদিক থেকে রাধার ভাবদ্যুতি যেমন বৈষ্ণব ভাবাকাশে গৌর-গৌরব এনেছে তেমনি অন্যদিক থেকে রাধার রূপদ্যুতিও শিল্পকে লীলারুচি দান করেছে।

ধবল বিভূষণ অম্বর বনই।
ধবলিম কৌমুদি মিলি তনু চলই॥

শ্রীরাধার আভরণ ও বসন শুভ্র। অভিসারিকার দেহদ্যুতি শ্বেত চন্দ্রকিরণের সঙ্গে একাকার। শুভ্র জ্যোৎস্নায় গৌরাঙ্গী রাধার রূপ আলোকলীন। তাই 'হেরইতে পরিজন লোচন ভূল।' এ রূপচ্ছটা,

মল্লিকাচিত-ধম্মিল্লাশ্চারুচন্দন-চর্চিতাঃ।
অবিভাব্যাঃ সুখং যান্তি চন্দ্রিকাস্বভিসারিকাঃ॥১

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবপদের আলঙ্কারিক রূপকলা এবং রসস্থাপনা বহুলাংশেই রসশাস্ত্র-শাসিত। বিশেষত রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বল-নীলমণি, বিদগ্ধমাধব, রসামৃতসিন্ধু, পদ্যাবলী, কড়চা ইত্যাদি গ্রন্থ সেযুগের কবিতা-রচনার রসাদর্শ ছিল। তাছাড়া, সনাতন গোস্বামীর সংস্কৃত পদাবলী সেকালের বৈষ্ণব কবিমানসে একটি নির্দিষ্ট রসবিধি এবং রূপরীতি প্রস্তুত রেখেছিল। প্রবল একটি সংস্কারের মত এই গোস্বামী-প্রভাব পদকাবের কল্পনায় মান্যস্থান লাভ করার ফলে প্রায় সব কবিতাতেই, প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে, অদৃশ্য এক উন্নতদৃষ্টির পর্যবেক্ষণ অনুভব করা যায়। আর একটি কথা। চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণবপদের রসস্থাপনা এবং রূপনির্মাণ কি রীতিমুক্ত এবং স্বতঃস্ফূর্ত। চৈতন্যকালে কৃষ্ণ ও রাধার যে নায়ক-নায়িকা সংস্কার (রূপগত ও রসগত ভাবে) বিশিষ্ট মূর্তিতে দেখা দিল, পূর্বকালে তার কোন পরিচয় নেই। প্রমাণ, অদূর-অতীত জয়দেবের গীতগোবিন্দ। পরকীয় প্রণয়লীলারসের কবিতা এবং আসন্ন বৈষ্ণবভাব-সম্মোহের আগমনী গান এই জয়দেব-পদাবলীর নায়ক নায়িকা গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের প্রলেপমুক্ত, নির্বিশেষ মানুষ। রাধামূর্তির সম্ভাবনা জয়দেবের নায়িকাতে থাকলেও গোপিনী পরিচয়ই তার মুখ্য পদবী। 'বিদ্যাপতিতে রাধামূর্তি-সংস্কার জয়দেবের অপেক্ষা আর একটু ঘনীভূত হলেও তার নির্বিশেষ নায়িকা-পরিচয় একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়। চৈতন্যপর্ব থেকে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্ব একটি নিরূপিত লীলাপর্যায়ে প্রবল ভাববন্যা সৃষ্টি করেছিল, তারই অমোঘ শক্তি পূর্বগামী বৈষ্ণবকল্প

১ ১০ম পরিচ্ছেদ, সাহিত্যদর্পণ, বিশ্বনাথ।

পদাবলীর সমগ্র আবেদনটিকে আপনার মধ্যে আত্মসাৎ করেছে। উপরন্তু পদকর্তা গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির কাব্যশিষ্য হওয়ার ফলে এবং চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণবকবি হিসেবে গোবিন্দদাসের খ্যাতি ব্যাপক হওয়ার জন্য কাব্যশিষ্যত্বের সঙ্গে সঙ্গে আমরা শিল্প-ঐতিহ্যেরও একটা ধারাসূত্র (এক্ষেত্রে) অনুমান করতে প্রলুব্ধ হই। এছাড়া ছন্দ এবং ভাষাগত সাধর্ম্য তো স্পষ্টই রয়েছে।

কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে নির্বাসিত যক্ষ নিমিত্ত মাত্র, নির্দিষ্ট নায়কের কথা গৌণ কথা। রূপ ও ভাব, অলঙ্কার ও ধ্বনি একদা নির্বিশেষ নায়ক নায়িকার বেদনা-মূর্তি রচনা করেছিল। জয়দেব অথবা বিদ্যাপতির কবি-কল্পনায় সংস্কৃত সাহিত্যের এই রীতি-রুচি বিদ্যমান ছিল। চৈতন্য-চিহ্ন অথবা গোস্বামী-দীক্ষা না থাকলেও জয়দেব অথবা বিদ্যাপতির নায়ক নায়িকা তাদের অগণিত ভাববিলাস ও কুটিল রূপকলায় নির্ণীত হয়েছে, অথচ নির্দিষ্ট কোন নাম-পরিচয়ে অতি-চিহ্নিত হয়ে যায়নি। এককথায় বলা চলে, গোস্বামীকৃত রসশাস্ত্রের প্রভাবে নায়ক নায়িকার নির্বিশেষ মানবরূপ নামাবলী-পরিহিত নির্দিষ্ট নায়ক নায়িকায় রূপান্তরিত।

যে কবিতা সুদীর্ঘকালে এবং অসংখ্য কবিমানসের আলোয় প্রতিফলিত হবে, তার বিষয়বস্তু ও মূলসুর যদি পূর্ব থেকেই নির্ধারিত মানদণ্ডে বেঁধে দেওয়া যায়, তবে কবির অবাধ কল্পনার স্বাধীনতা হরণ করা হয়। কবির প্রেরণা যদি মতবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, তবে জীবনকে ব্যক্ত করার নব নব আবেগ লুপ্ত হতে বাধ্য। ভারতীয় প্রেমকাব্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, নায়ক নায়িকার জটিল প্রেমে ভাবাকাশের যে মুক্তি ছিল, তা দিনে দিনে সঙ্কুচিত হয়ে বৃন্দাবন-ভূমির নিজস্ব প্রেমপদ্ধতির অবরোধ লাভ করেছে।

এবার রসের পর্যায়ক্রমে দৃষ্টান্ত উপস্থিত করব। রচনায় কবির শক্তি প্রকাশিত, কিন্তু একই সঙ্গে শাসনের ঋজু নির্দেশে তা কত কৃত্রিম। অবশ্য এমনও দেখা যাবে, যেখানে রসশাস্ত্র কবি-বিধান থেকে শ্লোক-সূত্র সংগ্রহ করেছে। চণ্ডীদাসের একটি পদ উদ্ধার করি।

সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসাঞা পরে॥

কবিতাটির ধ্বনি দূরবাহী। পূর্বরাগের নায়িকা কৃষ্ণের আগমন-সম্ভাবনায় একবার চকিতে অলঙ্কারগুলি পরিধান করছেন, পুনরায় প্রিয়াগমনের হতাশায় সে অলঙ্কার উন্মোচিত করছেন। প্রত্যাশা ও হতাশায় দোদুল মনের এই যে আলো-আঁধারি, ফলে যে মানবাবেদন, আলঙ্কারিক তাব থেকে শুধু ছানিয়ে নিলেন, অসজ্জিত অবস্থায় প্রিয়তমের সম্মুখে যাওয়ার অনিচ্ছা নায়িকাদের স্বভাবসিদ্ধ,

চিরায় সবিধে স্থানং প্রিয়স্য বক্সমন্যতে।
বিলোচনপথং চাস্য ন গচ্ছত্যনলঙ্কৃতা ॥১

এবং তারপর 'নিজ প্রিয় সহচরি মেলি। বেশ বনাই, কত যে মনে সংশয়, কালিন্দী তীরহিঁ গেলি।'—এইভাবে প্রসাধন করার একটানা কাহিনী, অঙ্গে অঙ্গে বিশিষ্ট ভূষণ, তাদের শোভাবর্ণনায় নির্দিষ্ট কাব্যালঙ্কার, রীতির দাসত্ব করতে স্বাধীন শিল্পরুচির এক করুণ পরিণাম বাধার প্রথাসিদ্ধ অঙ্গসজ্জায় দেখা দিল। বর্ণনার বাধ্যতা আছে এবং অসংখ্য কবি আছেন, ফলে একঘেয়ে অলঙ্কারব্যবহারের ক্লান্তি অনেকাংশে রূপের উল্লেখযোগ্যতা হারিয়েছে।

রসশাস্ত্রের নিয়মে এই নবাঙ্কুর পূর্বরাগ ঘনীভূত হয় লোকের মুখে নায়কের নাম শুনে, বংশীধ্বনি শুনে, চিত্রদর্শনে, সাক্ষাৎ দর্শনে, লিপি প্রেরণে। গোবিন্দদাসের একটি পদ,

সজনি, মরণ মানিয়ে বহু ভাগি।
কুলবতী তিন পুরুখে ভেল আরতি
জীবন কিয়ে সুখ লাগি ॥

পূর্বরাগের পর্যায়ে লোকশ্রুত কৃষ্ণ, বংশীবাদক কৃষ্ণ ও চিত্র-লিখিত কৃষ্ণ যে একই নায়ক, শ্রীরাধা তা জানেন না। অথচ স্বতন্ত্র গুণের পরিচয়ে প্রত্যেকের প্রতিই তিনি মোহিত। তাই আপন প্রগল্ভ এবং অবৈধ ইচ্ছার কথা উল্লেখ করে সখেদে সখিকে বলছেন, এর চেয়ে মরণ অনেক ভাল। এই পদের ভাব গৃহীত হয়েছে নিম্নলিখিত অংশ থেকে।

১ তৃয় পরিচ্ছেদ, সাহিত্যদর্পণ, বিশ্বনাথ

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদ-পরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধ-ঘন-দ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ সকৃদ্বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী ॥১

আর এইভাবে নায়ক নায়িকার পরস্পর আসক্তির পরে লালসা, উদ্বেগ, জাগর্যা, তানব, জড়িমা ইত্যাদি পূর্বরাগের রীতিসিদ্ধ দশদশা। বিদ্যাপতি গেয়েছেন,

অলখিতে হামে হেরি বিহসলি থোরি।
জনু রজনী ভেল চাঁদ উজোরি॥
কুটিল কটাখ-ছটা পড়ি গেল।
মধুকর-ডম্বর অম্বরে ভেল॥

অপূর্ব উৎপ্রেক্ষা রচনা করলেন কবি। নায়িকার কুটিল-বঙ্কিম কটাক্ষের যেন ছড়াছড়ি। পুনঃপুনঃ প্রক্ষিপ্ত কটাক্ষমালার সুনীল ছটায় ভ্রমর-পঙক্তির সম্ভাবনা প্রকাশিত। লালসার এমন অনপম রূপ কিন্তু কালিদাসের আদর্শে রচিত।

বেশ্যাস্ত্বত্তো নখ-পদ-সুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্র-বিন্দূ-
নামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকর-শ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্ ॥২

জ্ঞানদাস গেয়েছেন,

জাগিয়া জাগিয়া হইল খীন।
অসিত চাঁদের উদয় দিন॥

রাত্রি জাগরণে কৃশতনু রাধা দিবসের কৃষ্ণপক্ষীয় চাঁদের মত রূপের উপান্তে লীনা। কালিদাসের কাব্যে এ উপমা মেলে।

প্রাচী-মূলে তনুমিব কলামাত্রশেষং হিমাংশোঃ।৩

রাধামোহনের পদ,

ইহ বৃন্দাবনে দেহ উপেখব
মৃত তনু রাখবি হামার।
কবহুঁ শ্যাম-তনুক পরিমল পায়ব
তবহুঁ মনোরথ পূর।

---

১ ২য় অঙ্ক, বিদগ্ধমাধব, রূপ গোস্বামী।
২ মেঘদূত, কালিদাস।
৩ মেঘদূত, কালিদাস।

প্রেমের বৃদ্ধি আছে, কিন্তু সিদ্ধি নেই। রাধা তাই মরণ কামনা করে। অপূর্ব এ আর্তিপদ মতবাদ-নিয়ন্ত্রিত,

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিম্।
তমালস্য স্কন্ধে বিনিহিতভুজাবল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ ॥১

যদুনন্দন দাসের 'যদি কৃষ্ণ অকরুণ হইলা আমারে' পদটি বিদগ্ধমাধবের উক্ত শ্লোকের অবিকল অনুবাদ। বিদ্যাপতির আর একটি পদ উদ্ধৃত করে পূর্বরাগের পর্যায় শেষ করব,

তুহুঁ যদি কহসি করিয়ে অনুসঙ্গ।
চৌরি-পিরিতি হোয লাখ-গুণ রঙ্গ ॥

এই পদভাবেরই সমধর্মী,

পর্য্যঙ্কঃ স্বাস্তরণং
পতিরনুকূলো মনোহরং সদনম্।
তুলয়তি ন হি লক্ষাংশং
ত্বরিত-ক্ষণ-চৌর্য্য-সুরতস্য ॥২

দেখা গেল, নায়ক নায়িকার ভাবকলা শাস্ত্রীয় নির্দেশের ও পূর্ব কবি-দৃষ্টান্তের দ্বারা অনুশীলিত। নায়ক নায়িকার দেহরূপ-নির্মাণে নিযুক্ত অ[illegible]ার সংস্কৃত কাব্য অথবা বৈষ্ণব শাস্ত্রের দ্বারা নির্দেশিত। আমাদের অভিমতের পক্ষে এ কথাও স্পষ্ট হতে চলেছে যে, পরচৈতন্য বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের দ্বারা এবং প্রাক্‌চৈতন্য পদাবলী প্রাচীন কাব্যাদর্শে নিয়ন্ত্রিত।

এবার অভিসারের পদে রসশাস্ত্রীয় নির্দেশ লক্ষ্য করা যাক। জ্ঞানদাসের একটি পদ,

আনন-সররুহ করে পরশায়ল
সময় বুঝায়ল সাঝে ॥
কর-কমলে মুখ-কমল লুকায়ল
আন সমুঝায়ল নাহ।

১ বিদগ্ধমাধব, রূপ গোস্বামী।
২ কুট্টনীমতম্।

সূক্ষ্ম অলঙ্কারে নায়ক নায়িকার অভিসার সঙ্কেত। সূর্যাস্তকালে রবিকর পদ্মকে তির্যক রেখায় স্পর্শ করে অর্থাৎ কৃষ্ণ ঠিক সন্ধ্যায় কেলিকুঞ্জে মিলন-প্রত্যাশী। রাধার ইচ্ছা অন্য। পদ্মদলের পূর্ণ নিমীলনের লগ্নই তাদের মিলন-লগ্ন। অর্থাৎ ঘনান্ধকার রাত্রিই সুসময়। সঙ্কেতের শিল্পে মানুষ আর প্রকৃতিতে কেমন প্রীতিপূর্ণ দৌত্য! রাধার আচরণে একদিকে প্রকাশিত অনুরাগের লজ্জা, অন্যদিকে লগ্ন-নিরূপণের কৌশল। পদটির ভাবনাদর্শ রয়েছে,

সঙ্কেত-কাল-মনসং বিটং জ্ঞাত্বা বিদগ্ধয়া।
হসন্নেত্রাপিতাকূতং লীলা-পদ্মং নিমীলিতম্ ।।১

এরপর সনাতন গোস্বামীর তিমিরাভিসারের একটি ছবি,

হন্ত ন কিমু মন্থবযসি সন্ততমভিজল্পম্
দন্ত-রোচিবন্তরযতি সন্তমসমনল্পম্ ।।
.. ..
... .
সন্তনু ঘন-বর্ণমতুল-কুন্তল-নিচযান্তম্ ।।
স্বান্তং তব জীবতু নখ-কান্তিভিবভিশান্তম্ ।।

সনাতন গোস্বামী[২] কৃত আর একটি সংস্কৃত অভিসারের পদ।

ত্বং কুচ-বল্লিত-মৌক্তিক-মালা।
স্মিত-সান্দ্রীকৃত-শশিকর-জালা ।।
....
পবিহিত-মাহিষ-দধি-রুচি-সিচয়া ।।
বপুবর্পিত-ঘন-চন্দন-নিচয়া ।।

'হরিমভিসর সুন্দরি সিত-বেশা।' বলে সনাতন গোস্বামী রাধাকে অভিসারে উৎসাহ দিচ্ছেন।

---

১ ১০ম পরিচ্ছেদ, সাহিত্যদর্পণ, বিশ্বনাথ।

২ রূপগোস্বামী জয়দেবের অনুসরণে কতকগুলি পদ লিখেছিলেন সংস্কৃতে।......বড় ভাই সনাতন ছিলেন রূপের গুরু। পদগুলিতে তিনি গুরুরই ভণিতা দিয়েছেন। পদগুলি যে সনাতনের নয়, রূপের রচনা, তা রূপের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য জীব গোস্বামী লিখে গেছেন পদগুলির টীকায়। —বৈষ্ণব পদাবলী, শ্রীসুকুমার সেন।

মোটামুটি এই আদর্শেই অভিসারের (তিমির ও জ্যোৎস্না) পদাবলী রচিত। পদকর্তা সখিরূপে যেন স্বয়ং দূতী। আর রাধা যে স্বয়ং জ্যোৎস্না-রূপিণী, এ ভাবটি অন্যান্য বৈষ্ণব কবির রচনায় দেখা যায়।

চান্দনি রজনি কিরণ বন মাহ।
হাসিতে কুন্দ কুসুম গলি যাহ।

রাধার হাস্যে কুন্দ-কুসুম বিগলিত। অর্থাৎ চন্দ্রকান্তি যেন কুন্দ-কুসুমের শুভ্র তরল রূপপ্রবাহ। এটি অতিশয়োক্তিমূলক প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষা। তুলনীয়,

চন্দ্রোদয়ে চন্দনমঙ্গকেষু
বিহস্য বিন্যস্য বিনির্গতায়াঃ।
মনো নিহন্তুং মদনোহপি বাণান্
করেণ কৌন্দান্ বিভরাম্বভূব॥১

এবার মিলনের পালা। রাধামোহনের পদ,

রাইক দেহ-দণ্ড পরিশোভিত
শ্রমজল-মুকুতা বিকাশ॥
নিমিলিত নয়ন বয়ন-বর শোভন
অলখিত সহজহি হাস।
অনধিন বাহু-বল্লি অরু সব অঙ্গ
তে উহ রহত উদাস॥

পদে মধ্যা নায়িকার স্বভাব সূচিত। মিলনলীলায় মগ্ন নায়িকা। এ চিত্রের পূর্বরূপ,

শ্রমজলনিবিড়াং নিমীলিতাক্ষীং
শ্লথচিকুরামনধীনবাহুবল্লীম্।
মুদিতমনসমস্মৃতান্যভাবাং
রতিশয়নে নিশি রাধিকাং স্মরামি॥২

এরপর মিলনের জন্য স্থান-কালের সঙ্কেত। গোবিন্দদাসের পদ,

এতহুঁ সংকেত করল যব কামিনি
কানু চলল সোই ঠাম।
গোপ-গোঙার ভ্রমর বলি খোজত
গোবিন্দদাস রস গান॥

১ রসমঞ্জরী।
২ উজ্জ্বল-নীলমণি, রূপ গোস্বামী।

রাধার নির্দেশে কৃষ্ণ সঙ্কেতকুঞ্জে চলেছেন। রাধা আসলে কৃষ্ণকেই (স্বামীর সামনে) ভ্রমররূপে সম্বোধন করেছিলেন। সে সঙ্কেত-বাক্যের তাৎপর্য না বুঝে মূর্খ গোপ 'ভ্রমর কোথায়' বলে খুঁজতে লাগল। পদটিতে অলঙ্কারের সূক্ষ্ম প্রয়োগ দেখি। পদটি নিম্নলিখিত শ্লোকের মর্মানুবাদ,

মন্বক্ত্রাম্ভোরুহ-পরিমলোন্মত্ত সেবানুবন্ধে
পত্যুঃ কৃষ্ণভ্রমর কুরুষে কিন্তরামন্তবায়ম্।
তৃষ্ণাভিস্তুং যদি কলরুত ব্যগ্রচিত্তস্তদাগ্রে
পুষ্পৈঃ পাণ্ডুচ্ছবিমবিরলৈর্যাহি পুন্নাগকুঞ্জম্॥১

শ্রীমদ্‌ভাগবতে এ জাতীয় কিছু ভ্রমর-গীতাখ্য পদ আছে। রূপ গোস্বামী এদের চিত্রজল্প ভাগের অন্তর্গত 'প্রজল্প' অনুচ্ছেদে বিভাগ করেছেন।

রূপ ও ভাবকলার আলঙ্কারিক আদর্শ (মিলনপর্বে) দেখা গেল। এবার শাস্ত্রনির্দিষ্ট লীলাবিধানের আখ্যাপদগুলি উল্লেখ করব। বিদ্যাপতির বিপরীত-সম্ভোগের একটি ছবি,

কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
সব বিপরিত ভেল আজুক বিলাস॥
....
....
মরকত-দরপণ হেরইতে হাম।
উচ্ নিচ না বুঝি পড়লুঁ সোই ঠাম॥
পুন অনুমানিযে নাগর কান।
তাকর বচনে ভেল সমাধান॥

মরকত দর্পণ বলতে কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলকেই রাধা উল্লেখ করেছেন। প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষায় রাধার বিভ্রমমূলক রতি-সঙ্কেতের কথাটি সুন্দর। তুলনীয়,

প্রতিবিম্বিত-প্রিয়া-তনু
সকৌস্তুভং জয়তি মুরভিদো বক্ষঃ।
পুরুষায়িতমভ্যস্যতি
লক্ষ্মীর্যদীক্ষ্য মুকুরমিব॥২

মিলনের পূর্বে নায়ক নায়িকার রতি-তৃষ্ণা লক্ষ্য করে সখী বলছে,

কালা হৈয়া এত রসের ভোরা
খঞ্জন কমলে দেখিলা পারা॥

১ উদ্ধবসন্দেশ কাব্য।
২ আর্যা সপ্তশতী।

শাকুন শাস্ত্র অনুসারে পদ্মের মাঝে খঞ্জন পাখি দেখা ভাগ্যবান দর্শকেরই ঘটে। শাস্ত্রোক্ত প্রবাদ-কথার সঙ্গে সঙ্গে একটি আলঙ্কারিক রূপ-কথাও এখানে আছে। রাধার বদন-কমলে খঞ্জনের মত চঞ্চল নয়নভঙ্গি দেখেই যেন কৃষ্ণের রস-বিভোরতা। তুলনীয়,

একো হি খঞ্জনবরো নলিনীদলস্থো
দৃষ্টঃ করোতি চতুরঙ্গবলাধিপত্যম্।১

বিপরীত রতির একটি চিত্র, 'যামুনে মীলল গঙ্গ-তরঙ্গ।।' পদটিতে অলঙ্কারের কোন ঐতিহ্য না থাকলেও রতিবিহার-কলার নির্দিষ্ট বিধান অমরুশতক কাব্যে পাই। প্রথমে আলোচ্য পদটি উদ্ধার করি,

সুন্দরি, তুয়া মুখ মঙ্গলদাতা।
রতি-বিপরীত-সময়ে যদি রাখবি
কি করব হরি হর ধাতা।।
... .
বিদ্যাপতি-পতি ও রস-গাহক
যামুনে মীলল গঙ্গ-তরঙ্গ।

তুলনীয়,

আলোলামলকাবলিং বিলুলিতাং বিভ্রচ্চলৎকুণ্ডলং।
কিঞ্চিন্মৃষ্ট-বিশেষকং তনুতরৈঃ স্বেদাম্ভসাং শীকরৈঃ।
তন্ব্যা যৎ সুরতান্ত-তান্ত-নয়নং বক্ত্রং রতি-ব্যত্যয়ে
তৎ ত্বাং পাতু চিরায় কিং হরি-হর-ব্রহ্মাদিভির্দৈবতৈঃ।।২

সম্ভোগের আর একটি চিত্র উপস্থিত করে পরবর্তী রসপর্যায় আলোচনা করব

ভাসল হাস-কুমুদ পুলকাঙ্কুর
উয়ল স্বেদ-উদ-বিন্দু।
কহ ঘনশ্যাম দাস অব হোয়ল
যৈছে তটিনি অরু সিন্ধু।।

---

১ শৃঙ্গারতিলক।

২ অমরুশতক।

সাগর-নদীর নিসর্গ-সম্ভোগ-কথা নায়ক নায়িকায় আরোপিত। কালিদাসে পাই,

মুখার্পণেষু প্রকৃতি-প্রগল্ভাঃ
স্বয়ং তরঙ্গাধর-দান-দক্ষঃ।
অনন্যসামান্য-কলত্র-বৃত্তিঃ
পিবত্যসৌ পায়য়তে চ সিন্ধুঃ॥[১]

এবার রসোদ্গারের পদ। যেখানে পদের মধ্যে বিস্তৃত রতি-প্রকরণ-পরিচয়, সেখানে বাৎস্যায়নের আদর্শ গৃহীত.

প্রেম কমল কত বিদগধ-রাজ।
দশনে দশনে দুহুঁ ঘন ঘন বাজ॥
দুহুঁ তনু লাগল ভাঙ্গহি ভাঙ।
চন্দনে লাগল সিন্দুর-দাগ॥

মিলিত দেহের এই বিশেষ রতি-বিকার কামসূত্রে বিস্তারিতভাবে আলোচিত।

তস্মিন্নিতরোঽপি জিহ্বয়াস্যা দশনান্
ঘট্টয়েৎ তালু জিহ্বাং চেতি জিহ্বাযুদ্ধম্।
এতেন বলাদ্বদনবদনগ্রহণং দানং চ ব্যাখ্যাতম্।[২]

এবার রসোদ্গারেরই একটি আলঙ্কারিক পদ (সখির উক্তিতে প্রকাশিত) গ্রহণ করা যাক। কৃষ্ণ ও রাধার রূপবর্ণনার ছলে রাধার অনন্যা নায়িকা-রূপ অতি কৌশলে ব্যক্ত হয়েছে।

ঘন-রসময় তনু অন্তর গহীন।
নিমগণ কতহুঁ রমণি-মন-মীন॥
শ্রবণে মকর গিমে কম্বু বিরাজ।
হিয় মাহা লখিনি মিলিত মণি-রাজ॥
এ সখি শ্যাম-সিন্ধু করি চোর।
কৈছে ধয়লি কুচ-কনয়-কটোর॥

১ রঘুবংশ, কালিদাস।
২ কামসূত্র, বাৎস্যায়ন।

রূপসিন্ধু শ্যাম সাগরের প্রতিটি ঐশ্বর্যে মণ্ডিত, তার মত ব্যাপক ও বহমান রূপ-কায়াকে রাধা কেমন করে হৃদয়ে গোপন করল, অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে দূতীর এ বিস্ময়। তুলনীয়,

বিপুলেন সাগরশযস্য কুক্ষিণা
ভুবনানি যস্য পপিরে যুগক্ষয়ে।
মদবিভ্রমাসকলযা পপে পুনঃ
স পুরস্ত্রিয়ৈকতময়ৈকয়া দৃশা ॥১

এবার সংক্ষিপ্ত রসোদ্গারের একটি পদ,

কোন অবুঝ হেন কুচে নখ দেল।
হা হা শম্ভু ভগন ভৈগেল॥

এ পদের আলঙ্কারিক সাদৃশ্য ছাড়াও ধ্বনি এই যে, শম্ভু সযত্নে অর্চনীয়, চন্দ্রকলা ধারণ তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু অবিদগ্ধ ব্যক্তি (অকুশলতা হেতু) যদি তাকে বিদীর্ণ করে, তবে শম্ভুর মাহাত্ম্যই নষ্ট হয়। রাধার অতি-উন্নত বক্ষোদেশের কথায় সখি কৌশলে একথা বলেছে। তুলনীয়,

স্বয়ম্ভুঃ শম্ভুরম্ভোজ-লোচনে ত্বৎ-পয়োধরঃ।
নখেন কস্য ধন্যস্য চন্দ্রচূড়ো ভবিষ্যতি॥২

এবার 'প্রগল্ভা নায়িকা' ভাবে রাধার একটি সম্ভোগ কথা,

উর পর কমল-পাণি অবলম্বনে
দূরে করল আনোআন।
নিবিহক বন্ধ-বিমোচন নাগর
কি করল কিছুই না জান।
তৈখনে মদন কুসুম-শর হানল
জর-জর জীবন মোর।

সখীকে বিবৃত করতে গিয়ে রাধা বলেছেন, নীবিবন্ধ উন্মোচিত হলে তাঁর সংজ্ঞা লুপ্ত হল। আর কৃষ্ণের করস্পর্শেই প্রথম রাধার মনে রতিবিষয়ে বাস্তবতার বোধ জাগল। তুলনীয়,

১ সাহিত্যদর্পণ-ধৃত, মাঘ।
২ রসমঞ্জরী।

স্মরান্ধা গাঢ়তারুণ্যা সমস্তরতকোবিদা।
ভাবোন্নতা দরব্রীড়া প্রগল্‌ভাক্রান্তনায়কা।।[১]

রতিশয়নে বিবশা এই রাধাকে স্মরণ করেই তার দেহাবস্থান অনুমান করেছেন রূপ গোস্বামী,

মুদিতমনসমস্মৃতান্যভাবাং
রতিশয়নে নিশি রাধিকাং স্মরামি।।[২]

রসোদ্‌গারের আর একটি পদ উদ্ধার করি।

ছায়ায় ছায়ায় লাগিব লাগিয়া
ফিরয়ে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিগে
সে মুখে সে দিন থাকে।।

কৃষ্ণের মনে রাধার অঙ্গ-সঙ্গের কাতরতা। জ্ঞানদাসের 'গায়ের ছায়া বায়ের দোসর' ইত্যাদি পদাংশে এই একই ভাব। তুলনীয়,

আলিঙ্গ্যন্তে গুনবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি।[৩]

পুনরায়,

বহু মনুতে ননু তে তনুসঙ্গত-পবন-চলিতমপি রেণুং[৪]

এবার মানের পর্যায়,

অলি হে, না পরশ চরণ হামারি।
কানু-অনুরূপ বরণ গুণ যৈছন
ঐছন সবহুঁ তোহারি।।
পুর-রঙ্গিণি কুচ- কুঙ্কুম-রঞ্জিত
কানু-কণ্ঠে বন-মাল।
তাকর শেষ বদনে তুয়া লাগল
জ্ঞানদাস হিয়ে কাল।।

---

১ সাহিত্যদর্পণ।
২ উজ্জ্বল-নীলমণি।
৩ মেঘদূত, কালিদাস।
৪ গীতগোবিন্দ, জয়দেব।

কৃষ্ণের প্রতারণা-কল্পনায় রাধার মান। কৃষ্ণাঙ্গ ভ্রমরকে উদ্দেশ করে রাধার গঞ্জনাবাক্য। শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,

মধুপ কিতববন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচ-বিলুলিত-মালা-কুঙ্কুম-শ্মশ্রুভির্নঃ ॥
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদুসদসি বিডম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্ ॥১

উজ্জ্বল-নীলমণিতে রূপ গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের এ জাতীয় দশটি ভ্রমরগীতাখ্য শ্লোককে দিব্যোন্মাদ বা চিত্রজল্প ভাবের প্রজল্প প্রভৃতি দশটি সূক্ষ্মভাবের উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে এগুলি অতুলনীয় ধ্বনিকাব্য। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্রজবুলি ও বাঙলায় বহু প্রলাপ-মান পর্যায়ের পদ রচিত।

মানিনী নায়িকার রতিসম্ভোগ কবি রাধামোহন ব্যক্ত করেছেন। খিন্না নায়িকার নির্বাপিত মনের রূপ, অন্যদিকে কৃষ্ণকে লাভ করার বাসনা,

হরি মুখ হেরযিতে সুমুখি অবাঞ্চই
চাহনি কুটিলহি ভাতি।
গদ গদ বচন অসূয়া কছু সূচন
ততহি মনোরথে মাতি।

এ ভাবকল্পনা কিন্তু ঋণকৃত। তুলনীয়,

বক্ত্রং কিঞ্চিদবাঞ্চিতং বিবৃণুতে নাতিপ্রসাদোদয়ং
দৃষ্টির্ভ্রূকুটিতা ব্যনক্তি শনকৈরীর্ষাবশেষচ্ছটাম্ ॥২

বসন্তকালীন মানের আর একটি পদ,

চুম্বনে ইষত বয়ান ধনি ফেরি।
ভরমহি সরস আলিঙ্গন বেরি ॥
যব পরিরম্ভণে গদগদ নারী।
যৈছন চরবণ তপত কুশারি ॥
ইহ সংকীরণ দুহুঁক বিলাস।
জয় সেবই যদুনন্দন দাস।

১ ১০ম স্কন্ধ, শ্রীমদ্ভাগবত।
২ সম্ভোগ-প্রকরণ, উজ্জ্বল-নীলমণি, রূপ গোস্বামী।

নায়কের পূর্ব-অপরাধ স্মরণে নায়িকা কিঞ্চিৎ বিরস। তাই মিলন উষ্ণ.ইক্ষু-চর্বণের মত দুঃখ-সুখে জড়ানো। মানমিশ্র এ সম্ভোগকে রসশাস্ত্রে 'সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ' বলা হয়েছে।

যত্র সঙ্কীর্যমাণাঃ স্যুর্ব্যলীকস্মরণাদিভিঃ।
উপচারাঃ স সঙ্কীর্ণঃ কিঞ্চিত্তপ্তেক্ষুপেশলঃ॥১

'বিবিধ মান' পর্যায়ের একটি পদ,

যমুনা সমীপ নীপ-তরু হেলন
শ্যামর মুরলিক রন্ধে।
রাধা চন্দ্রা- বলিত বিমল-মুখি
গাওয়ে গীত পরবন্ধে॥

'রাধা চন্দ্রাবলিত' বাক্যের কৃষ্ণাভিপ্রেত অর্থ হল, রাধা চন্দ্রসমূহ অপেক্ষা বিমলবদনা। কিন্তু মানিনী নায়িকা এর কদর্থ গ্রহণ করে কৃষ্ণের দ্বিচারিতা বিষয়ে কোপনা হয়েছেন। বিদগ্ধমাধব নাটকে চতুর্থ অঙ্কের সংলাপাংশের ছায়ায় পদটি রচিত। অন্য অংশে কৃষ্ণ আপন উক্তির সদ্ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছে,

চন্দ্রস্তব মুখবিম্বং
চন্দ্রা-নখবাণি কুণ্ডলে চন্দ্রৌ।
নবচন্দ্রস্তু ললাটং
সত্যং চন্দ্রাবলী ত্বমসি॥

আমরা পূর্বেও বলেছি, আবার বলি, কেবলমাত্র রূপ রচনায় নয়, নায়ক নায়িকা দূতী ইত্যাদির ভাব-চেষ্টাতেও শাস্ত্রীয় প্রভাব প্রবল। দুর্জয় মানের একটি পদ,

সো সুখ-সম্পদ তুহুঁ বিনু সুন্দরি
হাসি হাসি আপন বোলাই।
জ্ঞানদাস কহ অন্ন ভাগি নহ
দূতিক পরশ না পাই॥

আশাভঙ্গের ফলে কৃষ্ণের হতাশা এবং সহানুভূতিশীলা দূতীর প্রতি আসক্তি নায়ক-পক্ষে স্বাভাবিক হলেও কবি বলছেন, কর্তব্যপরায়ণা দূতী এ সুযোগে কৃষ্ণকে আত্মসাৎ করেনি।

১ উজ্জ্বল-নীলমণি, রূপ গোস্বামী।

উত্তমাদূতী প্রাণান্তেও বিশ্বাসঘাতিনী হন না, এ রীতি বৈষ্ণব রসশাস্ত্রকারের নির্দেশিত সিদ্ধান্ত,

> দূত্যং তু কুর্বতী সখ্যাঃ সখী রহসি সঙ্গতা।
> কৃষ্ণেন প্রার্থ্যমানাপি স্যাৎ কদাপি ন সম্মতা।।১

এরপর বিরহের পদ-পর্যায়,

> দেখ সখি বরিষা-রঙ্গ।
> কোন অপরাধে আনায়ল মনমথ
> কাটিতে বিরহিণি-অঙ্গ।।
> চড়ি ঘন কুম্ভ কদম্ব-গজেন্দ্রহি
> বান্ধল কেতকি-তূণ।
> ধরি ধনু-রাজ সাজ করি নীরদ
> শরজল সমরে নিপুণ।।

রূপকাতিশয়োক্তিমূলক অলঙ্কারে রাধাবিরহের বর্ণনা। কালিদাসের রূপাদর্শ অনুসরণ করবার পরও সামান্যশক্তি কবির হাতে কেবল-অনুবাদের তুচ্ছতাটুকু অপনীত হল না।

> বলাহকাশ্চাশনি-শব্দ-মর্দ্দলাঃ
> সুরেন্দ্র-চাপং দধতস্তড়িদ্গুণম্।
> সুতীক্ষ্ণধারা-পতনোগ্র-সায়কৈ-
> স্তুদন্তি চেতঃ প্রসভং প্রবাসিনাম্।।২

বিরহিণী নায়িকার মুরলীর প্রতি আক্ষেপ,

> সৃষ্টিস্তে ধনুষশ্চ বংশররতো রন্ধ্রে তয়োরন্তিমং
> বিদ্ধো যেন জনস্তনুং বিরহয়ন্নান্তশ্চিরং তাম্যতি।
> বিদ্ধানাং হৃদি মার-পত্রি-বিষমৈর্র্বাণেষুভির্নিস্ত্বয়া
> ক্রূরে বংশি ন জীবনং ন চ মৃতির্ঘোরাবিরাসীদ্দশা।।৩

---

১ উজ্জ্বল-নীলমণি, রূপ গোস্বামী।

২ বর্ষাবর্ণন, ঋতুসংহার, কালিদাস।

৩ বিদগ্ধমাধব, রূপ গোস্বামী।

জ্ঞানদাসের একটি পদ,

দ্বিগুণ আগুন দেও শ্যামের মুরলী ॥
উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি।
মোর নাম লৈয়া আর না বাজিহ তুমি ॥
....
তোরে কহি বাঁশিয়া নাশিয়া সতীকুল।
তোর স্বরে মুঞি অতি হৈয়াছি আকুল ॥

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ইত্যাদি কবিদেরও এ জাতীয় পদ পাওয়া যায়। নায়িকার 'ভবন বিরহ' পদ,

খেণে খেণে কান্দি লুঠই রাই রথ আগে
খেণে খেণে হরি-মুখ চাহ।

শিবরাম দাসের 'খেণে ধনি রোই রোই খিতি লুঠত' ইত্যাদি পদও পাই। তুলনীয়,

ক্ষণং বিক্রোশন্তী বিলুঠতি শতাঙ্গস্য পুরতঃ
ক্ষণং বাষ্পগ্রস্তাং কিরতি কিল দৃষ্টিং হরিমুখে।
ক্ষণং রামস্যাগ্রে পততি দশনোত্তম্ভিত-তৃণা
ন রাধেবং কং বা ক্ষিপতি করুণাম্ভোধি কুহরে ॥১

বিরহের দশদশায় নায়িকা-ভাব বর্ণনা,

যাহাঁ পহুঁ অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাহাঁ তাহাঁ ধরণি হইয়ে মঝু গাত ॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ ॥
হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ ॥

রাধা নিখিল বিশ্বে প্রিয়তমের অনুভব কামনা করেছে। নিজ দেহের পঞ্চভূত-পদার্থে কৃষ্ণের সঙ্গ বাসনা করার বিরহার্তি। কল্পনার এমন উদার আধার বৈষ্ণব সাহিত্যে দুর্লভ। অতিশয়োক্তিমূলক অলঙ্কারের প্রয়োগ এস্থলে কত সুমিত। রাধামোহন ঠাকুরের মতে পদটি উজ্জ্বল-নীলমণি-ধৃত প্রাচীন একটি শ্লোকের মর্মানুবাদ,

১ পদকল্পতরু-ধৃত রূপ গোস্বামীর শ্লোক।

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তি স্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরং।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গনে
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ ॥[1]

বিরহের শেষাবস্থায় দিব্যোন্মাদ। কৃষ্ণ-কথার ইতিহাসে এই মিলনের বাণী সর্বত্র ঘোষিত। সমুন্নত আধ্যাত্মিক অনভূতিই এ জাতীয় ভাব-পদের প্রণেতা,

অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরি ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব সভাবহি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই ॥[2]

প্রেমের স্বভাবই এই, প্রণয়িযুগলকে সম-ধর্মাক্রান্ত করে। প্রেমোৎকর্ষ হেতু ব্রজগোপীরা যে কৃষ্ণ-বিরহে 'আমিই কৃষ্ণ' এরূপ ভাবাক্রান্ত হয়েছিলেন, তা শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত রয়েছে। জয়দেব গোস্বামীর পদেও পাই,

মুহুরবলোকিত মণ্ডন-লীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥[3]

গৌরাঙ্গবন্দনা থেকে সুরু করে পূর্বরাগ অভিসার মিলন রসোদ্গার মান বিরহ এবং ভাবোন্মাদ পর্যায় পর্যন্ত যে পরকীয়া প্রেমধারা বৈষ্ণব পদাবলীতে পাই, তা পূর্বগামী কবি, দার্শনিক ও শাস্ত্রকারের প্রতিষ্ঠিত রসপ্রস্থানের মানদণ্ডে বহুলাংশে নির্ণীত। আলোচনায় এ কথাটি অন্তত স্পষ্ট যে, রাধাকৃষ্ণ নাম-পরিচয়ে অতি-চিহ্নিত নায়ক নায়িকার মানব-সংস্থা (Entity) সঙ্কুচিত। ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রেমকাব্যে মানুষ হিসেবে যে নায়ক নায়িকা একদা বিশ্ববাসী হবার সৌভাগ্য পেয়েছিল, বৈষ্ণবের ধারণায় অনুবাসিত হয়ে তারাই বৃন্দাবন-বাসী রূপে দেখা দিল। প্রেমের ছলা-কলায়, ভাব-চেষ্টায়, আচরণ-প্রকরণে রাধাকৃষ্ণ কতকগুলি নির্ধারিত বৈষ্ণবী ইচ্ছার অনুগত। ফলে এই মানুষদুটিকে কেন্দ্র করে চেষ্টা, নিষ্ঠা, তৃষ্ণা অথবা তর্পণের যত পথ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে,

১ উজ্জ্বল-নীলমণি-ধৃত প্রাচীন শ্লোক।
২ সবগুলি বৈষ্ণবপদ শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত শ্রীশ্রীপদকল্পতরু গ্রন্থ থেকে গৃহীত।
৩ গীতগোবিন্দ।

(কখনো অলঙ্কারের রূপে, কখনো ভাবের ব্যঞ্জনায়) তা বহুলাংশেই শাস্ত্রোক্ত জীবনবিধির আজ্ঞাবহ। তাই জীবনের একই চেষ্টা অথবা রূপ নিয়ে প্রচুর সংখ্যক যে পদাবলী লেখা হয়েছিল, তাতে নতুন কথা তুলনায় কম। জীবন যেখানে আপন স্বভাবে প্রকাশিত হওয়ার বদলে পূর্বস্থাপিত কোন মানদণ্ডের যষ্টি ধরে চলে, সেখানেই তার সীমা-সঙ্কোচ। গোস্বামীকৃত শাস্ত্রশাসন বৈষ্ণব কবিকে মৌন করেনি, কিন্তু অনেকাংশে মুগ্ধ করেছিল। শাস্ত্রের সম্মোহনে পদাবলীর রূপ গোস্বামী-নির্ভর।

পঞ্চম অধ্যায়
জীবনীকাব্য

বৈষ্ণব জীবনীকাব্যে উপমার রূপমোহ কোথাও প্রায় ঘনীভূত নয়। এমন ব্যাপার সম্ভব হয়, যখন কবি উপমেয়-পক্ষের রূপ গুণ কর্মে এমন কোন অপূর্ণতার অবকাশ রাখেন না, যা উপমানের উৎকর্ষে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। জীবনীকাব্যে কবির প্রধান উপমেয় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। প্রতি গ্রন্থেই মহাপ্রভু সম্বন্ধে জীবনীকারদের প্রতিপাদ্য, চৈতন্যদেবকে মানুষের মূর্তিতে উপস্থিত না করা। অনন্ত ব্রহ্ম যখন কবির অলঙ্কার-কর্মের উপমেয় হয়ে দাঁড়ায়, তখন তার মধ্যে কোন পার্থিব সীমা থাকে না, যা উপমানের উত্তীর্ণ শক্তির সাহায্যে রম্য রূপাশ্রয় রচনা করতে পারে। লোচনদাস বলেছেন,

পঙ্গু মহী লঙ্ঘিবারে করে অহঙ্কার
ক্ষুদ্র পিপীলিকা গিরি চাহে বাহিবার।।
ঐছন আমার আশা হৃদযে বিশাল।
গোরা অবতার কথা করিতে প্রচার।। ১

গোরা-মাহাত্ম্য কীর্তন করাই যদি কবির সাধ্যাতীত হয়, তবে তাঁকে অলঙ্কারের রূপাশ্রয়ে নিরূপণ করা কল্পনাতীত ব্যাপার। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'সাধ্যসাধন' পরিচ্ছেদে লিখেছেন,

বায কহে আমি নট তুমি সূত্রধাব।
সেই মত নাচাও যেইমত নাচিবাব।।
মোব জিহ্বা বীণাযন্ত্র তুমি বীণাধাবী।
তোমাব মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চাবি।।২

পরিপূর্ণ শরণাগতিতে ভাবুকের মগ্নতা আছে, শিল্পীর রূপনির্ণয় অনুপস্থিত। ঐশী ভাবনাকে পরিচিত রূপলোকের নির্দিষ্ট আয়তনে যদি না পাওয়া যায়, তবে উপমার শোভা জাগতে পারে না। জীবনীকাব্যের প্রায় সর্বত্র সেই ব্যাপার।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, তবে কি ঈশ্বরচিন্তায় পদাবলী ও জীবনীকাব্যের রচনাকারদের দৃষ্টিভঙ্গির কোন পার্থক্য আছে। আগের পরিচ্ছেদে পদাবলী-কারের ভক্তিভাব ও কবিভাবের আলোচনা করেছি। গোষ্ঠীশাসনের ফলে

---

১ সূত্রখণ্ড, চৈতন্যমঙ্গল।

২ মধ্যলীলা, চৈতন্যচরিতামৃত।

কেবল-ভক্তেরই রাধাকৃষ্ণ লীলাবর্ণনার অধিকার। চৈতন্যকালীন ও পরবর্তী বৈষ্ণব কবিতার প্রায় সর্বত্র এ প্রমাণ মেলে। বৈষ্ণবদীক্ষাই যেখানে চিত্তে কবিভাব উদ্বোধনের হেতু, সেখানেও বর্ণনায় উপমার রূপবোধ জাগা উচিৎ ছিল না। কিন্তু তা অন্তত পদাবলীতে সম্ভব হয়েছে। ভক্তির দীক্ষা এ গোষ্ঠী-গণ্ডীতে প্রবেশের ছাড়পত্র হলেও রাধাকৃষ্ণ নামক দুটি (দেবস্বরূপ) মানুষের বিরহ-মধুর জীবনের চিত্র রচনাই পদাবলী-কবিদের বিষয় ছিল। জীবনীকার কবিও প্রথমে ভক্ত পরে রচয়িতা। কিন্তু তাঁদের রচনার বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের আবেগলীলা নয়, চৈতন্য নামক মানুষটির তত্ত্বমণ্ডিত ভাবলীলা। দীক্ষার প্রথম স্তরে পদাবলীকার ও জীবনীকারের মধ্যে পার্থক্য না থাকলেও তাঁদের কবিতার উদ্দীপক বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র। এক ক্ষেত্রে দেবতাকে কল্পনায় ও অনুরাগে মানুষী জীবনচেষ্টার রূপরেখায় নির্ণীত করা, অন্য ক্ষেত্রে মানুষকেই তত্ত্বদর্শনের মধ্যে ঊর্ধ্বায়িত (Sublimate) করে বৈষ্ণবীয় লীলাস্বরূপ প্রকাশ করা। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, পদাবলীতে চৈতন্যলীলার যে সব (জীবনীকাব্যের অংশ নয়) পদ পাওয়া যায়, সাধারণত সেগুলি কৃষ্ণ-লীলাপদ অথবা প্রার্থনাপদের তুলনায় রূপোৎকর্ষে অনেক সামান্য। আবার কৃষ্ণলীলার এক একটি পালার (যেমন অভিসার, মান, বিরহ ইত্যাদি) মুখবন্ধ (গৌরচন্দ্রিকা) হিসেবে প্রাপ্ত চৈতন্যলীলাপদগুলি গৌরাঙ্গবিষয়ক পদের তুলনায় অনেক ভাল। কেননা সেগুলিতে এক একটি পালার লীলানির্যাস চৈতন্যের রূপবর্ণনায় আরোপিত। কিন্তু যে চৈতন্যলীলাপদগুলি কৃষ্ণলীলাস্মৃতি-বর্জিত, সেগুলিতে চৈতন্যর রূপ-কথা কখনো অলৌকিক, কখনো বা তত্ত্বাশ্রয়ী।

আর একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। জীবনীকাব্যগুলিতে যত রকমের অলঙ্কার ব্যবহৃত, তাদের মধ্যে ব্যতিরেক সর্বাধিক। ব্যতিরেক অলঙ্কারের প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী, কেননা এই বিশেষ শিল্পক্রিয়ায় উপমেয়ের গৌরব দিয়েই আস্বাদনের সুরু। আর চৈতন্য সেই উপমেয়-গৌরবের সারবস্তু ব'লে এ প্রকার সম্ভাবনা অনিবার্য। বৃন্দাবন দাসের নিত্যানন্দ রূপবর্ননার একটু অংশ,

কি হয় কনকজ্যোতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চান্দের সাধ লাগে ॥
সে দন্ত দেখিতে কোথা মুকুতার দাম।
সে কেশ বন্ধন দেখি না রহে গেয়ান ॥
দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ান।
আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান ॥[১]

১ মধ্যখণ্ড, চৈতন্যভাগবত।

নিত্যানন্দের অভিনব রূপে কবি সম্মোহিত, ফলে শিল্পীর নিরাসক্তি লুপ্ত। পরিবর্তে মমত্বজনিত কতকগুলি মানব-দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। ব্যতিরেক অলঙ্কারে রূপের অভিনব শক্তি সুন্দরের চেতনাকে ততটা জাগ্রত করে না, প্রীতি এবং মমতার নিবিড় স্পর্শে যতটা রম্য ভাবসম্মোহ রচিত হয়। আর চৈতন্য-জীবনের রূপ নির্ণয় করা যেহেতু রচয়িতাদের পক্ষে ভক্তিধনের নিষেধের মত, সেজন্য ব্যতিরেক অলঙ্কার ব্যবহার করে তাঁরা ভক্তের আর্তির মধ্যে চৈতন্য-ভাবটিকে গেঁথে দিয়েছেন।

রাধাকৃষ্ণ পদাবলী আর চৈতন্যজীবনী নিয়ে বৈষ্ণবের ভাবাকাশ। পদাবলীতে অলৌকিক ঈশ্বর কবিশক্তির গভীর আকর্ষণে যতই পার্থিবতা পেয়েছে ততই কবিতা রচনার সার্থকতা। অন্যদিকে মানুষ-চৈতন্য ভক্তের বিহ্বল দৃষ্টিতে যতই দিব্যরূপ পেয়েছে, ততই তা নিরূপিত রূপাশ্রয় ছেড়ে একটা দার্শনিক ভাবানুভূতিতে পরিণত। পদাবলীতে চিরকালের মানব-মানবীলীলার বাস্তব অভিজ্ঞতা কবির কল্পনাদৃষ্টিতে শোভমান। জীবনীকাব্যে কালধৃত ব্যক্তি-মানুষের বাস্তবলীলা ভক্তের অলৌকিক বিশ্বাসে অতিরঞ্জিত। পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণ দেবনির্মোক ফেলে মানুষের আকারে রূপবান। জীবনীতে চৈতন্য মানবসীমা উত্তীর্ণ হয়ে অসীম অনুভূতির বিষয়।

চৈতন্যচরিতামৃত

কৃষ্ণদাস কবিরাজের জীবনীকাব্যে অলঙ্কারের স্বরূপ মূলত দার্শনিক। অধ্যাত্ম-রহস্য যখন নৈয়ায়িকের ধারণায় স্পষ্ট হতে থাকে, তখন সে অনুভূতি-প্রকাশের ক্ষেত্রে যে সব উপমান আহৃত হয়, তা চাক্ষুষ বস্তুপুঞ্জের রূপাশ্রয় নয়। উপলব্ধির স্তরভেদে সে উপমান কখনো বস্তুর পার্থিব ব্যঞ্জনাটুকু গ্রহণ করে, কখনো বস্তুর শুদ্ধ গুণাংশ মন্থন করে নেয়, আবার কখনো বা (অতি গভীর স্তরে) কবিমনের দার্শনিক যুক্তিক্রমই উপমানের মত প্রযুক্ত হয়ে থাকে। বিশুদ্ধ দর্শনের আলোকে পদ্য-প্রণয়নের যে উদ্যোগ আমরা কৃষ্ণদাসের চৈতন্য-চরিতামৃতে দেখি, তাদের প্রকৃতি মোটামুটি এই তিনপ্রকার।

বস্তুর ক্রিয়া বা ব্যবহারের দ্বারা যে পার্থিব ব্যঞ্জনা, তাকেই উপমানের মত গ্রহণ করার লক্ষণ,

> প্রভু কহে, তুমি কি কার্য্য করিলে।
> ঈশ্বর না দেখি কেনে আগে হেথা আইলে॥
> রায় কহে চরণ রথ হৃদয় সারথি।
> যাঁহা লঞা যায় তাঁহা যায় জীব-রথী॥১

রথ, সারথি ও রথী যথাক্রমে মানুষের চরণ, হৃদয় ও জীব,—এই উপমেয়-গুলির উপমান। উল্লিখিত উপমেয় উপমানগুলির বস্তুরূপগত (Objective) লৌকিক অর্থ কিন্তু কবিতার বক্তব্য নয়। প্রভুর অভিমুখে রায় রামানন্দের কেবল সশরীরে আগমনের কথা এ নয়। এখানে উপমেয়-বস্তু 'চরণ' ধর্মপথে গতির প্রতীক (Symbol), 'হৃদয়' ইষ্ট বা শ্রেয়োলাভের ব্যাকুলতার এবং 'জীব' ইষ্টপ্রাপ্তির আধারের। এই ভাবগত ব্যাকুলতার প্রবাহকে প্রবর্তিত করতে পারে যে উপমান, তা রথ, সারথি এবং রথীর নিছক অবয়ব-চেতনার দ্বারা সম্ভব নয়। এখানে 'রথ' অর্থে রূপাশ্রয়ী ধাবমানতা, 'সারথি' অর্থে মূর্ত পরিচালনা-বুদ্ধি এবং 'রথী' অর্থে অন্তরের জিগীষা। বহির্মুখী প্রবৃত্তিরিপুকে পরাজিত করে চৈতন্যের অভিমুখে সংহত চিত্তের এই যে বিজয়-অভিযান, তা যদি শুধু মামুলি সাক্ষাৎকার হত, তবে চৈতন্যমাহাত্ম্য এবং তাঁর ভগবত্তা জীবনী রচনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না। কবি কৃষ্ণদাস দর্শনের আলোকে চৈতন্য-

---

১ ১১শ পরিচ্ছেদ, মধ্যলীলা।

জীবনের ঘটনাতথ্য শোধিত করে নিয়েছিলেন বলেই মানব-চৈতন্যের ভগবত্তা এমন দার্শনিক ভাবনার পথ পেল।

কৃষ্ণলীলা-মণ্ডল শুদ্ধ শঙ্খ-কুণ্ডল
গড়িয়াছে শুক কারিকর।
সেই কুণ্ডল কানে পরি তৃষ্ণা লাউথালি ধরি
আশা-ঝুলি স্কন্ধের উপর।।
চিন্তা-কান্থা উড়ি গায় ধূলি বিভূতি মলিন কায়
হা হা কৃষ্ণ প্রলাপ উত্তর।
উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে লোভের ঝুলি নিল মাথে
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর।।[১]

রূপকের মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তের পরম বৈরাগ্যের রূপ। 'শুক কারিকরের' গড়া কৃষ্ণ-শোভন শঙ্খকুণ্ডলই ভক্তের নিত্য কর্ণভূষণ। শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রণেতা শুকের কারিকর-রূপ অথবা শঙ্খকুণ্ডলের কর্ণভূষণ জাতীয় পার্থিব রূপাশ্রয় এখানে উপমান নয়। মূল কথা, ভক্তির সর্বোত্তম দীক্ষাই ভক্তের জীবনে শরণ্য। কৃষ্ণদাস সেই মহতী ভক্তিকে ভক্তের অবলম্বনের উপমানরূপে ব্যবহার করেছেন। বস্তুর ক্রিয়া অথবা ব্যবহারের ফলে পার্থিব ব্যঞ্জনাটুকুই কবির উপমান।

সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হইলে তার প্রেম নাম কয়।।
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়।।
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড়খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিশ্রি উত্তম-মিশ্রি আর।।[২]

সাধন-ভক্তি থেকে রতি, রতির থেকে প্রেম, প্রেমের পথে পার্থিব কতকগুলি ভাবের মধ্যে দিয়ে স্বর্গীয় মহাভাবের জাগরণ। লক্ষণীয়, উপমানগুলির (যথা ইক্ষুরস, গুড়খণ্ড, শর্করা, সিতা, মিশ্রি, উত্তম-মিশ্রি ইত্যাদি) বস্তুপ্রকৃতি কবির উদ্দিষ্ট নয়, তাদের পরিণামের ক্রমোত্তীর্ণ স্বাদুতাই লক্ষ্য। অচল

---

১ ১৪শ পরিচ্ছেদ, অন্ত্যলীলা।

২ ১৯শ পরিচ্ছেদ, মধ্যলীলা।

বস্তুপিণ্ডের যথাস্থিত লক্ষণ যদি উপমান হত, তবে এ অলঙ্কারকে দার্শনিক প্রকৃতির না বলে ভোগধর্মী উপমা বলা চলত। কিন্তু এখানে ভাবের গাঢ়তা-ক্রমের সঙ্গে রূপান্তরশীল ইক্ষুরসের শেষ পরিণাম উপমিত। তাই বস্তু নয়, বস্তুর রূপান্তর-ব্যঞ্জনাই এখানে উপমান। অনেক ক্ষেত্রে কবির উপমান বস্তুভিত্তির শুদ্ধ গুণাংশ দিয়ে গড়া,

মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভাব।
জগদ্রূপ হয ঈশ্বব তবু অবিকাব ॥১

বিভুস্বরূপ বোঝাতে কবি মণির উপমা ব্যবহার করেছেন। মণির বিভাস আছে, বিকার নেই। বস্তুর এই শুদ্ধ গুণাংশ স্বতন্ত্র করে নিয়ে উপমানের মত ব্যবহার করা হয়েছে। আরও একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া গেল।

মাযা কার্য্য হইতে আমি ব্যতিবেক ॥
যৈছে সূর্যেব স্থানে ভাসযে আভাস।
সূর্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ ॥২

স্বরূপের বিলাসাংশ মায়া। সেই বিলাসই স্বরূপের ছদ্মমূর্তি। তেমনি মেঘের আড়ালে সূর্যের আভাস সূর্যের অস্তিত্বের জন্যেই সম্ভব। আকাশে সূর্যের আচ্ছন্ন মূর্তি তার আবহ সৃষ্টি করে। সূর্যরশ্মি সূর্য নয়, কিন্তু তা সূর্যমুখী পথের রেখা। তেমনি লীলাবিলাসের ছটামণ্ডলে মধ্যবিন্দু হল বিভুশক্তি। কবি এ অংশে সূর্যের বস্তুদেহ বা তার দৃশ্যগত রশ্মিজালকে উপমানরূপে ব্যবহার করেন নি, আসলে 'সূর্য' এবং তার 'রশ্মি' সম্বন্ধীয় মানব-ধারণার সূক্ষ্ম এবং অলক্ষ্য বিভ্রমটিকে তিনি ঈশ্বরস্বরূপ নির্ণয়ের উপমানরূপে ব্যবহার করেছেন। আব একটি দৃষ্টান্ত,

ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁব নির্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য যেন চর্মচক্ষে জ্যোতির্ময ভাসে ॥৩

সাকার রূপাবযবকে নির্ভর করে এবং অতিক্রম কবে কান্তি (grace) যেমন একটি বিদেহ-চেতনা, তেমনি সূর্যশরীরকে অন্তবশায়ী করে মৃদুদৃষ্টি মানুষের চোখে তার জ্যোতির্ময়তাও সত্যের প্রতিভাস মাত্র। বিশেষেরই এই যে নির্বিশেষত্ব, সেই শুদ্ধ সূর্যস্বভাবটিকে কবি উপমান হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

---

১ ষষ্ঠ পবিচ্ছেদ, মধ্যলীলা।
২ ২৫শ ,, ,,
৩ ১৯শ , ,,

অনুভূতির অতি গভীর স্তরে কবির দার্শনিক যুক্তিক্রম কি প্রকারে উপমান হয়ে ওঠে, এবার লক্ষ্য করা যাক,

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন॥
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন॥ ১

ব্রহ্ম ও বিশ্বের সম্পর্ক নির্ণয় করতে কৃষ্ণদাস যে উপমান ব্যবহার করেছেন, তা কোন বস্তুর রূপাবয়ব অথবা বস্তুর থেকে স্বতন্ত্র করে নেওয়া তার গুণ, ধর্ম বা ক্রিয়া পর্যন্ত নয়। ব্যাকরণের প্রতিষ্ঠিত যুক্তিসূত্র এখানে উপমানরূপে প্রযুক্ত। আমরা ব্যাকরণবুদ্ধিতে জানি, অপাদান কারকে পঞ্চমী, করণে তৃতীয়া এবং অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হয়। ব্রহ্ম থেকে (হৈতে) বিশ্বের উদ্ভব, ব্রহ্মের দ্বারা স্থিতি এবং ব্রহ্মের মধ্যে বিলয়, ব্রহ্মের এই তিন অভিজ্ঞান। তাকেই কৃষ্ণদাস বিশ্ব সম্পর্কে যথাক্রমে অপাদান, করণ এবং অধিকরণ বলেছেন। বিশ্বের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মের প্রথম কারক-রূপ হল, অপাদান। দ্বিতীয় কারক-রূপ করণ। তৃতীয় কারক-রূপ অধিকরণ। কারক অর্থে 'যে করে'। যেমন প্রস্তুতকারক। ব্রহ্ম সেইরূপ বিশ্বসম্ভব, বিশ্বস্থিতি এবং বিশ্ববিলয়ের কারক। কিন্তু এখানে ব্যাকরণগত উপমানের দ্বারা কবি ব্রহ্মকে মূল এবং বিশ্বের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। এ জাতীয় উপমা বাঙলা সাহিত্যে দুর্লভ। অনুভূতি কত গভীর ও সেই সঙ্গে স্বচ্ছ হলে তবেই এমন একটি যুক্তিমার্গ উপমানের মত ব্যবহৃত হতে পারে! রূপের সৌন্দর্য এখানে নেই, কেবল যুক্তির নিপুণ দক্ষতা এক অভাবিত বিচারকোণ থেকে পাঠকের ভাবনাকে বিহ্বল করে দেয়। আর একটি দৃষ্টান্ত,

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা অংশস্বরূপ তিন বিধেয় চিহ্ন॥
অনুবাদ আগে পাছে বিধেয় স্থাপন।
সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্র বিবরণ॥২

সীমাবদ্ধ-বুদ্ধি মানুষের দ্বারা উপলব্ধ এবং কথিত বলেই 'ব্রহ্ম আত্মা ভগবান' ইত্যাদি অনির্দেয় মূলস্বরূপের অনুবাদমাত্র। ধ্যানসম্ভব সত্য এইভাবে মানুষের

১ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, মধ্যলীলা।
২ ১ম ,, আদিলীলা।

'অনুবাদে নামাঙ্কিত হয়ে সগুণশক্তিরূপে আপন বিধেয়-কার্য প্রকাশ করে, তাকেই অঙ্গপ্রভা বলা হয়েছে। অনামিক স্বরূপশক্তি সম্বন্ধে মানব-ধারণার উপমান 'অনুবাদ'। এবং তারই সগুণ বিলাসের উপমান 'বিধেয়'। উপমার এই সূক্ষ্ম মানসক্রিয়া পাঠকের বুদ্ধিকে সচকিত করে।

এতক্ষণ কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনায় অলঙ্কার-কলার এক নতুন দিক দেখলাম। বস্তুর রূপগত উপভোগ পরিহার করে এমন যুক্তিবদ্ধ চিন্তাকে কাজে লাগানোর অভিনবত্ব, শুধু বাঙলা সাহিত্যে কেন, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও দুর্লভ। পারলৌকিক উপমেয়-কথাকে সচরাচর পার্থিব এবং রূপবান উপমান দিয়েই আলোকিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু কৃষ্ণদাস পরিবর্তে কতকগুলি পরিচিত এবং অভ্যস্ত মানব-সংস্কার, হৃদয়-বিশ্বাস এবং মানসক্রিয়াকে উপমানের মত ব্যবহার করেছেন। উপমাভূমি বস্তু-সম্পর্কহীন বলেই সুন্দরের রূপমোহ জাগেনি, পক্ষান্তরে যুক্তি ও বিচারণার তীক্ষ্ণ মননমুখিতা দেখা দিয়েছে। আর এ জাতীয় উপমা চৈতন্যচরিতামৃতে লঘুগুরু আকারে অজস্র। উপমা-প্রকরণের এই বৈশিষ্ট্য প্রবন্ধকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরিচয় প্রকাশ করে। কবি লিখেছেন,

ব্যাকরণ নাহি জানে না জানে অলঙ্কার।
নাটকালঙ্কার জ্ঞান নাহিক যাহার ॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।[১]

কৃষ্ণদাসের ধারণা, ব্যাকরণ-জ্ঞান এবং অলঙ্কারবোধ না থাকলে কৃষ্ণলীলা-বর্ণনার কবিত্ব সম্ভব নয়। অথচ যে বৈষ্ণব পদাবলী বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা, তার অধিকাংশ কবিই ব্যাকরণের অন্বয়ক্রিয়া অথবা অলঙ্কারের প্রয়োগ-কৌশল দিয়ে কাব্যরচনা করেন নি। পদাবলীকার কৃষ্ণকে রূপময় করতে চেয়েছিলেন। আর কৃষ্ণদাস চেয়েছিলেন, 'কৃষ্ণত্ব' বা 'কৃষ্ণ-তত্ত্ব'কে স্বরূপময় করতে। একজনের রচনায় চিন্ময় ব্রহ্ম মানবরূপে আমাদেরই পৃথিবীর গৃহবাসী, অন্যজনের রচনায় নদিয়াবাসী নিমাই ভগবদ্ভাবে অধিবাসিত হয়ে অনুভূতির সত্য। কবি এবং দার্শনিক মূলে দুজনেই অন্তর্দর্শী, প্রত্যক্ষ রূপের চেয়ে অন্তরীক্ষ স্বরূপ-ভাবনার মধ্যে উভয়েরই মন মগ্ন। কৃষ্ণ-দাস লিখেছেন,

---

১ ৫ম পরিচ্ছেদ, অন্ত্যলীলা।

গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ আত্মীয় বাক্য শুনিতে হয় সুখ॥
রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ॥১

কৃষ্ণদাসের বৈদগ্ধ্য ও গোষ্ঠীপ্রীতি অত্যন্ত প্রবল ছিল। 'বিদগ্ধ আত্মীয়বাক্য' বলতে তিনি প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের দ্বারা অনুশীলিত কৃষ্ণভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। এর থেকে কৃষ্ণদাসের কাব্যদৃষ্টি এবং তদন্তর্গত চৈতন্যভাবনা সম্বন্ধে একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পৃথিবীর রূপলোকে সুন্দরের সন্ধান অপেক্ষাও তত্ত্বালোকিত মানবরূপকেই তিনি তাঁর কবিতার কথাবস্তু করেছেন। ফলে তাঁর রচনায় চৈতন্য মানব-চৈতন্যরূপে অঙ্কিত না হয়ে তত্ত্বচৈতন্যরূপে নির্ণীত। এটাই সম্ভব। কেননা চৈতন্যকাল থেকে দূরবর্তী হওয়ার জন্য চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষতাবঞ্চিত তিনি। দ্বিতীয়ত, তাঁর সময়ে বৈষ্ণবীয় গোস্বামী সিদ্ধান্ত চৈতন্যকে রাধাকৃষ্ণ-শক্তির মূলরূপে দার্শনিক ব্যাখ্যায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর ঠিক এই কারণেই কৃষ্ণ-দাসের প্রযুক্ত উপমান পৃথিবীর বস্তুপুঞ্জের মধ্যে না জন্মে দর্শনের ভাবভূমি এবং সূক্ষ্ম তত্ত্ববিচারের মনোভূমি থেকে উৎপন্ন। দর্শনের অতিরিক্ত অনুশীলনে চৈতন্য-চিত্রণ মানবাকার না পেয়ে তত্ত্বেরই প্রতীক-মানব। এছাড়া এ-কাব্যে যে সব রূপের উপমা ব্যবহৃত, তা প্রায়ই প্রথাসিদ্ধ। সেগুলি উল্লেখের দ্বারা রচনার পুনরুক্তিদোষ না ঘটিয়ে বরং কৃষ্ণদাসের প্রথানুগতির অসতর্ক যুক্তি-বিভ্রম একটু লক্ষ্য করা যাক, যেখানে ধর্মের আবেশ অনেকসময় কবি-চিত্তকে অবশ করেছে,

নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধ-সিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণইন্দু॥২

'শচীগর্ভ' 'দুগ্ধসিন্ধু' এবং কৃষ্ণ তজ্জাত 'পূর্ণইন্দু' হলে ধর্ম-ভক্তিলাভের পথে কোন বাধাই থাকে না, কিন্তু সৌন্দর্যের সত্যলাভ সম্ভব নয়, অথচ অলঙ্কা-রের মূল কথাটাই তাই। আর একটি উপমা উদ্ধৃত করে চৈতন্যচরিতামৃতের আলোচনা শেষ করব।

সঘনে পুলক যেন শিমুলের তরু।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ কভু হয় সরু॥৩

---

১ ৫ম পরিচ্ছেদ, অন্ত্যলীলা।
২ ৪র্থ ,, আদিলীলা।
৩ ১০ম ,, অন্ত্যলীলা।

নৃত্যপর চৈতন্যের এ ছবি কৃষ্ণদাসের কল্পনায় সুন্দর রূপ পেয়েছে। অন্যত্র কৃষ্ণ-রসের সাগরতীরে কবি নিজেকে তৃষ্ণার্ত 'পক্ষী রাঙা টুনি' বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এমন উপমাশোভার স্থান চরিতামৃতে প্রায় নেই বললেই চলে। সমস্ত মনোযোগ দর্শনে নিযুক্ত থাকায় কৃষ্ণদাস রূপের প্রতি উদাস ছিলেন। যুক্তির নির্ভুল তুলনাই তাঁর পদ্যের উপমা-প্রকরণ, রূপশিল্পসৃষ্টি নয়।

চৈতন্যভাগবত

বৃন্দাবনদাসের কাব্যরচনার কাল চৈতন্যকালের অতিসন্নিহিত। অলৌকিক চৈতন্যজীবনের উচ্চরোল কীর্তন-কণ্ঠে তখনও বাঙলাদেশের বাতাস মুখরিত। তখনও বাঙালীমন মহাপ্রভুর কৃষ্ণলীলারসে অবশ। চৈতন্য-ভাবাকাশের উত্তাপ ও উত্তেজনাটুকু সময়ের দ্বারা নীত হয়ে তখনও দেশের মানুষের মনে শান্ত অনুভবের ধন হয়ে ওঠেনি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্য অনেক পরবর্তী হয়েও চৈতন্যের মানব-আকারকে জীবনীতে নির্ণয় করেনি। কিন্তু তার ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র। বৃন্দাবনদাস দার্শনিক ছিলেন না, বস্তুদর্শী মন তাঁর, চৈতন্যজীবনের খুঁটিনাটি বিষয় তিনি সমান বিস্ময়ের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। বড় মনীষা এবং ব্যক্তিত্ব দেশীয় জীবনকে কোনদিক থেকে পুষ্ট করে, সে মনীষার স্বরূপই বা কী, এ সব বৃত্তান্ত সমকালে বা সন্নিহিতকালে বসে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আর উত্তরকাল অতীত ব্যক্তিজীবনী থেকে এটুকুই প্রত্যাশা করে।

বৃন্দাবনদাসের বিবৃতিতে তথ্য আছে, কিন্তু সে তথ্য চৈতন্যের মানব-সঙ্কল্প প্রকাশ করে না। মহাপ্রভু যে স্বয়ং কৃষ্ণ, এ ভাবনা (দার্শনিক যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার বৈদগ্ধ্য নয়) লোকবিশ্বাসের অনুগত করার আকুলতা এবং উদ্যমে সমস্ত মনোযোগ নিঃশেষিত। চৈতন্যভাগবত এবং চৈতন্যচরিতামৃত একযোগে পাঠ করলে বোঝা যায়, কৃষ্ণদাসের মত দার্শনিক ভাব-গভীরতা বৃন্দাবনের ছিল না, পক্ষান্তরে বিশ্বাসপ্রবণ এক ভক্তহৃদয় এ কাব্যের রচয়িতা। তাই বৃন্দাবনের রচনায় চৈতন্যজীবনের যত তথ্য-তালিকা, তার সর্বত্রই কবি মহাপ্রভুর অলৌকিক লক্ষণ সন্ধানে ব্যস্ত।

গঙ্গাতীরে বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
চতুর্দিকে বেড়িয়া বসিল শিষ্যগণ॥
কোটিমুখে সেই শোভা না পারি কহিতে।
উপমাও তার নাহি দেখি ত্রিজগতে॥
চন্দ্রতারাগণ বা বলিব, সেহো নহে।
সকলঙ্ক, তার কলা ক্ষয় বৃদ্ধি হয়ে॥
সর্বকাল পরিপূর্ণ এ প্রভুর কলা।
নিষ্কলঙ্ক, তেঞিঁ সে উপমা দূরে গেলা॥
বৃহস্পতি উপমাও দিতে না জুয়ায়।
তেঁহো একপক্ষে—দেবগণের সহায়॥

এ প্রভু সবার পক্ষ, সহায় সভার।
অতএব সে দৃষ্টান্ত না হয় ইঁহার।।
কামদেব উপমা বা দিব, সেহো নহে।
তিঁহো চিত্তে জাগিলে চিত্তের ক্ষোভ হয়ে।
এ প্রভু জাগিলে চিত্তে সর্ববন্ধ ক্ষয়।
পরম নির্মল সুপ্রসন্ন চিত্ত হয়।।
এইমত সকল দৃষ্টান্ত যোগ্য নহে।
সবে এক উপমা দেখিয়ে চিত্তে লয়ে।।
কালিন্দীর তীরে যেন শ্রীনন্দকুমার।
গোপবৃন্দ মধ্যে বসি করেন বিহার।
সেই গোপবৃন্দ লই, সেই কৃষ্ণচন্দ্র।
বুঝি দ্বিজরূপে গঙ্গাতীরে করে রঙ্গ।।[১]

ব্যতিরেক অলঙ্কারে কবি গঙ্গাতীরে মহাপ্রভুর রূপনির্দেশ করার বিচিত্র চেষ্টা করেছেন। উপমেয়ের তুলনায় উপমানকে পুনঃপুনঃ তুচ্ছ করায় কবির শিল্প-অসন্তোষ ফুটে উঠেছে। কিন্তু লক্ষণীয়, পরিশেষে এমন একটি অভিপ্রেত উপমানের দ্বারা তাঁর রূপবোধ তৃপ্ত, যা শিল্পের এবং সুন্দরের মানরক্ষা করার বদলে কবির বিশেষ উদ্দেশ্যের মনরক্ষা করেছে। বৃন্দাবনদাসের পক্ষে চৈতন্য-রূপের জন্যে কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোন সদৃশ সুন্দরের ধ্যান সম্ভব ছিল না। এটাই বৈষ্ণবদীক্ষা এবং বৃন্দাবনদাসের প্রতিপাদ্য।

প্রিয়ার বিরহ দুঃখ করিয়া স্বীকার।
তুষ্ণী হই রহিলেন সর্ববেদসার।।
লোকানুকরণ দুঃখ ক্ষণেক করিয়া।
কহিতে লাগিলা নিজ ধৈর্যচিত্ত হৈয়া।।
....
....
শুনিয়া প্রভুর অতি অমৃত বচন।
সভার হৈল সর্ব দুঃখ বিমোচন।।
হেনমতে শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয় মন্দিরে।
বিদ্যারসে শ্রীবৈকুণ্ঠনায়ক বিহরে।।[২]

---

১ ৯ম অধ্যায়, আদিখণ্ড।
২ ১০ম ,, ,,

প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীর মৃত্যুতে চৈতন্যের চিত্র। শেষের দুটি পঙক্তি শিক্ষক নিমাই-এর ছবি। কবি বলেছেন, প্রিয়ার মৃত্যুতে চৈতন্য 'লোকানুকরণ দুঃখ'মাত্র করেছিলেন। সচ্চিদানন্দ স্বরূপের কোন মর্তবেদনা থাকতে পারে না, এটিই কবির মূল বক্তব্য। আর সেই ভাবনায় অনুবাসিত শেষ দুটি পঙক্তির ছবিতে মানব-গৌরাঙ্গ অনুপস্থিত।

আসলে, গৌরাঙ্গচ্ছলে এ যেন বৈকুণ্ঠনায়কের লীলা। অথচ মুকুন্দ-সঞ্জয়াদি প্রাকৃত মানব তার সহচর। বৃন্দাবনদাসের প্রবল বিশ্বাসের বলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারটির উপমান উপমেয়রূপে প্রতীত হয়েছে। অন্যত্র শিক্ষক চৈতন্যের মধ্যে কবি বহুরূপে ঈশ্বরদর্শন করেছেন,

গুরু নমস্করিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
চতুর্দিকে পড়ুয়া বেষ্টিত শশধর॥
আইলেন শ্রীমুকুন্দ-সঞ্জয়ের ঘরে।
আসিয়া বসিলা চণ্ডীমণ্ডপ ভিতরে॥[১]

'পড়ুয়া বেষ্টিত শশধর'জাতীয় অসম্ভব কল্পনাও চৈতন্যের মাহাত্ম্য-কীর্তনের অনুরোধে কবিভাবনার বিষয়। কবির কল্পনাবলেই হোক, অথবা ভক্তের বিশ্বাসবশেই হোক, অলঙ্কার কিম্বা অলৌকিকতায় চৈতন্যকে অলোক-সামান্য করে তোলাই বৃন্দাবনদাসের রচনা-সঙ্কল্প। এই জাতীয় ছত্র,

চলিলা পঢ়ুয়া সঙ্গে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তারকে বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর॥[২]

অথবা,

গোষ্ঠীর সহিত বসিলেন গঙ্গাতীরে॥
যমুনার তীরে যেন বেঢ়ি গোপগণ।
নানা রস করিলেন নন্দের নন্দন॥[৩]

এবং তারপরই,

কত বা আনন্দধারা বহে শ্রীবদনে।
চরণের গঙ্গা কিবা আইলা বদনে॥[৪]

---

১ ১ম অধ্যায়, মধ্যখণ্ড।
২ ১ম " "
৩ ১ম " "
৪ ২য় " "

আচার্য চৈতন্যের গঙ্গাতীরের লীলাদৃশ্য কবির ধ্যানের মধ্যে যমুনাতীরে গোপীকান্ত কৃষ্ণের ছবি জাগায়। চৈতন্যের শাস্ত্রব্যাখ্যার মধুরতা যেন গঙ্গাপ্রবাহ। সত্যযুগে বিষ্ণুর পাদপ্রবাহিনী গঙ্গাই যেন কলিযুগে চৈতন্যের বদন-নিঃসৃতা। বিষ্ণুর সঙ্গে চৈতন্যের অভিন্নত্ব কবি অত্যন্ত কৌশলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন।

> বসিলেন দুই প্রভু করিতে ভোজন।
> কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
> এই মত দুই প্রভু করিয়ে ভোজন।
> সেই ভাব সেই প্রেম সেই দুইজন॥[১]

কবির ধ্যাননেত্রে চৈতন্য-নিত্যানন্দের ভোজনরত রূপশোভা স্নেহপালিত রামলক্ষ্মণের রূপ প্রকাশ করেছে। এই দৃষ্টান্তকে অলঙ্কার না বলে ভক্তমনের আবেগস্মৃতি বলাই ভাল। আর একটি উপমা,

> প্রভু সে হইয়াছেন অচেতন প্রায়।
> দেখিমাত্র জগন্নাথ—নিজ প্রিয় কায়॥
> কি আনন্দে মগ্ন হৈলা বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
> বেদেও এসব তত্ত্ব জানিতে দুষ্কর॥[২]

চৈতন্যের জগন্নাথ দর্শন। বৃন্দাবনদাস চৈতন্য-জীবনের এই ঘটনাকে ভক্তিরসে কেমন অলৌকিক করে তুলেছেন। ছত্রগুলিতে অলঙ্কারের মাধ্যমে কবির উদ্দেশ্যসাধনের কৌশল লক্ষ্য করার মত। এ গ্রন্থে অজস্র তথ্যলাভের পরও চৈতন্যজীবনকে মর্তলোকের বাস্তব বলে বোধ হয় না। কারণ, জীবনের আদ্যন্তে বৃন্দাবনদাস কোথাও চৈতন্যের মধ্যে মানবসীমার চিহ্নটুকু পর্যন্ত দেখান নি। মহাপ্রভু সর্বদা এবং সর্বত্রই জীবচ্ছলে (জীবরূপে নয়) অসীম ব্রহ্মস্বরূপ। এ সব ক্ষেত্রে কবির আহৃত উপমান উপমেয়ের রূপবিস্তার করতে সক্ষম হয় না। উপমেয় (রূপে অথবা গুণে) সসীম হলে তবে উপমানের উদারতর দিগন্তে তাকে সুন্দর করা চলে। কিন্তু উপমেয় যদি স্বয়ং অনুপম হয়, তবে তার জন্যে আহৃত উপমানের দ্বারা সুন্দরের কোন মোহ সঞ্চারিত হতে পারে না। বৃন্দাবনদাসের উপমাক্রিয়াতেও তা হয়নি। তাই মানব-চৈতন্যকে মহত্তর করা নয়,

---

১ মধ্যখণ্ড।

২ ২য় অধ্যায়, অন্ত্যখণ্ড।

বরং চরিত্রের বাস্তব মানবাংশটুকু বর্জন করতে এ গ্রন্থে এত জীবনতথ্য সংযোজিত। অলঙ্কারের মধ্যেই সে ব্যাপার স্পষ্ট। তাই বলা চলে, চৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর বিচিত্র জীবন-ঘটনা তাঁকে অলৌকিক ঈশ্বররূপে রচনা করবার উপকরণ।

এবার চৈতন্যভাগবত থেকে এমন একটি দুটি উপমা উদ্ধৃত করব, যেখানে বৃন্দাবনদাস চৈতন্যজীবনের ঘটনা সংগ্রহ করতে গিয়ে আপনার অগোচরে মহাপ্রভুর মধ্যে মানবসীমা দর্শন করে ফেলেছেন। আলঙ্কারিক ভাষায় বললে বলতে হয়, কবির উপমেয় রূপ-গুণ-ক্রিয়ায় সসীম। বৃন্দাবনদাসের কবিশক্তির অনুপাতে এ অলঙ্কারগুলি অনেক সুন্দর,

> আর পথে ঘরে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
> হাথেতে মোহন পুঁথি যেন শশধর॥
> লিখন কালির বিন্দু শোভে গৌরঅঙ্গে।
> চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভৃঙ্গে॥[১]

বিদ্যার্থী চৈতন্যের ছবি। উপমেয়ে মানবরূপের সীমা সূচিত থাকায় উপমান তাকে সীমা থেকে উত্তীর্ণ করতে পারল। একটি দৃষ্টান্ত,

> পরম অদ্ভুত সভে দেখেন আসিয়া।
> পিপীলিকাগণে যেন অন্ন যায় লৈয়া॥
> এইমত প্রভুকে অনেক লোক ধরি।
> লইয়া যাহেন সভে মহানন্দ করি॥[২]

জগন্নাথদর্শনে হতজ্ঞান চৈতন্যকে মন্দির থেকে সকলের বহন। পিপীলিকার পক্ষে অন্নের মহার্ঘতাবোধের মত মহাপ্রভুও ভক্তদের কাছে মহার্ঘ। কবি সেই ভাবটুকু উপমানের উত্তীর্ণ শক্তিতে প্রকাশ করলেন। বৃন্দাবনদাস তাঁর কাব্যের বহুস্থানে শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটি প্রসিদ্ধ উদ্ধৃতির অনুবাদ-ছত্র যোজনা করেছেন,

> পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
> যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি যায়॥
> এইমত চৈতন্যযশের অন্ত নাই।
> যার যত শক্তি কৃপা সভে তাই গাই॥[৩]

---

১ ৪র্থ অধ্যায়, আদিখণ্ড।
২ ২য় ,, অন্ত্যখণ্ড।
৩ আদিখণ্ড।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের মূল শ্লোক,

নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণ-
স্তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ ।।

ঋক্‌বেদের বিষ্ণুমাহাত্ম্য বর্ণনায় পাখীর সমজাতীয় উপমা আছে। কবির বর্ণনীয় উপমেয়ে যদি অন্ত না থাকে, তবে তার রূপবেদনার জন্যে নিযুক্ত উপমানে রূপমোহ ঘনীভূত হয় না। বৃন্দাবনদাসের অলঙ্কার প্রয়োগে সেই ব্যাপারই ঘটেছে। তাই অলঙ্কার-প্রয়াস অনেক হলেও রসসিদ্ধির অংশ অনেক কম। এই সব উপমাছত্রে পাঠকের যে বিহ্বলতা জাগে, দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া সর্বত্রই তা চৈতন্যের অলৌকিক ঐশীরূপের প্রভাবে, অলঙ্কারের পার্থিব আলোকে নয়। চৈতন্যের দেহরূপের বর্ণনায় যে সব অলঙ্কার ব্যবহৃত, বেশিরভাগই তা প্রথাজীর্ণ এবং লক্ষণীয়রূপে 'ব্যতিরেক' অলঙ্কার। চৈতন্যের দেহরূপ বর্ণনায় 'ব্যতিরেক' অলঙ্কার প্রয়োগের আলোচনা আমরা পরিচ্ছেদের সূচনায় লিপিবদ্ধ করেছি।

চৈতন্যমঙ্গল : লোচনদাস

লোচনদাস দর্শনের আলোয় চৈতন্যজীবনকে দেখেন নি। কিন্তু বৃন্দাবনদাসের মত চৈতন্যকে স্বয়ং ঈশ্বররূপে প্রমাণ করার ব্যাকুলতা বা ব্যস্ততাও তাঁর নেই। লোচনদাসের ব্যবহৃত উপমায় মহাপ্রভুর যে রূপ, গুণ অথবা ক্রিয়াকর্মের পরিচয় পাই, সেখানে শিল্পের সৌন্দর্য (প্রথাসিদ্ধ হলেও) দুর্লক্ষ্য নয়। লোচনদাস চৈতন্যকে ভগবান কৃষ্ণের অবতাররূপে গ্রহণ করে-ছেন। বিভুস্বরূপের ভাব তাঁর (মহাপ্রভুর) আয়ত্ত হলেও মর্তমানবের লক্ষণ থেকে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নন।

> সমুদ্রের জল যবে কলসে পরিমাণি।
> পৃথিবীর রেণু যবে এক করি গণি॥
> আকাশের তারা যবে গণিবারে পারি।
> তবু গোরা-অবতার লিখিতে না পারি॥১

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যবর্ণনার মত এখানেও মহাপ্রভু রূপ-গুণ-কর্মে অন্তহীন। তবু মানবরূপে অবতার গৌরাঙ্গকেই লোচনদাস লক্ষ্য করেছেন,

> মায়েরে দেখিয়া প্রভু পালাইয়া যায়।
> মাতিল কুঞ্জর যেন উলটিয়া চায়॥২

আবার,

> অশুচি কুচ্ছিত স্থান ছাড় বাপ মোর।
> চাঁদের কলংক যেন গায়ে কালি তোর॥৩

উপরের পদছত্রে ঈশ্বর চৈতন্যের মানব-স্বরূপ প্রকাশিত। আর একটি দৃষ্টান্ত,

> মায়ের গলা ধরি কান্দে বিশ্বম্ভর রায়।
> খেলা খেলিবারে আকাশের চাঁদ চায়॥
> ....
> ....
> দেখিয়া জননী বোলে অবোধিয়া পুঁত।
> তোহার চরিত্র মোরে বড় অদ্ভুত॥

---

১ সূত্রখণ্ড।
২ আদিখণ্ড।
৩ আদিখণ্ড।

আকাশের চান্দ কেহ পারে ধরিবারে।
ও হেন কতেক চাঁদ তোমার শরীরে॥
হেরো দেখ লাজে চান্দ মলিন হইল।
না বুঝি তোমার আগে উদয় করিল॥[১]

শিশুর অবোধ আশার উত্তরে বাঙালী মায়ের প্রাণ যেভাবে প্রবোধ দেয়, কবি লোচনও ঠিক তেমনভাবে উপমেয়ের সীমা নির্দেশ করেছেন। চৈতন্যের সীমায়িত মানব-স্বরূপের পরিচয় আছে বলেই উপমানের রূপ এমন উপভোগ্য। লোচনদাস লিখেছেন,

কি দিব উপমা রূপের না দিলে সে নাবি।
খল্‌বল্‌ করে প্রাণ কহিলে সে পারি॥[২]

মায়ের সস্নেহ দৃষ্টি কবির চোখে তখনই এল, শিশু নিমাইর মৃদু দুর্বলতাগুলি যখন তাঁর মনোযোগ লাভ করল,

অমিয়া মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো
তাহাতে গঢ়িল গোরাদেহ।
জগত ছানিয়া কেবা রস নিঙ্গাড়িছে গো
এক কৈল শুধুই সুনেহ॥
....
বিজুরী বাঁটিয়া কে বা গাখানি মাজিল গো
চান্দে মাজিল মুখখানি।
লাবণ্য বাঁটিয়া কে বা চিত্র নিরমান কৈল
অপরূপ রূপের বলনি॥[৩]

ভাবের দ্বারা প্রিয়পাত্রকে পৃথিবীর সীমা পার করে দেবার আকুলতাই ভালোবাসার লক্ষণ। লোচনদাস ব্যতিরেক অলঙ্কার ব্যবহার করে একদিকে যেমন (উপমান-পক্ষে) তাঁর প্রীতিবোধকে অন্তহীন করেছেন, তেমনি অন্যদিকে (উপমেয়-পক্ষে) বর্ণনীয়ের রূপসীমা নির্ণয় করেছেন। আমাদের বক্তব্য, লোচনদাসের জীবনী রচনায় চৈতন্যের মানবাংশ নির্ণীত, কৃষ্ণদাস অথবা বৃন্দাবনদাসে যা অনুপস্থিত।

---

১ আদিখণ্ড।
২ আদিখণ্ড।
৩ মধ্যখণ্ড।

লোচনদাস চৈতন্যের ভাব-অবস্থানটি আপন হৃদয়ে সঠিক ও সুস্থির করতে পেরেছিলেন বলেই হয়ত তাঁর রচনায় উপমার শিল্পকুশলতা সমগ্র চৈতন্যজীবনী সাহিত্যে এমন অনুপম। কৃষ্ণদাসের চৈতন্য অনির্ণেয়, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য অনির্ণীত, কিন্তু লোচনের চৈতন্য রূপ-গুণ-কর্মে কবিহৃদয়ে স্বীয় অবস্থান লাভ করেছে। চৈতন্যের রূপ-গুণের ঠিকানা পেয়েছিলেন বলেই কবি অব্যাকুল চিত্তে তাকে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন।

সোনার পদ্ম মুখ রাতা পদুম আঁখি
আধ-মুদিত তারা।
হেন বুঝি পারা মহুর পাথারে
ডুবিল আধ-ভ্রমরা ॥১

প্রথমে ছত্রে রূপক, সমগ্র পদে উৎপ্রেক্ষা। এ যেন অলঙ্কারের একটা সামগ্রিক শৈলী এবং তার গায়ে গায়ে নানা রঙের মিনে করা। চৈতন্যের অর্ধ-নিমীলিত চোখদুটি কবিমনে অপূর্ব রূপসম্মোহ জাগায়। সজীব প্রাণের যোজনায় উপমা কত স্বাদু, উদাহরণটি তার প্রমাণ। আরও একটি দৃষ্টান্ত,

রসে ডুবুডুবু রাতা নয়ন যুগল।
কাজর অমিয়াপঙ্কে কে বান্ধ বান্ধল ॥২

লাবণ্যময় রক্তবর্ণ চোখদুটি যেন অমৃত-সায়র। তাতে কে বুঝি কাজলের বাঁধ বেঁধে দিয়েছে। কবির এ অলঙ্কার-কথায় চৈতন্যের অপরূপ মোহনদৃষ্টির পরিচয় ফুটল। এ রূপ পৃথিবীরই, কিন্তু উপমানের সুষমা তাকে পার্থিব সীমার অনেক ঊর্ধ্বে নিয়ে গেছে। রূপদক্ষ কবির এই সৌন্দর্যদৃষ্টি কেমন ধীরে ধীরে ধর্মের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, এবার তারই পরিচয় নেব.

লাখ্ লাখ্ আঁখি এক সুন্দর বদনে॥
অনেক চকোর যেন একচন্দ্র আগে।
পিবই অমিয়া শ্রীমুখ পরকাশে॥৩

এবং তারপরেই,

আর দশ চাঁদ কর-অঙ্গুলির আগে।
পাতকী দেখিলে হিয়া-আন্ধিয়ার ভাঙ্গে॥৪

১ আদিখণ্ড।
২ আদিখণ্ড।
৩ সূত্রখণ্ড।
৪ আদিখণ্ড।

প্রথম ছত্রটিতে চৈতন্যমুখ চাঁদের লাবণ্য-প্রতিমূর্তি। কিন্তু পরের ছত্রদুটিতে চাঁদের লাবণ্য দেহশোভাকে অতিশয়িত না করে পাতকী-উদ্ধারের ভার নিয়েছে। ধর্ম-কামনার চাপে কবির সৌন্দর্যদৃষ্টি অপসারিত।

করুণা ভরল সব হেম গোরা-গা।
বন্দিয়া গাইব সে শীতল রাঙা পা॥
সকল ভকত লঞা বৈসহ আসরে।
ও পদ-শীতল বা লাগু কলেবরে॥১

পাপ-তাপিতের আশ্রয় ও শান্তি যে রাঙা পা, তার শীতল বাতাসে পার্থিব গ্লানি দূর হোক, ভক্তের এ প্রার্থনা কবির 'রাঙা পা'এর রূপবর্ণনার ইচ্ছাকে শাসিত করে রেখেছে। এবং এই ভক্তির মাদকতা কাব্যের মধ্যে কোথাও কোথাও এমন স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে, যেখানে অসম্ভব অলৌকিকতার মধ্যে জীবনের সবকিছু যুক্তিসূত্র বিমূঢ়।

শ্রীবাসের পাদোদক দিলা তার গায়॥

স্বর্ণকান্তি জিনি দেহ বিয়াধি পালায়।
পালাইল ব্যাধি দেহ নির্মল হইল।
হরি হরি বলি ব্যাধি নাচিতে লাগিল॥২

লোচনদাসের জীবনীকাব্যে প্রথাসিদ্ধ সংস্কৃত উপমারও প্রতিচ্ছবি আছে,

আলোক অঙ্গের তেজে বায়ু বহে মলয়জে
তাহে নব মালতির মালা।
সুমেরু শিখরে যেন সুরনদী ধারা হেন
গোরা অঙ্গে বহে দুই ধারা॥৩

অথবা,

রোদন করিয়ে প্রভু অশ্রু নেত্রে ঝরে॥
চন্দ্রের উপরে যেন খঞ্জন বসিয়া।
উগারে মুকুতাহার যেমন গলিয়া॥৪

১ সূত্রখণ্ড।
২ মধ্যখণ্ড।
৩ মধ্যখণ্ড।
৪ আদিখণ্ড।

এগুলি প্রথাসিদ্ধ সংস্কৃত উপমা। কালিদাসের কুমারসম্ভবে প্রাপ্তব্য। এখানে লক্ষণীয়, রীতি প্রথাবদ্ধ হলেও বর্ণনায় রূপের শোভা ফুটিয়ে তোলার বিশেষ মনোযোগ লোচনদাসের ছিল।

'শেষখণ্ডে' চৈতন্যের রাসলীলা-স্মৃতি বর্ণনাচ্ছলে কবি কৃষ্ণের সঙ্গে মহাপ্রভুর অভিন্নত্ব সঙ্কেত করেছেন,

> এইখানে অপরূপ এ রাস বিহাব।
> এক গোপী এক কৃষ্ণ মণ্ডলী তাহাব।।
> কনক-চম্পক আর মরকত মণি।
> গাঁথিল যেমন মালা মণ্ডলী তেমনি।।[১]

আরও একটি রাসলীলার স্মৃতিপদ,

> আজি হৈতে রাধা রাজা হৈল বৃন্দাবনে।।
> রাসহাট উপরে পতাকা শশধরে।
> কোকিল কোটাল হঞা জাগায় কামেবে।।
> ভ্রমবা হাটের বাদ্য পসার যৌবন।
> গবাক রসিকবব মদনমোহন।।
> যূথে যূথে পাটোয়াবী পাটিনী গোপিনী।
> নাটুযা তাহাব মাঝে প্রভু যাদুমণি।।[২]

চৈতন্যমঙ্গলের শেষ খণ্ডে এই অংশদুটি প্রথম পাঠে অত্যন্ত আকস্মিক ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। বিশেষত এ স্থানটি 'চৈতন্যের রাসলীলা স্মৃতি' অথবা 'কবির রাসলীলা স্মৃতি', এমন কোন শিরোনামেও সূচিত নেই। কিন্তু ঈষৎ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, কৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গলীলাকে ভক্তমনে অভিন্নরূপে প্রতীত করাবার জন্যেই কবি এ কৌশল অবলম্বন করেছেন। জীবনী রচনায় লোচনদাস কবি প্রমাণিত না হলেও কাব্যের প্রতি আন্তরিক মনোযোগ তাঁর ছিল। লোচনদাসের কাব্যে একদিকে মহাপ্রভুর জীবনের তথ্য-তালিকা যেমন কম, তেমনি অন্যদিকে তথ্যবিরলতার অবকাশে গুরুগম্ভীর দর্শন রচনা করার আগ্রহও কম। অল্প তথ্যের আয়োজনে

---

১ শেষখণ্ড।
২ শেষখণ্ড।

কৃষ্ণাবতার চৈতন্য মহাপ্রভুর একটি লীলাময় ক্ষমাসুন্দর মূর্তি রচনা করতে চেয়েছিলেন লোচনদাস। তাই বৈষ্ণব আদর্শের দিক থেকে এ রচনার দর্শনমূল্য, অথবা ইতিহাস সন্ধানের দিক থেকে যথাযথ তথ্যের আয়োজন অপেক্ষা এ লেখায় মহাপ্রভুর একটি কাব্যমূর্তি লাভ করা গেছে। আর সে প্রাপ্তির পথে কবির উপমাপ্রীতির (উপমা-কৌশল নয়) কথাই সবার বড়।

চৈতন্যমঙ্গল ঃ জয়ানন্দ

চৈতন্যলীলা নদীয়াবাসীর মনোভূমিকে এক অপূর্ব দৈবমন্ত্রে কৃষ্ণগতপ্রাণ করে তুলেছিল। কবি জয়ানন্দ সমগ্র জনপদের সেই পরিপূর্ণ চৈতন্য-উদ্দীপ্তির ছবি লীলানায়কের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। ফুলের গন্ধ যেমন অনেক সময় ফুলের রূপ দেখার আগেই তার আকারটিকে চিনিয়ে দেয়, এ কাব্যেও তেমনি চৈতন্যের লীলা-নিকষিত বৈষ্ণবীয় সৌরভ পাওয়া যায়। যে বাঙালী-হৃদয়ের অমৃত মন্থন করা রূপ-কায়া চৈতন্যের চিত্রে পাই, কবি জয়ানন্দ তারই কারিগর। উপমার আলোকে পূর্বোক্ত তিনজন জীবনীকার কবির রচনা-বিচারের কালে দেখেছি, প্রতি কবিরই চৈতন্য-ভাবনার এক একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে। ভক্তহৃদয়ে অনুশীলিত চৈতন্য-মহিমার রূপস্থাপনা বর্তমান কাব্যের অলঙ্কার-লক্ষণ।

নদীয়া খণ্ড শুনিতে জত সুখ বাড়ে।
কোন পামর মূঢ় হেন ধন ছাড়ে॥[১]

নদীয়া খণ্ড, বৈরাগ্য খণ্ড, সন্ন্যাস খণ্ড ইত্যাদির মধ্যে নদীয়া খণ্ডটিই কবি-আবেগে বেশি বিগলিত। -আর সে অংশেই কবির অলঙ্করণ-শক্তির ক্ষেত্র প্রশস্ত। চৈতন্যের বাল্যরূপ কবি এঁকেছেন,

কুন্দ কলিকাদুটি দন্ত উঠিল।
পাকা তেলাকুচা যেন অধব ফুটিল॥
টাড় মগর হার চরণে মগরা।
বাঙ্গালাটি সোনার কাটি রূপের পসরা॥
দেখিঞা মোহন ছান্দ চান্দ রহি চাহে।
মদন লাখ কোটী রূপে মূর্চ্ছা জাএ॥[২]

অলঙ্কার-প্রয়োগ গতানুগতিক। উপমান প্রথাবদ্ধ। কিন্তু রূপ এখানে ঐশ্বর্যপূর্ণ নয়, স্নেহমুগ্ধ। প্রাপ্তবয়স্ক চৈতন্যের ছবি,

নবদ্বীপচন্দ্র নিমাঞি দ্বিজ শিরোমণি।
বংশসবসিরুহ কদম্ব তরুণী॥

---

১ নদীয়া খণ্ড।

২ নদীয়া খণ্ড।

প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড দীর্ঘ কিঞ্জল্কলোচন।
অসীম গরিম রূপ ভুবনমোহন॥
কুটিল কুন্তল ভ্রূ-যুগল মার-তনু।
সিংহগ্রীব কম্বুকণ্ঠ সাতকুম্ভ তনু॥
তিলফুল নাসিকা গরুড় গজাধব।
চম্পক কলিকাঙ্গুলি নখ নিশাকর॥[১]

এখানেও উপমান-চয়ন প্রথাবদ্ধ। তবু বর্ণনায় অবসাদের বিবর্ণতা নেই। বৈষ্ণবীয় ভাববন্যায় চৈতন্যের যে রূপমূর্তি সারা বাঙলাবাসীর মনে গভীরাঙ্কিত হয়ে গেছে, তা শুনতে যেন আরও একবার মন চায়। কবি জয়ানন্দ বৈষ্ণব-বাঙলার সেই তদ্‌গত চৈতন্যভক্তির মূর্তি রচনা করেছেন।

দুই পাশে প্রেমধারা বহে নিরবধি।
সুমেরু শিখরে জেন বহে সুরনদী॥[২]

বৈষ্ণব পদাবলী থেকে ধারকরা উপমান। নায়িকার বক্ষোদেশে রত্নমালার শোভা বর্ণনা করতে সংস্কৃত কবিরাও সুরনদী ও সুমেরু শিখরের উপমান ব্যবহার করেছেন। সেই নায়িকাযোগ্য উপমান চৈতন্যের প্রেম-বিগলিত বিরহী রূপচিত্রে ব্যবহৃত হয়েও শ্রোতার মনে কোন সংশয়-প্রশ্ন জাগায় নি। প্রথমত উন্নত গৌরতনু মহাপ্রভুর চক্ষে অশ্রুধারা সুমেরু শিখর ও সুরনদীর উপমানে যথাযোগ্য গৌরব পেয়েছে। যদি ছবির স্ত্রী-পুরুষগত লিঙ্গভেদ না হয়, তবে উপমানের নায়িকা-যোগ্যতা অথবা নায়কযোগ্যতার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু যে উপমানের ছবি বহুকাল ধরে নারী অথবা নায়িকার একটি বিশেষ প্রসাধন-রূপ প্রকাশ করে আসছে, তাকে যদি কোন এককালে অকস্মাৎ একটি স্বতন্ত্র এবং বিপরীত প্রসঙ্গে (অর্থাৎ চৈতন্যের বিরহী মূর্তির রূপাঙ্কনে) নিযুক্ত করা যায়, তবে সে ব্যাপারে মন ঈষৎ সচকিত হতেই পারে। কিন্তু চৈতন্য সম্বন্ধে শ্রোতার যে রূপস্মৃতি, তা কেবলমাত্র মানব-চৈতন্যের নয়। অর্থাৎ চৈতন্যের প্রাকৃত রূপস্মৃতির সঙ্গে বৈষ্ণবতত্ত্ব-স্থাপিত রূপভাবনা বিজড়িত হয়ে এক অলৌকিক রূপ বাঙালাবাসীর স্মৃতির সম্বল। চৈতন্য যে 'রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত,' তিনি যে নায়িকা-ভাব অঙ্গীকার করে তাঁর সাধনার জীবন অতিবাহিত করেছিলেন, রূপকারের হৃদয় সেটুকু সংবাদ পুনরায় চয়ন

১ নদীয়া খণ্ড।
২ নদীয়া খণ্ড।

করতে চায়। তাই চৈতন্যের রূপরচনায় প্রথাবদ্ধ নায়িকাযোগ্য উপমান গৃহীত হলেও আমাদের ধারণায় তা কোনপ্রকার বিঘ্ন স্থষ্টি করে না। আর কবি জয়ানন্দের কালে চৈতন্যরূপের এই বৈশিষ্ট্য দেশবাসীর স্মৃতিতে স্বীকৃত ছিল বলেই এ রূপ-কথা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ওঠেনি। প্রেমাবতার মহাপ্রভুর আর একটি রূপের কথা,

শতকুম্ভ জিনি অঙ্গ মদন মোহন বেশ।
কুন্দকলি জুতিব মালা নাম্বে চাঁচব কেশ॥
শরৎকালেব চান্দ জেন মুখ ঝলমল কবে।
শ্রুতিমূলে গ্যাঁঠাকড়ি কত ছিবি ধবে॥

....

ভকত চাতকবৃন্দ জলধব আশে।
অমৃতপিযাস আসি বহে আশে পাশে॥
পুলককদম্বাবম্ভ বিজুবী প্রকাশে।
গৌব প্রেমবন্যায অখিল জীব ভাসে॥[১]

প্রথমাংশে গৌরাঙ্গের সজ্জিত একক দেহরূপ, শেষাংশে ভক্ত-পরিবৃত প্রেম-মূর্তি। প্রথমাংশের রূপে স্থিতিব আভাস, শেষাংশে প্রবহমানতার ব্যঞ্জনা। উভয়ক্ষেত্রেই কবির ভক্তি-আবেগ, বিশদ অভিধাবাক্যের উপস্থিতি, অংশটির অলঙ্কার-কর্মে উদ্দীপ্তি এনেছে। ব্যতিরেক রূপক উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি অলঙ্কার-যোগে চৈতন্যচিত্র সমৃদ্ধ। উপমান-চয়ন প্রথাবদ্ধ এবং তাব প্রয়োগও গতানুগতিক। উদ্ধৃত অংশের ছন্দঃকুশলতায় রূপের প্রকাশ মনোরম। প্রায় প্রতি চরণের শেষপর্বে (যেমন 'নাম্বে চাঁচর কেশ', 'মুখ ঝলমল করে' ইত্যাদি) ললিত শব্দগুচ্ছের মৃদু আঘাতে উপমার রূপভঙ্গি লাবণ্যময়।

ভক্তির প্রবল আবেগ কবি জয়ানন্দের উপমা-প্রেরণার মূলকথা। এবার কবির বৈষ্ণব আবেগ এবং ভক্তদৃষ্টির পরিচয় নেব।

অল্প ভাগ্যে নহে নন্দনন্দনেতে মতি।
অল্প ভাগ্যে নহে সে ব্রাহ্মণকুলে জাতি॥
অল্প ভাগ্যে নহে সে মহাপ্রসাদ বিশ্বাস।
অল্প ভাগ্যে নহে সে জাহ্নবী তীবে বাস॥[২]

---

১ নদীয়া খণ্ড।

২ বৈরাগ্য খণ্ড।

এরপর আরও বাইশটি এই প্রকার ছত্র।

মাধবানন্দ গদাধর মোর ধ্যান।
মাধবানন্দ গদাধর মোর প্রাণ॥
মাধবানন্দ গদাধর মোর অঙ্গ।
মাধবানন্দ গদাধর মোর সঙ্গ॥[১]

এরপর আরও আটটি এই প্রকার ছত্র।

জয় জয় শব্দ করি শিরে দিল ক্ষুর।
হাহাকার করি চক্ষু বুজে দেবাসুর॥
চন্দ্র সূর্য লুকাইল গগন মণ্ডলে।
প্রেমে আকুল হৈঞা ধরণী আন্দোলে॥[২]

দৃষ্টান্তগুচ্ছের প্রথম দুটি বর্ণনায় একনিষ্ঠ ভক্তির পরিচয় আছে, কিন্তু কাব্যের কোন পরমার্থ লাভ ঘটেনি। তৃতীয় দৃষ্টান্ত চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের ছবি। এই প্রসঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত অংশের একটি চরণ স্মরণ করি। 'কুন্দকলি জুতির মালা নাম্বে চাঁচর কেশ॥' তৃতীয় উদ্ধৃতির প্রথম দুই ছত্রে চৈতন্যের মস্তক-মুণ্ডনের কথা। চাঁচর চিকণ কেশের এই করুণ অপচয়-চিত্র কবিমনে গভীর বেদনা সৃষ্টি করেছে। এটি সৌন্দর্যপ্রিয় কবির কথা। কিন্তু তারই এক কল্যাণকর ব্যাপক পরিণামের ভরসা কবিকে রূপপ্রীতি ভুলিয়ে ধর্মের আশ্রয় দিয়েছে।

চৈতন্যকে আঁকতে বসে রচয়িতার মনে যে ছবি জাগে, হয় তা কীর্তনের উচ্চরোলে পরিক্ষীণ, নয় তা বিশ্বাসের অলৌকিক প্রভাবে ভক্তিমদির। কোথাও কোথাও দু'একটি ছত্রে জীবনের প্রত্যক্ষ রূপবেদনা ঘনীভূত হবার চেষ্টা পেয়েছে,

শ্রাবণে সলিল ধারা ঘনে বিদ্যুলতা।
কেমনে বঞ্চিব আমি রহিব আব কোথা॥[৩]

চৈতন্যের বিভুস্বরূপ অপসারিত করে তার স্বামীরূপের সামনে আসন্ন বিরহিণীর এ প্রশ্ন ক্ষণকালের জন্য মানবপট ব্যক্ত করে বটে, আর তারই আকর্ষণে রূপ-

---

১ নদীয়া খণ্ড।

২ সন্ন্যাস খণ্ড।

৩ বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা, বৈরাগ্য খণ্ড।

রচনার তুলিও হয়ত মুহূর্তে উদ্যত হয়ে ওঠে, কিন্তু এ সব আয়োজনই নিশীথ-স্বপ্নের মত। চৈতন্যের বৈরাগ্যকেই সেকালের সমাজ অভিনন্দিত করেছিল, তাঁর নিরাভরণ সন্ন্যাসরূপই দর্শকের একাগ্র প্রার্থনার বিষয়। এতেই ভক্ত-জীবন চরিতার্থ। ভোগবর্জন যে জীবনকথার কাঙ্ক্ষিত পরিণাম, সেখানে রূপরচনার যৎসামান্য আয়োজনে অনুরাগ ঘনীভূত হয়ে সুন্দরকে প্রকাশ করে না। জীবনীকাব্যে রূপের কথা প্রাসঙ্গিক, প্রাথমিক নয়। সেজন্যেই কবি আপন রূপানুভূতিকে প্রতিফলিত করতে কোথাও মনোযোগী নন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অনুবাদ কাব্য

রামায়ণ ও মহাভারত শুনলে চতুর্বর্গ ফললাভ ঘটে। তবু ও দুটি কাব্য পুরোপুরি ধর্মগ্রন্থ নয়। রামায়ণে রাম-সীতার এবং মহাভারতে কুরু-পাণ্ডবের বিচিত্র জীবনের আকর্ষণ। তার সঙ্গে কবিদের আঁকা নানান রূপের ছবি। মূল রামায়ণ-মহাভারতের ভাবাকাশ প্রধানত ক্ষত্রিয় ব্যাপার হলেও ঋষির তপোবন-আদর্শ জীবনের সব ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রী শক্তির (Guiding principle) মত ছিল। আর তপোবনের ঋষিচর্যা জীবনের সত্যানুভূতি ও নীতিতত্ত্বকে পবিত্র হোমশিখার মত অনির্বাণ রেখেছিল। ধর্ম বলতে তাঁরা কেবল রুদ্ধ উপাসনালয়ের ক্ষণকালীন ঈশ্বর-শরণ বোঝেন নি। বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় ভাবাকাশে সমাজের উগ্র রক্ষণশীলতা কতিপয় নীতিসূত্রকেই দেবতারূপে গড়ে তুলেছিল। বাল্মীকির কাব্যে 'নরচন্দ্রমা' রাম কৃত্তিবাসের রচনায় রামাবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত। বাল্মীকি-রামায়ণে মানুষের দোষেগুণে গড়া লক্ষ্মণের মুখে শুনি, 'ন শোভার্থাবিমৌ বাহূ ন ধনুর্ভূষণায় মে।'[১] স্ত্রৈণ পিতা দশরথের আচরণে লক্ষ্মণের এ ক্রোধ মানবিক। কিন্তু কৃত্তিবাসে লক্ষ্মণের এ মানব-পরিচয়ের নামগন্ধটুকু নেই। লক্ষ্মণ অবতার রামের পরম অনুগত ভক্ত মাত্র। জীবন যেখানে মানব-তাৎপর্যলাভে বঞ্চিত, কবির নীতি-ধর্মদৃষ্টি দিয়ে যে কাহিনীর আগাগোড়া শোধন করা, সেখানে জীবনের বিচিত্র রূপ ও হৃদয়-লক্ষণ ছবির ভাষায় জাগে না। কৃত্তিবাসী রামায়ণে বার বার কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, রাম ভগবানের অবতার, তাঁর পদাশ্রয়েই এ ভবসাগর পার হওয়া যাবে।

যাঁরে মোরা ধ্যান করি দেখি মনোরথে।
তিনি ভাগ্যগুণে রয়েছেন মনোরথে।।[২]

পার কর রাম চন্দ্র রঘু-কুল-মণি।
তরিবারে দুটি পদ করেছ তরণী।।

....

১ অযোধ্যা কাণ্ড।
২ সুন্দর কাণ্ড।

বামনদী বহে যায় দেখহ নয়নে।

....

হেদেরে পামব লোক পাব হবি যদি।
মন ভবি পান কব বয়ে যায় নদী ।।১

আর কাশীরামের প্রতি বিবরণেই ধুয়াপদ পাই,

মহাভাবতেব কথা অমৃতসমান।
কাশীবাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ।।

যেখানে কাহিনীর পাত্রপাত্রী ঈশ্বর অথবা ঈশ্বর-সহচর, সেখানে আখ্যান-বর্ণনা কেবল ধার্মিকের পুণ্যলাভ মাত্র। কবি কৃত্তিবাস আর কাশীরাম দাস ভক্তের চোখেই রামকথা এবং কৃষ্ণনির্ভর কুরুপাণ্ডব-কথাকে দেখেছিলেন, কবির চোখে নয়। তাছাড়া মূল রামায়ণ-মহাভারত আমাদের আলোচ্য কাব্য-দুটির সামনে থাকায় কবিদের কাহিনী-কৌতূহল, জীবন-জটিলতা এবং রূপাঙ্কন সম্বন্ধে তৎপর হবার দরকার হয়নি। তবে বাঙলা রামায়ণ-মহাভারতে কবিদের স্ব-রচনার পরিচয় যেখানে যেখানে পাই, সেখানেও গ্রাম্য কল্পনার স্থূল ছাপটুকু ছাড়া স্থষ্টির কোন অভাবিত চমৎকৃতি নেই। মূল রামায়ণ-মহাভারতে ঈশ্বরত্ত্ব এবং ধর্মতত্ত্বের গন্ধটুকু নিয়েই কৃত্তিবাস ও কাশীদাস পদ্যছন্দে রীতিমত দু'খানি ধর্মকাব্য লিখে ফেললেন। সমকালের সমাজনীতি শোধনের প্রেরণা যদি রচয়িতাকে প্রবর্তিত করে, আর আদর্শের অনুকরণ যদি রচনার উৎসাহ হয়, তবে সে লেখায় স্বকীয়তার অবকাশ কম হবেই। বাঙলা রামায়ণ ও মহাভারতের রূপাঙ্কনক্ষেত্রে প্রথার প্রভাব যেমন বড় কথা, রূপ-উপভোগের প্রতি অনাগ্রহও তেমন অন্য সত্য। তাছাড়া কাব্যরচনার কালে কবিমনে যদি কোন সূক্ষ্ম শিল্পসম্মত আদর্শবাদ না থাকে, কবি যদি লোকজীবনের আটপৌরে বেশবাস দিয়েই তাঁর পাত্র-পাত্রীদের উপস্থিত করেন, তবে রচনায় মাটি ও মানুষের সহজ জীবনের সরাসরি স্পর্শ হয়ত মেলে, কিন্তু রূপের সূক্ষ্ম কারুকর্ম ফোটে না।

রামায়ণ মহাভারতে গল্পের আকর্ষণই সবচেয়ে বড়। এ কাব্যদুটির উপমা-গুলি গল্পগড়ার জন্যে যতটা দরকারী, রূপ-ভাবুকতার জন্যে ততটা দরকারী বলে কবিদের মনে হয়নি। ফলে প্রসঙ্গ-নিরপেক্ষ রূপস্থষ্টির অবকাশ এখানে কিছুটা কম। কাহিনীর টানে টানে রূপের কথা উপমায় ফুটেছে।

১ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

উপমার নিজস্ব রূপভূমি দেখা দেয়নি। স্রোতে-ভাসা জলজ উদ্ভিদের ফুল যেমন শান্ত সরোবরের শতদল-দীপ্তি পায় না। আখ্যায়িকা কাব্যে উপমার ধরনই সাধারণত এই রকম। এই প্রকৃতির উপমাকে তাই image of thought না বলে image of impression[১] বলা চলে। আলোচনায় উপমার অঙ্গাঙ্গী বিস্তৃত গল্প-প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধু উপমাছত্রগুলি উদ্ধৃত করতে হয়েছে। স্থানাভাবই এ বাধ্যতার কারণ।

---

১ The Romantic Assertion. R. A. Foakes

রামায়ণ

রামায়ণে উপমার স্থান অতি সঙ্কুচিত। সংখ্যাগণনার দিক থেকে উপমা অনেক, কিন্তু রূপদ্যুতি ক্বচিৎ মেলে। আমরা আলোচনা করেছি, কোন্ কোন্ কারণে অনুবাদকাব্যের কবি সৌন্দর্যের প্রতি উদাসীন। তুলনার মলিন সাদৃশ্য ছাড়াও উপমার যে একটা সঞ্চারছটা আছে, সমগ্র রামায়ণে সে পরিচয় প্রায়ই অনুপস্থিত। এ কাব্যের অলঙ্কার-পদ্ধতিতে উৎপ্রেক্ষা এবং রূপকের প্রাধান্য। কোথাও কোথাও উপমারও (Simile) দেখা মেলে। একটি পঙক্তির আয়তনেই অলঙ্কার-স্থাপনা সীমাবদ্ধ, আর তার উদ্দীপক শক্তি পরবর্তী চরণগুলিতে প্রবাহ-বারিত। মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যে প্রথাধৃত অলঙ্কারই সবচেয়ে বেশি, কিন্তু কোথাও কোথাও কবির নিজস্ব প্রয়োগ একেবারে দুর্লভ নয়। লোকজীবন থেকে গৃহীত উপমায় প্রকাশের একটা জোরালো ভঙ্গি আছে, অলঙ্কারবিধি কবিমনের সেই দৃপ্ত বলের দ্বারা ঈষৎ উজ্জীবিত। দুটি একটি ক্ষেত্রে উপমার ক্ষণিক জীবৎ-লক্ষণ (animation) কৃত্তিবাসের উপমাশিল্পের সম্বল।

রামায়ণে উপমান চয়নের বৈশিষ্ট্য মোটামুটি কয়েক প্রকার। (১) জন্তু-জগতের উপমান; (২) পুষ্পশোভার উপমান; (৩) পর্বত, নদীধারার উপমান; (৪) জ্যোতির্লোক লক্ষণের উপমান (মেঘ ও বিদ্যুতের উপমানকে এরই অন্তর্গত করা গেল) এছাড়া প্রয়োগবিধিগত আরও দুটি দিক; (৫) মৃত উপমান; (৬) প্রচলিত বাগ্‌বিধিগত উপমান।

পশুর উপমানে সর্প, সর্প ও গরুড়, মৃগ, হস্তী ও সিংহ, বাঘ, সিংহ ও শৃগাল ইত্যাদি পাই,

> সবল হৃদয় রাজা এত নাহি বুঝে।
> অজগব সর্প যেন কৈকেয়ী গবজে ॥[1]

> হাত পা আছাড়ে কবে কঙ্কণেব ধ্বনি।
> গরুড়ের মুখে যেন বদ্ধা ভুজঙ্গিনী ॥[2]

---

১ আদিকাণ্ড।
২ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড

মহাপাশ লাগি যেন বনে মৃগ ঠেকে।
প্রমাদ পড়িবে পাছু, রাজা নাহি দেখে ॥১

যেমন গর্জিয়া সিংহ ধরে ভক্ষ্য হাতী।
ইন্দ্রলে মারিতে যুক্তি করে মহামতি ॥২

কৌশল্যা সুমিত্রা আর কৈকেয়ী কামিনী।
ডম্বুর হারায়ে যেন ফুকারে বাঘিনী ॥৩

নিঃশব্দে বালির কাছে চলিল রাবণ।
সিংহের নিকট যায় শৃগাল যেমন ॥৪

বাল্মীকি-রামায়ণেও পশুজীবনের উপমান আছে। সেখানে উপমানের বিশদ ক্রিয়াক্রম শ্বাপদ হিংস্রতার শিহরণ জাগায়।

তদা তু বদ্ধা ভ্রুকুটীং ভ্রুবোর্মধ্যে নরর্ষভঃ।
নিশশ্বাস মহাসর্পো বিলস্থ ইব রোষিতঃ ॥৫

কৃত্তিবাসের একটি পদ উদ্ধৃত করি, বাল্মীকির অনুসরণে রচিত, কিন্তু উপমানের জীবনীশক্তি তুলনায় কত কম।

প্রবোধ না মানে কালসর্প যেন গর্জে।
সুমিত্রা কুমার শিশু ঘন ঘন তর্জে ॥৬

বাল্মীকির সঙ্গে কৃত্তিবাসের প্রভেদ বিস্তর। স্ত্রৈণ পিতা দশরথের দশায় লক্ষ্মণের যে ক্ষোভ, কবি বাল্মীকি উপমানের বিবৃত পরিচয়ে এবং সক্রিয়তায় তার নিপুণ লক্ষণ দেখিয়েছেন। কবি কৃত্তিবাস লক্ষ্মণের চিত্তকে কেবল সর্পরোষের সঙ্গে অত্যন্ত মামুলিভাবে তুলনা করেই দায়িত্ব শেষ করেছেন। সিংহের একটি উপমান,

---

১ অযোধ্যাকাণ্ড।
২ অরণ্যকাণ্ড।
৩ আদিকাণ্ড।
৪ উত্তরকাণ্ড।
৫ অযোধ্যাকাণ্ড।
৬ অযোধ্যাকাণ্ড।

পশুর মধ্যেতে যেন বসিল কেশরী।
বসিল সকল রাজা অজে মধ্যে করি ॥১

বাল্মীকিতে পাই,

ততস্তু তস্মিন বিজনে মহাবলৌ মহাবনে রাঘব-বংশ-বর্ধনৌ।
ন তৌ ভয়ং সম্ভ্রমমভ্যুপেযতুর্যথৈব সিংহৌ গিরিসানুগোচরৌ ॥২

বাল্মীকির উপমানে আরণ্য জীবনের একটা রোমাঞ্চস্পর্শ আছে। কিন্তু কৃত্তিবাসে সিংহের বিক্রম-কথাটি যেন নির্যাসের মত সংগ্রহ করে রাজা অজের শক্তিমত্তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে মাত্র। সিংহের সশরীর উপস্থিতির সম্ভ্রম ও শঙ্কাছায়া নেই। কৃত্তিবাসে পাই,

ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসেন কম্পিত অন্তরে।
বনে মৃগ ডরে যেন বাঘিনীর ডরে ॥

বাল্মীকির চিত্র,

সা তু শোকপরীতাঙ্গী মৈথিলী জনকাত্মজা।
রাক্ষসীবশমাপন্না ব্যাঘ্রীণাং হরিণী যথা ॥৩

কৃত্তিবাসের উপমা অনেকটা বাল্মীকির অনুগত। কালিদাসের রঘুবংশ থেকে একটি শ্লোক উদ্ধার করি। তুলনা করলে দেখা যাবে, বর্ণনীয় বিষয়ে বাল্মীকির মনোযোগ, কালিদাসের মনোযোগ বর্ণনীয়কে উপলক্ষ করে বর্ণনার চমৎকৃতির প্রতি,

সোপানমার্গেষু চ যেষু রামাঃ নিক্ষিপ্তবত্যশ্চরণান্ সরাগান্।
সদ্যো হতন্যঙ্কুভিরস্রদিগ্ধং ব্যাঘ্রৈঃ পদং তেষু নিধীয়তে মে ॥৪

বাল্মীকির রচনায় উপমানের প্রত্যক্ষ জীবনবেগ কালিদাসের কাব্যে সৌন্দর্যের উপায় ও উপকরণ।

---

১ আদিকাণ্ড।
২ অযোধ্যাকাণ্ড।
৩ অরণ্যকাণ্ড।
৪ রঘুবংশ।

সহজ জীবনের যথাবস্থিত রূপমূর্তি বাল্মীকি এঁকেছেন। হয়ত তাতে মার্জন এবং সৌষ্ঠবের অনেক অভাব, তবু রচনায় মাটির একটা গন্ধ পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসের রামায়ণে মধ্যযুগীয় জীবনের অনেক কথা আছে, কিন্তু অলঙ্কারের মধ্যে দিয়ে সে কথার রূপ ফোটেনি। 'বাল্মীকি যেন সুনিপুণ কৃষক। ....বৃহত্তর সমাজ জীবনে .... যত সোনার ফসল তাহাকেই .... সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কবিকল্পনা দ্বারা আঁটি বাঁধিয়াছেন'।[১]

পুষ্পশোভার উপমানে কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব সর্বাধিক।

কুড়ি পাটি দন্ত মেলে দশানন হাসে।
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে।।[২]

কবি জয়দেব লিখেছেন,

বিরহিনিকৃন্তনকুন্তমুখাকৃতিকেতকদন্তুরিতাশে।[৩]

কৃত্তিবাসের উপমায় প্রথাগন্ধ আছে, তবু উপমানের বিবৃত প্রয়োগে পঙক্তি-গুলি প্রাণের তাপে উষ্ণ। বিশেষত ভাদ্রমাসের বিরলবর্ষণ কালে কেতকী-কুসুমের সারিবদ্ধ শোভা কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দীপ্ত। নীলবর্ণ রাবণের দেহে শুভ্র দন্তের শোভা যেন সবুজ বনস্থলীতে শ্বেতকেতকীর অযত্নসম্ভার। আর, কেতকীবৃক্ষের অবয়বে যে একটি কর্কশ ঋজুতা, সেটুকুও রাবণ-শরীরের সঙ্গে সার্থকভাবে উপমিত। সামান্য উপমার মধ্যে এ চিক্কণ লাবণ্য তখনই ধরা পড়ে, যখন উপমেয়-উপমানের সাদৃশ্য আমাদের ভাবনায় গভীর অনুরণনের ইঙ্গিত দেয়।

লঙ্কাদাহন কাহিনীতে,

লঙ্কামধ্যে সরোবর ছিল সারি সারি।
তাহাতে নামিল যত রাক্ষসের নারী।।
সুন্দর নারীর মুখ নীরে শোভা করে।
ফুটিল কমল যেন সেই সরোবরে।।[৪]

---

১ ত্রয়ী, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।
২ উত্তরকাণ্ড।
৩ ১ম সর্গ, গীতগোবিন্দ।
৪ সুন্দর কাণ্ড।

বাল্মীকির বসন্ত বর্ণনায় পাই,

পদ্মকোশপলাশানি দ্রষ্টুং দৃষ্টিহি মন্যতে।
সীতায়া নেত্রকোশাভ্যাং সদৃশানীতি লক্ষ্মণ ॥১

উভয়ক্ষেত্রে রূপ-নির্ণায়ক পরিস্থিতি স্বতন্ত্র। অলঙ্কারের উপকরণগুলি মোটামুটি সমজাতীয়। তবু নারীমুখের যে কমলশোভা, বিস্তারিতভাবে তাকে উপস্থিত করার ফলেই কৃত্তিবাসের রচনা সৌন্দর্যে আমণ্ডিত। অন্যত্রও এই একই অলঙ্কারের উপকরণ দেখি, কিন্তু সেখানে অলঙ্কার-ব্যঞ্জনা পৃথক হওয়ার ফলে তার আবেদন পৃথক।

গোদাবরী তীরে আছে কমল-কানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ॥
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥২

সীতাহারা রামের অন্বেষণ। সীতার প্রতি সমবেদনায় আমাদের মন হয়ত আর্দ্র, কিন্তু পদ্মবনের ব্যাপ্ত আবেষ্টন পদ্মমুখীর কমলসম্ভব শোভা কতটুকু উদ্ভাসিত করতে পারলো। অথচ আগের দৃষ্টান্তে কমলের একবার মাত্র উল্লেখের দ্বারাই রম্য একটি রূপচ্ছবি ফুটে উঠেছে। অবশ্য এখানে উদ্দেশ্য ঠিক সাদৃশ্য-ব্যঞ্জনা নয়, বিস্তীর্ণ সৌন্দর্যের আধারে অনুরূপ ক্ষুদ্রায়তন সৌন্দর্যের আত্মগোপন। সীতা কি ফুলদলে মিশে গিয়ে রামের নিকট দুর্নিরীক্ষ্য হয়েছেন। প্রেমিকের কল্পনার্তিই এর ভাব-প্রেরণা। এ প্রসঙ্গে কৃত্তিবাসের আর একটি দৃষ্টান্ত। সীতাদর্শনে হনুমানের কথা,

পদ্মপত্রে জল যথা করে টল টল।
সেরূপ তোমার মাগো নয়ন যুগল॥৩

সন্তানের ভক্তিমূর্ত আবেগের সঙ্গে উপমানের পদ্মপত্রগত জলবিন্দুর তরল সুষমা মিলিত হয়ে রূপের উচ্ছ্বাস বহুগুণিত। আগের উপমায় পদ্মের একাধিকবার উল্লেখেও রূপের ব্যাপ্তি চোখে পড়ে না।

১ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।
২ অরণ্যকাণ্ড।
৩ সুন্দর কাণ্ড।

বালি ও সুগ্রীবের যুদ্ধবর্ণনা,

> সর্বাঙ্গে বিদীর্ণ বালি, তবু নাহি হটে।
> অশোক কিংশুক যেন বসন্তেতে ফুটে।।১

বাল্মীকিও লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিতের যুদ্ধবর্ণনা করেছেন,

> ততঃ শোণিতদিগ্ধাঙ্গৌ লক্ষ্মণেন্দ্রজিতাবুভৌ।
> রণে তৌ রেজতুর্বীরৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ।।

রক্তাক্ত আঘাতের যে শোভা বাল্মীকির রূপাঙ্কনে শৌর্য ও সৌন্দর্যকে একসূত্রে বেঁধেছে, কৃত্তিবাসের রচনা তারই প্রসাদপুষ্ট। আরও দুটি একটি দৃষ্টান্ত,

> নির্মল কোমল অন্ন, যেন যূঁথি ফুল।
> খাইল ব্যঞ্জন, কিন্তু মনে হইল ভুল।।২

এবং

> বুকে ফুটে বাণের যে বিন্ধি রহে ফলা।
> লক্ষ্মণের অঙ্গে যেন রক্ত-পদ্মমালা।।৩

নির্মল অন্নে যুঁইফুলের রূপারোপ, উপমেয়ের শুভ্রতা ও পবিত্রতাবোধে মূল্যবান। ঈষৎ-কথিত উপমানটি ব্যবহারে নতুন হওয়ার ফলে একটা অভাবিত সাদৃশ্যের শোভা এখানে প্রকাশ পেল। শৌর্যরূপের প্রকাশে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি পূর্ব আলোচনার অনুগত। এছাড়া দেহবর্ণনার উপমান হিসেবে যে সকল পুষ্পের উল্লেখ, সেগুলিতে কবির মনোযোগ নেই, রীতি প্রথাবদ্ধ, উদ্দীপনা স্তিমিত।

> পদ্মহস্ত বুলাইল বালকের গায়।৪
>
> দুই পদ কোকনদ ভূষণ হইলা।।৫
>
> রণে অবসর পেয়ে কমল-লোচন।।৬
>
> অশ্রুজলে ভাসিল কমল-কলেবর।।৭

---

১ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।
২ অযোধ্যা কাণ্ড।
৩ লঙ্কা কাণ্ড।
৪ আদি কাণ্ড।
৫ সুন্দর কাণ্ড।
৬ লঙ্কা কাণ্ড।
৭ লঙ্কা কাণ্ড।

ইতস্ততঃ বর্ণনায় 'কমল'কে এইভাবে বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের উপমান করা হয়েছে। বহু ব্যবহারের জীর্ণতা এগুলির সজ্জা-মূল্য (decorative value) ছাড়া উন্নততর কোন পরিচয় দেয় না। Homer এর fixed epithet এর মত পদ্মহস্ত, কমল-লোচন প্রভৃতি উপমা বহু-প্রয়োগে মলিন ও উপমেয়ের সঙ্গে একাঙ্গীভূত। এগুলো মুছে-যাওয়া উপমা।

পর্বত ও নদীধারার উপমানে রামায়ণের কোন রূপব্যঞ্জনা নেই। পর্বতের উপমান-ব্যবহার যদৃচ্ছ। কৃত্তিবাসের দৃষ্টিতে 'পবত' যেন ব্যাপ্তি, সমুন্নতি ও প্রচণ্ডতাবোধক আলঙ্কারিক পরিভাষা। আবার এর প্রয়োগ কখনও বস্তুরূপ সম্বন্ধে, কখনও মানসরূপের ক্ষেত্রে। নির্বাচনের মধ্যে এমনই অবহেলা, যা অনেক স্থানে অসঙ্গত ও হাস্যকর। সমতলবাসী কবি পর্বতের কথা কাব্যে শুনেছেন, কখনও প্রত্যক্ষ করেন নি।

এই আদি কহিলাম এই তার মূল।
সুমেরু পর্বতে যেন ধুতুরার ফুল।।[১]

কবি এখানে মূল রামায়ণের সূত্রোল্লেখ করেছেন। বাল্মীকির সুবৃহৎ কাব্য সুমেরুতুল্য, কবি কৃত্তিবাসের বর্ণনায় তা ধুতুরার ফুলের মত যৎসামান্য। তাছাড়া,

সুমেরু পর্বত যেন ধনুখান ভারি।[২]

অগ্নিসম বাণ জলে পর্বত-আকাব।[৩]

দুই হস্ত মোর যেন দুইটা পর্বত।[৪]

লক্ষ লক্ষ হস্তী দেখে পর্বত প্রমাণ।[৫]

আহা কপি কিবা পায় শোভা আকাশ উপবে।
যেন মেরুগিরি পক্ষ ধরি উড়য়ে অম্বরে।।[৬]

উপাড়ে ঘরের খাম পর্বত-আকার।[৭]

হেব হেব মুণ্ড মোব সুমেরুর চূড়া।
হের হের পদ মোর কৈলাসের গোড়া।।[৮]

---

১ আদি কাণ্ড।
২ আদি কাণ্ড।
৩ অরণ্য কাণ্ড।
৪ অরণ্য কাণ্ড।
৫ অরণ্য কাণ্ড।
৬ সুন্দর কাণ্ড।
৭ সুন্দর কাণ্ড।
৮ লঙ্কা কাণ্ড।

শালবৃক্ষ উপাড়িল পর্বতের বেগে।১

গিরি যেন বৃষ্টিধারা মাথা পাতি ধরে।
তেমতি তরণী বীর সংগ্রাম ভিতরে।।২

বড় বড় বৃক্ষ তথা পর্বত প্রমাণ।৩

পর্বত প্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি।৪

নদীধারার উপমান বিষাদ-এবং যুদ্ধ-বর্ণনায় দেখা যায়। অশ্রুনদী অথবা রক্তগঙ্গা কবির বড় প্রিয় উপমান।

বালির রক্তেতে নদী বহে খরশাণ।।৫

উভয়ে কটকে যুঝে রক্তে হইল বাঙা।
বক্তে নদী বহে যেন ভাদ্রমাসে গঙ্গা।।৬

শ্রীবামেব সর্বাঙ্গ তিতিল নেত্রনীবে।
ভাগীবথী বহে যেন হিমালয়োপবে।।৭

পর্বত ও নদীধারার মিলিত উপমান,

ছিঁড়িয়া ফেলেন মণি মুকুতাব ঝাবা।
হিমালয শৈল হতে যেন গঙ্গাধাবা।।৮

বাবণেব গা বহিয়া বক্ত পড়ে ধাবে।
যেমন গঙ্গাব ধাবা পর্বত শিখবে।।৯

পর্বত ও নদীধারা বাল্মীকির পক্ষে কেবলমাত্র আলঙ্কারিক উপমান-প্রক্রিয়া নয়। নদী-পর্বতের বিশদ পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর প্রত্যক্ষ স্পর্শ কবি তাঁর কাব্যে উপস্থিত করেছেন। লঙ্কার বর্ণনা,

মহীতলে স্বর্গমিব প্রকীর্ণং শ্রিয়া জ্বলন্তং বহুবত্নকীর্ণম্।
নানা তরুণাং কুসুমাবকীর্ণং গিবেবিবাগ্রং বজসাবকীর্ণম্।।১০

---

১ লঙ্কা কাণ্ড।
২ লঙ্কা কাণ্ড।
৩ লঙ্কা কাণ্ড।
৪ উত্তর কাণ্ড।
৫ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।
৬ লঙ্কা কাণ্ড।
৭ উত্তর কাণ্ড।
৮ অরণ্য কাণ্ড।
৯ উত্তর কাণ্ড।
১০ সুন্দর কাণ্ড।

লঙ্কার ধ্বস্তরূপ, তবু তার মহিমা পর্বতের মত সমুন্নত। সুন্দরের সঙ্গে বিপুলের এমন সমাবেশ বাল্মীকি তাঁর নিসর্গ-অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকেই সংগ্রহ করেছেন। নদীর একটি উপমা,

সচক্রবাকানি সশৈবলানি কাশৈর্দুকূলৈরিব সংবৃতানি।
সপত্রলেখানি সরোচনানি বধূমুখানীব নদীমুখানি॥১

শরতের নদীদৃশ্যে বধূরূপের আরোপ। কাশকুসুমের অবগুণ্ঠন, চক্রবাক আর শৈবালে পত্রলেখা রচনার কথায় রূপের বহমান লাবণ্য প্রকাশিত। নদী-পর্বতের মিলিত উপমান,

প্রস্রুতঃ সর্বগাত্রেভ্যঃ স্বেদং শোকাগ্নিসম্ভবম্।
যথা সূর্যাগ্নিসন্তপ্তো হিমবান্ প্রস্রুতো হিমম্॥২

কৃত্তিবাসের রামায়ণে বাল্মীকির শিল্পবস্তুই গৃহীত। কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে প্রয়োগের কুশলতা না থাকায় উপমেয়ের স্পষ্টতাবিধান করা ছাড়া সেগুলি আর কোন কাজেই লাগেনি।

রবি, শশী, তারা, আকাশ, বজ্র, বিদ্যুৎ, মেঘ, বৃষ্টি, উল্কা ইত্যাদিকে জ্যোতির্লোক-লক্ষণের উপমান বলব। দেহরূপ, মানসভঙ্গি, মানবাচরণ অথবা পরিস্থিতি-পরিচয় দেবার জন্যেই কবি এ সব উপমান ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গের উপমান সংখ্যায় অজস্র। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এদের প্রয়োগ অত্যন্ত মামুলি। জ্যোতির্লোক-সম্ভব একক উপমান ছাড়া যৌগিক রূপ-প্রয়োগও আছে। যেমন রবি ও শশী; রবি ও মেঘ; শশী ও তারা; শশী ও আকাশ; শশী ও মেঘ; তারা ও আকাশ; তারা ও মেঘ; বজ্র ও বৃষ্টি; বিদ্যুৎ ও মেঘ; মেঘ ও আকাশ; মেঘ ও বৃষ্টি। এছাড়া বাতাস আছে। আহৃত উপমানপুঞ্জের মধ্যে যেগুলির গতিশীলতা প্রবল এবং প্রত্যক্ষগম্য, প্রধানত সেগুলি মানবগুণ অথবা মানব-কর্ম এবং বিবর্তমান পরিস্থিতি রচনায় নিযুক্ত। যেমন বজ্র, বিদ্যুৎ, মেঘ, বৃষ্টি, উল্কা, বাতাস ইত্যাদি। আর যেগুলি ঈষৎ গতিবান অথবা স্থিতিকল্প, সেগুলি প্রায়ই মানবদেহের অবয়ব-(পূর্ণ অথবা খণ্ড) শোভা বর্ণনার জন্যে ব্যবহৃত। যেমন রবি, শশী, তারা,

---

১ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

২ অযোধ্যা কাণ্ড।

আকাশ, ইত্যাদি। অবশ্য ব্যতিক্রমও যথেষ্ট মেলে। সংখ্যায় এবং যোজনায় বিচিত্র হয়েও এদের প্রয়োগে সৌন্দর্যের চমৎকৃতি নেই। সমস্ত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত না-করে আমরা সূত্রাকারে তাদের উল্লেখ করব।

অনন্ত শয়নে বিষ্ণু জলে ভাসমান মেঘের মত (আদি); সদ্যোজাতা ক্রন্দ্যমানা সীতা যেন সৌদামিনী (আদি); রামের দেহদ্যুতি কোটি সূর্যজয়ী, বদন সুধাংশুনিন্দন (আদি); চন্দ্র কলা বৃদ্ধি যেন দশরথ পুত্রদের (আদি); ধনুর্বাণ যুদ্ধ যেন বর্ষায় বিদ্যুতের ঝন্ঝনা (আদি); রামের বাণবর্ষণ জলধরের মত (আদি); কপালের সিন্দূরে বাল-সূর্যের তেজ (আদি); পাত্রমিত্র বেষ্টিত নৃপ যেন নক্ষত্র-বেষ্টিত পূর্ণশশী (অযোধ্যা); মন্থরার গৌরবর্ণ দেহরূপ যেন চন্দ্রকলা (অযোধ্যা); সাত শত মহারাণী বেষ্টিত নৃপ যেন তারকাবেষ্টিত চন্দ্রমা (অযোধ্যা); রাম-বিরহে দশরথের মলিনতা যেন রাহুগ্রস্ত চন্দ্র (অযোধ্যা); মুনিগণে বেষ্টিত ভরদ্বাজ যেন তারাগণ মধ্যে দ্বিজরাজ (অযোধ্যা); রামের পশ্চাতে সীতা যেন সজল জলদের সঙ্গে সৌদামিনী (অযোধ্যা); কুজার ছিন্ন মণিহার যেন স্খলিত তারা (অযোধ্যা); রামবিরহে বিষণ্ণ ভরত যেন মেঘাচ্ছন্ন শশধর (অযোধ্যা); রাক্ষসের আর্তনাদ যেন মেঘগর্জন (অরণ্য); বাণাহত শরীর যেন বজ্রাঘাতে দীর্ণ পর্বত (অরণ্য); বনান্তরালে জানকীর আত্মগোপন যেন মেঘের আড়ালে সৌদামিনীর আত্মগোপন (অরণ্য); সীতা সুধাংশুবদনী (অরণ্য); স্ত্রীগণ বেষ্টিত বালি যেন তারাগণ মধ্যে চন্দ্র (অরণ্য); নেত্রনীর যেন শ্রাবণধারা (কিষ্কিন্ধ্যা); রাক্ষস-ঠাট যেন মেঘমালা (কিষ্কিন্ধ্যা); রাবণ ও অপহৃতা সীতা যেন মেঘের উপরে বিদ্যুৎ (কিষ্কিন্ধ্যা); মারুতির গতিবেগ যেন মরুত্বান পবন (সুন্দর); মারুতির উচ্চ পুচ্ছ যেন ইন্দ্রধ্বজ (সুন্দর); পীতবস্ত্রধারী রাবণ যেন নবজলদে বিদ্যুৎ (সুন্দর); মেঘবর্ণ বৃক্ষ (সুন্দর); মলিনা সীতা যেন দ্বিতীয়ার চাঁদ বা দিবাভাগে চাঁদ (সুন্দর); হনুর লেজে আগুণ যেন মেঘে বিদ্যুৎ (সুন্দর); অঙ্গদের অন্তরীক্ষগতি যেন বাতাসে সঞ্চরমান জলন্ত উল্কা (সুন্দর); মেঘেতে চপলা যেন (রাবণের) গলায় উত্তরী (লঙ্কা); কুম্ভকর্ণের দুই চোখ যেন চন্দ্রসূর্য (লঙ্কা); কুম্ভকর্ণের যুদ্ধযাত্রা যেন মেঘ থেকে সূর্যের প্রকাশ (লঙ্কা); কুম্ভকর্ণের গগণস্পর্শী মাথা যেন নবজলধর (লঙ্কা); কুম্ভকর্ণের দুইচক্ষু যেন আকাশে দেউটি (লঙ্কা); ইন্দ্রজিতের যুদ্ধস্থানে প্রবেশ যেন পূর্বাচলে আদিত্য-উদয় (লঙ্কা); মহীরাবণের আশ্বাসে হাত বাড়িয়ে আকাশ পাওয়া (লঙ্কা); দিব্য রথের অবতরণ যেন বিজলী-পতন (লঙ্কা); জানকীর রূপে বিজলী-পতন (লঙ্কা); ঘরের শোভা যেন বিজলী-পতন (লঙ্কা); বানরীর রূপ যেন বিজলী-পতন (উত্তর); বাণের গতি যেন তারার গতি (উত্তর); সীতার রূপে বিজলী ঢাকা পড়ল (উত্তর)।

প্রয়োগের অবহেলায় রূপ গতানুগতিক। এদের মধ্যে থেকেই ঈষদ্দ্যুতি দু'একটি দৃষ্টান্ত,

রামের রূপ,

শ্যামল কোমল তনু সুপীত বসন।
তড়িৎ জড়িত যেন দেখি নবঘন॥১

রাবণের সীতাহরণ,

কালবর্ণ রাবণ সে গৌরবর্ণা নারী।
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারি॥২

বালির মৃত্যু, তারার খেদ,

চন্দ্র যান অস্ত, তাঁর সঙ্গে যায় তারা।
তোমার হইল অস্ত কেন রহে তারা॥৩

রাম-সীতার বিবাহ,

পূর্বাপর বরকন্যা আইল দুইজনে।
রোহিণীর সহ চন্দ্র যেমন গগনে॥৪

বাল্মীকির সদৃশ দৃষ্টান্ত দেখা যাক। রাবণের পুরী বর্ণনায়,

স বেশ্মজালং বলবান্ দদর্শ ব্যাসক্ত বৈদূর্যসুবর্ণজালম্।
যথা মহৎ-প্রাবৃষি মেঘজালং বিদ্যুদ্বিনদ্ধং সবিহঙ্গজালম্॥৫

বর্ষার বর্ণনা,

শক্যমম্বরমারুহ্য মেঘসোপানপংক্তিভিঃ।
কুটজার্জ্জুনমালাভিরলঙ্কর্তুং দিবাকরঃ॥৬

যুদ্ধ-গমনের প্রতিরূপ,

বিদ্যুৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ
শৈলেন্দ্রকূটাকৃতি সন্নিকাশাঃ।৭

কবি বাল্মীকির বর্ণনায় জ্যোতির্লোক কোথাও আকুঞ্চিত নয়। তার সুমহৎ ব্যাপ্তি সব সময়েই রূপের আভিজাত্যে আমাদের সম্ভ্রম আকর্ষণ

১ উত্তর কাণ্ড।
২ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।
৩ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।
৪ আদি কাণ্ড।
৫ সুন্দর কাণ্ড।
৬ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।
৭ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

করে। কৃত্তিবাসের অলঙ্কার যোজনায় সে লক্ষণ দুর্লভ। যেমন জীর্ণ মুদ্রার ধাতুমূল্যটুকুই সব, মুদ্রণের কোনও স্বীকৃতি যেমন সেখানে নেই, কৃত্তিবাসের কাব্যের অলঙ্কার সে প্রকৃতির।

উপমানের প্রয়োগবিধিগত আরও দুটি দিক আছে। প্রথম, মৃত উপমান। দ্বিতীয়, প্রচলিত বাগ্‌বিধিগত উপমান। যে সব উপমানের রূপ-উদ্দীপক শক্তি অপগত, জীবৎশক্তি লুপ্ত, সেগুলি মৃত উপমান। দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্।

রাজ প্রদক্ষিণ করি যায় মনোরথে।।[১]

'মনোরথ' কথাটিতে মনের ত্বরিত গতিকে রথের গতির সঙ্গে উপমিত করে রূপক অলঙ্কার করা হয়েছে। মন রূপ রথ। 'রথ' এই উপমানের যোগে অদৃশ্য 'মনের' যথাসম্ভব স্পষ্ট পরিচয় মেলে। প্রথম যে কবি রথের প্রবলগতিকে মনের সঙ্গে উপমিত করেছিলেন, তাঁর রচনায় রথের প্রত্যক্ষগোচর রূপটি কত উজ্জ্বল ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এর উপমেয়-প্রকাশিকা শক্তি বারিত হল। 'মনোরথ'এর অর্থ-সংস্কার কবি ও পাঠকের মনে হয়ে দাঁড়ালো, মনোবাসনা, মনস্কামনা, অথবা শুধুই মন। 'মন' কথাটির প্রবল উপমেয়-শক্তি 'রথে'র সংজ্ঞা গ্রাস করে ফেলল। উল্লিখিত দৃষ্টান্তে রথের সংজ্ঞা পূর্ণগ্রস্ত নয়। সেখানে কান পাতলে, রথের ক্ষীয়মাণ ঘর্ঘরধ্বনি একটু হয়ত শোনা যায়। কিন্তু,

যাঁরে মোরা ধ্যান করি দেখি মনোরথে।[২]

এইরূপ করিতে করিতে মনোরথে।
শুনিতে পাইল কোলাহল ব্যোমপথে।।[৩]

সুখে অন্তঃপুরে তুমি থাক মনোরথে।
সেবক হইয়া রাজ্য পালিবে ভরতে।।[৪]

তোমার চরণে খুড়া করি দণ্ডবৎ।
আশীর্বাদ কর, যেন পূরে মনোরথ।।[৫]

---

১ লঙ্কা কাণ্ড।
২ সুন্দর কাণ্ড।
৩ লঙ্কা কাণ্ড।
৪ উত্তর কাণ্ড।
৫ লঙ্কা কাণ্ড।

দৃষ্টান্তগুচ্ছে 'মনোরথে'র অর্থ কখনো 'মনস্কামনা' কখনো বা শুধুই মন। অর্থাৎ 'রথ' শব্দটির ব্যঞ্জনা লুপ্ত। অথচ এটি মূলে একটি উপমান। এই দ্যোতনালুপ্ত অর্থ-নিঃশেষ উপমানই মৃত উপমান।

আকর্ণ পুরিয়া বাণ মারেন রাঘব।
বরিষয়ে বর্ষায় যেন মেঘ সব॥১

মহাবীর রামচন্দ্র না হন কাতর।
শরবৃষ্টি করেন যেমন জলধর॥২

সম্মুখেতে বাণবৃষ্টি করেন লক্ষ্মণ।৩

মেঘের আড়ে থাকি করে বাণ-বরিষণ।৪

নানা অস্ত্র গাছ পাথর করে বরিষণ।৫

সহস্র সহস্র গুণ তুষার বরিষে।৬

রামের উপরে করে পুষ্প বরিষণ।৭

'বর্ষণ' কথাটির সিদ্ধরূপে যে উপমান শক্তি, তা ধীরে ধীরে ব্যবহারের জীর্ণতায় অন্য অর্থ-রূপ পাচ্ছে। উপরের দৃষ্টান্তগুলি ক্রমানুসারে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বর্ষণের তাৎপর্য ধীরে ধীরে 'নিক্ষেপ' এই সামান্য অর্থে রূপান্তরিত। পুষ্প-বরিষণ, তুষার-বরিষণ, গাছ ও পাথর-বরিষণ ইত্যাদি যতটা 'নিক্ষেপ' শব্দের অর্থবহন করে, ততটা ধারাপতনের ছবি জাগায় না। আধুনিক যুগের যুদ্ধে 'বর্ষণ' এই উপমান তাজা হয়ে আবার ফিরে এসেছে মনে হয়। বাণবর্ষণ মৃত প্রথা, বোমাবর্ষণ জীবন্ত সত্য। আমরা অনেক সময় 'মুষলধারা'য় বৃষ্টি পড়ার কথা বলে থাকি। প্রচলিত লৌকিক অর্থ-সংস্কারে মুষলধারা শব্দটির অর্থ হল প্রবলবেগে। আসলে শব্দটি পুরাণ-স্মৃতিমূলক একটি উপমান। 'মুষল' নামক মারণাস্ত্রের ধারাবর্ষণেই মহাভারত-খ্যাত যদুবংশের বিনষ্টি। প্রবল বৃষ্টিবিন্দুর আঘাত অতিশয়িত

১ আদি কাণ্ড।
২ আদি কাণ্ড।
৩ লঙ্কা কাণ্ড।
৪ লঙ্কা কাণ্ড।
৫ লঙ্কা কাণ্ড।
৬ উত্তর কাণ্ড।
৭ উত্তর কাণ্ড।

হয়েছিল মুষলের উপমানে। মুষলের কেবল গুণগত অর্থটিই আধুনিক কালে স্মৃতির সম্বল। তাই 'মুষলধারা' বললে আমরা 'প্রবলবেগে' অর্থ করি। 'ইল্‌শেগুঁড়ি' শব্দটির অর্থ আজও তার প্রসারিত উপমান-তাৎপর্য নিয়ে বর্তমান। আশা করলে হয়ত অন্যায় হয় না, সুদূর ভবিষ্যতে শব্দটি কেবল 'অল্পবৃষ্টির' সামান্য মানে নিয়েই বেঁচে থাকবে। কোন এককালে এ শব্দটির সৃষ্টিতে যে ধীবর-জীবনের একটি বিশ্বাস-সংস্কার মূল কারণরূপে ছিল, আগামীকাল হয়ত সে সত্য সম্পূর্ণ বিস্মৃত হবে। এইভাবেই উপমান তার উদ্দীপন-শক্তি হারিয়ে জড় শব্দস্তূপে পরিণত হয়। আর একটি দৃষ্টান্ত,

> গৌরবর্ণ ধব তুমি যেন চন্দ্রকলা।
> গলায় তুলিয়া দেহ দিব্য পুষ্পমালা ॥১

মনে হয়, কবি প্রথম যখন এই 'দিব্য' শব্দটি কাব্যে ব্যবহার করেছিলেন, তখন এর অর্থের স্বর্গীয়তা উপমেয়কে আলোকিত করতে পারত। কিন্তু দিনে দিনে ব্যবহারের বৈগুণ্যে এ শব্দের অর্থাবশেষ দাঁড়ালো বেশ 'ভাল'তে। উল্লিখিত দৃষ্টান্তে 'দিব্য' শব্দটির উপমান-রূপ একেবারে নিঃশেষিত নয়, কিন্তু আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত,

> কিবা তার রথ অতি মনোহর হয়।
> অলঙ্কৃত দিব্য দিব্য ঘোটকে বহয় ॥

অথবা,

> মধ্যেতে যাইছে বজ্রদংষ্ট্র দিব্যবথে।

দিব্য শব্দের মূল অর্থ ছিল দেবশক্তিবিশিষ্ট। এখানে দিব্য শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট অথবা সুসজ্জিত। স্বর্গের কোন রূপমহিমার আভাস পর্যন্ত নেই। আমরা চল্‌তি কথায় কোন সুখী মানুষকে সম্বোধন করে বলে থাকি, 'দিব্যি আরামে আছেন মশাই।' এখানে 'দিব্য' অর্থে বেশ অথবা খুব। আধুনিক কালে এই অর্থই অবশিষ্ট। উদ্দীপন-শক্তি এইভাবে বিনষ্ট হয়ে শব্দ-দ্যোতনা নিঃশেষ, মৃত উপমান-গোষ্ঠীভুক্ত। এখন আর এগুলিকে উপমান বলে চেনবার জো নেই।

---

১ অযোধ্যা কাণ্ড।

এবার প্রচলিত বাগ্‌বিধিগত উপমানের কথা। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙলাদেশের মধ্যযুগীয় জীবনবিশ্বাস ও সংসার-সংস্কারের আটপৌরে ব্যবস্থাকে এই জাতীয় উপমানের দ্বারা অনেক বেশি স্পষ্ট করতে পেরেছে।

এ দেখি বাঘের ঘরে ঘোগেব বসতি।
মরিবাব ঔষধ কে বাঁন্ধিল দুর্মতি।।১

'বাঘের ঘরে ঘোগের বাস' গৃহস্থ-চতুরতার কুটিল ক্রম বোঝাতে আমরা প্রায়ই এ প্রবচন ব্যবহার করে থাকি। এর ছবিতে হয়ত সৌন্দর্য নেই, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের একটি প্রত্যক্ষ রূপের বেগ আমাদের গার্হস্থ্য অভিজ্ঞতাকে কবুল করিয়ে নেয়।

জল ফেলাইয়া যেন দিল তপ্ত তৈলে।
কুপিয়া বশিষ্ট মুনি পুত্র প্রতি বলে।।২

আমাদের ঘরের ছবি দিয়ে কবি ঋষি-রোষের রূপটি জীবনের অনেকখানি নিকট করে আঁকলেন। এতে ঋষির তপঃশক্তি ধরা পড়েনি, কিন্তু সাধারণ সমাজ-মানুষের মনের কথা বড় হয়েছে।

মন্দোদবী পানে বাজা ফিরিয়া না চায়।
মৃত্যুকালে বোগী যেন ঔষধ না খায়।।৩

দৃষ্টান্তে রাবণের রাজসিক মহিমা-পরিধি হয়ত ব্যঞ্জিত হয়নি, কিন্তু প্রবচনের উপমা-দ্যোতনায় রক্ষোরাজ অনেকটা আমাদের ঘরের মানুষ হয়ে উঠেছে। রূপের আস্বর্গব্যাপ্তি নেই, কিন্তু মর্তসীমাটুকু বেশ স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত।

মহী যদি কবিলেক এতেক আশ্বাস।
হাত বাড়াইযা যেন পাইল আকাশ।।৪

হাতে চাঁদ পাওয়া বা হাতে আকাশ পাওয়ার উপমান-প্রবচন আমাদের সাংসারিক জীবনযাত্রার সুলভ ছবি। কাব্যরচনার শিল্পবোধ বাল্মীকির থাকলেও কৃত্তিবাসের ছিল না। রামের জীবনালেখ্য দিয়ে কবি আমাদের মধ্যযুগীয় সমাজজীবনে নীতিবোধের একটি আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। লক্ষ্য করলে

১ অরণ্য কাণ্ড।
২ আদি কাণ্ড।
৩ লঙ্কা কাণ্ড।
৪ লঙ্কা কাণ্ড।

দেখা যাবে, বাল্মীকির কাব্যে নিরপেক্ষ নিসর্গ রূপবর্ণনার স্থান অনেক, কিন্তু কৃত্তিবাসের নিসর্গ সব সময়েই পাত্রপাত্রীর রূপ-গুণ-ক্রিয়া-পরিস্থিতির মধ্যে পরোক্ষ। রাম-কাহিনী অবিকৃত রেখে তারই দৃষ্টান্তে বাঙলাদেশের জীবনযাপন-পদ্ধতিতে ন্যায়নীতির একটা ত্বরিত প্রতিষ্ঠা কবি চেয়েছিলেন। দেখা যায়, প্রতি কাণ্ডেই যত্র তত্র (অনেকটা অসংলগ্নভাবে অনেক সময়) 'রামমাহাত্ম্য' কীর্তন করেছেন কবি কৃত্তিবাস। এ সব লক্ষণ, আর কিছুই নয়, কৃত্তিবাসের শিল্পানুরাগের চেয়ে সমাজ-অনুরাগই বড় করে দেখায়।

সীতামা'র দেহখানি দেখিলাম ক্ষীণ।
অলসেব বিদ্যা যথা ক্ষীণ দিন দিন॥১

অলসের বিদ্যার মত ক্ষীয়মাণতা উপমানরূপে সীতার দেহরূপের উপমেয়ে প্রযুক্ত। বাল্মীকির রামায়ণেও পাই,

ক্ষীণামিব মহাকীর্তিং শ্রদ্ধামিব বিমানিতাম্।
প্রজ্ঞামিব পরিক্ষীণামাশাং প্রতিহতামিব॥২

কৃত্তিবাসে পাই,

দেখি মুনিপত্নীকে ভাবেন মনে সীতা।
মূর্তিমতী করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা॥৩

মানবগুণের উপমান মানবদেহকে অতিশয়িত করলে রূপের সূক্ষ্ম ধ্বনিই মূর্তি পায়। মূর্তিমতী শ্রদ্ধা অথবা আলস্যলালিত বিদ্যার মূর্তিতে শরীরী কোন চেতনা নেই, রূপের লাবণ্যটুকু ছাড়া। বাল্মীকি শোভার নির্যাস অলঙ্কারবদ্ধ করেছেন। কৃত্তিবাস সেই পদ্ধতির অনুগত।

ভারতবর্ষীয় বিশ্বাস এই যে সমস্ত জড় প্রকৃতি 'অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ।' জড়ের মধ্যে জীবনের সন্ধান ও সখ্য উদার কবি-সহানুভূতির ফলমাত্র।

অনুগন্তুমশক্তাস্ত্বাং মূলৈরুদ্ধতবেগিনঃ।
উন্নতা বায়ুবেগেন বিক্রোশন্তীব পাদপাঃ॥৪

---

১ সুন্দর কাণ্ড।
২ সুন্দর কাণ্ড।
৩ অরণ্য কাণ্ড।
৪ অযোধ্যা কাণ্ড।

নিসর্গকে যথাবস্থিত রেখে কবি তার সত্তার সখ্য ও সমবেদনা সংগ্রহ করে নিয়েছেন। কৃত্তিবাসে তার স্পষ্ট অনুসরণ।

আকাশে থাকিয়া গাছ জলে স্থলে পড়ে।
বন্ধু অনুবর্জি যেন বান্ধব বাহুড়ে।।১

বাল্মীকিতে রামের বনগমন দৃশ্য, কৃত্তিবাসে হনুমানের লঙ্কাগমনের চিত্র। উভয়ক্ষেত্রে উপমানের উদ্দেশ্য এক। তথাপি কৃত্তিবাসের নিসর্গ আকুল মানবনর্মের মূর্তি পায়নি। বাল্মীকি নিসর্গের প্রাণময়তা কাব্যবর্ণনায় যুক্ত করেছেন। কৃত্তিবাস বন্ধুকৃত্যের কথাকে উপমানরূপে ব্যবহার করেছেন। আলোচ্য রামায়ণে বাল্মীকির অনুকরণ আছে, কিন্তু তার গূঢ় উদ্দেশ্যের রূপ ধরা পড়েনি।

---

১ লঙ্কা কাণ্ড।

মহাভারত

রামায়ণের মতই মহাভারতের উপমারীতির আলোচনা সম্ভব। অর্থাৎ পশুর উপমান, পুষ্পের উপমান, নদী-পর্বেতর উপমান, জ্যোতির্লোকের উপমান এবং প্রয়োগ-প্রকরণের দিক থেকে মৃত ও প্রচলিত বাগ্‌বিধিগত উপমান। আমরা সূত্রাকারে এদের ক্রম নির্দেশ করব।

পশু,

শল্য ভীষ্ম দুইজনে হৈল মহারণ॥
দুই সিংহ যুঝে যেন পর্বত উপব।১

পুষ্প,

জর্জব হইল তনু রক্ত বহে স্রোতে।
কিংশুক কুসুম যেন বিকাশে বসন্তে॥২

নদী,

যতেক আছিল সৈন্য বক্তে হৈল বাঙ্গা।
খবস্রোতে বহে যেন ভাদ্রমাসে গঙ্গা॥৩

পর্বত,

মনেব আবেশে বাড়ে বীব হনুমন্ত।
কি দিব উপমা যেন পর্বত জ্বলন্ত॥৪

জ্যোতির্লোক.

ছাড়িলেন দিব্য অস্ত্র গঙ্গাব নন্দন।
যেন জলধব ঘন কবে ববিষণ॥৫

মৃত-উপমান,

মনোরথে নন্দিনীব যত দুগ্ধ খায।৬

১ আদি পর্ব।
২ অশ্বমেধ পর্ব।
৩ আদি পর্ব।
৪ বন পর্ব।
৫ ভীষ্ম পর্ব।
৬ বন পর্ব।

প্রচলিত বাগ্‌বিধি,

জীয়ন্ত বাঘের চক্ষু আনে কোন জনে।[১]

কাশীরাম দাসের রচনায় এ জাতীয় অলঙ্কার অজস্র নয়। সে কারণে আমরা অন্য পদ্ধতিতে এ কাব্যের উপমা বিচার করব। ব্যাসদেবের মহাভারতে আছে,

নবনীতং হৃদয়ং ব্রাহ্মণস্য বাচি ক্ষুরো নিহিতস্তীক্ষ্ণধারঃ।
তদুভয়মেতদ্বিপরীতং ক্ষত্রিয়স্য বাঙ্‌নবনীতং হৃদয়ং তীক্ষ্ণধারং ইতি।।[২]

এই ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের কথায় সংস্কৃত মহাভারত পূর্ণ। কিন্তু কাশীদাসী মহাভারতে নির্ভূষণ ঋষির রাগ-রোষের চেয়েও কবচ-কুণ্ডলধারী ক্ষত্রিয়ের বৈভব এবং শৌর্যশোভা বড়। কাশীরামের বর্ণনায় যুদ্ধের রূপচ্ছবি এবং দেহ-শোভার উপমান সবচেয়ে বেশি।

অরণ্যজীবনের একটা নিবিড় আবেষ্টন কৃত্তিবাসের কাব্যে সর্বত্র। সেখানে বন্য এবং গৃহপালিত পশুপক্ষী আছে, আমাদের ঘরের পাশে পাতা-লতা-ফুলের বাহারটুকু আছে, পাহাড়-নদীর সম্প্রীতি আছে, মেঘ-বিদ্যুৎ বৃষ্টি-বাতাসের চেনাজানা রূপের কথা আছে, আর আছে ঘরগড়া দুঃখ-সুখের সংস্কার-বিশ্বাসে তৈরী প্রবচনের অজস্র ছবি। রামায়ণের যুদ্ধও কম বড় নয়। কিন্তু গোটা কাব্য পাঠ করার পর একটানা আশা-নৈরাশ্যের দোলায় আমাদের গৃহ-সংবাদ আবেদনে সবার বড় হয়ে দাঁড়ায়। রামায়ণের উপমা স্নিগ্ধ গৃহাশ্রয়ের রূপকর্ম। কাশীরাম দাসের মহাভারতে ঐশ্বর্যের আজানুলম্বিত রাজবেশ, ক্ষত্রিয়বীরের শ্লাঘা ও শক্তি-পরীক্ষা, কূটনৈতিক চক্রান্তের জটিল প্রয়োগফল। শত্রুর গোপন আক্রমণের মুখোমুখি জীবন যেন সর্বদাই বর্মপরিহিত সতর্কতায় আত্মরক্ষা করছে। রামায়ণে যুদ্ধ থেকেও শান্তির ব্যঞ্জনা বড়, মহাভারতে শান্তির অনুজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও একটানা রণোন্মাদনার প্রবাহ। রামায়ণের পটভূমি গৃহাঙ্গন, মহাভারতের পটভূমি প্রসারিত রাষ্ট্রক্ষেত্র। গৃহীবৃত্ত রামায়ণ আর রাজবৃত্ত মহাভারত। ব্যাসের মহাভারতে পাই,

অগত্বা সংশয়মহমযুদ্ধ চ চমূমুখে।
অক্ষান্ ক্ষিপন্নক্ষবিদ্ধৈ বিদ্বানবিদুষো জয়ে।।
গ্লহান্ ধনূংষি মে বিদ্ধি শরানক্ষাংশ্চ ভারত।
অক্ষাণাং হৃদয়ং মে জ্যাং রথং বিদ্ধি মমাসনম্।।[৩]

---

১ বন পর্ব।
২ আদি পর্ব।
৩ সভা পর্ব।

সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের শ্রীবৃদ্ধিতে দুর্যোধনের ঈর্ষা। বিরাটপর্বে অর্জুন অস্ত্রমুখে শকুনির এ কৌশলের উত্তর দিলেন,

তোমায় আমায় আজ খেলাইব পাশা।
....
ধনুক করিব পাশা অস্ত্রগণ অক্ষ।
মস্তক করিব সারি যত তোর পক্ষ।।১

ভীত শকুনির সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ। কাশীরামের এ উপমান মূল মহাভারত থেকেই গৃহীত, কিন্তু প্রয়োগ ঠিক বিপরীত পটভূমিতে। কবি কাশীরাম দক্ষতার সঙ্গে এ রূপক অলঙ্কারটি কাজে লাগিয়েছেন। এতে হয়ত রূপের লাবণ্য নেই, কিন্তু মূল শ্লোকের পটভূমিতে তীক্ষ্ণ ও ত্বরিত প্রত্যুত্তরের মত ক্ষাত্রগৌরব ঝিলিক দিয়ে ওঠে। ব্যাসকৃত মহাভারতে বনযাত্রী পাণ্ডবগণের পক্ষে থেকে কৃষ্ণ দুর্যোধনকে বলেছেন,

মুহূর্তং সুখমেবৈতত্তালচ্ছায়েব হৈমনী।
....
ইতশ্চতুর্দশে বর্ষে মহৎ প্রাপ্স্যথ বৈশসম্।।২

কৃষ্ণের এ অভিশাপ কেবল দুর্যোধনের অদৃষ্টকেই গ্রাস করেনি, সঙ্গে সঙ্গে গোটা মহাভারতের ভাগ্যপট আমূল চিহ্নিত করে দিয়েছে। হেমন্তের তালচ্ছায়ার মত ক্ষণিকের শান্তিই মহাভারতের রূপব্যঞ্জনা। রাজকুমার উত্তরকে আশ্বাস দিয়ে অর্জুন বলেছেন,

ক্ষণেক থাকিয়া দেখ বিরাট নন্দন।।
....
রুধির করিব নীর কুম্ভীর কুঞ্জর।
কচ্ছপ হইবে অশ্ব মীন হবে নর।।
হস্তপদ সব হবে তৃণ কাষ্ঠবৎ।
হংসবৎ ভাসিয়া চলিবে সব রথ।।৩

উপমানের এই রূপ অন্যত্রও একাধিকবার পাই। ভীষ্মপর্বে নবম দিনের যুদ্ধে ভীমের বিক্রম বর্ণনায়, দ্রোণপর্বে অভিমন্যুর যুদ্ধ-বর্ণনায় ইত্যাদি। উপমান এখানে বীরের রণস্পৃহা এবং ক্ষাত্রতেজের পরিচয় দেয়। কর্ণ ও সহদেবের যুদ্ধ,

---

১ বিরাট পর্ব।

২ সভা পর্ব।

৩ বিরাট পর্ব।

আষাঢ়-শ্রাবণে যেন বর্ষে জলধর।
ততোধিক দুইজনে বরিষয় শর ॥১

প্রথম দিনের যুদ্ধ,

মণিময় সর্প যেন আকাশেতে ধায়।
উভয় সৈন্যের অস্ত্র সেইরূপ যায় ॥
কনক রচিত নাগ আকাশে ভরিল।
যোদ্ধাগণ অস্ত্র সেইরূপ আচ্ছাদিল ॥২

কর্ণের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ,

অস্ত্রে অস্ত্রে নিবারিল কর্ণ মহাবল।
কূলেতে নিবৃত্ত যেন হয় সিন্ধুজল ॥৩

ভীমের যুদ্ধ,

শরজালে আচ্ছাদিল বীর বৃকোদর।
কুজ্ঝটিতে যেন আচ্ছাদিল গিরিবর ॥
.. ..
যেই দিগে বৃকোদর সৈন্যে যায় খেদি।
দুই দিগে তট যেন মধ্যে হয় নদী ॥৪

অর্জুনের যুদ্ধ,

জন্তুগণ মধ্যে যেন কালান্তক যম।
ইন্দ্রের নন্দন বীর মহাপরাক্রম ॥
বৃক্ষ যেন বৃষ্টিধারা মাথা পাতি ধরে।
তাদৃশ আয়ুধ-বৃষ্টি অর্জুন উপরে ॥
....
নিমিষেকে শরবৃষ্টি কৈল নিবারণ ॥
যেন মহাবায়ে নিবারিল মেঘমালা ।৫

---

১ ভীষ্ম পর্ব।
২ ভীষ্ম পর্ব।
৩ বিরাট পর্ব।
৪ আদি পর্ব।
৫ আদি পর্ব।

হিড়িম্ব বধ,

> ভীম হিড়িম্বের যুদ্ধ না যায় বর্ণনা।
> যুগল পর্বত প্রায় দেখি দুইজনা।।
> যুদ্ধ-ধূলি আচ্ছাদিল দোঁহা কলেবর।
> কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিল দুই গিরিবর।।১

সমুদ্র-মন্থন,

> মারহ, অসুরগণ বলিয়া উঠিল।
> প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল।।২

দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ,

> অন্ধকার করি সবে গগন মণ্ডলে।
> শরদের কোলে যেন হংসপংক্তি চলে।।
> দিব্য অস্ত্র ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।৩

যুদ্ধের বেগ ও ভয়াবহতা বর্ণনায় আহৃত উপমানগুলি বীরোচিত এবং শক্তিমন্ত। শর যেন আকাশে সঞ্চরমান মণিময় ও কনক-রচিত সর্প। শরজালে আচ্ছাদিত ভীম যেন কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়। ধূলি-আবৃত যুধ্যমান দুই বীর কুয়াসাবৃত দুটি পর্বত। বিতাড়িত সৈন্য-রূপে তটবদ্ধ নদীর ছবি। যুদ্ধের আস্ফালন যেন প্রলয়কালের উদ্বেল সমুদ্র। শরাবৃত আকাশে শাণিত ফলকের ছটা যেন শরতের আকাশে শুভ্র বলাকা। এ ছবিগুলি যুদ্ধের পরাক্রান্ত প্রতিরূপ। প্রতিপক্ষের যোদ্ধাও শক্তিতে কোন অংশেই হেয় নয়। শত্রুর অস্ত্র-নিবারণ যেন কূলের দ্বারা প্রতিহত সিন্ধুজলরাশি। ধনুর্গুণে শত্রুর শরবৃষ্টি নিবারণ যেন ঝড়ে অপসারিত মেঘমালা। ক্ষত্রিয় গৌরবের অনুরূপ এই যে ছবির সমৃদ্ধি, উপমান নির্বাচনে কবির বীরস্মৃতিই তার কারণ। এগুলির সবই প্রায় প্রথাভাণ্ডার থেকে আহরণ করা। যুদ্ধের চিত্র রচনা করতে কবি কখনো কখনো আমাদের গৃহ-প্রতিবেশ থেকে রূপচয়ন করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অস্ত্রত্যাগের ঠিক পূর্বমুহূর্তে ভীষ্মের শর-কণ্টকিত রূপ,

> বাণাঘাতে শরীর কম্পিত ঘনে ঘন।
> শিশির কালেতে যেন কাঁপয়ে গোধন।।৪

---

১ আদি পর্ব।
২ আদি পর্ব।
৩ বিরাট পর্ব।
৪ ভীষ্ম পর্ব।

যুদ্ধের একটি সামগ্রিক রূপের কথা,

চারিদিকে বীরগণ বরিষয়ে বাণ।
বাণে অঙ্গ হৈল যেন সজারু সমান ॥[১]

অর্জুনের যুদ্ধ-দৃশ্য,

ভাদ্রমাসে পাকা তাল যেন পড়ে ঝড়ে।
পুঞ্জে পুঞ্জে স্থানে স্থানে পার্থ কাটি পাড়ে ॥[২]

ছবিগুলিতে যুদ্ধের তাপ আছে, কিন্তু উপমান-চিত্র আমাদেরই গৃহপোষ্য প্রাণী অথবা গৃহভাণ্ডারের সঞ্চয় থেকে গৃহীত হওয়ায় মনের মধ্যে সম্ভ্রম জাগাবার বদলে এগুলি কেবল যথার্থতার রূপ-পরিচয় দিয়েই শেষ হয়। আর চেনা-জানা বলে আমাদের অন্তরে অনায়াসে প্রবেশাধিকার পায়। কিন্তু ব্যাসকৃত মহাভারতের উপমানগুলি পৃথক ওজনের,

অদ্রীনামিব কূটানি ধাতুরক্তানি শেরতে।
হাহাকারঃ সমভবত্তত্র তত্র সহস্রশঃ ॥[৩]

প্রতিজ্ঞাভঙ্গে কৃষ্ণ,

মদান্ধমাজৌ সমুদীর্ণদর্পং সিংহো জিঘাংসন্নিব বারণেন্দ্রম্।
সোঽভিদ্রবন্ ভীষ্মমনীকমধ্যে ক্রুদ্ধো মহেন্দ্রাবরজঃ প্রমাথী।
ব্যালম্বিপীতাম্বরধৃক্ চকাশে ঘনো যথা খে তড়িতাবনদ্ধঃ ॥[৪]

যুধিষ্ঠিরের শল্যবধ,

দীপ্তামথৈনাং প্রহিতাং বলেন সবিস্ফুলিঙ্গাং সহসা পতন্তীম্।
প্রৈক্ষন্ত সর্বে কুরবঃ সমেতা দিবো যুগান্তে মহতীমিবোল্কাম্ ॥

....

সা তস্য বর্মাভিবিদার্য শুভ্রমুরো বিশালঞ্চ তথৈব ভিত্বা।
বিবেশ গাং তোয়মিবাপ্রসক্তা যশো বিশালং নৃপতের্দহন্তী।

....

মহেন্দ্রবাহপ্রতিমো মহাত্মা বজ্রাহতং শৃঙ্গমিবাচলস্য ॥[৫]

---

১ দ্রোণ পর্ব।
২ আদি পর্ব।
৩ আদি পর্ব।
৪ ভীষ্ম পর্ব।
৫ শল্য পর্ব।

ব্যাসকৃত মহাভারতের উপমানগুলি প্রথমোদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুচ্ছের (কাশীরাম থেকে) আদর্শ। ধাতুরাগরঞ্জিত পর্বতশৃঙ্গ, সিংহ ও হস্তীর দ্বৈরথ, উল্কার মত অস্ত্র, বজ্রাহত পর্বতশৃঙ্গ ইত্যাদি উপমান পরিচিত ভাবস্তরের নয়। সংসার-জীবনে এগুলির সঙ্গে আমাদের একটা বিস্ময়-সম্ভ্রমের যোগমাত্র আছে। এদের রূপের বৃহৎ পরিচয় এবং প্রবল আবেশ আমাদের সম্মোহিত করে। কাশীরামের কাব্যে যুদ্ধ-রূপ প্রধানত এই জাতীয়। রামায়ণের কথায় বলেছি, যুদ্ধে শৌর্যপ্রকাশের ক্ষেত্রেও উপমানের রূপচয়ন বহুলাংশে আমাদের ঘরের নম্র প্রতিচ্ছবি দিয়ে তৈরী। উপমার আলোকে মহাভারত শৌর্যের কথাকাব্য, মহাভারত সম্বন্ধে 'প্রাচীন সাহিত্য'-ধৃত রবীন্দ্রনাথের অভিমত স্মরণে রেখেই এ উক্তি করেছি। রবীন্দ্রনাথ কাহিনী-নির্ভর জীবনের পরিণাম লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন, মহাভারতের ভীষ্মপর্ব মহাপ্রস্থানে গিয়ে শেষ হয়েছে। উপমাকলা আমাদের আলোচ্য। অর্থাৎ বস্তু ও ভাবের রূপাঙ্কন। মহাভারতে (কাশীরাম দাস) রূপের প্রবাহ ও পরিণাম ক্ষাত্রদীপ্তিতে উজ্জ্বল। গোড়া থেকে সুরু করে প্রায় শেষ পর্যন্ত একটানা যুদ্ধায়োজন এবং তার কাজেই অলঙ্কারের নিয়োগ। পরিশেষে গতশক্তি অর্জুনের ছবি,

> মহাকোপে ছাড়িলেন বজ্রসম বাণ।
> দৈত্য অঙ্গে ঠেকি পড়ে তৃণের সমান॥
>
> ....
>
> এড়িল অক্ষয় অগ্নিবাণ ধনঞ্জয়।
> যত বাণ এড়িলেন সব ব্যর্থ হয়॥[১]

ভুবনবিজয়ী অর্জুন সামান্য দস্যু-কবল থেকে যদুনারী রক্ষায় অপারগ। এ তাঁর বিধিলিপি। মহাভারতের এ-পর্যন্ত জীবনভাব যে ধীরে ধীরে তার আচরিত পদ্ধতি ত্যাগ করে একটি নতুন আদর্শমার্গে চলেছে, অর্জুনের বাহুসর্বস্ব ক্ষত্রিয়-মূঢ়তা তা জানে না। তাই অক্ষমের শেষ চেষ্টাটুকুও সমভাবেই শ্লাঘাপরায়ণ। সমৃদ্ধি থেকে বৈরাগ্যর পথে এ পটবদলের কথা আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক, সন্দেহ নেই। কিন্তু দর্শনমূঢ় অর্জুনের রণোদ্যম পূর্ণ পরাজয়ের মাঝেও যখন হার মানে না, অথচ তার দৃপ্ত পদভরে যখন রূপের ছটা জাগে, তখন এ উপমান-চিত্রকে ক্ষত্রিয় ধর্মের বিষয় না বললে সত্যের অপলাপ হয়। স্বর্গারোহী যুধিষ্ঠিরের প্রতি স্বর্গের যে অভিনন্দন, তার মূলে হয়ত পুণ্যাত্মার প্রতি সম্মানবোধ আছে, কিন্তু ভূপতির প্রতি রাজোচিত ব্যবহারের কোন ত্রুটিও নেই,

---

১ মষল পর্ব।

এত বলি প্রণমিয়া যান তথা হৈতে।
দেব-পুষ্প পড়ে আসি ভূপতির মাথে।।১

ধর্ম ও দর্শনের কথায় যুধিষ্ঠিরের সাত্ত্বিক পরিচয় আছে। রূপ ও অলঙ্কারের কথায় তাঁর ভূপতি-পরিচয়ও দুর্লক্ষ্য নয়।

এতক্ষণ উপমার আলোকে মহাভারতের অসি-চমক দেখলাম। এটি তার সমৃদ্ধি-ছটা। এবার এ কাব্যের সমৃদ্ধি-সঞ্চয়ের হিসেব নেব। দেহরূপ-কে কাশীরাম বিচিত্র এবং বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এতে নারীরূপ ও পুরুষরূপ, ক্ষাত্ররূপ ও ঋষিরূপ সবই আছে। মহাভারতের পাত্রপাত্রী, ভাবাকাশ ইত্যাদি সম্বন্ধে কাশীরামের মনে যদি একটা সমৃদ্ধিবোধ না থাকতো, তবে রূপবর্ণনার প্রবাহ ও পরিমাণ এত অসংখ্য হত না। আমরা সূত্রাকারে এদের উল্লেখ করব। আদিপর্বে সমুদ্রমন্থনে পাওয়া লক্ষ্মীর রূপবর্ণনা ; সুধা পরিবেশনে শ্রীকৃষ্ণের মোহিনীরূপ ; ব্যাসদেবের দেহরূপ ; সত্যবতীর (ধীবর কন্যা) রূপ ; স্বয়ংবরা দ্রৌপদীর রূপ ; দ্রুপদসভায় ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনের রূপ ; বনপর্বে অভাগিনী দময়ন্তীর রূপ ; ভীষ্মপর্বে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ ; মুষলপর্বে দেহত্যাগী কৃষ্ণের রূপ ইত্যাদি। এগুলি সবই প্রায় প্রথার দ্বারা অনুবাসিত। তবু দেহের এই সবিস্তার বর্ণনা কাব্যে বহুবার থাকার ফলে মহাভারতে একটা স্পষ্ট ঐশ্বর্যদ্যুতি ফুটেছে। শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী রূপ.

নাসিকায় লজ্জা পায় শুক চঞ্চুখানি।
নেত্রদ্বয় শোভা হয় নীলপদ্ম জিনি।।
পুষ্পচাপ হরে দাপ ভ্রূদ্বয়-ভঙ্গিমা।
ভালে প্রাতঃ-দিননাথ দিতে নারে সীমা।।
পীতবাস করে হাস স্থির সৌদামিনী।
দন্তপাঁতি করে দ্যুতি মুক্তার গাঁথনি।।২

স্বয়ংবরা দ্রৌপদীর রূপ,

কণ্ঠ দেখি কম্বু প্রবেশিল অম্বু
অগাধ অম্বুধি-নীরে।।
করে কোকনদ পাইল বিষাদ
দ্বিজরাজ নখ তেজে।
....

১ স্বর্গারোহণ পর্ব।
২ আদি পর্ব।

কমল বদন কমল নয়ন
কমল গণ্ডিত গণ্ড।
দ্বিকর কমল আর পদতল
ভুজ কমলের দণ্ড॥১

ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনের রূপ,

সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধর রাতুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর যুগ্মবর জানু সুবলিত॥
.. ..
মহাবীর্য যেন সূর্য ঢাকিয়াছে মেঘে।
অগ্নি অংশু যেন পাংশু আচ্ছাদিত নাগে॥২

অভাগিনী দময়ন্তীর রূপ,

পদ্ম যেন বিচলিত হস্তী দন্তাঘাতে।
চন্দ্র যেন বিচলিত সৈংহিকের দাঁতে॥৩

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ,

দশদিক জংঘা তাঁর পাতাল চরণ।
শৈলগণ তাঁর অস্থি রোম তরুগণ॥
মাংসরূপ ধরণী দেখেন ধনঞ্জয়।
দেখিয়া বিরাটরূপ মানেন বিস্ময়॥৪

ব্যাসদেবের রূপ

কনক পিঙ্গল জটা বিরাজিত শির।
কৃষ্ণ অঙ্গে শোভা যেন মেঘে দামিনীর॥৫

---

১ আদি পর্ব।
২ আদি পর্ব।
৩ বন পর্ব।
৪ ভীষ্ম পর্ব।
৫ আদি পর্ব।

দেহত্যাগী কৃষ্ণের রূপ,

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পদ রবিবিম্ব কোকনদ
শতপত্র যেন সুশোভন
রাতুল চরণ দেখি ব্যাধসুত হৈল সুখী
মৃগবর্ণ হেন লয় মন ॥[১]

রূপস্থাপনার সাড়ম্বর আয়োজন অলঙ্কারগুলির অভিজাত পদবী চিনিয়ে দেয়। দৃষ্টান্তগুচ্ছে নানান মানুষের বর্ণনা রয়েছে। নারী, পুরুষ, রাজা, ঋষি, ঈশ্বর, —সবই বর্তমান। লক্ষণীয়, প্রতিক্ষেত্রেই ব্যক্তি এবং পরিস্থিতি সম্বন্ধে কবির রূপাঙ্কনে সজাগ মাত্রাজ্ঞান ক্রিয়াশীল। রূপবর্ণনা যেখানে অজস্র, সেখানে একই উপমান দিয়ে নারী এবং পুরুষের, ঋষি এবং রাজার দেহবর্ণনা করার আলস্য (প্রথাশৈথিল্যও হতে পারে) দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে তা দেখেছি। কাশীরামের রচনা কিন্তু সে বিষয়ে সতর্ক। ব্যাসকৃত মহাভারতে আছে,

ততো গোক্ষীরকুন্দেন্দু-মৃণালরজতপ্রভঃ।
বনমালী হলী রামো বভাষে পুষ্করেক্ষণম্ ॥
ন কৃষ্ণ! ধর্মশ্চরিতো ভবায় জন্তোরধর্মশ্চ পরাভবায়।[২]

আরও ছবি পাই,

দদর্শ তাং পিতা চৈব যে চৈবান্যে তপস্বিনঃ।
বিচেষ্টমানাং পতিতাং ভূতলে পদ্মবর্চসম্ ॥[৩]

অন্য একটি ছবি,

এবমুক্তস্য কর্ণস্য ব্রীড়াবনতমাননম্।
বভৌ বর্ষাম্বুবিক্লিন্নং পদ্মমাগলিতং যথা ॥[৪]

কাশীরামের অনুবাদ,

এতেক শুনিয়া কর্ণ কৃপের বচন।
হেঁটমুণ্ড হইল বীর বিরস বদন ॥
না দিল উত্তর কিছু কর্ণ মহাবল।
বৃষ্টি-জলে ছিন্ন যেন কমলের দল।[৫]

---

১ মুষল পর্ব।
২ বন পর্ব।
৩ আদি পর্ব।
৪ আদি পর্ব।
৫ আদি পর্ব।

এবার মূল মহাভারত থেকে দু'একটি দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করব, অলঙ্কার-কথায় সামান্য হয়েও যা বিশদ পরিচয়ের দ্বারা সৌন্দর্যের এক প্রসারিত প্রতিবেশ রচনা করেছে। এ মহাভারত বাঙলা মহাভারতের আদর্শ হলেও কাশীরামের ভাবনায় সদৃশ রূপবোধ অনুপস্থিত। সংশপ্তকগণের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধের ব্যাপক ছবি,

> ততোহন্যোন্যেন তে সৈন্যে সমাজগ্মতুরোজসা।
> গঙ্গাসরয্বৌ বেগেন প্রাবৃষী বোল্বণোদকে॥
> ....
> তে কিরীটিনমায়ান্তং দৃষ্ট্বা হর্ষেণ মারিষ।[১]

আর একটি দৃষ্টান্ত,

> ততস্তাবুদ্যতগদৌ গুরুপুত্রেণ বাবিতৌ।
> যুগান্তানিলসংক্ষুব্ধৌ মহাবেলাবিবার্ণবৌ॥[২]

যুদ্ধ-বিরতির ব্যাপক ছবি,

> তৎ সংপূজ্য বচোহক্রুবং সর্বসৈন্যানি ভারত।
>
> তত্তয়া নিদ্রয়া মগ্নমবোধমস্বপম্বলম্।
> কুশলৈঃ শিল্পিভির্ন্যস্তং পটে চিত্রমিবাদ্ভুতম্॥
>
> হরবৃষোত্তমগাত্রসমদ্যুতিঃ স্মরশরাসনপূর্ণসমপ্রভঃ।
> নববধূস্মিতচারুমনোহরঃ প্রবিসৃতঃ কুমুদাকরবান্ধবঃ॥[৩]

একটি দেহ-সৌন্দর্য প্রতিবেশ.

> সমাসীনাস্তে সমেতা মহাবলা ভাগীরথ্যাং দদৃশুঃ পুণ্ডরীকম্॥
> দৃষ্ট্বা চ তদ্বিস্মিতাস্তে বভূবুস্তেষামিন্দ্রস্তত্র শূরো জগাম।
> সোহপশ্যদ্‌যোষামথ পাবকপ্রভাম্ যত্র দেবী গঙ্গা সততং প্রভূতা॥
> সা তত্র যোষা রুদতী জলার্থিনী গঙ্গাং দেবীং ব্যবগাহ্য ব্যতিষ্ঠৎ।
> তস্যাশ্রুবিন্দুঃ পতিতো জলে যস্তৎ পদ্মমাসীদথ তত্র কাঞ্চনম্॥[৪]

---

১ দ্রোণ পর্ব।
২ আদি পর্ব।
৩ দ্রোণ পর্ব।
৪ আদি পর্ব।

বাঙলা মহাভারতের আর কয়েকটি উপমান আলোচনা করি। এটি মৃত-উপমানেরই আলোচনা-প্রসঙ্গ। রামায়ণে দেখেছি, 'মনোরথ' কথাটির রূপব্যঞ্জনা প্রায়ই নেই। বাঙলা মহাভারতে পাই,

মনোরথে নন্দিনীর যত দুগ্ধ খায়।
দুধারের দুগ্ধেতে ধরণী ভিজে যায়॥১

এখানে 'মনোরথ' কথার দ্যোতনা নেই, রামায়ণের 'মনোরথের' মতই। কিন্তু কবি কাশীরাম রামায়ণকারের মত এ বিষয়ে একেবারে নিরঙ্কুশ ছিলেন না। তাঁর রচনায় এ উপমানের ঈষৎ সার্থক প্রয়োগও আছে,

ধনঞ্জয় গোবিন্দে বান্ধিয়া মনোরথে।
গোবিন্দ সারথি সহ উঠিলেন রথে॥২

প্রথম পঙক্তির 'মনোরথ' শব্দটিতে দ্বিতীয় পঙক্তির রথবেগ প্রতিফলিত হয়েছে। যুদ্ধোদ্যমের সঙ্গে সঙ্গে মনও যে উদ্যত, কৃষ্ণশরণ অর্জুনের চিন্তাধারার সঙ্গে যে একযোগেই গৃহীত, বিশ্লেষণ করলে সে আভাস মেলে।

কাশীরামের প্রয়োগবিধি লক্ষ্য করে একথা বলতে পারি, উপমানের তাৎপর্য, শক্তি ও সীমা সম্বন্ধে কবির ধারণা অনেক পরিচ্ছন্ন। কৃত্তিবাসের সঙ্গে তুলনা করলে এও বলা চলে, কাশীরামের আলঙ্কারিক দক্ষতা অধিকতর। বাঙলা রামায়ণ ও মহাভারতের ক্রমিক দৃষ্টান্তগুলি এ মতের প্রমাণ।

এবার মূল মহাভারতের অলঙ্কার-শ্লোক ও বাঙলা মহাভারতের অলঙ্কার-ছত্র পাশাপাশি উপস্থাপিত করব। এগুলিকে অনুসরণের বদলে অনুবাদ বলাই ভাল। এখানকার উপমানগুলি বস্তুরূপের দ্বারা উপমেয়কে প্রসারিত না করে জীবনের কতকগুলি নীতিকে আলো দেখিয়েছে।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
নন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥৩

---

১ বন পর্ব।
২ কর্ণ পর্ব।
৩ ভীষ্ম পর্ব।

এখন ত্যজহ শোক আমার বচন রাখ
দুঃখ ভাব কিসের কারণে ॥
জীর্ণ বস্ত্র পরিহরে যেন নব বস্ত্র পরে
তেমনি শরীর পরিবর্ত ।[১]

অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে
সূর্যাগ্নিনা রাত্রিদিনেন্ধনেন ।
মাসর্তুদর্বী পরিঘট্টনেন
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা ॥[২]

ঘোটন কারণ হৈল মাস ঋতু হাতা ।
রাত্রিদিবা কাষ্ঠ তাহে পাবক সবিতা ॥
মোহময় সংসার-কটাহে কাল কর্তা ।
ভূতগণ করে পাক এই শুন বার্তা ॥[৩]

মূল মহাভারতে কৃষ্ণের বিশ্বরূপদর্শনে অর্জুনের স্তবে যে উপমান-পদ্ধতি, তার প্রয়োগ-প্রসঙ্গ বদল করে কাশীরাম অন্যত্র সেই একই উপমান ব্যবহার করেছেন,

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ ।[৪]

উত্তর বলিল কি বলহ বৃহন্নলা ।
মহাসিন্ধু পার হতে বান্ধ তৃণ-ভেলা ॥
অগ্নির কি করিবেক পতঙ্গ-শকতি ।[৫]

ক্ষত্রিয়-জীবন কাশীরামের উপমাভূমি। এখানকার রূপে সৌন্দর্যের মৃদু কোমলতা হয়ত নেই, কিন্তু বীরের দর্প ও দীপ্তি চমৎকার ফুটেছে।

---

১ নারী পর্ব।
২ বন পর্ব।
৩ বন পর্ব।
৪ ভীষ্ম পর্ব।
৫ বিরাট পর্ব।

কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য

কৃষ্ণের অবতার-কথা এ কাব্যের বক্তব্য। জন্মকাল থেকে প্রয়াণকাল পর্যন্ত তিনি একাদিক্রমে (দুষ্টদমন ও শিষ্টপালনের জন্যে) রাক্ষস, দৈত্য, অসুর বধ করেছেন, পৃথিবীর প্রাণীদের অভয় দিয়েছেন। এ কাব্য-রচনার সমকালীন সমাজজীবনে মানুষেব আত্মবল, চরিত্রের নৈতিক মান, ভগবৎ-তৃষ্ণা ইত্যাদিতে নতুন একটি বেগ সঞ্চার করার জন্যে শ্রীমদ্‌ভাগবতের আদর্শে একাধিক কৃষ্ণমঙ্গল রচিত হয়েছিল। বিশেষত কৃষ্ণেব একটানা শৌর্য প্রকাশের কাহিনীকাব্য বাঙলা সাহিত্যে কৃষ্ণমঙ্গল ছাড়া আর দেখা যায় না। মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের উদ্দেশ্য ছাড়াও প্রবল শত্রুর আক্রমণে ত্রস্ত সমাজ-মানুষের প্রাণে সাহস সঞ্চারিত কবার লক্ষ্যও এ সব কাব্যের অন্য প্রেরণা হতে পারে।

কৃষ্ণমানসেব কোন্ বিশেষ পটভূমি আশ্রয় করে বৈষ্ণব কবিতায় রূপ ও সৌন্দর্য মধুবরসে অবাবিত হয়েছিল, আমরা বৈষ্ণব কবিতার উপমা আলোচনায় তা লক্ষ্য করেছি। শ্রীমদ্‌ভাগবতেব দশম স্কন্ধ নির্ভর করে আলোচ্য কাব্য রচিত হলেও শ্রীমদ্‌ভাগবতেও যেমন, তেমনি বাঙলা কাব্যে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যশক্তিই বড় কথা। যদিও কৃষ্ণ,

> এইরূপে গোপাঙ্গনা লয়্যা বনমালী।
> মোহিয়া আপন সঙ্গে কবে নানা কেলি॥
> যেন শিশু খেলা কবে লৈযা আপন ছাযা।[১]

যদিও,

> যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেণ তাসাং মধ্যে দ্বযোর্দ্বযোঃ।
> প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্ব-নিকটং স্ত্রিয়ঃ॥[২]
>
> যত গোপি তত কৃষ্ণ হএন গদাধব।
> এক গোপি এক কৃষ্ণ দেখিতে সুন্দব॥[৩]

বিষ্ণুমায়ার বিস্তারে কৃষ্ণের এ লীলাকলা তাঁর ঐশী শক্তিকেই উজ্জ্বল করে। কবি মাধবাচার্য উপমায় বলেছেন, শিশু যেমন আপন ছায়া নিয়ে অবোধ লীলা

---

১ রাসোৎসব, মাধবাচার্য।
২ রাসোৎসব, শ্রীমদ্‌ভাগবত
৩ রাসলীলা, মালাধর বসু

করে, পরমেশ্বর তেমনি আপন সত্তার অবিভাজ্য প্রতিভাসের সঙ্গে লীলা-পরায়ণ। আসলে এ সবই যেন সেই সর্বশক্তিমানের মায়িক বিভূতি মাত্র। এর পরেও কবি কৃষ্ণের বিশেষ স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বলেছেন,

শুন শুন ওরে ভাই করিয়ে বচন।
পরদার করিলা বৃষ্ণ না করিহ মন॥
প্রভু যাহা করে তাঁহা কে বুঝিতে পারি।
হেন কুবিচার পাছে জান সত্য করি॥
পরম নির্লেপ প্রভু সেই মহাশয়।
নিজে গুণরহিত পরম শুদ্ধময়॥১

লীলার সবটুকুই যদি ভগবৎ-মায়া হয়, তবে বস্তুনির্ভর সৌন্দর্যের রূপ উপমায় জাগবে কেমন করে। পৃথিবীর চাক্ষুষ পরিচয়কে মায়াস্বপ্ন বিবেচনা করে কবি যেখানে প্রতিক্ষণেই তত্ত্বকথার মধ্যে মগ্ন হচ্ছেন, সেখানে উপমাশ্রয়ী শোভার বিষয় গৌণ। ভাগবতের দশম স্কন্ধের গোপীলীলা পর্যায়ে অলঙ্কারের রমণীয় মূর্তির দর্শন মেলে না। অনুবাদের মাধ্যমে অথবা আদর্শের ছায়ায় যেটুকু বাস্তব রেখা-রঙের আঁচড় তাতেও নিজস্বতার কোন চিহ্ন এ কাব্যে নেই। অথচ যেখানে অসুর ও রাক্ষস বধের ঘটনা, কিম্বা যুদ্ধের পরিস্থিতি মূলের অনুগত, সে ছবির সংখ্যা ও উৎকর্ষ এ সব কাব্যে প্রচুর। কৃষ্ণমঙ্গলের কবিরা উত্তমরূপে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেছিলেন। অধ্যয়নকালে তাঁদের স্মৃতিতে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য রূপের কথাটিই একমাত্র হয়ে জেগেছিল। এবং সেই একমাত্র ভাবানুধ্যানের বাসনা নিয়ে তাঁরা কাব্যরচনা করতে বসেছিলেন। তবু বৃন্দাবন লীলার মধুররসাত্মক পরিচয় শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের উপমায় যতটুকু আছে, মূলের অনুসারী রচয়িতাদের রচনায় মধুর কথা ততটা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়নি। আরও লক্ষণীয়, কৃষ্ণের প্রাকৃত লীলার ছবিগুলি কবিরা যেখানে যেখানে অঙ্কিত করেছেন, তার ঠিক পূর্বে অথবা পরে রূপনিষেধের সতর্ক বাণী ঘোষিত থাকায় বর্ণনাগুলি বিশ্বাস্য হয়ে ওঠেনি। শ্রীমদ্ভাগবতের রূপ-বর্ণনায় কোথাও কোথাও শিল্পীর শক্তিপরিচয় আছে, অথচ সেখানে রূপের নিষেধ মাত্রও নেই। কিন্তু বাঙলা কাব্যগুলিতে সে লক্ষণ অনুপস্থিত। আসলে বাঙালী কবিরা ভাগবতের মূলসুরের যত বেশি অনুগত ছিলেন তত বেশি ভাগবতের ভাষাবদ্ধ বর্ণনাধারার অনুগত ছিলেন না। তাই এসব কাব্যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্যকে গ্রহণ করে কাহিনী গড়ার যত মনোযোগ, কাহিনী উন্মো-

১ মাধবাচার্য

চনের রূপধারা অনুসরণ করে ছবির কথাকে বড় করার তত মনোযোগ নেই। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণের শৃঙ্গাররসের লীলা-পরিচয় আছে। আর সেই স্কন্ধটিকে সম্পূর্ণ নির্ভর করে রচিত বাংলা কাব্যগুলি[১] কৃষ্ণের মাধুর্যশক্তির চেয়ে ঐশ্বর্যশক্তিকেই বড় করে এঁকেছে। অবশ্য এর দ্বারা বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের আয়োজন হয়ত সিদ্ধ হয়, কিন্তু সে তাত্ত্বিক আলোচনা আমাদের প্রসঙ্গ বহির্ভূত। প্রথমে আমরা ঐশ্বর্যগুণযুক্ত অলঙ্কার-পদ আলোচনা করব। এর মধ্যে প্রধান ছবি কৃষ্ণস্বরূপ-বর্ণনা দৈত্যবধ ইত্যাদি,

এক্ই আবাস ভেদ জেন নানা স্থানে ভিন্ন।
তেমতি আমার স্থুল সংসারের চিহ্ন॥
এক সূর্য্য জল ভিন্নে অসংক্ষত ছায়া।
প্রকিতি আশ্রিয়া তেন মত মোর মায়া॥[২]

ভাগবতে নেই। গীতার দশম-একাদশ অধ্যায়ের ছায়ায় রচিত।[৩] অলঙ্কারটি শান্তরসাশ্রিত, প্রকাশভঙ্গি দার্শনিক। আকাশবিম্ব ও সূর্যবিম্বের নির্গুণ বিশ্ব-ব্যাপ্তির সঙ্গে কৃষ্ণের উপমা। আধারের বিচিত্র আকারে প্রতিফলিত আকাশ বা সূর্য যেমন পরিপূর্ণ ও প্রকৃত আকাশ অথবা সূর্য নয়, পক্ষান্তরে তা যেমন অনন্তের আপাত ছায়া, প্রাকৃত কৃষ্ণও তদ্রূপ। অলঙ্কারে সৌন্দর্যের মনোহারিতা নেই, শুধু যুক্তির নিপুণ তর্কে বক্তব্য যথাযথ। উপমানে ব্যাপ্তি ও বিশালতার সার্থক আভাস ফুটেছে।

শিরে যার উপজিল আকাশ মণ্ডলে॥
স্তনে ধর্ম পৃষ্ঠে যার জন্মিল অধর্ম।
যার হাস্য হৈতে হৈল অপসরার জন্ম॥
ভুরুযুগে যম লোভ জন্মিল অধরে।
কাল উপজিল যার কটাক্ষ ভিতরে॥
প্রাণ হৈতে প্রাণবল শকতি জনম।
হেন অদভুত কর্ম করে নারায়ণ॥[৪]

স্রষ্টার রূপ। এখানে প্রতিষ্ঠিত কোন অলঙ্কার নেই, অলঙ্কারের আভাস আছে মাত্র। স্রষ্টার শীর্ষদেশে আকাশ মণ্ডল। স্রষ্টার অনির্বচনীয় মহিমার

---

১ রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ছাড়া।
২ উদ্ধবের নিকট বিশ্বরূপ প্রদর্শন, মালাধর বসু।
৩ ভূমিকা, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।
৪ রঘুনাথ ভাগবতাচার্য।

বস্তুপ্রতিরূপ কল্পনায় অপারগ কবি তাই আকাশের মত উচ্চ, বিস্তৃত এবং শোভমান দৃশ্যকে স্রষ্টার শিরোভাগের সঙ্গে লগ্ন করলেন। স্রষ্টার পুলক-হাস্যেই যেন ত্রিভুবনের উপভোগ ও আমাদের জীব-প্রতিরূপ জন্মলাভ করেছে। (কুটিল ভ্রূকুটিতে অসন্তুষ্ট স্রষ্টার ধ্বংসকারী শক্তি যেন যমের রূপ লাভ করেছে একথাও অন্যদিক থেকে বলা যায়।) আমাদের বক্তব্য, বর্ণিত ছত্রে আকাশ, অপ্সরা, যম ইত্যাদি যেন স্রষ্টার নির্মল শুচিতার, ত্রিভুবনের উপভোগময়তার এবং অমোঘ নিয়তিশক্তির রূপক। অথচ অলঙ্কারের পরিপূর্ণ প্রকাশ এখানে নেই। দৃষ্টান্তের রূপসঙ্কেত অস্ফুট অলঙ্কারের মত। ভগবানের স্বরূপপরিচয় দিতে গিয়ে তত্ত্বাবিষ্ট কবিমন এমন করেই রূপোদ্ভেদশক্তি হারায়। পূতনা রাক্ষসী বধের ছবি,

লাঙ্গলেব ইস্ জেন দন্ত সারি সারি।
গিরিসম স্কন্ধ নাসিকা দেখিতে ভয়ঙ্করি ।।
গণ্ডশৈল দুই স্তন কপিল কেসভাব।
অন্ধকূপ দুই আখি গভির তাহাব ।।
বড় বড় দিঘির পাড় তাব হাত পা ধবি।
উদর গোটা জেন তাব সুখান পখুবি ।।১

একই বিষয়ের বর্ণনা,

কূপ হেন চক্ষু দুটি দেখি লাগে ডব।
মাথায় মুকুট পড়ে যোজন অন্তব ।।
দুই গোটা হস্ত যেন সমুদ্র আড়িযা।
হোগলেব ডোল কর্ণ বহিল পড়িযা ।।
পুষ্কর্ণীর জাঠি যেন দন্ত সাবি সাবি।
....
পর্বতেব শৃঙ্গ যেন স্তন দুই গোটা।
তথি পরে খেলে কৃষ্ণ কোটিচন্দ্রছটা ।।২

পূতনার মৃত্যুরূপের দুটি পৃথক চিত্র উপস্থিত করলুম। এবার শ্রীমদ্‌ভাগবতের মূল বর্ণনা লক্ষ্য করা যাক।

ঈষামাত্রোগ্রদংষ্ট্রাস্যং গিরিকন্দরনাসিকম্।
গণ্ডশৈলস্তনং রৌদ্রং প্রকীর্ণারুণমূর্দ্ধজম্ ।।
অন্ধকূপগভীরাক্ষং পুলিনারোহভীষণম্।
বদ্ধসেতুভুজোর্বঙ্ঘ্রি শূন্যতোয়হ্রদোদরম্ ।।

---

১ পূতনার মৃত্যু-রূপ, মালাধর বসু।
২ ,, দঃখী শ্যামদাস।

অনুবাদ অংশদুটির অলঙ্কার কোথাও উৎপ্রেক্ষা, কোথাও রূপক। উভয়-ক্ষেত্রে রূপ বিকট ও ভয়াবহ। ভাগবতের বিশদ বর্ণনাভঙ্গিতে এই ভয়াবহতা বেশি। মালাধরের রচনা অধিক মূলানুগ। শ্যামদাসের রচনায় মূলকে আদর্শে রেখে নিজস্ব কল্পনার স্ফূর্তি। তবে দুটি পদেই মূলের হুবহু অনুবাদ নেই, মালাধরের রচনায় সে চেষ্টা বেশি হলেও মূলাংশ আসলে কবিদের আপন আপন কল্পনাকেই উদ্দীপ্ত করে দিয়েছে। এ রূপবর্ণনায় কোন রমণীয়তা নেই, কেবল মানব-কল্পনায় রাক্ষসী-রূপ যথাযথ মূর্তি পেয়েছে। আর একটি ছবি,

একখান উষ্ট তার পৃথুবির তলে।
আর উষ্টখান তার গগন মণ্ডলে।।
বাঙ্গা মুখখান তার অরুন কীরন।
জিহি গোটা পাটল তার সকল ভুবন।।
মেঘখান উবিল জেন ডুবিয়া আকাস।
দারুন ঝড় বহে তার নাকের নিস্যাস।।১

শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই ছবিটিই,

ধরাধরোষ্ঠো জলদোত্তরোষ্ঠো দর্য্যাননান্তো গিরিশৃঙ্গদংষ্ট্রঃ।
ধরান্তান্তরাস্যো বিততাধরজিহ্বঃ পরুষানিলশ্বাসদবেক্ষনৌষ্ণঃ।।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকের আদর্শে মালাধর বসুর অনুবাদ যথাযথ। কবি বলেছেন 'ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে।' কিন্তু তাঁর অনুবাদভঙ্গি সে সত্য প্রমাণ করে না। ভাগবত শ্রবণের আগ্রহ থাকলেও মালাধর নিজেও এ কাব্য পাঠ করেছিলেন। রাক্ষস ও অসুরের দেহবর্ণনার অংশগুলি আমরা ঐশ্বর্যগুণযুক্ত অলঙ্কার-কথার শীর্ষকে সাজিয়েছি। এই সব বিকটদেহ দুষ্টের বিনাশের দ্বারাই কৃষ্ণের শক্তিগৌরব এবং ঐশ্বর্যগুণ আমাদের আলোচ্য কাব্যে কীর্তিত। এবার যুদ্ধের বর্ণনা,

অতি ঘোরতর নদি সংগ্রাম ভিতরে।
স্রীগাল কুকুর পীএ সন্যের রুধিরে।।
নদি মাঝে হস্তি দ্বিপ দেখি এ সকলে।
মানুস মস্তক কুম্ভির হয জলে।।
বিচিত্র পতকা হৈল হংসের পাঁতি।
নখেতে কর্কবা নদি করএ দিপতি।।
রথধ্বজ পথ হৈল নদি খরতরে।
অস্ব রথ মদ্ধে নদি দেখিত ভযঙ্করে।।২

---

১ অঘাসুর বধ, মালাধর বসু।
২ জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ, মালাধর বসু।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে এ ছবি আছে,

> সংছিদ্যমানদ্বিপদেভবাজিনামঙ্গপ্রসূতাঃ শতশোহসৃগাপগাঃ।
> ভুজাহয়ঃ পুরুষশীর্ষকচ্ছপা হতদ্বিপদ্বীপহয়গ্রহাকুলাঃ॥
> করোরুমীনা নবকেশশৈবলা ধনুস্তরঙ্গায়ুধগুল্মসঙ্কুলাঃ।
> অচ্ছুরিকাবর্তভয়ানকা মহামণিপ্রবেকাভরণাশ্মশর্করাঃ।

মালাধর বসুর বর্ণনায় অনুবাদের আক্ষরিকতা আছে, কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতকার রূপ-কে যত বিশদ করেছেন, বাঙলা কাব্যে তার লক্ষণ নেই। যেহেতু রূপের কথাটি কবির স্বরচিত নয়, সেইহেতু রূপপ্রকাশের প্রতি পর্বকে নিখুঁত করে উদ্ভিন্ন করার প্রযত্ন কবির নেই। উচ্চাঙ্গের কাব্যভূমি থেকে রূপচ্ছবি সংগৃহীত হলে অনুবর্তক কবির মনে অনুগৃহীতের একটি বশ্যতাবোধ দেখা দেয়, যার ফলে এ সব ক্ষেত্রে আত্মশক্তির আস্থা কবিদের মনে অনেক কমে যায়। বাল্মীকি-রামায়ণের অনুসারক কবি কৃত্তিবাসের লেখায়, ব্যাসের মহাভারত অনুসরণকালে কাশীরাম দাসের রচনায় এবং এক্ষেত্রে মালাধর বসুর রূপাঙ্কনে সেই একই লক্ষণ। প্রতিক্ষেত্রেই মূলের রূপগৌরব এবং অলঙ্কারকুশলতা যত সুচারু, অনুসরণে তার অর্ধভাগও উপস্থিত নেই। এগুলি শুধু চর্বিত উচ্ছিষ্টের মত আহার্যের পূর্ব পরিচয় প্রকাশ করে। আর একটি যুদ্ধের ছবি,

> একলাফে উঠে কৃষ্ণ মঞ্চের উপরে।
> সেই মঞ্চে বসি আছে কংস নৃপবরে॥
> কৃষ্ণ দেখি কংসরাজা সত্বরে উঠিল।
> সাক্ষাতে জম জেন ধরিতে আইল॥
> খাণ্ডা বাহু রণে জায় জুঝে নৃপবরে।
> মত্ত সিংহ হেন তারে ঝাঁপে গদাধরে॥১

শ্রীমদ্‌ভাগবতে পাই,

> তং খড্গপাণিং বিচরন্তমাশু শ্যেনং যথা দক্ষিণ-সব্যমম্বরে।
> সমগ্রহীদ্দুর্বিষহোগ্রতেজা যথোরগং তার্ক্ষ্যসুতঃ প্রসহ্য॥
> প্রগৃহ্য কেশেষু চলৎকিরীটং নিপাত্য রঙ্গোপরি তুঙ্গমঞ্চাৎ।
> তস্যোপরিষ্টাৎ স্বয়মব্জনাভঃ পপাত বিশ্বাশ্রয়ঃ আত্মতন্ত্রঃ॥
> ....
> তং সম্পরেতং বিচকর্ষ ভূমৌ হরির্যথেভং জগতো বিপশ্যতঃ।

---

১ কংস বধ, মালাধর বসু।

বলরাম কর্তৃক কল্লোল দৈত্যবধের ছবি,

> মুষলের ঘায় অরি ব্রাহ্মণের হোম করি
> ললাটে পড়িল রক্তধারা।
> উচ্চনাদে পড়ে ক্ষিতি রুধিরে অরুণজ্যুতি
> যেন গিরি ধাতু রাগে সারা ॥১

কংস বধের দৃশ্যে শ্রীমদ্‌ভাগতের কবি ছবির পর ছবি দিয়ে রুদ্ররসকে যত প্রবল করতে পেরেছেন, মালাধরের কাব্যে তার অর্ধাংশ-পরিচয়ও নেই। দূরশ্রুত যুদ্ধধ্বনির একটা ক্ষীণ উত্তেজনা হয়ত এ বর্ণনায় আছে, কিন্তু তা অনুকরণের টানে যতটা এসেছে, স্বকীয়তার বেগে ততটা জাগেনি। মত্ত সিংহ ও সাক্ষাৎ যমের উপমানদুটি এ অংশে রূপরচনার সম্বল। মাধবাচার্যের ছবি সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যঞ্জনাধর্মী। হোমান্তে ব্রাহ্মণ যেমন কপালে রক্ত-ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করেন, আহত মস্তকে শোণিত তেমনই শোভমান। দ্বিতীয় উপমানটি আরও ব্যাপক। কল্লোল দৈত্যের বিশাল রক্তাক্ত দেহ যেন গলিতলাভা আগ্নেয়গিরি। অলঙ্কার উভয়ক্ষেত্রেই উৎপ্রেক্ষা। এতে আদর্শের অনুসরণ থাকলেও কবির নিজস্ব প্রকাশক্ষমতায় সহজেই একটি পরিচ্ছন্ন ছবি ফুটেছে।

অনুবাদ অথবা অনুসরণের পথে মূলের যে বাংলা ভাষ্য, তাতে রূপগোচরের শক্তি বড় কম। কবিরা অলঙ্কার-কথাকে নিপুণ করতে না পারলেও ভাষার ব্যবহারগত অভিধাধ্বনিকে যদি আরও কিছু জোরালো করতে পারতেন, তবে জীবনের এইসব শ্লাঘ্যতম মুহূর্তের রূপাঙ্কনে অলঙ্কারের ক্ষীণশক্তি কিঞ্চিৎ উদ্দীপনা পেত। না অলঙ্কারে না অভিধাবাক্যে, কোনদিক থেকেই এ কাব্যের বর্ণনাগুলি সহায়তা পায়নি। তাই মূলের পরিক্ষীণ প্রতিধ্বনির মত এতে শুধু রূপের প্রমাণ আছে, প্রাণশক্তি নেই।

এবার শৃঙ্গাররসাত্মক রূপবর্ণনার অংশ আলোচনা করব। এ রূপবর্ণনা-গুলি মূলত কৃষ্ণের বৃন্দাবনে রাসলীলানির্ভর। তাছাড়া মথুরা গমনের পর বিবাহাদির ব্যাপারে এবং পরিশিষ্টের দানলীলা, নৌকালীলা ইত্যাদিতে এ বিশিষ্ট শীর্ষকের রূপ-কথা পাই।

> পিতবস্ত্র পরিধান দেব বনমালি।
> নুতন মেঘেতে জেন পড়িছে বিজুরি ॥
> নিলমনি জিনি তাঁর মুখানি অনুপাম।
> তার মাঝে সোভা করে বিন্দু বিন্দু ঘাম ॥

---

১ মাধবাচার্য।

চিত্রগতি চলে জেন নাটুয়া খঞ্জন।
দেখিয়া জুবতিগন স্থির নহে মন ॥১

অচল তড়িত তুল্য উবে হাব হাসে।
আবত জনাব দুঃখ কটাক্ষে বিনাশে ॥২

নিরখি হবিব আঁখি ভবিযা তাহারে দেখি
পীযে রূপ না যায পিয়াস ॥
কেহ ঘনাইযা কাছে যত বিবরণ পুছে
প্রেমে হৃদয় উতরোল।
নব নব অনুরাগে বেড়িল গোপিণীভাগে
ভৃঙ্গে যেন বেড়িল কমল ॥ ৩

দেখিযা কৃষ্ণেব বেশ জগ-অনুপম।
পদেক চলিতে শক্তি না ধবে জঙ্গম ॥
পল্লব পুলকে অতি আকুল স্থাবব।
প্রেমেতে শিশিবধাবা বহে নিবন্তব ॥৪

মধুররসাশ্রিত রূপবর্ণনা। কৃষ্ণের প্রতি মমতাসিক্ত মন নিয়ে কবি তাকিয়েছেন। অলঙ্কারে প্রথার স্মৃতি থাকা সত্ত্বেও রূপাঙ্কনে কবিমনের আবেগ কবিতাগুচ্ছের সর্বত্রই কমবেশি দেখা যায। মালাধর রচিত প্রথম দৃষ্টান্তের বর্ণনায় তিনটি অলঙ্কার আছে। দ্বিতীয় ছত্রে উৎপ্রেক্ষা, তৃতীয় ছত্রে ব্যতিরেক, পঞ্চম ছত্রে উৎপ্রেক্ষা। কিন্তু অলঙ্কারছটার চেয়েও অভিধাকথার কোমল শব্দের (যেমন, মুখানি, নাটুয়া ইত্যাদি) আবেগধ্বনি রূপ-কে মরমীয় করেছে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের প্রথম পংক্তিতে 'হাসে' শব্দটি ব্যবহারের দ্বারা বক্ষোদেশে ভূষণেব লীলাকান্তি চকিতে আভাসিত। যদি 'হাসে' শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তে 'শোভে' শব্দ ব্যবহৃত হত, তাহলে তা উপমেয়কে (হার) নির্দেশ করেই রূপবারিত হত। এক্ষেত্রে 'অচল তড়িত' এই উপমানটি 'হাসে' শব্দের গুণপ্রকাশক ধ্বনিতে রূপগোচরে অনেক বিশদ। দেখা যায়, বেশির-ভাগ ক্ষেত্রেই গুণপ্রকাশক 'সাধারণ বাক্য' উপমেয়কে বিশেষিত করে আপন দায়িত্ব শেষ করে। ফলে রূপব্যঞ্জনা পরিপূর্ণরূপে সঞ্চারিত হয় না। যদি

১ মালাধর বসু।
২ কৃষ্ণের গোষ্ঠরূপ, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য।
৩ মাধবাচার্য।
৪ „

উপমেয়ের বদলে উপমানের রূপ, গুণ অথবা ক্রিয়া প্রকাশ করবার জন্যে 'সাধারণ বাক্য' বা অভিধাবাক্য নিয়োজিত থাকে, তবে উপমানের ক্ষমতায় বিশদ হওয়ার শক্তি জাগে, সুন্দরের মনোহারিতা বহুগুণে বাড়ে। তৃতীয় দৃষ্টান্তের শেষে ভৃঙ্গকমলের উৎপ্রেক্ষা। অলঙ্কারটির রূপব্যঞ্জনা পূর্বছত্রগুলিতে বিশদভাবে বর্ণিত হওয়ায় উপমেয়-উপমান এই রূপবর্ণনাকে সঞ্চারিত করে দিয়েছে। চতুর্থ দৃষ্টান্তে কবিমনের আবেগে শিল্পীর রূপদর্শন কিছুটা আচ্ছন্ন। কৃষ্ণ-রূপ দর্শনের পুলক মানবহৃদয় থেকে নিসর্গে সঞ্চারিত, কবি রূপের এই তাৎপর্যই শ্রোতৃমনে গোচর করতে উৎসুক। কিন্তু সে উৎসুক্য পূর্ণ সার্থকতা পায়নি, যেহেতু কবির রূপাকুলতা স্বচ্ছ রূপদৃষ্টিকে কিছুটা আড়াল করেছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ক্বচিদ্দৃষ্ট কৃষ্ণ-রূপ ঘিরেই রাসলীলার সুরু। কৃষ্ণ বাঁশীতে লীলার আহ্বান জানিয়েছেন,

> নব কিসলয় বৃক্ষ সোভে বৃন্দাবনে।
> অধিক পীড়যে কাম চন্দ্রের কীরনে ॥
> কাম অবতার করি বংসি নাদ কৈল।
> সুনিঞা গুয়ালা নারি মুর্চ্ছিত হইল ॥১

শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে,

> দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।
> বনঞ্চ তৎকোমলগোভিরঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্ ॥

সংস্কৃতের বর্ণনায় রূপের শোভা কত পরিপূর্ণ। বাংলা রচনাটি রমণীয় বাক্যে রূপ রচনার চেষ্টা পেয়েছে। চার পঙ্‌ক্তির এ বর্ণনাংশের প্রতি ছত্রেই এক একটি স্বতন্ত্র ঘটনার কথা বলা হল। প্রথম ছত্রে বৃন্দাবনে বৃক্ষ, নব কিশলয় শোভমান। দ্বিতীয় ছত্রে চন্দ্র কিরণে কামনা উগ্র হল। তৃতীয় ছত্রে বাঁশীতে কৃষ্ণ কামগান করলেন। চতুর্থ ছত্রে গোপবালা তা শুনে মূর্চ্ছিত হল। প্রতি ছত্রেই বস্তুজগৎ অথবা বস্তুজীবনের এক একটি বিষয়-ভাবনা। কোন একটি বিশেষ ছত্রের ভাবনা পরবর্তী ছত্রে নীত হয়ে রূপের কথাকে বিশদ অথবা বিশেষিত করেনি। ভাগবতে কিন্তু উদিত চাঁদকে রূপে বিশদ বা বিশেষিত করার জন্যে কবি আরও একটু বাক্যব্যয় করতে কুণ্ঠিত হননি। তার ফলে চাঁদের শোভা পরিপূর্ণ রূপপ্রকাশের শক্তি পেয়েছে। অনুবাদ-সূত্রে গৃহীত রূপের কথায়, আগেই বলেছি, কোনক্রমে দায়মোচনের চেষ্টাই বড়। ধর্মপ্রাণতা অথবা দার্শনি-

১ মালাধর বসু।

কতা যাই থাক না কেন, পয়ারে কেবল পদ্যগাঁথার শক্তি ছাড়া উন্নত কোন কবি-প্রাণতা এসব কবির ছিল না। পরের ঘটনাচিত্রে অবৈধ আসক্তির ফলে কৃষ্ণের কপট তিরস্কার ও গোপীদের মনোবেদনা,

এতেক বিপ্রীয় জবে গোবিন্দ বলিল।
হেটমাথা কবি গোপি কান্দিতে লাগিল॥
স্তন বাহিয়া আখিব জল পড়ে ভূমি তলে।
বসন মলিন হৈল নয়ানেব জলে॥
কি কবিব কি বলিব অনুমান কবি।
পদাঙ্গুলি ভূমে লেখি বলে ধিরি ধিবি॥[১]

শ্রীমদ্‌ভাগবতের রূপাদশ,

কৃত্বা মুখান্যব শুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্-
বিম্বাধবানি চবণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ।
অস্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি
তস্থুর্মৃজন্ত্য উরুদুঃখভবাঃ স্ম তূষ্ণীম্॥

মালাধরের বর্ণনা মূলের যথাযথ অনুসরণ। গোপীর ব্যথিত হৃদয়ের সঙ্কেত অলঙ্কারের মাধ্যমে বস্তুরূপ আশ্রয় করেনি। প্রত্যাখ্যাতার ভাব-সংস্কার অভিধাকথায় লিপিবদ্ধ থাকার ফলে পরিচিত আচরণের ছবিতে (তার দেহ-রূপের বিষণ্ণ বাস্তব মূর্তি নয়) হৃদয়ভাবের করুণ অসহায়তা স্পষ্ট। আসলে, প্রত্যাখ্যানের আঘাত নায়িকাকে কোন্ বিশেষ আচরণে (অবনতবদন, ভূমি খনন ইত্যাদি) নিযুক্ত করে, প্রথাগতভাবে ব্যবহৃত হতে হতে তা নায়িকার বিষণ্ণ শারীরমূর্তিকে প্রকাশ করার বদলে আমাদেব চেতনায় তার অসহায় পরি-স্থিতির ব্যঞ্জনা দিয়েই শেষ হয়। নায়িকা-ভাগ্যের এই বিশেষ অবস্থাটি গোচর করতে ব্যথিতা নারীর উক্ত আচরণ-সংস্কাব (অবনতবদন, ভূমিখনন ইত্যাদি) কাব্যে বহু প্রয়োগের দ্বারা এতই রূপজীর্ণ যে, তার দ্বারা কোন সজীব বস্তু-সৌন্দর্য জাগে না। অথচ সার্থক শিল্পদৃষ্টি থাকলে মালাধরের পক্ষে এই বর্ণনারই অন্তরশায়ী সুপ্ত সম্ভাবনাকে নব মূর্তিতে জাগিয়ে তোলা কঠিন হত না। 'বৈষ্ণব-তোষণী' টীকাগ্রন্থের টীকাকার শ্রীমদ্‌ভাগবতের উক্ত বর্ণনায় সুপ্ত রূপ-সম্ভাবনাকে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন। গোপীগণের ব্যাখ্যা এইরূপ, 'গোপীরা ভাবলেন, চন্দ্রের উদয়ে যেরূপ কমল সঙ্কুচিত হয়, সেরূপ আমাদের মুখচন্দ্র

---

১ মালাধর বসু।

দেখালে শ্রীকৃষ্ণের নয়নকমল মুদ্রিত হয়ে যাবে, তিনি আর আমাদের দেখতে পাবেন না। আর আমাদের দেখতে না পেলে তিনি আমাদের কথা ভুলে যাবেন। অতএব আমাদের মুখচন্দ্র প্রদর্শন করা বিহিত নয়।' প্রথাবদ্ধ হলেও চন্দ্র ও পদ্মের রূপ-সংস্কার দিয়ে টীকাকার যে সূক্ষ্ম অলঙ্কারের আভাস দিয়েছেন, তা তাঁর শিল্পীমনেরই পরিচয়। অবনত বদনের মাধ্যমে নায়িকা-হৃদয়ের বিষণ্ণ পরিস্থিতিটি অলঙ্কার-কর্মের কি বিপুল রূপ-সম্ভাবনায় প্রতীক্ষারত! মালাধর বসু কবি আখ্যার অধিকারী হয়েও রূপশোভার এ মনোহারী মুহূর্ত অপচয় করেছেন। কুশলী শিল্পীর হাতে পড়লে অবনত বদনের ছবিই বিচিত্র উপমানকে আশ্রয় করে সুন্দরের বাস্তব দ্যোতনা জাগাতে পারত। ক্ষণিক এ মানের পর মিলনের ছবি,

বৃন্দাবনে গোপী সনে ভ্রমে নারায়ণ।
চন্দ্র বেড়িয়া যেন শোভে তারাগণ॥[১]

বিকসিত পদ্ম রমনীর মুখ শোভে।
পদ্মবনে অলি যেন ধায় মধু লোভে॥

....

সজল জলদ জিনি গোসাঞের কলেবর।
বিদ্যুতের যোতি জিনি গোপিনি সুন্দর॥
মুকুতার মাঝে জেন সোভিছে প্রবাল।
নিলমণি গাঁথিল জেন কনকের মাল॥[২]

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা,

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা॥

....

স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ॥
তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গ-সঙ্গ-ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুম রঞ্জিতায়াঃ
গন্ধর্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্ বাঃ শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ

এবং

উবাব হাসদ্বিজ-কুন্দ-দীধিতি-
র্ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোড়ুভির্বৃতঃ॥

[১] মালাধর বসু।
[২] কৃষ্ণের রাসলীলা, মালাধর বসু।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের রাসলীলার ছবি বিচিত্র উপমেয়-উপমানে আঁকা। হেমকান্ত মণিমালায় মরকতমণি, মেঘমণ্ডলে সৌদামিনী, রমণশ্রান্ত হস্তী-হস্তিনী, কুন্দপুষ্প ও ভ্রমরশ্রেণী, তারকাপরিবৃত পূর্ণচন্দ্র ইত্যাদি। অন্যান্য কবির রূপবর্ণনা,

যমুনাব জল কাল কানুব ববণ।
বিকাশে বিনোদ মুখকমল নয়ন॥
শ্যামকব পদ ছবি বকত উৎপল।
নানা আভবণ মণি তনু ঢলঢল॥
....
যমুনাব জলে যেন চন্দ্রেব কিবণ।
নীলমেঘে নিবিড় তড়িত ঘনঘন॥
পূর্ণ শশধবে যেন বাহুব মিলন।
রাধিকা বদনে মধুকব নাবাযণ॥[১]

সাত পাঁচ সখী মেলি যমুনায জল কেলি
আছিলু পবম কুতূহলে।
কূলেব বসন মোর নিল যে কাড়িয়া চোব
না জানি গো হবিল কোন্ ছলে।[২]

মিত্তুদেঅ ভাসে জেন নাবি গোপাঙ্গনা।
হবিদ্র কুসুম জিনি জেন কাঁচা ষুনা॥
....
জমুনা জে গৌব হইল দুহান আবাএ।
সকল জে গৌব হইল জথ জিব তাএ।[৩]

সহজে গোপিব মুখ দেখিতে সুন্দব।
জমুনাব মৈদ্ধে জেন ষুভে সযুধব॥
নআন বআন গোপিব অতি অনুপাম্।
চন্দ্র কুমুদ জেন শুভে অনুপাম্॥[৪]

১ কৃষ্ণের বাধাবিহাব, দুঃখী শ্যামদাস।
২ লীলাস্মৃতি, মাধবাচার্য।
৩ পরিশিষ্ট, নৌকাখণ্ড, মাজাধব বসু।

গোপীরূপের পরিচয়,

> শতেশ্বরী হার মধ্যে বুকে দোলে মণি।
> নীলগিরি শৃঙ্গে যেন বহে মন্দাকিনী ॥
> হরশির হৈতে কুণ্ডল ফণী অনুমান।
> নাভিপদ্মে নামিয়া করয়ে মধুপান ॥১

একাধিক কবি বৃন্দাবনের রাসলীলা বর্ণনা করেছেন। মালাধর রচিত প্রথম দৃষ্টান্তের সর্বত্রই ভাগবতের অনুকরণ চিহ্ন, কেবল একটিমাত্র পংক্তি ছাড়া। 'মুকুতার মাঝে যেন শোভিছে প্রবাল।' ছত্রটির অলঙ্কার নতুন, কিন্তু গৌরাঙ্গী গোপবালাদের মধ্যে কৃষ্ণকান্তি কৃষ্ণের বর্ণশোভা কি এ উপমানের দ্বারা যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'কানু'র রূপ আর যমুনার লাবণ্য যেন তাৎপর্যে এক হয়ে গেছে। রাধিকার স্পষ্ট নামোল্লেখ শ্রীমদ্‌ভাগবতে নেই। বৈষ্ণবীয় লীলার অকর্ষণে এ নামটি কবির স্মৃতিকে অধিকার করেছে, বোধ করি। তৃতীয় উদ্ধৃতির দ্বিতীয় ছত্রে 'কুলের বসন' কথাটির ভাবসঙ্কেত দুটি। প্রথম, নদীকূলে রক্ষিত বসন। দ্বিতীয়, বংশের সম্মান ও রক্ষণশীলতা। শ্লেষালঙ্কার চাতুর্যাশ্রয়ী। কথাটির কুশল প্রয়োগ এ অংশের রূপলক্ষণকে অষ্টাদশ শতকের সমকালীন করে দিয়েছে। চতুর্থ দৃষ্টান্তে মালাধর অলঙ্কারের ইঙ্গিতে চৈতন্যস্মৃতির মৃদু একটি স্পর্শ দিয়েছেন। যমুনাজলে ভাসমানা গোপবালার আবিষ্ট রূপে মৃতদেহের প্রতীতি। মৃত্যুর উল্লেখ এখানে রসবিভোরতার সূচক, করুণ রসাভাসের নয়। পরবর্তী দৃষ্টান্তের রূপবর্ণনা মামুলি। শেষ দৃষ্টান্তের প্রথম দুটি ছত্র প্রথাবদ্ধ, কালিদাসের উপমাকলার অনুগত। কিন্তু শেষের ছত্র-দুটিতে শিল্পীর মনসীয়ানা দেখি। কুণ্ডলবদ্ধ কেশভার হরশিরস্থিত সর্পের মত নিম্নদেহে আলম্বিত হয়ে যেন নাভিপদ্মের মধুপান করছে, অপ্রচলিত হলেও ছবিটিতে রূপের রম্য দীপ্তি আছে। দৃষ্টান্তগুলি একসঙ্গে ধরে বলা চলে, এ কাব্যে কবিদের সচেতন মন শ্রীমদ্‌ভাগবতের আদর্শে ভগবানের ঐশ্বর্য-রূপের যতই শরণাপন্ন হোক না কেন, অবচেতন মনে কৃষ্ণের মধুর মূর্তির লীলা দর্শন করার জন্যেও উৎসুক। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধটি তাঁরা অনুসরণের আদর্শ করেছিলেন, আর কৃষ্ণের মধুরসের কথা তাঁদের রূপকৌতূহল অধিক উদ্রিক্ত করেছিল। আসলে শান্তরসের অপার মহিমামূর্তি সচেতন জ্ঞান-ক্রিয়ার বিষয়। সে জন্যে সাধনার প্রয়োজন। কিন্তু নৈকট্যকামনা গৃহীমনের

১ দঃখী শ্যামদাস।

ধর্ম। আর সেই নিকটরূপের ছবি কৃষ্ণের মধুর মূর্তিতে যত বেশি ধরা যায়, ঐশ্বর্যরূপে ততটা সম্ভব হয় না।

ক্ষেত্রধান্য ত্যজি যেন তণ্ডুলের আশে।
বহে যেন বড় বড় পাতিনায় বসে॥
ভক্তি বিনা মুক্তিপদ কিছু নহে আর।
ভক্তি বিনা জ্ঞানযোগ সকলি অসার॥১

জ্ঞানবাদের সঙ্গে ভক্তিবাদের মিশ্রণে ঈশ্বর কৃষ্ণ ও মধুর কৃষ্ণের জড়িত মূর্তি কবিত্ব অথবা দার্শনিকতার বদলে ভক্তের তদ্‌গত শ্রদ্ধা ও শরণাগতিকে এ কাব্যে অবারিত করেছে। মালাধর বসুর রাসলীলা বর্ণনা,

বৃন্দাবনে গোপী সনে ভ্রমে নারায়ণ।
চন্দ্র বেড়িয়া যেন শোভে তারাগণ॥

তৃপ্ত নায়িকার ছবি। একই উপমানে কবি গোপীহৃদয়ে মথুরাগত কৃষ্ণের সঙ্গ-বঞ্চনার বিষাদ-সঙ্কেত দিয়েছেন।

বিলাপ করিয়া বোলে সকল জুবতি।
আকাশের মুখে চাহে দেখে নিশাপতি॥
কৃষ্ণ মুখ জ্ঞান করি হরিষ অন্তরে।
আমা ছাড়ি নারি লৈয়া কৃষ্ণ ক্রীড়া করে॥
চাহিতে জানিল নহে কানাঞি সুন্দর।
তারাগণ মদ্ধে সোভা করে সসোধর॥২

নায়িকা-হৃদয়ের অপূর্ব বিভ্রমচিত্র। চন্দ্র ও তারার একই উপমান দিয়ে আঁকা। ভ্রান্তির মাধ্যমে কৃষ্ণজীবনের পরবর্তী ঘটনার ছায়া রূপে ও ভাবে শিল্পের রমণীয় সঙ্কেত দেয়। কৃষ্ণের মাথুরলীলার সঙ্গে বৃন্দাবন লীলার স্বাপত্ন্য-সম্পর্ক নায়িকার দৃষ্টি-বিভ্রান্তির ফলে কাব্যময়।

অলঙ্কার-চিত্রে কবি কৃষ্ণের মথুরা গমনের আর্ত বিদায়দৃশ্য রচনা করেছেন। প্রথাগত অলঙ্কারে ব্যথার ছবির চেয়েও বস্তুরূপের পরিচয় অনেক গভীর। অভিধাবাক্যের কুশলতা এখানে লক্ষণীয়। দুই জাতীয় বর্ণনাই উপস্থিত করা গেল। অলঙ্কার-কথায় বিদায়দৃশ্য,

---

১ কৃষ্ণের নিকট ব্রহ্মার আগমন, মাধবাচার্য।
২ বিরহিণী গোপীগণের ভ্রান্তি, মালাধর বসু।

পাছু পাছু ধায় গোপী হইয়া আকুলি।
মেঘের সহিত যেন ধাইছে বিজুলী ॥
করিবর সঙ্গ যেন না ছাড়ে করিণী।
সর্পের নাগলি যেন না ছাড়ে সাপিণী ॥১

অভিধাপ্রধান অলঙ্কার-কথায় বিদায়দৃশ্য,

পদ্মবন এড়ি যেন উড়িল ভ্রমর ॥
....
উড়িল বিহঙ্গ যেন তেজি সরোবর ॥
বিবেকী গৃহস্থ যেন লড়ে দূরদেশে।
দেহ ছাড়ি চলে যেন পরাণ পুরুষে ॥
তখন বল্লবীকুল হইল নিস্তব্ধ।
শুষ্ক আঁখি জল নাহি ক্রন্দনের শব্দ ॥
যতেক ইন্দ্রিয়গণ হইল অচল।
পটের পুতলী যেন রহিল সকল ॥
নাহি লড়ে নাহি চড়ে নাহি স্ফুরে বাত।
একদিঠি চাহে যথা যায় প্রাণনাথ ॥
ক্ষণেক রহিয়া বাহ্য হইল শরীরে।
উঠিয়া গোপিকা সব চাহে চারিধারে ॥ ২

দুটি অংশই এক কবির রচনা এবং কাব্যক্ষেত্রে পরস্পর সন্নিহিত। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শুধু অলঙ্কার-কথায় রূপবর্ণনার চেয়ে অভিধাপ্রধান অলঙ্কার-কথায় রূপের ব্যঞ্জনা অনেক বেশি। প্রথম দৃষ্টান্তের অলঙ্কার গোপীর হৃদয়দর্শী না হয়ে তার সাধারণ রূপশোভার প্রদর্শক মাত্র। আর সে শরীরী রূপ কৃষ্ণমিলনে হৃষ্টা নায়িকাচিত্রেও যেমন, বিচ্ছেদের সকরুণ মুহূর্তেও তেমনি। অলঙ্কার প্রতি ক্ষেত্রেই উৎপ্রেক্ষা। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে অভিধার প্রবল বাক্‌শক্তি প্রথাজীর্ণ অলঙ্কারের শিথিল রূপ-সম্ভাবনাকে প্রকাশের সতেজ দীপ্তি দিয়েছে। মনে হয়, রূপবর্ণনার যে সব ক্ষেত্রে অলঙ্কার প্রথাভাণ্ডার থেকে নেওয়া, সে সব ক্ষেত্রে অবশ রূপ-কে জাগিয়ে তোলার যাদুশক্তি আছে অভিধাভাষার মধ্যে। প্রথাবদ্ধ উপমায় রূপবর্ণনা করতে গিয়ে কবি যদি কথ্য বাক্‌রীতির সহায়তা নেন, তবে এ সব নির্জীব ছবিতে কথঞ্চিৎ প্রাণবেগ সঞ্চারিত হয়। কবি মাধবাচার্যের রচনা মুখের কথায় যত ভাল ছবি এঁকেছে, অলঙ্কারের কথায় তেমন নয়

১ মাধবাচার্য।
২ মাধবাচার্য।

আর সে সত্য সমগ্র কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য জুড়ে। মথুরা গমনের পর রুক্মিণীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ। বিবাহ মণ্ডপের (ছাঁদ্‌নাতলার) বর্ণনা,

বিচিত্র ছাওয়ালখান অপরূপ নিরমাণ
উচ্চ সমান পরিসব।
স্ফটিকেব স্তম্ভ আগে প্রবাল মুকুতা লাগে
বত্ন পাঁতি তথিব উপব॥
মহামবকতময রূপ কাষ্ঠ শোভে তায
বজত সাঁকড মাঝে মাঝে।
মাণিকে তাহাবি কুল হীবাব দিনাবি ফুল
হস্তিদন্ত মুঠি মাঝে সাজে॥[১]

বর্ণনায় অলঙ্কার প্রায নেই। স্বভাব-রূপের মধ্যে প্রকাশভঙ্গি কত সার্থক। এরপরই রুক্মিণীর বিবাহসজ্জাব রূপ,

সবত পুন্নিমাসসি জিনিঞা বদন।
সিন্দুবে মাজিল মুকুতা জিনিঞা দসন॥
পদে পদে ধ্বনি যেন বাজহংসী চলে।
বাহু মৃণাল তাব কঙ্কণ সোভে কবে॥
কুটিল কুন্তল সোভে মস্তক উপবে।
আকাশ মণ্ডলে জেন বাহু সসোধবে॥

কনক পুতলী বামা তনুতে ত্রিবলি।
নাবীরূপ হযে যেন আইলা বিজলী॥[২]

শ্রীমদ্‌ভাগবতের রূপাদর্শ,

তাং দেবমাযামিব বীরমোহিনীং সুমধ্যমাং কুণ্ডলমণ্ডিতাননাম্।
শ্যামাং নিতম্বার্পিতরত্নমেখলাং ব্যঞ্জৎস্তনীং কুন্তলশঙ্কিতেক্ষণাম্॥
শুচিস্মিতাং বিম্বফলাধবদ্যুতিশোণাযমানদ্বিজকুন্দকুড্মলাম্।
পদা চলন্তীং কলহংসগামিনীং শিঞ্জৎকলানূপুবধামশোভিনা॥

প্রথম দৃষ্টান্তে প্রথার দাসত্ব থাকলেও অনেকক্ষেত্রে প্রথাদর্শ মালাধরেব কল্পনাকে স্বতন্ত্র রূপবিন্যাসে উদ্বুদ্ধ করেছে। ভাগবতে যেখানে বলা হয়েছে, রুক্মিণীর

---

১ মাধবাচার্য।

২ মালাধর বসু।

কুন্দদন্ত রক্তাভ, মালাধর তাকেই 'সিন্দুরে মাজিল মুকতা জিনিঞা দসন'। রূপে প্রকাশ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'সিন্দুরে লোটাইল যেহ্ন গজমুতী' স্মরণীয়। ভাগবতে যেখানে কেশপাশের ভয়ে ভীত চক্ষুর কথা, মালাধরে সেখানে রাহু-শশধরের উপমান-প্রয়োগ। বিশেষত শেষছত্রটি 'নারী-রূপ হয়ে যেন আইলা বিজলী', রূপের সার্থক সঙ্কেতে এবং সমগ্রতার আবেদনে সুন্দর। রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে কবি মালাধর এত সংক্ষেপে এমন শক্তির পরিচয় তাঁর কাব্যের আর কোথাও দিতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। সমগ্র দৃষ্টান্ত ব্যতিরেক, উৎপ্রেক্ষা ও রূপক অলঙ্কারে গড়া। দেহবর্ণনার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কবিরা অভিজাত রূপাদর্শের সন্ধান করতে গিয়ে প্রথাপরবশ হয়ে পড়েছেন। অবশ্য প্রথাবন্ধন কোথাও কোথাও শিথিলও হয়েছে, কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে আরও উচ্চাঙ্গের রূপরচনা প্রত্যাশিত ছিল।

হরিৎ বরণ ঘাসে কোথাহ হরিতা।
ইন্দ্রগোপ নামে কীট কোথাহ লোহিতা॥
কোথাহ ছত্রাক-ছায়া শোভে বসুমতী।
যেন রাজসম্পদ সাক্ষাতে মূর্তিমতী॥[১]

বর্ণনায় রূপের ব্যাপকতা আছে। চতুর্থ ছত্রের উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে কবি রাজ্যশ্রীর যে বর্ণচ্ছটাভাস দিতে চেয়েছেন, অনুবাদের সূত্রে আকৃষ্ট হওয়ায় রূপের কোন মনোহারিতা জাগেনি। এ যেন বর্ণের উল্লেখমাত্র, বর্ণের শোভা নয়। ভাগবতের মূলাংশ,

হরিতা হরিভিঃ শষ্পৈরিন্দ্রগোপৈশ্চ লোহিতা।
উচ্ছিলীন্ধ্রকৃতচ্ছায়া নৃণাং শ্রীরিব ভূবভূৎ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের এই বিংশ অধ্যায়ে মোট উনপঞ্চাশটি শ্লোক আছে, বর্ষা ও শরৎকাল বর্ণানার প্রসঙ্গে। তার মধ্যে সদ্যোস্থাপিত শ্লোকের নিসর্গরূপটি সুন্দর। ভাগবতাচার্যের অনুবাদে যথার্থতা থাকলেও রূপসঙ্কেত নেই। রূপের প্রতি আকর্ষণের অভাব এ প্রসঙ্গের বড় কথা।

আরও দু'একটি বর্ণনাপদ আমরা লক্ষ্য করব। মূলের চমৎকারিত্ব বেশি বলেই তাকে পূর্বে স্থাপিত করছি।

---

১ বর্ষাবর্ণনা, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য।

মার্গা বভূবুঃ সন্দিগ্ধাস্তৃণৈশ্ছন্না হ্যসংস্কৃতাঃ
নাভ্যস্যমানাঃ শ্রুতয়ো দ্বিজৈঃ কালহতা ইব ॥

এবার বাঙলা কৃষ্ণমঙ্গলে বিভিন্ন কবির রচনাংশ,

দুই দিগে বন বাড়ি পথ আৎসাদিল।
বেদ না জানিঞা জেন দ্বিজ নষ্ট হইল ॥[১]

স্থানে স্থানে পথ ঘাট তৃণে আৎসাদিত।
জেন ধনহীন ফিরে কুলীন পণ্ডিত ॥[২]

কর্দম দেখিয়া পথে কেহ নাহি হাঁটে।
তৃণ জল পঙ্কে কৈল অধিক সঙ্কটে ॥
দুষ্ট কলিযুগে যেন দুষ্ট ব্যবহার।
ব্রাহ্মণে না পড়ে বেদ না ধর্মপ্রচার ॥[৩]

পথ হৈল জলময় বাটব ন মেলল নব
ব্রাহ্মণ বেদ পাসোবিলে,
যেমন্ত হোন্ত পশুহিলে ॥[৪]

বর্ষাজলে দ্রুতবর্ধিত আগাছায় ঢাকা পথের ছবি আঁকতে ভাগবতকার যে সংশয়ের উপমান ব্যবহার করেছেন, মালাধর ও অন্যান্য কবিরা তাকে কিছুটা স্বতন্ত্ররূপে লক্ষ্য করেছেন। ভাগবতে আছে, পথের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ, বেদবিস্মৃত ব্রাহ্মণদের বেদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের মত। কিন্তু মালাধর ইত্যাদি কবিদের উপমানে বেদ-বিস্মরণের পরিবর্তে বেদ সম্বন্ধে অজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। উপমানের নির্দেশ তাই বাঙলা বর্ণনার উপমেয় 'পথ'কে (আছে কি নেই) এই সংশয়-মূর্তিতে উপস্থিত করেনি। কৃষ্ণদাস তাঁর প্রকাশভঙ্গিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন করে ফেলেছেন। বাকি সবাই মালাধরের অনুগত। সংস্কৃতে গভীর জ্ঞান থাকার পরও রঘুনাথ মালাধরের অনুসারক। মূল ভাগবতের উপমাক্রিয়ায় যে নিরাসক্ত রূপাঙ্কনের উদ্যোগ, অনূদিত বাঙলা অংশে তার পরিচয় নেই।

---

১ মালাধর বসু।
২ কৃষ্ণদাস।
৩ রঘুনাথ ভাবগতাচার্য।
৪ জগন্নাথ দাস।

আর একটি নিসর্গের ছবি,

লোকবন্ধুষু মেঘেষু বিদ্যুতশ্চলসৌহৃদাঃ।
স্থৈর্যং ন চক্রুঃ কামিন্যঃ পুরুষেষু গুণিষ্বিব ॥[১]

কৃষ্ণমঙ্গলের বিভিন্ন রচনাংশ,

মেঘের শব্দে বিজুলি আকাসেতে জাএ।
নির্দ্ধন পুরুসে জেন কামিনি না ভাএ ॥[২]

মেঘচয়ে স্থির নহে চঞ্চল তড়িত।
নির্গুণ পুরুষে যেন কামিনীর চিত ॥[৩]

লোকবন্ধু মেঘ যেন অস্থির চপলা।
গুণবান পতি যেন অস্থির অবলা ॥[৪]

ঘন ঘন মেঘমালা করে বরিষণ।
যেন অধনীরে দান করে ধনীজন ॥[৫]

মূলের চিত্রটি আকাশ-নিসর্গের, মেঘ ও বিদ্যুতের চপলতা সংক্রান্ত, মানবচরিত্রের দ্বিচারিতার সঙ্গে উপমিত। মালাধরের উপমানের উপস্থাপনা বিপরীত। ফলে লোকবন্ধু মেঘের তাৎপর্য বিনষ্ট। রঘুনাথ ভট্টাচার্য সংস্কৃতজ্ঞ হলেও মালাধরের অনুবর্তক বলে তাঁরও প্রকাশভঙ্গি বিভ্রান্ত। মাধবাচার্যের উপস্থাপনা মূলানুগত। রূপসিদ্ধির ত্বরা ছবির রসকে অনুভবগোচর করেনি। কৃষ্ণদাসের উপমা স্বতন্ত্র অর্থ নিয়ে পৃথক। শ্রীমদ্‌ভাগবতে এছাড়াও ছবি আছে। অনুবর্তক প্রায় কোন কবিই সে বিষয়ে মনোযোগী নন। নিসর্গ বর্ণনায় দুঃখী শ্যামদাসের বিক্ষিপ্ত চেষ্টা আছে, কিন্তু অলঙ্কারে ছবিআঁকার উদ্যোগ নেই।

বর্তমানে কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে লোকসংস্কারগত কয়েকটি অলঙ্কার-চিত্রের আলোচনা করব।

---

১ শ্রীমদ্‌ভাগবত

২ মালাধর বসু।

৩ রঘুনাথ ভট্টাচার্য

৪ মাধবাচার্য

৫ কৃষ্ণদাস

কুমার গমন কথা শুনি প্রভাবতি।
কতদূরে বলি কণ্যা উদ্ধমুখে চাহন্তি॥
জেনক কৃসক বহে দেখি অনাবৃষ্টি।
মেঘের সবদে জেন চাহে ভগ্ন দৃষ্টি॥১

মূল ভাগবতে এ অংশ নেই। হরিবংশের বিষ্ণুপর্ব থেকে নেওয়া।[২] কৃষ্ণ-পুত্রের মিলনপ্রত্যাশী নায়িকার কাতরতা হতাশ কৃষকের শূন্যগর্ভ মেঘদর্শনের মত ব্যথাতুর। প্রেমের প্রসঙ্গে এমন একটি লৌকিক উপমানের আরোপ প্রত্যাশিত ছিল না। বিশেষত নায়ক ও নায়িকার সমাজ-পদবী যখন রাজসিক। কিন্তু প্রেমের পরিস্থিতি অঙ্কনের প্রচলিত পদ্ধতিকে অপসারিত করে কবি সবলে আমাদেরই জীবনযাপন ব্যবস্থার নিকটভূমি থেকে প্রত্যক্ষ একটি ছবির উপমান সংগ্রহ করলেন। এর দ্বারা নায়িকারূপের বহুবর্ণ ঐশ্বর্য হয়ত ছটাময় হয়ে ওঠেনি, কিন্তু নায়িকাহৃদয়ের প্রত্যাশা ও ব্যর্থতায় ভারাক্রান্ত মনটি ঠিক ঠিক রূপ পেয়েছে। আর একটি ছবি,

মমব্যথা পায্যা পাপ ধড়ফড় করে।
ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠেত প্রচুরে॥
নাদ মূত্র তেজিয়া আছাড়ে চারি ঠ্যাঙ্গ।
আঁখি মেলি প্রাণ দিল যেন কোলা ব্যাঙ্গ॥৩

শক্তিমান অসুরের মৃত্যু কোলা ব্যাঙের মত, ভাবনাটি হাস্যকর ও কিঞ্চিৎ স্থূল। রৌদ্ররসের পরিচয় কোলা ব্যাঙের উপমানে নেই। কেবল মৃত্যুভঙ্গির একটা তাৎক্ষণিক সাদৃশ্যে ছবিটি আমাদের রূপসংস্কারকে চকিত করে দিয়েছে। বর্ষাকালে বাঙলাদেশের পথে ঘাটে দলিত ভেকের এমন অপঘাত-মরণের শত শত ছাব চোখে পড়ে। বড়াই দূতীর ছবি এঁকেছেন কবি। অলঙ্কার আছে, কিন্তু অভিধার বল উপমানকে অতিরিক্ত তীব্রতা দিয়েছে।

তা দেখি বড়াই হইল আগুণ সোসরে।
ক্রোধমুখী দন্তসারি আঁখি পাকাইয়া॥
গোপালে মারিতে যায় লড়ি হাথে লয্যা॥

১ প্রভাবতীর প্রতীক্ষা, বজ্রনাভবধ পালা, মালাধর বসু।
২ ভূমিকা, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।
৩ অরিষ্টাসুরবধ, মাধবাচার্য।

আর যত সখী সব আইল রড়ারড়ি।
ভাঙ্গা ঢোল হেন বুড়ি যায় গড়াগড়ি॥
ধুলায় ধূসব বড় বোল নাহি তুণ্ডে।
মাথাব চুল ফুব্ ফুব্ কবে ধূলাভাব মুণ্ডে॥১

বৃদ্ধার জরাজীর্ণ দেহ ধূলোয় গড়াচ্ছে, যেন ফেলে দেওয়া ভাঙা ঢোল। রূপ সম্বন্ধে কবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও উপমেয় উপমানের তুল্যমূল্যবোধ এখানে স্পষ্ট। বুড়ি আর ভাঙা ঢোলের মিল রূপে একেবারে রাজজোটক। বড়াইর আর একটি ছবি,

বড়াইব বেশ যত কি বলিতে পাবি।
পাকা চুলে রঙ্গফুলে বেঁধেছে কববী॥
... ...
এ বৃদ্ধ বযসে বুড়ী না ছাড়ে কজ্জল।
বসনা চলনে নড়ে দশন সকল॥
স্বর্ণসূত্র নাসাপুটে গজমতি দুলে।
স্তন দুই গোটা তাব দোলে নাভিমূলে॥
... ...
এক পদ চলে বুড়ী চাব পদ বৈসে।
হাঁটু ধবি উঠে বুড়ী ঘন ঘন কাসে॥
অষ্ট অঙ্গে বাঁকা বুড়ী পবে পীতাম্বব।
নড়ি ধবি দাণ্ডাইল কানুব গোচব॥২

বর্ণনায় অলঙ্কাব নেই, কেবল কথাব কথায় রূপ অতি স্বচ্ছ। বর্ণনা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ায়ি বুড়ির রূপ স্মরণ করায়। এ ছবিতে হাস্যকরতা থাকলেও স্বল্প বর্ণনায় সংযম ক্ষুণ্ণ হয়নি। বড়ায়িজাতীয় কুটনী অথবা বৃদ্ধা, সমাজজীবনের জটিল সমস্যার দায়িত্ব যাদেব নেই, কেবল বর্ণিতব্য ঘটনাব বৈচিত্র্য বাড়াতেই যাদের উপস্থিতি, মধ্যযুগেব কথাকাব্যেব কবিবা প্রায়ই তাদেব নিয়ে স্থূলভ রসিকতার আসর জমিয়েছেন। এ চবিত্র-পবিকল্পনা প্রথার মত মধ্যযুগেব বাংলা কাব্যেব বহুস্থানে আত্মপ্রকাশ কবেছে। অলঙ্কার না থাকলেও ছবিটিতে অভিধাভাষাব শক্তি রীতিমত মনোজ্ঞ, লোকপদ্ধতিব অনুগত। আর একটি চিত্র,

১ মাধবাচার্য।

২ দুঃখী শ্যামদাস।

নিজ দাসী যত গৃহকর্মরত
আপনি মথয়ে দধি॥
ক্ষৌম পবিধান ঘন পাশ টান
শ্রমে ঘর্মমুখী কুচ দোলে।
কববী গলতি মল্লিকা মালতী
কুণ্ডল চারু বিলোলে॥[১]

যশোদার দধিমন্থনের রূপ। কোন অলঙ্কার নেই। গৃহিণীর সংসার-কর্মের ব্যস্ত ছবি। চতুর্থ ছত্রে রূপের অপূর্ব বাস্তবতা জেগেছে। এমন অকপট স্বভাব-বর্ণনা বোধ কবি এ সব কবির হাতে অলঙ্কারেব মাধ্যমে এমন করে ফুটতো না। গৃহকর্মের ঘর্মাক্ত গৃহিণীপনা অলঙ্কারে পরোক্ষভাষিত হলে নিঃসন্দেহে তার প্রত্যক্ষতা হারাতো। বিশেষত এ সব কবির রূপপ্রয়োগের ক্ষমতা যখন তেমন বেশি নয়।

এবার রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের কাব্য থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করব। এ কবির ভাগবতদৃষ্টি অন্যান্য কবি থেকে পৃথক। লক্ষ্য করার বিষয়, গূঢ় দর্শন ও তত্ত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে কবির অলঙ্কারকুশলতা যত বেশি, দেহের সৌন্দর্যরচনায় অথবা ঘটনাদৃশ্যের রূপাঙ্কনে তেমন নয়। বলা চলে, সে সব ক্ষেত্রে কবি মুখের ভাষাতেই কাজ সেরেছেন। অথচ তিনি যে উপমা-কুশলী কবি সে প্রমাণ পাই কবির তত্ত্বজ্ঞাপক অলঙ্কারের বিচিত্র ব্যবহারে। হয়ত কবির বিশিষ্ট মানসগঠনই এই স্বাতন্ত্র্যের হেতু। ভাগবতের লীলামধুর অধ্যায়টিকে যে বিশেষ লক্ষ্যে রেখে অন্যান্য কবি কাব্যরচনা করেছেন, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য সেই আদর্শবুদ্ধি থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র।

তৈল সলিতায় যেন প্রদীপের শিখা।
ধূমময় হৈয়া নানা বর্ণে দেই দেখা॥
তৈল বাতি না থাকিলে নিজ রূপ ভজে।
মুকতি-কাবণ মন যদি গুণ তেজে॥
মনের কল্পনা সব বিবিধ বাসনা।
শত শত কোটি কোটি না যায় গণনা॥

ছবিটি রূপকাশ্রিত। দীপশিখা এখানে মানুষের প্রাকৃত লালসা। তৈল, সলিতা ইত্যাদি কামচর্চার উপকরণ। স্বরূপের ভজনা তখনই দেখা দেয়, দীপশিখার

১ মাধবাচার্য।

বহুবর্ণ বিচ্ছুরণ তখনই অপগত হয়, যখন প্রদীপের উপকরণাদির মত মানব-কামনার সহায়ক উপকরণগুলি স্খলিত হয়। জীবজন্মের হেতু-রহস্য বর্ণনা করতে কবি সরল জীবনের পরিচিত ছবির উপমান ব্যবহার করেছেন।

যেন স্থালী তাপে হয় জলের সন্তাপ।
তার তাপে তণ্ডুলের বাহ্য পরিপাক॥
তবে ত তণ্ডুলের হয় অন্তরে বন্ধন।
এইরূপে দেহযোগে জীবের জনম॥
দেহের সন্তাপে যেন ইন্দ্রিয় তাপিত।
তার তাপে হয় প্রাণগণ বিমোহিত॥
তার তাপে হয় তেন মনের সন্তাপ।
তার অনুবোধে হয় জীবের বিপাক॥

মানবজন্মের রহস্য বর্ণনা করতে কবি গৃহস্থালীর আটপৌরে রূপের কথা পেড়েছেন। দার্শনিক উপমার লক্ষণই হল, কবিরা ব্যবহারিক জীবনের অতি-সন্নিহিত ভূমি থেকে উপমান চয়ন করেন। তণ্ডুলের বহুবিচিত্র পাকপ্রণালীর ভিতর দিয়ে যেমন অন্নের সৃষ্টি, নতুন একটি মানবজীবনও দেহের অভ্যন্তরে তেমন করে সৃষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে উপমাক্রিয়া বিশদ ও বিবৃত। সংসারক্ষেত্রের আরও দু'একটি রূপ,

বৎসরে বৎসরে যেন কৃষি করে খেতে।
যদি বীজ পোড়াইতে নারে কোন মতে॥
সেই খেতে শস্য যদি বুনিল কৃষাণে।
তৃণ গুল্ম ঘাসে হয় গহ্বর সমানে॥
এইরূপ গৃহাশ্রম বলি কর্মখেত।
কত কর্ম উঠে তার নাহি পরিচ্ছেদ॥

কর্পূরের ভাণ্ডে যেন গন্ধ নহে দূর।
কর্পূর না থাকে তবু গন্ধ সে প্রচুর॥
এইরূপে শূন্য ঘরে উঠে নানা কাম।

প্রথমটি কৃষিবিধিগত, দ্বিতীয়টি গৃহস্থালীর। তত্ত্বদর্শনের কুহেলি উপমানের আলোকে এক লহমায় স্বচ্ছ। মানুষের বিষয়বাসনা এবং ভোগবাসনা মনের কি জটিল গতিরেখায় রহস্যময়, অন্ধকার নিরসনকারী রূপচ্ছবির যুক্তিতে তা স্পষ্ট। জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ দার্শনিক উপমা ব্যবহারের শক্তি দেখিয়েছেন, রঘনাথ ভাগবতাচার্যও সেই সমাজাতীয় কুশলতার অধিকারী।

এ তো গেল জীবনের ঘটনাকে দর্শনতত্ত্বের সূক্ষ্মতামণ্ডিত করে দেখার কৌতূহল। পক্ষান্তরে তত্ত্বকেই বাস্তব উপকরণে রূপময় করার উৎসাহ। এছাড়া কবির রচনার আরও একটি দিক আছে। দেহসৌন্দর্য অথবা নিসর্গশোভা বর্ণনায় কবির অলঙ্কার চয়নের চেষ্টা যেন শিথিল। দুটি দৃষ্টান্ত,

তাহার ভিতরে দেবী গমনে মন্থরা।
ললিত চলিত চারু নিতম্ব মেখলা॥
সমান উন্নত স্তন তার গতি মন্দ।
মধুস্মিত বিনিন্দিত মতিময় দন্ত॥
কুচযুগল মণ্ডলে চঞ্চল হারজাল।
ললিত কলিত পারিজাত বনমাল॥
গেঁড়ুয়া ক্ষেপণে লোল নয়ন বিলাস।
চলিত কুণ্ডল চারু কপোল বিকাশ॥

নীল উতপল শ্যাম সর্বাঙ্গ সুন্দর।
নবীন যৌবনা স্তনযুগ্ম মনোহর॥
বিলোল অলকাবলি ললিত কপোলে।
বিবিধ রতন মুক্তাদাম গলে দোলে॥
রণিত কিঙ্কিণীজাল কটি বিলসিত।
কেয়ুর কঙ্কণ মণি ভূষণে ভূষিত॥
লজ্জিত হসিত স্মিত কটাক্ষবিলাস।
দৈত্যগণ চিত্তে কৈল কাম পরকাশ॥

কৃষ্ণের মোহিনীরূপের ছবি। বর্ণনাপদে দেহের বিশদ বিবরণ আছে। অসংখ্য অনুপ্রাসাত্মক বিশেষণে দেহরূপ রম্যও বটে। কিন্তু প্রতিচ্ছত্রেই যেন অলঙ্কার প্রয়োগের প্রত্যাশা লক্ষিত। অর্থাৎ উপমেয়-বিবৃতির পর উপমান-যোজনার একটু ফাঁক যেন পাঠকের চোখে পড়ে। কবির ভাষা অভিধা-সর্বস্ব। অভিধাভাষা বিশেষণভূষিত হওয়ায় বর্ণনায় ঐশ্বর্যের ছটা লেগেছে। আর একথাও সত্যি, আলঙ্কারিক উপমানও একজাতীয় বিশেষণ। কিন্তু সে বিশেষণ সদৃশ বস্তুরূপ আকর্ষণ করে বর্ণিতব্য রূপের দিগন্ত বিশদ করে। এ অংশে সেই আলঙ্কারিক বিশেষণ অনুপস্থিত। লক্ষ্য করা যায়, সৌন্দর্য বর্ণনায় বস্তু-উপমান চয়ন করতে কবি কুণ্ঠিত। অথচ দেখেছি, মানব-স্বভাবের সূক্ষ্ম গতিবিধি নিরূপণ করতে কবির কত শত আলঙ্কারিক প্রয়াস। এবং সৌন্দর্যের প্রতি কবি যে উদাসী নন, তার প্রমাণ মোহিনীরূপ বর্ণনায় কবিমনের আবেগ ও উল্লাস। আরও পাই,

সুগন্ধি কুসুম বন ভৃঙ্গ-বিরাজিত।
শুক পিক বিহগ বিবিধ সুনাদিত॥
তরল বিমল জল দীঘি সরোবর।
কুমুদ কমল ফুল নীল উতপল॥
হংস কারণ্ডব জলচর উত্তরোল।
সুললিত নদ নদী তরঙ্গ কল্লোল॥

সায়রশোভার সুরম্য চিত্র, স্বভাব-বর্ণনার অভিধাভাষায় মনোজ্ঞ। কোথাও ঈষৎ উপমা-চেষ্টা পর্যন্ত নেই। সৌন্দর্যচিত্র আঁকতে আরও পাঁচজন কবির তুলনায় এ কবির অলঙ্কারের প্রতি অমনোযোগ স্পষ্ট হলেও রূপরচনার সার্থকতা কবির নতুন একটি দক্ষতাকে প্রতিপন্ন করে—শুধু মুখের কথায় ছবির স্বাদ জাগাবার দক্ষতা। তবু সব মিলিয়ে এ কথাই বলব, জীবনের তাত্ত্বিক অভিব্যক্তির দিকে কবির আলঙ্কারিক মনোযোগ যত উন্মুখ, জীবনের বস্তুরূপশোভার প্রকাশে তত নয়। আর এই স্বাতন্ত্র্য নিয়েই কবি রঘুনাথ ভাগবতাচার্য কৃষ্ণমঙ্গলের কবিগোষ্ঠীতে থেকেও কিছুটা স্বতন্ত্র।

মূল ভাগবতের রূপগৌরব এ সব কবিকে স্বরচনার অবকাশ দেয়নি। তবু স্বতন্ত্র আদর্শভাবনার পথে মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যে আমরা এমন এক কৃষ্ণের পরিচয় পেয়েছি, যিনি বৈষ্ণবীয় ভাব-চন্দনের অনুলেপে বিগলিত নন, অথবা বড়ু চণ্ডীদাসের লোককল্পনার প্রবল টানে মদবিহ্বলও নন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কামুক কৃষ্ণ লোকবাসনার সন্তান। বৈষ্ণব কবির প্রেমিক কৃষ্ণ গোষ্ঠীসাধনার সিদ্ধিমূর্তি। আর কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের ঈশ্বর কৃষ্ণ ললিতে-কঠোরে এক বিশেষ যুগের জীবনদেবতা।

সপ্তম অধ্যায়

মনসামঙ্গল কাব্য

মনসামঙ্গল বাঙলাবাসীর জীবনকাব্য। দেবতার সঙ্গে ঘর করার আগ্রহে বাঙলার সমাজ একদা কত কামনায় জীবনকে গড়তে চেয়েছিল, এ কাব্য তারই ছবি। জীবনের এই ব্যাপক উদ্যোগে বাঁচার ভরসা হয়ত বহুবার বিপন্ন হয়েছে, মানুষের প্রতিজ্ঞা দেবতার প্রতিশোধ-বাসনাকে উদ্দীপ্ত করে দিয়েছে, সৌভাগ্যের মধুকর অদৃষ্টের আবর্তে অকূল সাগরে দিক হারিয়েছে, তবু মানুষ আপন মূঢ়তায় ও অবাধ্যতায় আত্মশক্তির প্রবল পরীক্ষাভূমিতে দেবতাকে আকর্ষণ করে এনেছে। দুঃখ-স্বীকারের নব নব অভিজ্ঞতায় যেন এ কাহিনীর নায়ক চন্দ্রধরের চিত্ত-পরীক্ষা—'আরো আঘাত সইবে, আমার সইবে।'[১] পরীক্ষার কষ্টিপাথরে জীবনের ক্ষণায়ু পরিচয়কে এমন করে নিকষিত করে নেওয়ার কাহিনী আর নেই। মনসামঙ্গল কাব্য নিভৃতে আপন মনোনীতের জন্যে শিল্পের মহামূল্য মাল্যরচনা নয়, অজানা অভিযানের হাজারো বিপদে মানবশক্তির বহুমুখী প্রকাশকে অবারিত করা। গোটা সংস্কৃত কাব্য সুন্দর ও মধুরের শিল্পবয়ন নিয়ে ব্যস্ত। সে সব কাব্যে দুর্ভাগ্য যে নেই, এমন নয়। কিন্তু উত্তররামচরিতের প্রতিটি অশ্রুবিন্দু কাব্যের কাঞ্চনপাত্রে ধরে নিয়ে কবি যে অক্ষয় মুক্তামালা গেঁথে দিয়েছেন, সেখানে একটি শোকবিন্দুরও অপচয় নেই। স্বামীহারা রতির বিলাপ কবির চোখে মানব-দুর্ভাগ্যের বিষয় না হয়ে শিল্প-আয়োজনের একটি দুর্লভ সুযোগরূপে দেখা দিয়েছে। যুগের নিজস্ব আবিষ্কারের দিকটি দুর্লক্ষ্য না হলেও রূপসাধনার আসনে বসে বাঙলার বৈষ্ণব যে সুন্দরের ধ্যান করেছিল, তার বীজমন্ত্র সংস্কৃত কাব্য থেকেই পাওয়া। তবু বিশিষ্ট একটি ভগবত্তার বোধ বৈষ্ণবীয় রূপানুভূতিকে সংস্কৃত প্রভাব থেকে ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র করছিল।

মনসামঙ্গল কাব্যেও প্রথাবদ্ধ উপমা আছে, বলা ভাল, গোটা মঙ্গলকাব্য জুড়ে এ এক ব্যাপক লক্ষণ। পড়লে মনে হয়, উপমাগুলো নিঃসাড়, কেমন যেন পুথির জগতের, সমসাময়িক জীবনের তাপ ও বেগ অনেকক্ষেত্রেই এদের জীবন্ত করেনি। এ কাব্যের উপমাচর্চা করতে বসে প্রশ্ন দাঁড়ায় এই, অভাববোধ যখন ভাতকাপড়েই সীমাবদ্ধ, তখন সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা জাগে কি। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের উপমা আলোচনাকালে দেখা যাবে, যে সব ক্ষেত্রে

---

১ গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ

জীবনধারণ করার অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ চয়নের সঙ্গে সঙ্গে কবিরা রূপের কথা চয়ন করেছেন, সে সব ক্ষেত্রেই কবিশক্তির আভাস। ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যক্ষ কর্মক্রম থেকে সুন্দরকে ছানিয়ে নেবার শৈল্পিক নিরাসক্তি তাঁদের নেই। সুখ-দুঃখের কাহিনী শোনাতে বসে আটপৌরে ছবির রূপ আর রঙ, হাতের কাছে যা পেয়েছেন কবি, তাই দিয়ে তাঁর কাব্যের উপাদানগুলোকে একটু আলো দেখিয়েছেন। একান্ত ঘরের কথা তুলির বিরল আঁচড় লেগে একটু ঝিকিয়ে উঠেছে। এখানে জীবনবাসনা আর শিল্পবাসনা একই ভাবভূমি থেকে পাওয়া। দেবতার সঙ্গে কোমর বেঁধে লড়াই করতে নেমেও এ কাব্য ভাঁড়ারের ধানচালের হিসেব ভোলেনি,

ভাল চাইয়া একখানি তালুক দেও তুমি
থাকে জেন একশত খামার।
জামাই না জায় জেন দেসান্তর না হয় জেন সদাগর
না করে জেন বানির্যেতে মন।
জাবত জিয়ে মোর বেউলা লক্ষিন্দর
তাবত বসিয়া জেন খায়॥[১]

এই কারণেই মঙ্গলকাব্যে ধীরে ধীরে 'ক্লাসিক্যাল' উপমার রূপান্তর সুরু হয়েছিল। লৌকিক উপমার প্রসঙ্গে সে বিষয়টি লক্ষ্য করতে পারব।

প্রথাবদ্ধ উপমার রূপাঙ্কনে কবির নিজস্ব ভাবকল্পনার কোন স্বাক্ষর নেই। ভঙ্গিটুকু পর্যন্ত নকল করে কবিরা রূপের পরিচয় দিয়ে[illegible]। তবে তারই মধ্যে অল্পবিস্তর নতুনত্বের যেটুকু ইসারা, তা হাতবদলের ফলেই হোক, অথবা নতুন হাতের স্পর্শেই হোক, সামান্য কিছু থাকবেই। নাগমাতা মনসার রূপ,

অলকাবলি চিত্র-নাগ হইল শোভন।
জেন নীল মেঘেতে উদয় তারাগণ॥
সিন্দুরিয়া নাগ হৈলা সীমন্তে সিন্দুর।
উদয়গিরি সূর্য্য যেন করিছে মেদুর॥
সর্বনামে নাগেতে মাথার সিথি-পাতি॥
নীলমেঘ-তটে জেন বিজুলি-দিপতি॥
কালচিতি নাগে দেবীর ভুরু-যুগ সাজে।
কালিন্দীর হস্তী জেন স্বর্ণগিরি মাঝে॥
কালি-নাগিনী হৈল নয়নে কজ্জল।
কুবলয়দলে জেন খঞ্জন যুগল॥

১ নারায়ণদেব।

সুরঙ্গ সিন্দুর নাগে অধবেব কান্তি।
ধবলিয়া চিতি হৈল দশনেব পাঁতি ॥
শ্বেতকর্ণ নাগেতে গলাব কেযাপাতি।
পীতগিবি বেড়ি জেন বহে ভাগীবথী ॥
কণ্ঠে ভূষিত মণিনাগেব দিপতি।
উদযশিখবে জেন স্বর্ণময জুতি ॥
হালিযা নাগ দেবীর হৃদযে শোভে হাব।
সুমেরু শিখবে জেন বিজুলি-ঝঙ্কাব ॥১

প্রত্যঙ্গবাচী বর্ণনা এবং তদনুসারী উপমান-চয়ন সংস্কৃতের রীতিগত। উপমানের নিয়োগভঙ্গিও (যেমন দেবীব নয়নে কজ্জলের মত কালনাগিনী যেন কুবলয়দলে খঞ্জনযুগল ইত্যাদি) ঐতিহ্যসূত্রে আহৃত। সামান্য হলেও কবির নিজস্বতা ধরা পড়েছে রূপরচনায় দেবভীতির মধ্যে থেকে। প্রতি ক্ষেত্রেই কবি প্রথম ছত্রে দেহের যথাস্থানে সর্প-ভূষণ যোজনা করেছেন, এবং দ্বিতীয় ছত্রে সেই শোভার আভাস দেখিয়েছেন নিসর্গের উপমান আকর্ষণ কবে। বেশিরভাগ উপমানে পর্বতের বিরাটত্ব এবং দুর্জ্ঞেয়তার রহস্য। কখনো উদযগিরিতে সূর্য, পীতগিরিতে ভাগীরথী, উদয়শিখরে স্বর্ণজ্যোতি, সুমেরুশিখরে বিদ্যুৎপ্রভা, স্বর্ণগিরিমধ্যে কালিন্দীর হস্তী ইত্যাদি। অবশিষ্ট উপমান নীলমেঘ, বিদ্যুদ্দীপ্তি, তারার শোভা একাধিকবাব ব্যবহৃত। মেঘ, বিদ্যুৎ অথবা তারার উপমান ভয়বোধক না হলেও সম্ভ্রমাত্মক অবশ্যই। কেবল একস্থানে কবি কুবলযদলে যুগল খঞ্জনেব সুকুমার একটি রূপ যুক্ত করেছেন। নিসর্গের এমন সমুন্নত রূপমূর্তি একাধিকবার যোজনা করেও পাঠককে সৌন্দর্যের স্বাদ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। সমুদ্র দর্শন করে এ যুগেব কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন, 'মহৎ ভয়ের মূরত সাগর, বরণ তোমার তমঃশ্যামল।' পাঠকচিত্তও যেন সবিস্ময়ে বিষহরির সেই বিপুল ভয়ের দেবী-রূপ দর্শন করল। সংস্কৃত কাব্যকালের রূপ-উপকরণ কবি নিয়েছেন সত্যি, কিন্তু ত্রস্ত কবিবাসনার স্বতন্ত্র একটি ভঙ্গিতে এ রূপ উপস্থাপিত। এ রূপস্থাপনার প্রতি একটু মনোযোগ দিলেই বোঝা যাবে, সূক্ষ্ম অথচ নিশ্চিত গতিতে 'ক্লাসিক্যাল' উপমার প্রয়োগভঙ্গি কেমন ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হতে সরু করেছে। নাগভূষণা দেবীর ধ্যানকায়া,

স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্নাগরত্নৈরনেকৈ-
র্বন্দেহহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং ভোগিণীং কামরূপাম্ ॥২

---

১ বিপ্রদাস পিপিলাই।

২ স্তবকবচমালা।

নায়িকা বেহুলার রূপচ্ছবি,

স্নানে চলিল বেহুলা সাহেব কুমারী।

মুখখানি পূর্ণিমার চাঁদ দন্তগুলি ছোলা ॥

....

চাঁচর মাথার কেশ চন্দন ললাটে।
পূর্ণিমার চাঁদ যেন রাহুর নিকটে ॥
দশন মুকুতাপাঁতি অধরে তাম্বুল।
নাসিকা নির্মাণ যেন দেখি তিলফুল ॥

....

অর্দ্ধোত্থিত স্তনদ্বয় শোভে হৃদিপরি।
সরোবর মধ্যে যেন কমলের কুঁড়ি ॥

শেষ ছয়টি ছত্রে প্রথাবদ্ধ বর্ণনা। দ্বিতীয় ছত্রটি এ প্রসঙ্গে মূল্যবান। মুখখানি পূর্ণিমার চাঁদ, কিন্তু দন্তগুলি ছোলা। প্রথমাংশে রূপের প্রথানুসরণ, শেষাংশে লোকায়ত দৃষ্টি। দুয়ে মিলে কবিকল্পনার বিভ্রাট। চাঁদের মত মুখে মুক্তোর মত দাঁতই মানানসই। কবি বিজয় গুপ্ত যদি বেহুলার মুখ পান পাতার সঙ্গে তুলনা করতেন (কেননা নিটোল গোলাকৃতি মুখকে 'পানপারা' বলে পল্লী-বাঙলার মানুষ আজও সৌন্দর্যের উৎকর্ষ বোঝায়), তবে দাঁতের সাদৃশ্যে ছোলার উপমান আকস্মিক বলে মনে হত না। সেক্ষেত্রে জাতি ও প্রকৃতিতে উভয় উপমানের মধ্যে রূপকামনার সামঞ্জস্য থাকতো। ক্লাসিক্যাল উপমা-ক্রিয়ার রাজকীয় প্রভাব কাটিয়ে কবিভাবনা কেমন ধীরে ধীরে পল্লীর মেঠোপথ ধরতে চাইছে এ পঙক্তিগুলি তার স্পষ্ট চিহ্ন।

প্রথাসর্বস্ব উপমায় কবির কৌতূহল অনেক শিথিল। বাবকরা কথা মঙ্গলকাব্যের কবিরা অনেক কয়েছেন, কিন্তু সে সব কথার মধ্যে কবিহৃদয়ের উত্তাপ নেই। সঙ্কবৈদ্য নিধনে মনসার রূপধারণ,

চাঁচর প্রচুর কেশ চামর জিনিয়া বেশ
বিচিত্র কবরী বান্ধে তথি।
পুষ্পমালা শোভে শিরে জেন নীল গিরিবরে
অভিনব বহে ভাগীরথী ॥

লখাই-এর বিবাহসজ্জা,

কুসুম-টোপর শিরে শোভে দিব্যজ্যোতি।
হেমগিরি শৃঙ্গে জেন বিজুলী-দিপতি ॥

....
হৃদয়ে লম্বিত শ্বেত কুসুমের হার।
হেমগিবি শৃঙ্গ বেড়ি সুবেশ্বরী ধাব॥

বেহুলার বিবাহসজ্জা,

চাঁচব চিকুব কববী সুন্দর
তাহে মালতির মালা।
নীল গিবিববে জৈর্ছে্দ (?) কবে
জেন শশী ষোলকলা॥

বেহুলার রূপসজ্জা,

সহজে সুন্দবী গুবি পট্টচিব পবি।
প্রভাতেব সূর্য্য জেন ঢাকে হেমগিবি॥

বিপ্রদাসের কাব্যে এই ধরনের প্রথানুগত্য একটু বেশি। এবার মৃত লখিন্দরের দেহ-বর্ণনার প্রসঙ্গে দুটি স্বতন্ত্র রচনাংশের তৌলন আলোচনা করি,

মস্তক খসিয়া যায ঝুনা নাবিকল।
মাথাব কেস খসিয়া পড়ে হাড়িয়া চামব॥
মুখখানি খসিযা পড়ে ডালিম্বেব সিস।
....
ঠোট খসিযা পড়ে প্রদীপের সিস।
....
বুকখান খসিয়া পৈল সোনাব চাঙ্গবি।
পিষ্টখান খসিয়া পৈল গাবাবেব পিড়ি॥
ধবিয়া তুলিতে খৈসে বাজহংসের গলা॥
দুই কর্ণ্য খসিযা পৈল সোনাব মদন-কড়ি।
দুই হস্ত খসিযা পড়ে জাব পাথুবি॥[১]

নৃপতি ব্যথিত হইয়া অনুগত লোক লইয়া
আনিল সুন্দব লখিন্দবে
স্নান করাইযা নীবে শোভে নানা অলঙ্কারে
শোযাইল মাজষ ভিতবে।
অপরূপ রূপ-ছাঁদে জেন পূর্ণিমার চাঁদে
অস্ত জায় গুহারো ভিতরে॥[২]

---

১ নারায়ণদেব।

২ বিপ্রদাস পিপিলাই।

নারায়ণদেবের বর্ণনায় লোকায়ত রূপবাসনা। কিন্তু কবির উপমান-সন্নিবেশ-ভঙ্গি প্রথানির্ভর। উপমান-বস্তু সংগ্রহ করার কালে কবি তাঁর লোকজীবন-অভিজ্ঞতার দ্বারস্থ হয়েছেন। যেমন, বুকখান সোনার চাঙ্গরি ; পিষ্টখান গাবারের পিড়ি, ইত্যাদি। দু'এক স্থানে প্রথানুকরণের প্রত্যক্ষতা আছে। যেমন, রাজহংসের গলা ; মাথার কেস চামর ইত্যাদি। আসলে, প্রথাগত অলঙ্কার-ক্রিয়া সম্বন্ধে কবির স্মৃতি অত্যন্ত সজাগ। আর সেই প্রথা-সচেতনতার জন্যেই কবির লৌকিক উপমান-প্রযোগ প্রাচীন রীতির ভঙ্গিপ্রভাবিত। নৃত্যের রূপহর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করবার জন্যেই হয়ত কবি বিপ্রদাস পিপিলাই পূর্ণিমার চাঁদকে গুহার ভিতরে অস্তগমনে পাঠিয়েছেন। নইলে স্বাভাবিকভাবে চাঁদ গুহার ভিতরে অস্ত যায় না। পর্বতপ্রান্তে অস্তগামী চাঁদের উপমান ক্লাসিক্যাল রীতিতে গড়া। কিন্তু আলোচ্য অংশে সেই প্রথাকেই প্রয়োজন অনুযায়ী একটু মেজেঘসে নেওয়া হল। দক্ষতা গোচরের ক্ষেত্র পেয়ে কবির প্রকাশশক্তি অনেক বেশি অভিপ্রায়ের অনুগত। স্বর্গে বেহুলার নৃত্যরূপ,

সিরের মুকুট বেউলার করে ঝলমল।
আকাসে সুভিছে জেন কমলের দল॥
খেনে উড়ে খেনে পড়ে তালে দিছে মন।
মধুমাসে ময়ুরে জেন ধরিছে পেখম॥
সুতা সঞ্চারে হাটে নাহি তোলে গাও।
চরণের নপুরে বেউলার করে চুয়া রাও॥
পবনগতি জিনিয়া বেউলা লইলেক পাইর।
আভরণ উড়ে জেন ভ্রমরা ঝাকে ঝাক॥
তারামণ্ডল পাকে করিল সোভন।
একে একে মোহিত কৈল জত দেবগণ॥

প্রথাবদ্ধ অলঙ্কার-পদ্ধতির কাঠামোয় কবি নারায়ণদেব পল্লীকল্পনার মাটি ধরিয়েছেন। কবি-ইচ্ছায় ময়ূর বসন্তকালে নৃত্য করছে। অথচ বর্ষাকালে ময়ূরের নৃত্যই প্রথাপ্রসিদ্ধ। নৃত্যশীলা বেহুলার পায়ের নূপুরে 'চুয়া রাও' করে। নূপুরের শব্দে কত মনোরম উপমার প্রযোগ সংস্কৃত কাব্যে আছে। কিন্তু এ প্রয়োগ একান্তভাবে কবির লোকবাসনার ফল। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে ইঁদুরের ডাকের তীক্ষ্ণ এবং ধাতব (metallic) ঝঙ্কার কেমন করে নূপুরধ্বনির উপমান হয়। ঊষার রূপবর্ণনা,

সুন্দর তিলক তায় কজ্জলের রেখা।
চন্দ্রের উপরে যেন আর চন্দ্র সখা॥

সারঙ্গ-গমনী ঊষা হংস-গতি চূর।

....

শিশিবে উদিত যেন মাকড়েব জালি।
সরুয়া বসন গায় খেলে ঊষা বালী।।

....

বিজুরি জিনিয়া তাব অঙ্গেব ববণ।

প্রথম তিনটি পঙক্তি প্রথাপরবশ। যেন পুথির জগতেব প্রত্নচিত্র। অথচ চতুর্থ এবং পঞ্চম ছত্রে ঊষার চিক্কণ বসনের জন্যে কবি কেতকাদাস যে উপমান আহরণ করেছেন, কাঁচা রঙের টাটকা ভাবটুকু তাতে ফুটেছে। মাকড়সার জালে শিশিরবিন্দু যেমন ভোরের আলোয ঝিকিমিকি করে, অথচ সেই সঙ্গেই জালের নিপুণ বয়ন-সূক্ষ্মতা প্রকাশ কবে, বালিকা ঊষার পরিধেয় বসনখানি তেমনই। প্রত্যক্ষ রূপের গায়ে নম্র একটু সৌন্দর্য। উপমাটুক সংগ্রহ করতে কবিকে স্বপ্ন-পক্ষীরাজে চেপে আকাশে পাড়ি দিতে হযনি। এ সব লৌকিক উপমার একটা আকর্ষণ এই, উপমান প্রয়োগেব কালে শিল্পবুদ্ধির সঙ্গে প্রস্তুত বাস্তববুদ্ধির (ready common sense) মিলন। প্রথার পুরোনো গাঁথুনির গাযে গায়ে সমসাময়িক জীবনেব আশ-পাশ থেকে পাওয়া ছিন্ন দু'একটি ছবির ফুল দুলিয়ে দিয়েছেন কবি। তাতে রূপের বাহার বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রথাব শিলীভূত সৌন্দর্য আপন জড়তা কাটিয়ে কিছু পরিমাণ লাবণ্য সঞ্চারের ক্ষমতা পেয়েছে।

বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহে আইহগণের ও লখাইর রূপবর্ণনা,

কুমারেব চাক জেন হাতেব বাহুটী।
কাকালির পেট জেন মাতাবেব মাটি।।

....

তাহাব পাছে চলে আইয় নাম তাব বাখি।
দুই কুচ পড়িছে জেন বিছানেব গদি।।

আদি কালেব বুডি প্রিষ্ঠে মেজ ছয় কড়ি
দুই চক্ষু জেন পেযাজের কোস।।

স্বর্গের তাবা হেন দেখি লখাইর যেন দুই আখি
সুমিত্রা দিল সোহাগ-কাজলখানি।
মুকুতার গাথনি লখাইর পড়ে চক্ষুর পানি
আইঅ সবের না ধরে পরানি।।

হাতের 'বাহুটী' যেন কুমারের চাক। কাকালির পেট যেন মাতারের মাটি। বিগতযৌবনা স্থূলাঙ্গীর কুচভার যেন বিছানের গদি। প্রতিক্ষেত্রেই উপমানের ভাবস্তর উপমেয়ের ভাবস্তরের অতি নিকট। কুচভার বিছানের গদির সঙ্গে উপমিত হওয়ার মুহূর্তেই উক্তা নারীর দেহগঠন, বয়ঃক্রম সব কিছুই আমাদের কমবেশি অভিজ্ঞতাকে স্পষ্ট করে তোলে। 'নাভিমূলে দুঈ কুচ লুলে।'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এ বর্ণনা অভিধাধর্মী। এখানে উপমানের নিবিড় সাদৃশ্যে রূপ একেবারে মূর্তিমান। উপমানের প্রখর ইঙ্গিতে এই বিশেষবয়স্কা নারীর বক্ষোদেশের বাস্তবগুণগুলি (স্থূলতা, বিশালতা, শিথিলতা) এক লহমায় উদ্ভাসিত। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে আদিকালের বুড়ি এয়োব রূপ। দুটি চোখ যেন পেঁয়াজের কোষ। কবি নারায়ণদেব যেন মাটির তলা থেকে লোকচক্ষুর আড়ালের এই সামান্য ফসলটুকু অকস্মাৎ আবিষ্কার করে নতুন রূপেব মূল্যে তাকে গৌরব দান করেছেন। 'নীল কুরুবক তোব নয়নে' ছবিতে কুরুবকেব নির্যাসটুকু নয়নে নিক্ষিপ্ত মাত্র। কিন্তু চোখ যখন পেঁয়াজেব কোষ, তখন এ রূপের কথায় চিত্রগুণের সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কর্যগুণও প্রকাশ পায়। যেহেতু পেঁয়াজেব কোষের রূপে third dimension আভাসিত। উপমায় লৌকিক রূপাঙ্কনের ক্ষেত্রে চিত্রবোধের সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কর্যবোধও জেগে ওঠে, হয়ত ভাস্কর্যবোধের আবেদন এ প্রসঙ্গে কিছু বেশিই। তৃতীয দৃষ্টান্তে লখাইএর আঁখি স্বর্গের তাবা, আর অশ্রুবিন্দু যেন মুক্তার গাঁথনি। দুটি উপমাই ক্লাসিক্যাল। রূপপ্রয়োগে কবির কোন আন্তবিকতা নেই। কিন্তু যে কবি সর্বপ্রথম এই সাদৃশ্য আবিষ্কার কবেছিলেন, তাঁব প্রকাশে এ রূপযোজনা কতই না জীবন্ত ছিল। যা নিজেই সুন্দব, তাকে নিয়ে শিল্পসৃষ্টি কবা দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু একতাল কাদামাটির থেকে রূপের রম্য মূর্তি নির্মাণ কবেন যিনি, তাঁব সাধনা কঠিন। মঙ্গলকাব্যেব কবি সনাতন রূপবচনারীতিকে আপন কল্পনা-আদর্শের গণ্ডীতে বেঁধে রূপের এক নতুন তাৎপর্য সৃষ্টি করতে চাইছেন। নয়নেব শোভাবৃদ্ধির কাজে আকাশেব ফুলকে অপসাবিত করে মাটির ফসল স্থান গ্রহণ করছে।

ক্লাসিক্যাল উপমায় যেমন সৌন্দর্যের সমাবোহ এবং জৌলুষ থাকে, লৌকিক উপমায় তেমন নয়। সামান্য উপকরণ দিয়ে কবি রূপেব নৈবেদ্য সাজিয়ে দেন। অল্পে তুষ্ট লোকজীবন ভাত-কাপড়ের সমস্যা দূর করার দ্বারাই যেমন সুখী সংসারের আশা করে, তেমনি ভাবকল্পনায়ও এখানে কোন তূরীয় সূক্ষ্ম-লোকের সন্ধান নেই। রূপাঙ্কনের ক্ষেত্রে মাটির সঙ্গে প্রাণের যোগ সবচেয়ে বড় কথা। দেবী কর্তৃক চান্দোর সাজা,

বাম পাসেব দাড়ি ফেলায় ডাহিন পাসের চুল।
মাথাব উপবে ভেজায় মুড়া খুব।।
আসে পাসে দুই পোছ দিলেক কপালে।
মবা পুড়িবাব জেন খাচিল চিতা গালে।।
মুড়া ২ কবিলেক খুবত নাহি হাটে।
খিল ভূঞিব চাসে জেন মুড়া লাঙ্গল ফোটে।।১

হাসেন হোসেন সংবাদ,

ফুটন্ত ধুতুবাব ফুল যেন দেখি দন্তমূল
মাথায উকুন শতে শতে।
কাজি কান্দে মনস্তাপে গোলাম খাইল সাপে
বিধিবে প্রবোধ দিবে কে।।২

হাসননগরে সাপেব উপদ্রব,

প্রাণভয়ে কেহ যদি উঠে গিযা চালে।
তাহাবে চালেব চিতি খায হেন কালে।।
বিষঘ্বালে ধড়ফড় নাগেব কামড়ে।
জেন পাঁড় কুষ্মণ্ডিকা চালে হৈতে পড়ে।।৩

অনিরুদ্ধ-ঊষাহরণ,

ধব ধব বলিযা দেবী জ্বলিয়া গেল কোপ।
হবিণ দেখিযা যেন বাঘে মাবে ছোপ।।
পদ্মাব আদেশে নাগে মাবিলেক ছোপ।
শুক্না কাষ্ঠেতে যেন কুড়ালেব কোপ।৪

মনসার ক্রোধশান্তি ব্রত,

তালু কাটিযা বেউলা লাগাইল বাতি।
স্তন্যেব প্রদিপ দিল ঘৃতে জলে আতি।
আপনে মনসা দিল দুই স্তন জোড়া।
দুই স্তন হৈল জেন কনক কটোবা।।৫

---

১ নারায়ণদেব। ২ বিজয় গুপ্ত। ৩ বিপ্রদাস পিপিলাই।
৪ বিজয় গুপ্ত। ৫ নাবায়ণদেব।

বিবাহে বেহুলার সজ্জা,

> পঞ্চ পাটের খোপ মুক্তার খিচনি।
> অন্ধকার রাত্রে যেন দীপ্ত করে মণী॥
> বান্ধীল উত্তম খোপা অধিক সুন্দর।
> মধুমাসে দেখি জেন কামটুঙ্গি ঘর॥১

দৃষ্টান্তগুচ্ছের প্রথমটিতে চান্দোর মাথা মুড়ানোর ছবি। আমরা কেশদামের রূপগৌরব দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু সেই কেশশোভার এমন অপমানকর রূপাঙ্কন কবির স্বৈররুচিতেই সম্ভব। অলঙ্কার-কর্মটিকে প্রসঙ্গ-নিরপেক্ষ করলে আমাদের সনাতন রূপ-সংস্কার ব্যথা পায়। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে দন্তমূল যেন ফুটিন্ত ধুতুরার ফুল। গীতগোবিন্দে দন্তপঙক্তি প্রস্ফুটিত কেতকী কুসুমের সঙ্গে উপমিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণে তারই প্রতিধ্বনি। অন্যত্র উপমান হিসেবে কুন্দফুলেরও ব্যবহার আছে। কিন্তু ধুতুরার ফুলের উপমান নতুন। লৌকিক উপমানে কবিদের পছন্দের স্বাধীনতা লক্ষণীয়। তৃতীয় দৃষ্টান্তে ঘরের চাল থেকে সর্পদষ্ট মানুষ কুমড়োর মত গড়িয়ে পড়ছে। 'কুমড়ো গড়ান' আমাদের ভাষার এক বিশিষ্ট বাক্‌পদ্ধতি। আত্মসংযমে অপারগ অবশ দেহের পতনচিত্রের এ প্রতিরূপ যথাযথ। চতুর্থ দৃষ্টান্তে কুপিতা দেবীর রোষ-চিত্র। সবল ও দুর্বল প্রাণীর ভয়ভীতির উপমান-সম্পর্কে আঁকা। পঞ্চম দৃষ্টান্তে বিদ্যাপতির রাধাচিত্রের স্মৃতিচিহ্ন। শেষ দুটি চিত্রে কবির রূপাঙ্কন ঈষৎ স্থূল। ষষ্ঠ দৃষ্টান্তে বেহুলার প্রসাধন। শেষাংশে রূপের পরিচয় লৌকিক। খোঁপার বিন্যাস যেন পুষ্পিত, ভ্রমরগুঞ্জিত কুঞ্জের বসন্তকালীন মিলনস্থলী। কেশবিন্যাস নারীর বিশিষ্ট প্রসাধনের ব্যাপার। আবার প্রসাধনের সঙ্গে সম্ভোগের নিকট সম্পর্ক। এখানে প্রসাধনের মাধ্যমে সম্ভোগের ইঙ্গিত ফুটেছে। অনেক সময় সরোবরের মাঝখানেও এই ধরনের বিহারকুঞ্জ রচনা করা হত, তার নাম জলটুঙ্গি।

দেহরূপ ছাড়াও অন্যান্য উপমেয়ের রূপাঙ্কনে পল্লীকবির দক্ষতা ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাক।

> ধোবানীর সঙ্গে রামা ত্রিবেণীর ঘাটে।
> বেহুলা কাপড় কাচে সুবর্ণের পাটে॥
> ধোবানী কাপড় কাচে ক্ষারে আর জলে।
> বেহুলা কাপড় কাচে শুধু গঙ্গাজলে॥
> ধোবানী কাপড় কাছে কাঁচড়ার ফুল।
> বেহুলার কাপড় যেন সূর্য সমতুল॥২

---

১ নারায়ণ দেব।

২ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ।

স্বর্গে গিয়েও বেহুলা গঙ্গাজলে কাপড় কাচছে। গঙ্গাজলের দৈবী মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সচেতন কবি স্থানসঙ্গতির বোধটুকু মুলতুবী রেখে লোকমানসের অকপট গঙ্গাভক্তি প্রকাশ করেছেন। তারপর ধোবানীর কাচা কাপড় কাঁচড়ার ফুলের মত নীলবর্ণ, কিন্তু বেহুলার ধৌতবসন সূর্যের মত উজ্জ্বল। ভক্তির আতিশয্যে রূপের অপহ্নব লোকভাবনারই লক্ষণ। নিদ্রোত্থিতা বেহুলার বিলাপ,

আম ফলে থোকা থোকা নুইয়া পড়ে ডাল।
নারী হইয়া এ যৌবন রাখিব কত কাল॥
সোনা নহে রূপা নহে অঞ্চলে বান্ধিব।
হারাইলাম প্রাণপতি কোথা যাইয়া পাব॥১

'থোকা থোকা' আমের স্থূল ছবি দিয়ে যৌবনের প্রতিরূপ রচিত। দ্রাক্ষাকুঞ্জ২ ক্বচিদ্দৃষ্ট শোভা, ফলে অনেকটা কল্পনার সামগ্রী। আম্রকুঞ্জ সর্বথাদৃষ্ট সুলভ দৃশ্য, ফলে ইন্দ্রিয়-চেতনার বিষয়। দ্রাক্ষাকুঞ্জ সম্বন্ধে কল্পনা যত রূপমুগ্ধ, আম্রকুঞ্জ সম্বন্ধে আমাদের রসনা ততটাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সদৃশ চিত্র আর একটু সূক্ষ্ম। লোহার বাসরে রতিকামনায় কাতর লখিন্দরকে প্রবোধ দিতে বেহুলার সলজ্জ উত্তর,

তুমি যে আমার পতি আমি তোমার নারী।
তোমার ধনে তুমি ধনী আমি সে ভাণ্ডারী॥৩

লখিন্দরকে নিরস্ত করার ভঙ্গিটি কতই না মনোজ্ঞ। এ অলঙ্কারে সৌন্দর্য নেই। কিন্তু প্রসঙ্গের উপযোগী ভাবগোচরের দক্ষতা আছে। অলঙ্কার প্রকাশ্য ভাবকে জোরালো করেছে।

চান্দোর চৌদ্দ ডিঙ্গা বুড়ানোর ব্যাপারে গঙ্গার উত্তর শুনে কুপিতা মনসা বলেছেন,

গঙ্গার ঠাঁই পদ্মা পাইয়া এতেক উত্তর।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে যেন মাথার উপর॥
....
মা হইয়া বল তুমি মুই বলব কি।
ঊর্ধ্ব আঙ্গুলে কভু বাহির না হয় ঘি॥৪

---

১ বিজয় গুপ্ত। ২ রবীন্দ্রনাথের 'আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে' স্মর্তব্য।
৩ বিজয় গুপ্ত। ৪ বিজয় গুপ্ত।

'সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না।'—শায়েস্তা করার আরও নিষ্ঠুর উপায়চিন্তায় তৎপর দেবীর মুখের ভাষা। রূপের কথা পাকাপাকি সংলাপ হয়ে ওঠে, এ ব্যাপার কেবল লৌকিক রূপভঙ্গিতেই সম্ভব।

আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা আলোচনা শেষ করব। সোনেকার ভক্তিতে দেবীর সমবেদনা,

> চান্দব বনিতা সেই সোনেকা সুন্দরী।
> বাত্রিদিন ভাবে সেই দেবী বিষহবি॥
> মশাব দোষে দিলাম মশারিতে আগুণ।
> সোনেকার দুঃখে প্রাণ জ্বলিছে দ্বিগুণ॥১

দেবীর অনুশোচনা। রূপের এমন প্রত্যক্ষতা লোকধর্মী রচনাব সম্পদ। এ প্রসঙ্গের উপমাগুলিতে সংসার-চেতনা প্রবল।

মনসামঙ্গলে প্রথাবদ্ধ উপমাবীতিব আশ্চর্য রূপান্তর। কবিদের প্রচেষ্টায় ত্রুটি হয়ত আছে, হয়ত উপমার ভঙ্গি অনেকস্থানেই মিশ্র। তবু প্রয়োগের অভিজাত বীতি বদল করে লোকবীতি আপন স্থান দখল করেছে। অথচ অভিজাত উপমার প্রতি এ সব কবির যে একটি লুব্ধ কৌতূহল ছিল, তার প্রমাণও এই কাব্যই।

---

১ বিজয় গুপ্ত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য গ্রামবাঙলার সমাজ ও সংসারের দৃশ্যপট। উপমার রূপ-কথায় সে সত্য স্পষ্ট। আদ্যোপান্ত কাব্য পাঠ করে বুঝতে কষ্ট হয় না যে এই আপাত ধর্মকলহ সমাজবাসী মানুষের জীবনকে ক্ষণকালের জন্যে বিড়ম্বিত করলেও বৃহত্তর ধর্ম-সমন্বয়ের মধ্যে চিরকালের এক ব্যাপক আশ্রয়চ্ছায়া দিয়েছে। শিবভক্ত ধনপতি পরিশেষে বুঝল, শিব ও চণ্ডীর মিলিত উপাসনাতেই জীবনের অচলা ভরসা মেলে।

ধনপতি বোলে মোর ব্যাধি যদি খণ্ডে।
শিবের ঘরিনী মুই পূজিমু এই দণ্ডে ॥

কি গণজীবনে, কি গণ্যজীবনে, বাস্তব সুখের চেষ্টা দিয়ে এ কাব্যের সুরু, এবং সে চেষ্টাপূরণের শান্তি নিয়ে এ কাব্যের শেষ। কালকেতু আত্মনির্ভর ও স্বাবলম্বী, মাটিতে তার জন্ম এবং মাটির মানুষরূপে তার পরিচয়।

শয়ন কুৎসিত বীরেব ভোজন বিটকাল।
ছোট গ্রাস তোলে যেন তেআঁঠিয়া তাল ॥
ভোজন কবিতে গলা ডাকে ঘড় ঘড়।
কাপড় উসাস কবে যেন মবাযেব বড় ॥[১]

ফুল্লরাও গ্রাম্যবধূ, সমাজজীবনের দাবি মেটানোই তার লক্ষ্য। ধনপতির সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। সমাজের ওপরতলার মানুষ এই ধনপতির স্ত্রী খুলনার 'ছাগ চরানি'র যে ছবি দ্বিজমাধব এঁকেছেন, তাতে এ স্তরের মানুষের নিন্দাপবাদের কথা বড় হলেও, সামান্য কিছু সতীত্ব-পরীক্ষার দ্বারাই সে বিসংবাদ শান্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ অভিজাত মানুযের পক্ষে ছাগল চরানোর অপমান-কলঙ্ক তার ঐশ্বর্য-সুখভোগের সঙ্গে জীবনের মধ্যে একযোগেই গৃহীত।

হাট হাট ঘন বোলি　　　চালাযে সকল ছেলি
প্রবেশিল নগর ভিতবে ॥
নগরুয়া ইতরগণ　　　অনিমিখ নয়ন
দাঁড়াই খুলনাব রূপ চাহে।
কেহো বোলে কুলনারী　　　কেনে বা এমন করি
কেহো কেহো দেখিয়া ঝুরয়ে ॥
হেটমুণ্ড হইয়া কান্দে　　　কাতরে উত্তর না দে
ভুজ দিয়া কুচের উপর।

---

১ কালকেতুর ভোজন, মুকুন্দরাম।

সপত্নী-কলহের যে গ্রাম্য রূপ ধনপতির উপাখ্যানে আঁকা আছে, সেখানেও জীবনের সঙ্কল্পে সেই একই সামান্যতার ইঙ্গিত।

কেশে ধরি কিল লাথি মারে তার পীঠে।
জৈষ্ঠ মাসে গোহালা গোহালি যেন পিটে ॥[১]

জীবনের পরিকল্পনায় মানুষের আশা-স্বপ্ন যদি এতই খাটো মাপের হয়, দেবতার কাছে চাইবার কালেও সে মানুষ যখন কেবলমাত্র তুচ্ছ সংসার-সুখের প্রার্থী, তখন তাদের জীবন-সংস্কারকে কেন্দ্র করে কবির রূপরচনা সূক্ষ্ম কোন আদর্শলোকের ইঙ্গিত না দিলেই ভাল। আপন আদর্শের প্রাণপণ সাধনায় এ কাব্যের কোন চরিত্রই অকারণে কাতর নয়।

সর্বাগ্রে দেবরূপের পরিচয় নেওয়া যাক। আদিদেবীর বন্দনা,

শ্রবণ উপব দেশে হেমকলিকা ভাসে
কুটিল কুঞ্চিত কেশপাশে।
আষাঢ়িয়া মেঘ মাঝে যেমন বিদ্যুৎ সাজে
পবিহবি চাপল্যক-দোষে ॥

গৌরীর রূপ,

শ্রবণ উপব দেশে হেমমুকুলিকা ভাসে
কিঞ্চিত কুঞ্চিত কেশপাশে।
আষাঢ়িয়া মেঘ মাঝে যেমন বিজুলী সাজে
পবিহবি চপলতা দোষে ॥

কমলেকামিনী রূপ,

শ্রবণ উপব দেশে হেমেব কলিকা ভাসে
কিঞ্চিৎ কম্পিত কেশপাশে।
আষাঢ়িয়া মেঘ মাঝে যেমন বিদ্যুৎ সাজে
পরিহবি চপলতা দোষে ॥

রূপাঙ্কনের ক্ষেত্রে মেঘ ও বিদ্যুতের উপমান প্রথাগত। কেশপাশে সোনার কর্ণভূষণ দেখে কবির মনে এ রূপাকর্ষণ। উপমেয়-উপমানের এবং প্রয়োগ-ভঙ্গির পৌনঃপুনিকতা থেকে বোঝা যায়, এই বিশেষ ছবি কবি মুকুন্দরামের

---

১ লহনা ও খুলনার কলহ, মুকুন্দরাম।

প্রিয়। তথাপি সে প্রীতিবোধের মধ্যে কবির সংযম কৈ। কবি যদি একই উপমেয়-উপমানকে পৃথক ভাষায় নতুন রীতিতে উপস্থিত করতেন, অথবা ভিন্ন অলঙ্কারের সাহায্যে স্বতন্ত্র সৌন্দর্য-আঙ্গিক রচনা করতে পারতেন, তবে এই প্রীতিবোধের গভীরতা বাড়ত। হুবহু প্রথা না থাকলেও কবি যেন এখানে স্বরচিত মুদ্রাদোষের (mannerism) দাস। দেবীর স্বপ্নমূর্তি,

সিচিল-পোখবি যেন বদন বিরূপ তেন
ঘোব তিমিব অণুববা।
যেন বজ্র পোড়া তাল দশন বিকট গাল
গাযেব লোম উলুখাগড়া ।।
বটের নামন জট হাসে দেবী উৎকট
দুই আঁখি কোটবেব স্থয়া।
দন্তের কড়মড়ি কর্ণে লাগযে তালি
শুখনা উদব অন্ধ কুযা ।।১

এ বীভৎস রূপবর্ণনা শ্রীমদ্‌ভাগবতে পূতনার মৃত্যুদৃশ্য স্মরণ করায়। কলিঙ্গ-রাজকে স্বপ্নাদেশকালে চণ্ডীর এ রূপ দৈবাপরাধীর মগ্নচৈতন্যে স্থিত ভয়-ভীতির রঙে আঁকা। এ প্রকাশ প্রসঙ্গ ও পরিস্থিতির উপযোগী এবং কবির পরিমাণবোধের প্রমাণ। দেবীর দেহরূপের ভাষারীতি গ্রাম্য। এ অংশের দু'একটি উপমান (উলুখাগ্‌ড়া, বজ্র-পোড়া তাল ইত্যাদি) পরিচিত রূপভাণ্ডার থেকে গৃহীত। ভাষাপদ্ধতিতে জোরালো অভিধাধ্বনি লক্ষণীয়। দেবীর আর একটি রূপ,

অরুণ সদৃশ তান দর্শন সুরঙ্গ।
মৃণাল বাহিয়া যেন উঠযে ভুজঙ্গ ।।
মধুকর ভ্রমিয়া যে পড়ে কুতূহলে।
সেই ত কমলে কন্যা বৈসযে মৃণালে ।।২

এখানে রূপাঙ্কন অপুষ্ট। ছবিটি স্বচ্ছ নয়। কমলময়ী রূপে দেবীদেহ রচনা করার অভিপ্রায় কবির ছিল। কিন্তু রূপ-নিষ্পত্তির ব্যগ্রতায় চিত্রটি পূর্ণ অভিব্যক্ত হয়নি। অথচ পূর্বদৃষ্টান্তের দেবীরূপ বীভৎস রসের আধারে সুচারু মূর্তি পেয়েছে। সে রূপে সৌন্দর্যের মনোহারিতা নেই, কিন্তু ভয়ের একটি নির্ভুল ছবি প্রত্যক্ষ। বন্দনা পালায় মহাদেবের রূপাংশ,

---

১ দ্বিজ মাধব।

২ দ্বিজ মাধব।

মস্তকে রাজিত জটা ভালে ইন্দু অর্দ্ধ-ফোঁটা
গঙ্গা ধরিলান গঙ্গাধর ॥১

এখানে স্পষ্টত কোন উপমা নেই। কিন্তু একটু চাপ দিলেই ঐ জাতীয় কিছুর দেখা মিলতেও পারে। 'ইন্দু অর্দ্ধ-ফোঁটা' কথাটিতে কবি-আবেগের লাবণ্য ফুটেছে। বিশেষত গঙ্গাধর শঙ্করের রূপরচনায় 'ফোঁটা' শব্দটির প্রয়োগ খুব সঙ্গত। আর একটি উপমা,

মহিষে চাপিয়া আইলা চতুর্দ্দশ যম।
হরিণে আইল ঊনপঞ্চাশ পবন ॥২

ভৃগুমুণির যজ্ঞে দেবতাদের আগমন বর্ণনা। হরিণ ঊনপঞ্চাশ পবনের বাহন। এখানেও কোন উপমা নেই। আমাদের বক্তব্য, বাহনের সঙ্গে আরোহীর স্বভাবের মিল। হরিণও চপল, ঊনপঞ্চাশ পবনও। পবনদেবতার চপলতা কবি হরিণের রূপদেহে মূর্ত্ত করলেন।

এবারে কাব্যের নায়ক-নায়িকার দেহবর্ণনার প্রসঙ্গ। কালকেতুর রূপ,

আজানুলম্বিত বাহু প্রশস্ত কপাল।
পঙ্কজ লোচন তার চাহন্তি বিশাল ॥
নাভি গভীর তার বৃষের আকৃতি।
মরকত জিনি তার দেহের দীপতি ॥৩

তুলির দ্রুত টানে কবি বর্ণনাকে শোভাময় করতে চেয়েছেন। তৃতীয় ছত্রে বৃষাকৃতি নাভির ছবি বহু ব্যবহারে বিবর্ণ নয়। 'পঙ্কজ লোচন' এবং 'মরকত দেহদীপ্তি'-তে অভিজাত রূপাঙ্কনের প্রখ্যাচিহ্ন। লোক-লক্ষণ এবং অভিজাত লক্ষণে একাকার এই চার পঙক্তির দেহবর্ণনায় কালকেতুর নিষাদ-পরিচয় ও নৃপতি-পরিচয় একযোগে আভাসিত। কালকেতুর শৈশবরূপ,

দিনে দিনে বাঢ়ে কালকেতু।
জিনিয়া মাতঙ্গ গতি যেন নব রতিপতি
সভার লোচন-সুখ হেতু ॥
নাক মুখ চক্ষু কান কুন্দে যেন নিরমাণ
দুই বাহু লোহার সাবল।

১ মুকুন্দরাম। ২ মুকুন্দরাম। ৩ দ্বিজ মাধব।

গুণ শীল রূপ বাঢ়া যেন সে শালের কোঁড়া
জিনি শ্যাম চামর কুন্তল ।।

....

বুকে শোভে বাঘনখে অঙ্গে রাঙ্গা ধুলি মাখে
তনু মাঝে শোভিছে ত্রিবলী ।।
কপাট বিশাল বুক নিন্দি ইন্দিবর মুখ
আকর্ণ দীঘল বিলোচন।
গতি জিনি গজরাজ কেশরী জিনিয়া মাঝ
মোতিপাঁতি জিনিয়া দশন ।।
দুই চক্ষু জিনি নাটা ঘুরে যেন কড়ি ভাটা
কানে শোভে ফটিক কুণ্ডল।
পবিধান বীব ধড়ি মাথায় জালের দড়ী
শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল ।।১

ব্যতিরেক অলঙ্কারের মাধ্যমে কবিমনের মমতা কালকেতুর রূপ ও শক্তিতে মধুর একটি অতিরঞ্জন এনেছে। দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া লৌকিক উপমান এ দীর্ঘ দৃষ্টান্তে প্রায়ই নেই। কিন্তু এ রূপাঙ্কনের আশেপাশে কথার কথায় এমন সহজ অথচ প্রবল অভিধাধ্বনি বিন্যস্ত, যার বলে গোটা ছবিটি প্রথালীন হয়েও চূড়ান্ত আবেদনে আমাদের রূপ-অভিজ্ঞতার অতিনিকট। কালকেতুর এ রূপ কবির ব্যক্তিগত কল্পনা এবং সমগ্র জনপদ-মানুষের কল্পনায় একযোগে রচিত। এমনই এক সুপুষ্ট ও বলবান শিশু বাঙলা-দেশের মানুষের চিরকালের কামনার ধন। নবজাতক ধনপতির রূপ,

পঙ্কজ লোচন শিশু সুন্দর বিশাল।
আজানুলম্বিত বাহু প্রশস্ত কপাল ।।
দশ মাস দশ দিনে পুত্র প্রসবিল ।২

প্রথালীন অলঙ্কারকে ভাষাবদ্ধ করতে কবির অমনোযোগ এবং অবহেলা স্পষ্ট। রূপরচনার প্রতি দ্বিজ মাধবের বিশেষ আগ্রহ ছিল না, তা সে অভিজাত শোভার কথাই হোক, অথবা লৌকিক শোভার কথাই হোক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ কবি প্রথা-রূপের অনুবর্তন করেছেন, কিন্তু প্রায় কোথাও সেই প্রথাকে স্বকীয় করার উদ্যম নেই।

খুল্লনার রূপের কথায় কবিরা কিন্তু মুখর। তার কয়েকটি অংশ এখানে সন্নিবেশিত করি,

---

১ মুকুন্দরাম।
২ দ্বিজ মাধব।

যেন শিশু রবি ছটা ললাটে সিন্দূর ফোঁটা
অধর জিনিয়া জবাফুলে।
ভুরু দুই ধনুধর নয়ন তাহার শর
বাহু রবি শশী তাব কোলে ॥

এ রূপবিষয়ে কবিমনে একটি মৃদু আবেগ আছে। খুল্লনার বিবাহসজ্জা,

কবপল্লবে শোভে বতণ-অঙ্গুঠি।
অলক্ষিতে পুষ্প যেন ফুটে গাঠি গাঠি ॥
....
ভ্রূযুগে পবযে বামা কাজলের বেখা।
নীল গিবি মাঝে যেন চান্দে দিল দেখা ॥১

রূপমুগ্ধ ধনপতির খুল্লনার রূপবর্ণনা,

বদন শাবদ-ইন্দু তথি স্বেদ বিন্দু বিন্দু
সুধাংশু-মণ্ডলে যেন তাবা।
বাহু তোব কেশপাশ আইশে কবিতে গ্রাস
পূণ্যেব সময হৈল পাবা ॥২

ছাগচারণকালে খুল্লনাব রূপ,

নয়ানে গলযে নীব নিবাবিতে নাবে চিব
কুচমাঝে গলিত চিকুব।
ঘন ববিষণ জানি ভুজঙ্গিনী ভয মানি
গিবি ডালে আছয়ে প্রচুব ॥৩

খুল্লনার মানভঙ্গ চেষ্টায় ধনপতির রূপবর্ণনা,

কুচ তোর গিবিবব মাঝে কনকেব হাব
সুবচিত শোভয়ে তাহাযে।
যেন হিমাচল মাঝে ভাগীবথী ধাবা সাজে
দেখি ধন্দ পাইলু মনযে ॥
তুয়া কুচ মন্দিব যেন কনকেব পুব
প্রবেশ করিতে মুঞি চাহো।
লৈয়া তুয়া আশ্রম ঘুচাও কাম-ভ্রম
অভিমত সিদ্ধিবর পাও ॥৪

---

১ দ্বিজ মাধব। ২ মুকুন্দরাম। ৩ দ্বিজ মাধব। ৪ দ্বিজ মাধব।

অথবা,

কুচ হেম-ঘট মাঝে হার-ভুজঙ্গ আছে
তথির উপরে দেহি হাত ।।
কহি থাকোঁ কোন অংশে সাঁপিণী সাধুরে দংশে
ইথে যদি না পাও প্রতীত।
আপনার অভিলাষে বান্ধ মোরে ভুজ পাশে
কর শাস্তি যে হয়ে উচিত ।।১

উদ্ধৃতিগুচ্ছের প্রতিক্ষেত্রেই রূপের কথা পৃথক পরিস্থিতিগত। খুল্লনার বাল্যরূপ, বিবাহের জন্য সজ্জিত রূপ, যৌবনরূপ, ছাগ-চরানির মলিন রূপ, মানিনী রূপ ইত্যাদি। অলঙ্কার সর্বত্রই প্রথাবদ্ধ। প্রায় প্রতিটি দৃষ্টান্ত জীবনের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যের পটভূমিতে রচিত হলেও সর্বত্র খুল্লনার সালঙ্কারা মূর্তির একই প্রকাশ দেখি। 'নয়ানে-গলয়ে নীর' ইত্যাদি দৃষ্টান্তে কবি মাধব খুল্লনার রূপ-কে তার দুর্দশার কিছুটা অনুগত করতে পেরেছেন। আমাদের কথা হল, মানিনী খুল্লনার রূপের সঙ্গে তার বিবাহসজ্জার রূপ অথবা তার শিশুকালের উদ্ভিন্ন রূপের কোন পার্থক্য নেই। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে নায়িকার মানের যে ছবি,

কোপেতে লোহিত হইল বদন সুন্দব।
উদয় কালেতে যেন রকত সুধাকর ।।২

রূপাঙ্কনে কুপিত হৃদয়ের সার্থক প্রতিবিম্ব। কিন্তু আমাদের স্থাপিত বর্ণনা-গুচ্ছের কোথাও চরিত্রের পরিস্থিতিদর্শী রূপপ্রকাশ দেখি না। কবিকল্পনা প্রথাকবলিত হয়ে এমনই অসাড় অবস্থায় পৌঁছেছে, যেখানে রূপপ্রকাশক উপমান চয়নে কবির নির্বাচনশক্তি লুপ্ত। আলোচ্য কাব্যের কবিরা কখনও সংস্কৃত কবির কখনও বৈষ্ণব কবির আঁকা ছবি ধার করেছেন। কিন্তু সেই ধারকরা রূপের কথাগুলি তাঁদের নিজ নিজ ব্যবহারের উপযুক্ত করে নেননি। এ রূপ-কথা তাই যত বৈষ্ণবীয় রাধাস্মৃতির অথবা সংস্কৃত নায়িকা-স্মৃতির উদ্দীপক, তত খুল্লনার শোভানির্ণায়ক নয়। পঞ্চম দৃষ্টান্ত বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি বর্ণনার হুবহু নকল। এ দৃষ্টান্তের শেষ দুটি ছত্র বহুব্যবহারে বিবর্ণ নয় এবং মানিনীর প্রতি অনুনয়ে কিছুটা পরিস্থিতির অনুগত। দ্বিজ মাধবের রূপকবিতা বৈষ্ণব ভাবকল্পনার দ্বারা রীতিমত প্রভাবিত। ষষ্ঠ দৃষ্টান্ত পদাবলী থেকে গৃহীত। যথাস্থানে 'বিষ্ণুপদ' আলোচনায় এ বিষয়ের বিশদ বক্তব্য উপস্থিত করব।

১ দ্বিজ মাধব।
২ মধুসূদন চক্রবর্তী কবীন্দ্র রচিত।

কালকেতুর কুটীরে ছদ্মবেশিনী দেবীর যে সুন্দরী নারীরূপ, দ্বিজ মাধব তার উৎকৃষ্ট ছবি এঁকেছেন,

> পূরক কবি-শিশু জিনিয়া ভুজদণ্ড
> দীপতি করযে শঙ্খ জালে।
> বাম করে দিয়া ভর সানন্দ হৃদয ভর
> যেন হংস শুয়াছে মৃণালে ॥

বাল্মীকি-রামায়ণে নারীরূপের কথায় এ বিশেষ উপমান প্রযুক্ত। দেবীঅঙ্গের লাবণ্য যেন শান্ত সরোবরের ঘন সুষমা। মৃণালদণ্ডের মত দেবীর ঋজুললিত বামহস্ত যেন জলতল থেকে দীর্ঘ হয়ে উর্ধ্বমুখী। তার উপর দেবীর নিরুত্তেজ গৌব মুখখানি স্থাপিত, যেন সুগভীর নৈঃশব্দ্যের শান্তিতে আকুঞ্চিতপক্ষ একটি শ্বেত চিত্রহংস। রূপের মাধ্যমে কবি এমনই এক শান্তি, নিস্তব্ধতা ও সুষমা উদ্দীপ্ত করেছেন, যার তুলনা গোটা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পাওয়া ভার। এই সঙ্গে শুচিতা ও স্নিগ্ধতার স্পর্শে কবির নির্জন রূপানুভূতি আবেশমন্থর। সদৃশ পরিস্থিতির চিত্রে মুকুন্দরামের এমন মনোযোগের লক্ষণ নেই,

> দূব হইতে দেখে বীব আপনাব বাসে।
> তিমিব ফেটেছে যেন তপন তবাসে ॥

অথবা,

> জিনি নীলগিবি তোমাব কববী
> মণ্ডিত মল্লিকা মালে।

'দূর হইতে দেখে বীর' ইত্যাদি ছত্রে দেবীরূপেব অন্ধকার-বিদারণকারী হঠাৎ শোভার বিপুল চমক আছে, ব্যাধের দারিদ্র্যজীর্ণ কুটীরপ্রাঙ্গনে এ শোভা অভাবিত ঐশ্বর্যের মত স্থাপিত, তবু আমাদের রূপকল্পনাকে আরও উদ্দীপ্ত করে দেওয়ার শক্তি কবি নিজেই সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন,

> আপনাব ঘবে যায্যা দিল দবশন।
> দেখিতে পাইল দুটি অভয চবণ ॥

'অভয় চরণ' দেখার ভক্তিব্যগ্রতায় কবির রূপাগ্রহ সীমাবদ্ধ। ভক্তের ধর্মচিন্তা এমন অনেকস্থানেই চিত্রকরের হাতের তুলি কেড়ে নিয়েছে। রূপ এখানে কবিকল্পনার পূর্ণ শক্তিলাভে বঞ্চিত। অবশ্য এ-ও বলা চলে যে, কাল-

কেতুর মত সৌন্দর্যবোধহীন ব্যাধের পক্ষে দেবীর তিমির-বিদারিণী রূপচ্ছটা অপেক্ষা আর কিছু সূক্ষ্মতর অনুভূতির অবকাশ ছিল কি। দেবীর শক্তিও যেমন, তার লাবণ্যলীলাও তেমনি অঘটন-পটীয়সী। এ যেন কালকেতুর অবোধ, বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের সামনে অভাবনীয় এক রূপরাজ্য রচনা করা।

এবার কয়েকটি প্রবহমান রূপের প্রসঙ্গ আলোচনা করা যাক। শিকারী কালকেতুকে দেবীর পরীক্ষা,

মৃগ অনুপদী বীর ধায় লঘুগতি।
খেনে খেনে ধূলায় লুকায় ভগবতী ॥
বহিয়া বহিয়া যান দীঘল তবঙ্গ।
তার পাছে ধায় ব্যাধ যেমন পতঙ্গ ॥[১]

খুল্লনার সঙ্গে ধনপতির প্রথম বাক্যালাপ,

ধনি নব সুন্দবি সুন্দরি।
পাবাবত লৈলে মোর প্রাণ কৈলে চুরি ॥
....
বনিতাজনেব ঠাঁই নিতে নাবি বলে।
পবাণ ধরিযা মোব বাখিলে আঁচলে ॥[১]

বসন্তে খুল্লনার খেদ,

লোহিত পল্লবগণ রাগাব হরযে মন
দেখি মনে ভাবযে খুল্লনা।
বসন্ত আসিয়া কিবা অটবী করিল শোভা
ভালো দিয়া সিন্দুব অর্চ্চনা ॥[১]

দৃষ্টান্তগুচ্ছের প্রথমটিতে দেবীর কালকেতুকে ছলনার ছবি। পশুর ছদ্মবেশে দেবী নদীর তরঙ্গভঙ্গিতে চলেছেন, পিছনে ব্যাধ কালকেতু তরঙ্গশীর্ষে পতঙ্গগতিতে ধাবমান। শান্ত নদীপ্রবাহ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করলে এই অনতিগোচর রূপ দেখা যায়। নদীর ছোট ছোট ঢেউ একটু মাথা তুলে বয়ে চলেছে, আর তারই অতিসন্নিহিত মূঢ় কয়েকটি পতঙ্গ বিভ্রান্ত গতিতে ঢেউগুলির মাথায় মাথায় কী যেন খুঁজে ফিরছে। ছবিটি নিভৃত এবং দুর্লক্ষ্য, তরঙ্গ-পতঙ্গের

১ মুকুন্দরাম।

অবোধ লীলা মানুষেরই উদাস ভাবনার প্রতিফলক। নিরুদ্দেশের পিছনে নিষ্ফল অনুসন্ধানকে কবি চমৎকার উপমানে গড়েছেন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে ধনপতির পারাবত হরণের কথা। এখানে শুধু বস্তুভিক্ষা ও প্রত্যর্পণের বৈষয়িক জিজ্ঞাসাই নেই। বরং সেটুকু গৌণ কথা। মূলকথা হল, নায়িকার অনুপম রূপলাবণ্যে মুগ্ধ নায়কের শ্লিষ্ট আত্মনিবেদন। অংশটি সূক্ষ্ম চাতুর্যে ভারতচন্দ্রের সমকালীন রচনার বাক্‌যোগ্যতা পেয়েছে। বিশেষত 'পারাবত' নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎকারের অগ্রদূত হওয়ায় অলঙ্কারের অনুক্ত ধ্বনি মনোজ্ঞ। অলঙ্কারের দৃষ্টিকোণ থেকে এ 'পারাবতে'র বাস্তব তাৎপর্য গৌণ, এর প্রতীক তাৎপর্যই বড়। তৃতীয় দৃষ্টান্তে 'ছাগ-চরানি' খুল্লনার বিরহকথা। কাননের পুষ্পশোভা প্রোষিতভর্তৃকার বেদনায় রাঙা। ধনপতি তখন দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্যরত। প্রিয়-মিলনের আকুল প্রত্যাশা খুল্লনার। খুল্লনার দৃষ্টিতে এ শুধু ফুল-ফোটা বসন্তের বনানী নয়, এ যেন নায়ক-বসন্তের আপন হাতে পরিয়ে দেওয়া নায়িকা-অটবীর কপালে সিন্দূর-তিলক। ছবির ভাষায় কবি খুল্লনার মনকে স্মৃতিবয়নের কাজে নিযুক্ত করে দিয়েছেন। একদিকে বসন্তশোভা, অন্যদিকে নায়িকার ভবন-বিরহ, দুয়ে মিলে এ প্রকাশভঙ্গি ব্যঞ্জনাময়।

মুকুন্দরামের উপমা ব্যবহারে আর একটি লক্ষণের কথা বলি। আখেটী খণ্ডে কালকেতুর কাহিনী এবং বণিক খণ্ডে ধনপতির কাহিনী বর্ণনা করতে বসে কবি তাদের ভিন্ন স্তরগত সমাজ-পদবীর ইঙ্গিত দিয়েছেন। কালকেতু ও ফুল্লরার এবং ধনপতি ও খুল্লনার বিবাহ ব্যাপার,

> সেই বর-যোগ্য কন্যা তোমার ফুল্লরা।
> খুঁজিয়া পাইল যেন হাঁড়ির মত সরা ॥

> কুলে শীলে হীন দোষ হয় যেই জন।
> সেই খানে দিব কন্যা করি সমর্পণ ॥
> যেন করিবর দন্ত কনকে জড়িত।
> অকলঙ্কে দিলে সুতা হয় সে উচিত ॥

প্রথম ক্ষেত্রের উপমান লোকবাসনাজাত, ফলে তা উপমেয়ের ভাবস্তরের নিকটবর্তী। দ্বিতীয় ক্ষেত্রের উপমান জীবনের সমৃদ্ধিভাণ্ডার থেকে গৃহীত, ফলে কবির আদর্শরাজ্যের বস্তু। কালকেতু-ফুল্লরার দাম্পত্যরূপ ঘরের ছবিতে যথাযথ। ধনপতি-খুল্লনার দাম্পত্যযোগ্যতা ভূষণে রমণীয়। আলোচনার গোড়ার দিকে মুকুন্দরামের পরিমাণহীন রূপপ্রয়োগের বিষয় ব্যাখ্যা করেছি। এখানে ছোট ছোট জীবন-ঘটনায় চলতি ছবির রূপ ফোটাতে কবির সুষ্ঠু পরিমাণ-

বোধের পরিচয় পাওয়া গেল। দেহবর্ণনায় প্রথারূপের প্রয়োগে কবির দক্ষতা তেমন উচ্চাঙ্গের নয়। কিন্তু অলঙ্কারের দ্বারা জীবন-ব্যাপারের (দেহরূপের নয়) ছোট ছোট চিত্রসঙ্কেত দিতে কবিকঙ্কণ যত সিদ্ধহস্ত, দ্বিজ মাধব তত নন।

এবার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লৌকিক উপমার প্রয়োগরীতি লক্ষ্য করা যাক। কালকেতুর ভোজন,

> শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।
> ছোট গ্রাস তোলে যেন তেআঁঠিয়া তাল॥
> ভোজন কবিতে গলা ডাকে ঘড়ঘড়।
> কাপড় উসাস করে যেন মরায়ের বড়্॥

লহনা ও খুল্লনার কলহ,

> কেশে ধবি কিল লাথি মারে তাব পীঠে।
> জ্যৈষ্ঠ মাসে গোহালি গোহালা যেন পিঠে॥

শ্রীমন্তের সেতুবন্ধ গমন,

> কুম্ভীবিয়া দহে সাধু দিল দবশন॥
> নৌকাব বাস কেবোযালেব ঘা পায।
> খেজুবেব বৃক্ষ যেন ভাসিযা বেড়ায॥

শ্রীমন্তের জীবনভিক্ষায় কোটালের বিনয়,

> কল্পতরু ত্যজি হীন জনা ভজি
> সেওড়াতলে সাধ যান॥

দানাগণের যুদ্ধ,

> তবকী ছড়ায়ে গুলি অতি ধীর ধীর।
> চৈত্র মাসে মেঘে যেন বরিষয়ে শিল॥

যুদ্ধ বর্ণন,

> মশানে ফিরয়ে দানা সভে হয়্যা ক্ষীণ।
> পখুর গাবানে যেন চিলে তুলে মীন॥

লৌকিক রূপের প্রথম লক্ষণ, প্রকাশের প্রবল বেগ। দ্বিতীয় লক্ষণ, উপমানের অশোভন স্থূলতা। তৃতীয় লক্ষণ, হাস্যকরতা। দৃষ্টান্তগুচ্ছের প্রতি ক্ষেত্রেই এ পরিচয় কমবেশি ফুটেছে। প্রথম দৃষ্টান্তে ভোজনের স্থূল ভঙ্গি হাস্যকর।

শেষছত্রটি আমাদের কৃষিনির্ভর পল্লীবাঙলার বাসনায় মণ্ডিত। ধান-মরাই এর স্ফীত পরিধি সুরক্ষিত করার জন্যে কৃষক খড়ের দড়ির বেড় দিয়ে আগাগোড়া একটা বাঁধন দেয়। একেই 'মরায়ের বড়্' বলে। ধান বোঝাই হলে দড়ির এ বাঁধন টান্ টান্ হয়ে ওঠে। কালকেতুর আহারান্তিক অবস্থা অপরিণামদর্শী। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে গ্রাম-গৃহস্থের গোহাল গড়ার প্রত্যক্ষ ছবি। তৃতীয় দৃষ্টান্তে নদীতে ভাসমান মৃত কুমীরের রূপ কর্কশ ও সকণ্টক খেজুর গাছের মত। সজীব অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থেকে এ উপমান গৃহীত। চতুর্থ দৃষ্টান্তে সমজাতীয় গ্রাম্যতা। মান-সাধনার শালীন বৈষ্ণবীয় ভূমি কদম্বতলা। বৈষ্ণবীয় ভাবস্মৃতি এই গ্রামীণ উপমাকলার মধ্যে লোকায়ত ভঙ্গিতে নীত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ দৃষ্টান্ত দুটি যুদ্ধের। উপমানে রূপের তাৎক্ষণিক বোধ স্পষ্ট।

দ্বিজ মাধবাচার্যের 'বিষ্ণুপদ' আলোচনা না করলে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অলঙ্কার-পবিচয় অপূর্ণ থাকে। আসলে এই সংক্ষিপ্ত পদগুলি কবির বৈষ্ণব-শরণেরই প্রমাণ। গৌরচন্দ্রিকা যেমন বৈষ্ণবপদের লীলাসূচী, মাধবের কাব্যে 'বিষ্ণুপদ' তেমনি চরিত্রের এবং ঘটনার গতি-নির্দেশক। কাব্যের ঘটনাকথা যদি অভিধা হয়, তবে 'বিষ্ণুপদ' উপমানগত অলঙ্কার বাক্য। কয়েকটি দৃষ্টান্ত,

বিষ্ণুপদ,

চল চল হামু পবিহবি।
কালো কাহ্নাযিব লাগি হৈছ বনচবী ॥১

লহনা বোলে খুলনাব তবে।
ক্রোধ সঙ্কলিযা চল ঘবে ॥
না পাঠাইম ছেলি বাখিবাব।
যত দোষ ক্ষমহ আমাব ॥

বিষ্ণুপদ,

তোমাব বদলে শ্যাম থুইযা যাও বাঁশী।
তবে সে আসিবা হেন মনে বাসি ॥২

খুলনাযে বোলে প্রভু শুনহ বচন।
এত অমঙ্গল দেখি না যাও পাটন ॥
ধনপতি বোলে প্রিয়া তুমি যাও ঘর।
কি কবিবে আন যাবে সহায শংকব।

বিষ্ণুপদ,

বহাঅ বহাঅ নদীযাব লোক
বৈবাগে চলিল দ্বিজমণি।
কেমনে ধবাইব প্রাণ শচী ঠাকুবাণী ॥
....

কান্দে রামা ভাবিযা আকুল।

বণিকের সোনা মাষা দরিদ্রে কবযে আশা
অন্ধেব হাতেব যেন লড়ি।

১ বিরহ।
২ মাথুর।

নিজ পুর হতে গোরা নদীতীরে যায়।
আউলাইয়া মাথার কেশ শচী পাছে ধায়।।১

যেখানে সেখানে যাই এড়িলে প্রত্যয় নাই
হেন পুত্র ছাড়ি মায়ের বাড়ী।।২

বিষ্ণুপদ

চিকণ কালারে গো দেখিতে যাইবে কে।
নিরখিতে নারি কালার রূপ মেঘে ঢাকিয়াছে।।
কালা নহে গোরা নহে কেবল রসময়ে।
হাঁটি যাইতে ঢলি পড়ে পরাণি কাড়ি লয়ে।।৩

স্থানে স্থানে পাটের থোপ রূপ অতিশয়ে।
প্রভাত সময়ে যেন অরুণ উদয়ে।।
সভার চরণে নেপুর খাড়ুয়া হরিষে প্রচুর।
রাঙা পাটের ধড়া পৈর্হে কটির উপর।।
গোপী চন্দনের ফোঁটা ললাটে শোভিত।
....
বৈস বৈস কবি রাজা পাত্রের বোলায়ে।৪

এক একটি পদ এক একটি পরিস্থিতির পরোক্ষভাষণ। অথচ বিষ্ণুপদগুলিকে পুরোপুরি উপমাও বলা যায় না। শাক্ত দেবতার মঙ্গলগান হলেও পদগুলির ব্যঞ্জনায় কবি-আবেগ ব্যাপক এক পটভূমি পেয়েছে। বিশেষত বৈষ্ণবীলীলা আভাসিত মাত্র থেকে রচনার ভাবগৌরব বাড়িয়েছে।

এ কাব্যের দেবভক্তি লোকমানসের সম্পদ। উপমা-প্রয়োগে সমাজ ও সংসার জীবনের আটপৌরে রূপ। প্রথাবদ্ধ উপমা এ কাব্যে সংখ্যায় কম নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে কবিদের মনোযোগ কম। গৃহস্থ-প্রত্যাশার কাব্য-কাহিনী চণ্ডীমঙ্গলে লোককল্পনার বর্ণে-গন্ধে জীবনের মাঙ্গলিক রচিত।

১ গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস। ২ শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রা। ৩ রূপোল্লাস। ৪ রাজসভায় শ্রীমন্ত।

বন্দনাপালায় ধর্মমঙ্গলের কবিরা প্রথমে গণেশের বন্দনা করেছেন, তারপরে নিরঞ্জন ধর্মঠাকুরের। মানিকরাম গাঙ্গুলির গণেশ বন্দনা,

দশন আঘাত করি   বধিয়া দুরন্ত অরি
রুধির ঝলকে নিরন্তর।
তাহাতে ত্রিরূপ তনু   জিনিয়া সিন্দূর ভানু
তাহে কিবা শোভে শশধর।।

'স্তবকবচমালায়' গণেশের ধ্যান,

খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং
প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধ-মধুপ-ব্যালোল-গণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্।।

মানিকরামের গণেশ বন্দনার প্রারম্ভে এই ছত্রটি আছে, 'দেবেন্দ্রমৌলিমন্দার-মকরন্দকণারুণাঃ।' ঘনরামের গণেশ বন্দনায় উক্ত রূপেরই নিকট-সাদৃশ্য,

তনুরুচি জবাফুল   জিনিয়া বাতুল স্থূল
গজেন্দ্রবদন লম্বোদর।

হাতীর দাঁতে শত্রুর রক্তের উজ্জ্বলতা গণেশের তনুবর্ণ। অন্যত্র তাঁর দেহরুচি মন্দারমধুর মত লাল, ঘনরাম তাকেই জবাফুলের লাল রঙে রঙিয়ে দেখেছেন। কোথাও পুষ্পের বর্ণে, কোথাও পশুর হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের বর্ণনায় গণেশ-রূপের উপমান আহৃত। রূপবর্ণনায় কবিরা যথাসম্ভব সংস্কৃত ধ্যানমালার অনুগত, যেখানে ব্যতিক্রম সেখানে তাঁদের বর্ণনা সমান্তরাল অথবা সন্নিহিত। এর পর নিরঞ্জন বন্দনা। কাহিনীতে ধর্মঠাকুর শূন্যমূর্তি নিরঞ্জন। জলদেবতা বরুণের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য, কোথাও বা তিনি কূর্ম প্রতীক।[১] মানিকরামের ধর্মবন্দনার গোড়ায় সংস্কৃত শ্লোকে আছে,

উলূকবাহনং ধর্মং কামিণ্যা সহিতং শিবং।
কুন্দেন্দুধবলকায়ং ধ্যায়েদ্ধর্মং নমাম্যহং।।

---

১ শ্রীসুকুমার সেন।

তদনুসারী বাঙলা বন্দনাপদ,

ধবল অঙ্গের জ্যোতি ধবল বর্ণের দ্যুতি
ধ্যানগম্য ধবল ভূষণ।
ধবল চন্দন গায় ধবল পাদুকা পায়
ধবল বরণ সিংহাসন ॥
ধবল বর্ণের ফোঁটা ধবল উজ্জ্বল জটা
ধবল বর্ণের চাঁদমালা।
.. ..
ধবল বরণে ঘর আলা ॥

এইভাবে নিরাকার ধর্ম বাঙালী কবির ধ্যানে মূর্তিমান। সংস্কৃত ধ্যানপদ্ধতি অনুসরণের কালেও ধর্মমঙ্গলের কবি বর্ণনার মধ্যে রূপবিস্তারের একটা ধর্মীয় উল্লাস দেখিয়েছেন। ধর্মপূজার কবিবিবৃত উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যাক।

পরম সাদরে পূজিলে তোমারে
ধন পুত্র লক্ষ্মী পায়।
মনের আঁধার ঘুচে সবাকার
আপদ দূরেতে যায় ॥[১]

এই গার্হস্থ্য নিরাপত্তার কামনা একান্তভাবে গ্রামবাঙলার মনের কথা। যে দেবতাকে দৃষ্টিপথে রেখে কবি মাহাত্ম্যসূচক মঙ্গলগান গাইছেন, তাকে তিনি নিজেই ভাল করে বোঝেন নি।

কবণ কারণ ধর্ম কেবা জানে মায়া।
কোনখানে রৌদ্রজল কোনখানে ছায়া ॥[২]

ক্রমশ দেখবো, দেবতার আচরণে, মানুষের চরিত্রে, রূপের বর্ণনায়,—কাহিনীর সর্বত্রই গ্রামের সরল অজ্ঞতা দিয়ে দেবতা ও মানুষের স্বরূপ নির্ণয়ের উৎসাহ।

ধর্মমঙ্গলগুলির অলঙ্কারে একটি সাধারণ লক্ষণ হল, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের চরিত্রাদর্শ বিষয়ে কবিমনে সশ্রদ্ধ এবং সজাগ স্মৃতি। শালেভর পালায় আছে,

---

১ মানিকরাম।
২ ঐ

ব্যস্ত হয়ে রঞ্জাবতী ডাকে যাত্রীগণে।
ঐমনি উঠিল সবে পাইয়া চেতনে।।
কেমত আনন্দ হৈল শুন সর্বজন।
লঙ্কাকাণ্ড বাল্মীকি দৃষ্টান্ত রামায়ণ।।
লক্ষ্মণ পড়িল শেলে লোটায়ে ধরণী।১

বাঘজন্ম পালায় লাউসেনের গৌড় গমনকালে,

বুড়া রাজা কর্ণসেন চলিয়া পড়িল।
দশরথ দশা যেন রাম বনে গেল।।
গোবিন্দ মথুরা গেলা ছাড়িয়া গোকুল।
ব্রজের গোপগোপী যেন হৈল আকুল।।২

ইছাইবধ পালায়,

দু বীরে দারুণ করে মহারণ
দ্বন্দ্ব বহে ঘোরতর।
কীচক মহিমে শেষে যেন ভীমে
....
কিবা বালি সুগ্রীবের বাদ।।৩

আখড়াপালায়,

এত শুনি হনুমান্ জ্বলন্ত আগুন।
দেখিতে দেখিতে হৈল সহস্র অর্জুন।।৪

বিবাহপালায়,

কর্ণসেন কর্ণের সমান দাতাময়।৫

লাউসেনের ঢেকুর-যাত্রায় পত্নীদের বিলাপ,

শিখিলা নূতন প্রেম নিবদয় হবি।
টল্ বল্ করে যেন পদ্মপত্রের বারি।।
নারীর যৌবন নাথ নিশির স্বপন।
মৃত্তিকায় মিলায় মদন অদর্শন।।৬

১ মানিকরাম ২ রামদাস আদক। ৩ ঘনরাম। ৪ রূপরাম। ৫ ঐ ৬ মানিকরাম

পাত্রপাত্রীদের বর্ণনায় কবি যেখানে সেখানে স্মৃতিভূমি থেকে পুরাণ-কথা চয়ন করেছেন। পুরাণের সাহায্য সুলভ হওয়ায় রূপরচনায় নতুন উপমান স্থষ্টির তাগিদ কবির নেই। দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের উপমান পুরাণভাণ্ডার থেকে গৃহীত হলে ভক্ত হৃদয়ের পুরাণ শ্রবণের তৃষ্ণা তৃপ্ত হয় মাত্র, উচ্চতর রূপমোহ ঘনীভূত হয় না। এ অলঙ্কারের প্রধান গুণ, বর্ণনীয় বস্তুকে (উপমেয়কে) প্রসারিত ভাবভূমি দেওয়া, সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন ভাবাষঙ্গের চেতনা সঞ্চার করা। তৃতীয় উদাহরণটি ব্যাখ্যা করি। ইছাই ঘোষের সঙ্গে লাউসেনের মল্লযুদ্ধ। এখানে উপমান-শক্তি যুদ্ধদর্শনকে ইছাই-লাউসেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি, পুরাণের দুটি সদৃশ স্মৃতি এই প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত। একটি, মহাভারতে কীচক-ভীমের যুদ্ধ, অন্যটি রামায়ণে বালি-সুগ্রীবের। দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের মোট সামর্থ্য এই। রূপ-কে গভীর করার বদলে ব্যাপক করাই এ অলঙ্কারের গুণ। তবে এই কাজে যদি ঘনঘন একই পুরাণ-সাগর মন্থন করা হয়, তবে পাঠকের পুরাণস্মৃতিকে জীর্ণ করা ছাড়া কোন নতুনের স্বাদ দেওয়া সম্ভব হয় না।

ধর্মমঙ্গলগুলিতে কবির মন পুরাণের স্মৃতিগন্ধে মন্থর। ঐ সব পুরাণের মানুষ এবং মনুষ্যত্ব চেতনার অতিসন্নিহিত থাকায় কবিরা আপন আপন কাব্যের চরিত্রগঠনে নতুন করে শ্রম স্বীকার করেন নি। বাঘজন্ম পালায়,

লাউসেনের পাছু যায় অনুজ কর্পূর।
শ্রীরাম সংহতি যেন লক্ষ্মণ ঠাকুর ॥১

অথবা

কিবা রূপ দেখি যেন কৃষ্ণ বলরাম ॥২

কবিরা কখনো রাম-লক্ষ্মণের, কখনো কৃষ্ণ-বলরামের, কখনো বা ভীমার্জ্জুনের আদর্শপ্রলেপ দেবার চেষ্টা করেছেন। লাউসেন এবং কর্পূরের জীবনে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের নায়কের গভীর হৃদয়মর্ম সংগৃহীত নেই। কেবল যেখানে যেখানে ঈষৎ আচরণের মিল, ক্ষণিক পরিণামের সাদৃশ্য, সেখানেই এ পৌরাণিক চরিত্রগুলির ভাবচেষ্টা যোজিত। আসলে, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের কাহিনী ও চারিত্র্য সম্বন্ধে সেকালের গোটা বাঙলা সমাজেই একটা গুণধন্য মুগ্ধতার বোধ ছিল। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত থেকে চরিত্র-সাদৃশ্য নিয়ে আপন রচনার মাপসই করে জুড়ে দেওয়ার দক্ষতাকে কবিরা উচ্চাঙ্গের কবিকর্ম

১ রামদাস আদক।
২ মানিকরাম।

বলে (হয়ত) মনে করতেন। কিন্তু বাঙলা রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্রগুলি যে মহৎ ঐতিহ্যভাব উত্তরাধিকারসূত্রে বহন করছে, তার কোন পরিচয়ই ধর্মমঙ্গলের এই নতুন (সদ্যোজাত) চরিত্রগুলির মধ্যে নেই। সেগুলি পল্লীকবির লৌকিক সংস্কারে গড়া। পুরাণ-কাহিনীর কৌলীন্যস্পর্শ দিয়ে এদের জাতে তোলার চেষ্টা ধর্মমঙ্গলের প্রধান উপমা-লক্ষণ।

বাঙলা রামায়ণ-মহাভারতেও গ্রাম্যতার প্রলেপ আছে। তবু সেখানকার চরিত্র ও পরিস্থিতি মূল রচনার অনুগত। ধর্মমঙ্গলের নায়ক-শক্তিতে এ জাতীয় কোন আদর্শের অবলম্বন ছিল না। সে কেবল দেবতার কৃপাটুকু অস্ত্রের মত ব্যবহার করে দিগ্বিজয়ী। রামায়ণে পিতৃসত্য পালনের দুঃখ-স্বীকার, মহৎ ত্যাগের পরিচয়, গার্হস্থ্যাদর্শে স্নেহ-প্রীতির এমন উন্নত মান এবং মহাভারতে পাত্রপাত্রীর মনোবল ও ব্যক্তিত্ব, ক্ষাত্রশক্তির নির্ভীক পরীক্ষা ও প্রমাণ, ঘোর গৃহবিবাদের মধ্যেও জীবনের সজাগ সততাবোধ,—এ জীবনভাব দীর্ঘকাল অনুশীলনের ফলেই লাভ করা সম্ভব। ধর্মমঙ্গলের রচনাদর্শে এ রকমের কোন আর্যরুচিমার্জিত পূর্বরূপ ছিল না। লাউসেনের জয়ধ্বনি সবদিকে ঘোষিত হলেও তাকে সামান্য মানুষের মতই মনে হয়। লাউসেনের রূপ,

> রূপ দেখ্যা সর্বলোক সুবিস্ময় লাগে।।
> কেহ বলে অভিমন্যু অর্জুন আত্মজ।
> পঞ্চম প্রসন্ন মূর্তি মুখানি পঙ্কজ।।
> কেহ বলে কামদেব কৃষ্ণের কুমার।
> অন্যে বলে দ্বিতীয় অর্জুন অবতার।।[১]

রূপদর্শনের মুগ্ধতা ও বিস্ময় আছে, কিন্তু পুরাণের শাসন কবিকে মুক্তি দেয়নি। দেখানো যেতে পারে, কবিদের পুরুষরূপ রচনার আগ্রহ অতিমাত্রায় পুরাণ-প্রভাবিত।

নারীরূপকীর্তনে, বিশেষত শৃঙ্গার-সজ্জা বর্ণনায় কবিদের চেষ্টা ঈষৎ সার্থক। ভ্রষ্টা নারীর রূপাঙ্কনে আলঙ্কারিক কৌতূহল,

> সিন্দূরের বেড়ি দিল চন্দনের রেখা।
> প্রথম দিনে উদয় যেন কুমুদের সখা।।
> কাজলের বিন্দুকা দিল তার কোলে।
> নব জলধর যেন বিষ্ণুপদতলে।।[২]

---

১ মানিকরাম।
২ রামদাস আদক।

প্রথাবদ্ধ উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। তবু প্রকাশভঙ্গিতে গ্রাম্যছাঁদের একটা শ্রীও কোথাও কোথাও চোখে পড়ে। নারীর কেশ ও খোঁপার বর্ণনা,

বাব মাসে তেব ফুল চৈত্রে ফুটে ভাঁটি।
একে একে এলাইল পেঁড়াব যত গাঁটি ॥
পরশমণি খোঁপাখানি মউর-পেকম ছাঁদে।
বঙ্গেব বেলা রঙ্গেব কড়ি পড়ে মদন কাঁদে ॥১

পদটিতে অলঙ্কার যৎসামান্য, খুঁজলে হয়ত ব্যতিরেকের আভাস মিলবে। কিন্তু মনোহারী শব্দচয়নে রূপের নিটোল প্রকাশ পল্লীশ্রীর ব্যঞ্জনা দেয়। এটি বারবনিতার লাসবেশের ছবি। রূপের প্রতি লুব্ধতা জাগালেও দেহের স্থূল ইঙ্গিত কিছু নেই। বারনারী সুরিক্ষার লালসার একটি ছবি,

বুকের বসন খুলে খল খল হাসে।
দেখ হে নাগর কুচ কনক মহেশে ॥
অবিবল শ্রীফল যুগল যেন দুটী।
অনঙ্গের এই ধন আগুণের কুটী ॥
যুগল কমল হস্ত যদি দেয় ইথে।
সুখ পাবে স্বর্গ যাবে সদ্য চেপ্যা রথে ॥
আমাব অধরে আছে অমৃতেব সব।
উদব পুবিযা খাবে হইবে অমব ॥২

প্রকাশভঙ্গিতে বারাঙ্গনাসুলভ পিচ্ছিল লালসা ও নির্লজ্জতা। তথাপি কবির রূপাঙ্কন যথাযথ। শিল্পীর রূপ-উপভোগ লজ্জা পায, যেহেতু কামনার তাপে দেহবর্ণনা অতিশয়িত। নাগর-ছলনায় নটী-দূতীর বেশ,

চিরুণি চিরুণি বলে পড়ে গেল সাড়া।
বাব হল চিরুণি তার তিনটে ছিল দাঁড়া ॥
কেশ আঁচড়িতে বুড়ি যতনে বসিল।
তিলভূঞে কৃষাণ যেন লাঙ্গল জুড়ে দিল ॥

বোল্ চাল্ নাঞি মাগী হেসে নুট গেল।
পূর্ণ অমাবস্যা যেন সম্মুখে দাঁড়াল ॥৩

---

১ রামদাস আদক। ২ মানিকরাম। ৩ রামদাস আদক।

বিগতযৌবনার প্রসাধনে হাস্যকর অসঙ্গতি উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে সুন্দর ফুটেছে। গ্রামে-গঞ্জে এ সব নারীকে প্রত্যক্ষদর্শনের ফল যেন এই কবিতাছত্রগুলি। এবার বৈধী নারীর রূপবর্ণনা লক্ষ্য করা যাক। বিবাহপালা,

রঞ্জাবতী বনী কোথা শুন গো জননী।
ছোট বনী আমাব প্রাণেব সম গণি॥
বঞ্জাবতী বিনে মোব বাড়ীঘব শূন।
পদ্মফুল শিখরে ভ্রমবে যেন ঊন॥১

পদ্মের মাথায় ভ্রমর একটি পরিপূর্ণ প্রথারূপ। তার অভাব যেমন নিটোল একটি শোভাকে অপূর্ণ রাখে, তেমনি রঞ্জার অভাবে সমস্ত রাজপুরীর শোভা অপূর্ণ। উপমায় প্রথাগন্ধ থাকলেও উপমানের নতুন উপস্থাপনা শুচি মাধুর্যবোধ জাগায়। রঞ্জাবতীর বাসর বর্ণনা একাধিকবার পাই। শালে-ভব পালা,

সুধাসিক্ত হলে নাখ সব সুধাময়।
তোমা লয়ে বস নাখ কোন কালে নয়॥
মকবন্দপূর্ণ যদি অববিন্দ ফুটে।
তায অতি অকৃতী অলিব মন ছুটে॥
লুঠিতে নিষেধ মধু যদি হয যোগ।
তবু না নিষেধে পদ্ম ভ্রমবেব ভোগ॥২

পদ্ম-ভ্রমরের নিষেধ ও প্রলোভনের ছবিতে বাসরসজ্জায় কপট-কোপনা পত্নীর মন। অলঙ্কার গতানুগতিক, কিন্তু নিযোগশক্তি কবিব নিজস্ব। আব একটি পদ,

পবিমলপূর্ণ যদি অববিন্দ ফুটে।
ষট্ ষট্পদ্ তাব মকবন্দ লুটে॥
পদ্মিনী কখন যদি কবে অনুযোগ।
ভ্রমব ছাড়ে কি তাব স্বভাব-সম্ভোগ॥৩

এখানেও সাধ্বী নায়িকার পতির প্রতি অনুযোগ। ষট্ অর্থে কামাদি ষড়রিপু। ষট্পদ অর্থে ভ্রমর। উপমাটির সঙ্কেতশক্তি লক্ষণীয়। একটি সম্ভোগের ছবি,

১ রূপরাম। ২ ঘনরাম। ৩ রামদাস আদক।

এই কথা কহিতে বদনে চুম্ব দিল।
পদ্মফুলে মধু পায়্যা ভ্রমরা মাতিল ॥

....

বুভুক্ষিত হরি যেন হরিণীরে পায় ॥
চঞ্চল কুণ্ডল পাশ ফেরাফেরি বাহু।
শরতের চাঁদ যেন গরাসিল রাহু ॥১

অলঙ্কার প্রথাবদ্ধ। বাসরঘরে নায়ক-নায়িকার নিভৃত প্রেম ও গোপন সম্ভোগের ছবি। নিসর্গের সূক্ষ্মচিক্কণ অবগুণ্ঠন দিয়ে কবিরা কুলবধূ-কামচর্যার সলজ্জ ছবিগুলি সন্তর্পণে এঁকেছেন। পূর্বোধৃত কুলটারূপের থেকে এগুলির বর্ণনা-ভঙ্গি স্বতন্ত্র। দেহ-রূপের আরও কতকগুলি পদ। রঞ্জাবতীর ধর্মপূজা,

ধুপ ধুনা ধূমেতে আঁধার দশ দিশি।
তার মাঝে রঞ্জা যেন মেঘে ঢাকা শশী ॥২

লাউসেনের ব্যাঘ্রশিকার,

কর্পূরের বুকে বয় রুধিরের ধার।
ওড়মালা কেবলি গাঁথিল মালাকার ॥৩

জাগরণ পালা,

এলায়ে সাধের খোঁপা চাঁপাফুল গা।
সুন্দর নাগরী কিবা ছেলেপিলের মা ॥৪

রঞ্জার বাসরে নিদ্রিত কর্ণসেনের রূপ,

চূয়া দেয় গায় ঢেলে চন্দনের ছড়া।
গঙ্গাজলে ভাসে যেন ঠিক বাসিমরা ॥৫

দূতী কর্তৃক বর্ণনা,

বদন শরতের শশী অধর হিঙ্গুল।
তনুরুচি শোভা করে সরিষার ফুল ॥৬

১ রূপরাম। ২ রামদাস আদক। ৩ ঐ। ৪ ঘনরাম। ৫ রামদাস আদক। ৬ ঐ।

সপ্তম পালা,

করিবর-করে পরে কাঞ্চনেব চুড়ি।
বিধুকে রহিল যেন বিদ্যুল্লতা বেড়ি॥১

সব অলঙ্কারেই কমবেশি প্রথার শাসন। আর যেখানে প্রথার প্রভাব একটু শিথিল, সেখানে পল্লীবাসনার প্রকাশ। রূপবর্ণনায় প্রথার বন্ধন ও মুক্তি দুইই লক্ষণীয়। কোথাও পল্লীর লক্ষ্মীশ্রী, কোথাও বা নগ্ন নাগরালি, আবার কোথাও হয়ত কথার কথায় রূপের দ্যোতনা। নারীরূপে শৃঙ্গারসজ্জা বর্ণনায় কবিদের সমধিক উৎসাহ। কবিরা নারীকে শুধু কামিনীমূর্তি বা রতিমূর্তিতে দেখেছেন।

এবার ধর্মমঙ্গলের যুদ্ধকথা। এ কাব্যে যুদ্ধ (পশু-মানুষের যুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, অস্ত্র-যুদ্ধ) আগাগোড়া। কাম্যকবনে অর্জুনের বরাহ শিকারের কথায় লাউ-সেনের যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণিত। কোথাও কোথাও প্রথাবদ্ধ অলঙ্কারও আছে। গ্রাম্য-ভাবে গড়া দুটি একটি যুদ্ধ-ছবির হদিসও মেলে। অস্ত্র-যুদ্ধের ছবি,

সোমবায চতুরঙ্গ সাজে নবলক্ষ।
পক্ষবল পশ্চাতে মিলিল রণদক্ষ॥
গুরুগতি গমন গর্জন বীরদাপে।
চলিতে চবণ চারে বসুমতী কাঁপে॥

মেঘমালা কাদম্বিনী হাতীর চাপান॥
অশ্বেব পাতা যেন ববোজেব পান॥
ধাঁ ধাঁ শবদে বাজিছে বড় দামা।
বহু সৈন্যে সেজে এল মাউদার মামা॥২

যুদ্ধের আর একটি ব্যাপক দৃশ্য,

চটাচট্ চৌদিকে চাপিয়ে হানে চোট্
ভূতলে সেফাই সব পড়ে খায় লোট্॥
কোদালে কদলী যেন কাটিছে কৃষাণ।
তেমনি লখের রণে হাতী হতমান॥৩

---

১ মানিকরাম। ২ রামদাস আদক। ৩ ঘনরাম

যুদ্ধ-দৃশ্যে প্রথাবদ্ধ উৎপ্রেক্ষা। কিন্তু সেগুলির প্রয়োগফল একান্তভাবে পল্লী-চেতনাশ্রয়ী। অশ্বত্থপাতা আর বরোজের পানের মধ্যে যে একটি নিয়মিত শ্রেণীসজ্জা, কবি অগণিত সৈন্যের নিয়মিত অবস্থানকে তার সঙ্গে উপমিত করেছেন। 'হস্তী' এবং 'কদলী'এ দুটি রমণী-উরুর প্রতিষ্ঠিত উপমান। এখানে সেই কদলীই হস্তীর উপমানরূপে ব্যবহৃত। কৃষাণের কোদাল চালানোর ছবি একান্তভাবে গ্রামের। যুদ্ধ-রূপ হয়ত এখানে তার রাজসিক ঐশ্বর্য কিছুটা হারিয়েছে, কিন্তু পল্লীর দৃশ্যপটে তা এক লহমায় জীবন্ত। সারেঙ মল্লের সঙ্গে লাউসেনের যুদ্ধ,

> লাউসেন যম যেন যবে হয় ক্রুদ্ধং।
> মল্লসনে ঐছনে কবে ঘোব যুদ্ধং॥
> প্রথমেতে হাতে হাতে পবে পায পায়ং।
> কসাকসি ডুসাডুসি মাথায় মাথায়ং॥১

বর্ণনায় যুদ্ধ এবং যুদ্ধের বাজনা একসঙ্গে শোনা গেল। অনুস্বারের ব্যবহার বাদ দিলেও লড়াইএর দাপাদাপি ঠিকই ফুটতো। তথাপি কবি অনুস্বারের হাস্যকর সংযোজনার দ্বারা যুদ্ধের তাপকে হয়ত আরও তেজালো করতে চেয়েছিলেন। এ জাতীয় গ্রাম্য অসঙ্গতি অথচ সরল ভাবুকতার ছাপ ধর্মমঙ্গলের অষ্টেপৃষ্টে।

কেবল মানব-রূপের প্রকাশেই নয়, দেবতাদের শক্তি অথবা সীমা সম্বন্ধেও কবিদের পরিমাণবোধ অত্যন্ত কম। এ কাহিনীর নায়ক লাউসেন,

> বরপুত্র ধর্মের বলের নাই সীমা।
> ত্রিভুবনে কেহ নাই কি দিব উপমা॥২

এই লাউসেনকেই চুরি করবার জন্যে দেবী বাসুলী বব দিলেন,

> এত যদি বাষুলি বলিল ঘনে ঘন।
> স্তব করে ইন্দা চোর অভয় চবণ॥
>
> ....
>
> বব দিয়া সর্বজয়া কান্দিতে লাগিল॥
> বলেন করুণাময়ী মধুর বচন।
> হেন সে তুচ্ছ বর নিলে অভয়াচরণ॥
> ব্রহ্মার উপরে নাঞি নিলে অধিকার।
> আমার সাক্ষাতে বর নিলে হেন ছার॥৩

১ মানিকরাম। ২ মানিকরাম। ৩ রূপরাম।

ইন্দা চোরকে চৌর্যে সহায়তা করছেন দেবী অভয়া। আসলে তিনি ধর্মঠাকুরের বিরোধী। আবার কাব্যের অন্যত্র দেখছি, এই দেবীই লাউসেনকে পরীক্ষা করে অস্ত্র উপহার দিয়েছেন। উপরের উদাহরণে আরও দেখা গেল, ইন্দা চোরের যৎসামান্য করুণা প্রার্থনায় দেবী অনুতপ্ত। তিনি ভক্ত ইন্দা চোরকে ইন্দ্রত্ব পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। আত্মবিস্মৃত দেবশক্তির এমন যদৃচ্ছ ব্যবহার-কল্পনা কবিদের মাত্রাজ্ঞানহীন গ্রাম্য জীবনভাবনার প্রকাশক।

'শালে-ভর পালা'য় রঞ্জাবতীকে মনোমত আশীর্বাদ করবার জন্যে ধর্মঠাকুর ইন্দ্রকে বললেন,

> দেহ বায়ু মেঘগণ আমার সংহতি ॥
> যে আজ্ঞা বলিয়া ইন্দ্র উঠে জোড়হাত।
> ধাবাধবে এনে দিল ধর্মের সাক্ষাৎ॥
> রঞ্জাকে করিতে দয়া দেব নিরঞ্জন।[১]

দেবতার দয়া করার এমন অযাচিত ব্যগ্রতায় মানুষের সাধনার দৈন্য ফুটে উঠেছে। বারাঙ্গনা সুরিক্ষার প্রশ্নে কেবল লাউসেনই বিব্রত নয়,

> ব্রহ্মা কন বিপর্যয় বেউশ্যার বাণী।
> বাপের বয়েসে বাপু আমি নাই জানি॥[২]

সর্বজ্ঞ ব্রহ্মা পর্যন্ত অক্ষমতা জানিয়েছেন গ্রামের ভাষায়।

যে শক্তিদেবী লাউসেনকে দেবাস্ত্র দান করে পৃথিবীতে অপরাজেয় করেছেন, তিনিই আবার ইছাই ঘোষকে যুদ্ধজয়ের আশীর্বাদ দিয়েছেন। তিনিই আবার বাঘকে বরদান করেছেন, যতবার লাউসেন তার মুণ্ডচ্ছেদ করবে, ততবারই সে মুণ্ড জোড়া লাগবে। আসলে দেব-প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানব-প্রতীক এ চরিত্রগুলি। দৃষ্টান্ত, সুরিক্ষা নটিনী ও লাউসেনের সংবাদ। ইছাই ঘোষ ও লাউসেনের সংগ্রাম। মূলত এগুলিই শাক্তদেবী ও ধর্মঠাকুরের শক্তিশ্রেষ্ঠতা-প্রমাণের পরিস্থিতি-পট। দ্বিতীয় কথা, গ্রামজীবনের ভাবসংস্কার কবিমনে এমনই প্রবল যে তার দ্বারা আকৃষ্ট দেবতারা পর্যন্ত স্বর্গবাস ত্যাগ করে গ্রামেরই মানুষ। এই প্রবল গ্রাম্যচেতনা রূপরচনার ক্ষেত্রে স্থূলতা সঞ্চার করেছে। স্বর্গ সম্বন্ধে কবির ধারণা,

---

১ মানিকরাম

২ ঐ

কলিঙ্গা কানড়া আর সুয়াগা বিমলা।
সেনে দেখ্যা সম্ভ্রমে সবাই কুতূহলা ॥
স্বর্গ চল বলিয়া বলিলা মহীপাল।
আনন্দের সীমা নাই আজি শুভকাল ॥
এত শুন্যা চারি রাণী উর্ধ্ব বাহু নাচে।
আমা সবাকার মনে এই বাঞ্ছা আছে ॥[১]

স্বর্গে যাওয়া যেন লাউসেনের পক্ষে শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার মতই অতি সহজ ব্যাপার। আর তার চার রাণী যেন পুলকিত মনে পিতৃগৃহে চলেছে। আসলে দেবতা, দেবমাহাত্ম্য, স্বর্গ অথবা ধর্ম সম্বন্ধে কবিদের ধারণা পল্লীপরিধির বাইরে যেতে পারেনি। স্বর্গে যাবার কালে কালু যখন বেঁকে বসল,

কালু কয় মহারাজা মনে অবিসাব।
জিউ গেলে না ছাড়িব জেতের ব্যবহার ॥
স্বর্গ গেলে সদ্য যদি মদ্য মাংস পাই।
সংসার অসার বলে তবে স্বর্গ যাই ॥
সেন কন সুবা মাংস স্বর্গে নাই পাবে।
দবশন কবিবে দেবাদিদেব দেবে ॥
কালু কয় দেব দেবে মোর কিবা কাজ।
মদ্য মাংস না পেলে মাথায় পড়ে বাজ ॥[২]

সংসার যে স্বর্গের চেয়েও, অভ্যস্ত সংস্কার যে ধর্মবোধের চেয়েও বড়, এ বিশ্বাস কালুরও যেমন, কবিদেরও তেমনি। ঠিক এই জাতীয় মানসরুচির পরিচয় পৃথিবীর অন্য অংশের লোকজীবনের মধ্যেও দেখা যায়,

> The story is told of a Jesuit priest who failed to convert a group of Eskimos to Christianity because he could not honestly promise them that there were seals in heaven. Choirs of white-robed angels singing eternally in praise of God scarcely made up in the minds of these practical men for the absence of the seal, the means of their subsistence[৩]

ধর্মমঙ্গলের কবিদের বাসনা পল্লীপরিধিতে সীমাবদ্ধ। এগুলো ঠিক উপমা নয়, কবিদের কল্পনায় পল্লীপ্রভাবের নিদর্শন। তবু উপমা-নির্বাচনের

---

১ মানিকরাম। ২ ঐ।
৩ Materialism and Idealism, What is Philosophy. Howard Selsam.

পটভূমিকারূপে এদের মূল্য। আর এ কাব্যে সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে অলঙ্কারনির্ভর রূপকলার জন্ম। সংসারের ক্রিয়াকরণ, আচার-সংস্কারে মশ্‌গুল পল্লীমন,

নাভিচ্ছেদ করিলেক সোনার ঝিনুকে।
স্বর্ণ ডাবরে স্নান করাইল শিশুকে ॥
চালের খড় ফিড়্যা তখন জ্বালাল্য আঁতুড়ি।
সিজ ডাল ঢেকি দ্বারে জ্বালে আদাগুঁড়ি ॥
রঞ্জাবতী আপনি পুত্রের দেখে মুখ।[১]

এই ঘরকন্নার মাঝে কবিদের মনে রূপের ছবি এমনই ঘরোয়া কল্পনার আশ্রয়ী,—

হোসেন হুসনে দিব চাবি ভাগ্‌না বৌ।
মকরের চান্দে যেন খস্যা পড়ে মউ ॥[২]

হরিশ্চন্দ্র পালা,

এত শুনি রাজারাণী চলে ধাওাধাই।
বাছুর হারালে যেন বাথানিয়া গাই ॥[৩]

ইছাই-এর ভরসা,

করপুটে কয় ঘোষ ভরসা রাঙা পা।
পাষাণের রেখ মা তোমার মুখের রা ॥[৪]

যুদ্ধ-প্রস্তুতি,

থরে থরে বসে গেল বন্দুকী ধানুকী।
বেণাগাছের ঝোড়ে যেন বসিল জাম্বুকী ॥[৫]

এ সব রূপের ছবি যাঁর চরণ-ভরসায় জাগে, তাঁর উপাসনাবিধি নায়ক থেকে সুরু করে কবি পর্যন্ত সকলের দুর্জ্ঞেয়। পশ্চিম-উদয় পালা,

সেন কন আমি গো মানব গৃহবাসী
দেবের দুর্লভ দ্রব্য কোথা পাব মাসি ॥
সামুলা বলেন............... ....
তোমার শরীরে বাপু আছে কত পদ্ম।
শিরসি সহস্রদল সেই ব্রহ্ম-সদ্ম ॥

---

১ রূপরাম। ২ মানিকরাম। ৩ রামদাস আদক। ৪ ঐ। ৫ ঐ।

তোমার দুখানি বাহু কমলের ডাঁটা।
লোমাবলী যত কিছু কমলের কাঁটা॥
নয়ান কমল-দল বয়ান কমল।
মাথা কেটে পূজ ধর্ম ভকত বৎসল॥[১]

আর এই 'ভক্তবৎসল'এর এবংবিধ তপশ্চর্যায় সন্তুষ্ট ধর্মঠাকুরের দয়া জীবনের চূড়ান্ত অসম্ভব 'পশ্চিমে সূর্যোদয়' ঘটিয়েছে। ধর্মঠাকুরের বরপুত্র হিসেবে লাউসেনের মাহাত্ম্য ও বীরত্বের এই যদি পরিচয় হয়, তবে তাকে কেন্দ্র করে এ কাব্যের রূপচর্চায় পল্লীর মানসিকতা (mood) ফুটবেই।

---

১ ঘনরাম

শিবায়ন

শিবের গীত দীর্ঘকাল বাঙলাবাসীর বিক্ষিপ্ত স্মৃতিকে আশ্রয় করে ছিল। কবিদের প্রসাদে তারই পূর্ণগঠিত অভিজাত মহিমার রূপ এবং লোকমহিমার রূপ বাঙলা কাব্যে প্রতিষ্ঠিত হল। শিবের অভিজাত মহিমা রামকৃষ্ণের এবং লোকমহিমা রামেশ্বরের আলঙ্কারিক রূপাঙ্কনে জেগেছে। অবশ্য প্রথাগত পৌরাণিক রূপাঙ্কনের আদর্শ-অসতর্কতার রন্ধ্রপথে রামকৃষ্ণের লেখনীতে যেমন লৌকিক চিত্র ফুটেছে, তেমনি রামেশ্বরের রচনাতেও প্রথানুসরণ দেখা গেছে। তথাপি কবিবাসনার উৎস বিচারে রামকৃষ্ণ প্রথাচিত্রের রূপকার, রামেশ্বর লোকচিত্রের। প্রথমেই বন্দনাপালা,

রজত অচল কলেবরে।
আধ শশী মুকুট উপরে॥
বিশদ জটাজুট ভারা।
তাহে উরধ জলধারা॥১

ধ্যানমন্ত্রে শিবের রূপ,

"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং,২

শিবাষ্টকস্তোত্রম্-ধৃত রূপচ্ছবি,

শশলাঞ্ছিত-রঞ্জিত-সন্মুকুটং
কটিলম্বিত-সুন্দর-কৃত্তিপটম্।
সুরশৈবলিনী-কৃত-জূটপটং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥৩

রামকৃষ্ণের শিবরূপবর্ণনা সংস্কৃত ধ্যানকল্পনার অনুগত। রামেশ্বরের প্রকাশভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে পল্লী আদর্শে রচিত। ভগবতীর প্রতি হিতোপদেশছলে শিবরূপের বর্ণনা,

গঙ্গাকে গৌরব করে ধরেছিল শিরে।
গড় করি গেল সেহ রত্নাকর-নীরে॥
লক্ষ্মীছাড়া ললাটে লাগিয়া শশধর।
অর্ধভাবে অপূর্ণ আছেন নিরন্তর॥৪

---

১ রামকৃষ্ণ। ২ স্তবকবচমালা। ৩ স্তবকবচমালা। ৪ রামেশ্বর।

রামেশ্বরের প্রকাশভঙ্গি পুরোপুরি লৌকিক। গ্রাম্য উপাখ্যানের মোহ এ বর্ণনাকে বেষ্টন করেছে। এ ছবি যেন রঙ দিয়ে আঁকা নয় (যেমন, রজত অচল কলেবরে), কেবল মুখের ভাষায় গড়া। রামকৃষ্ণের ভাষাভঙ্গি কিছুটা ব্রজবুলি প্রভাবিত। কবির রচনায় কয়েকটি শিবরূপ-বন্দনা,

ভূষণ জাম্বুনদ কুঙ্কুম মৃগমদ
চন্দনচর্চিত অংস।
তড়িত সম জটা উত্তরি হেম পাটা
উরগ উবে উপবীত॥

শিবের মোহন রূপ,

বদন সুন্দর যেন শারদের শশী।
হিঙ্গুলে হীরার পাঁতি হেন দেখি হাসি॥
বচন পীযূষ সম অধরে মিলায়।
মণিবস্ত্র ভূষণ ভূষিত সর্বকায॥
কণ্ঠেতে গরল যেন কস্তুরীর শোভা।
গলায় বাসুকী যেন মুক্তাহার আভা।
চারিভুজ সুবলিত করসরসিজে।
বরাভয় দান পিণাকযন্ত্র বাজে॥
পরিসর উর কটি জিনিঞা কেশরী।
নাভি গভীর তাহে ললিত ত্রিবলী॥

হরগৌরীর রূপ,

হরের বামে হিমালয়সুতা।
রজত অচল তনু ঢল ঢল
তাহাতে কনকলতা॥
দাহিন লোচনে দেখি বিরোচনে
বামেতে উদয় শশী।

দৃষ্টান্তগুচ্ছের প্রথম রূপচ্ছবিতে কবির স্বকীয় কল্পনার বৈশিষ্ট্য। ধ্যানমন্ত্রের সহায়তা পরোক্ষ হলেও দুর্লক্ষ্য নয়। 'স্তবকবচমালা'র বিচিত্র রূপ,

১ গঙ্গাতরঙ্গ-রমণীয়-জটা-কলাপং,
২ নাগহারো নাগকেশো ব্যোমকেশঃ কপালভৃৎ॥
৩ ভুজঙ্গমেখলং দেবমগ্নিবর্ণশিরোরুহম্।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের রূপ-প্রসঙ্গে,

নয়নত্রয়ভূষিতচারুমুখং
মুখপদ্ম-বিরাজিত-কোটিবিধুম্।
বিধুখণ্ড-বিমণ্ডিত-ভালতটং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥

তৃতীয় দৃষ্টান্তের রূপ-প্রসঙ্গে,

১ গৌরীনিবস্তব-বিভূষিত-বামভাগম্।
২ হেমাঙ্গদায়ৈ চ ফণাঙ্গদায়
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায॥
চাম্পেযগৌবার্দ্ধশবীবকাযৈ, কর্পূবগৌবার্দ্ধ শবীবকায়।

৩ গিবিবাজ-সুতান্বিত-বামতনুং
তনু-নিন্দত-রাজিত-কোটিবিধুম্।

এইভাবে শিবের বিচিত্র মূর্তি কিছুটা স্বকীয়তায় কিছুটা অনুকরণে রচিত। এ রূপকর্মে উৎপ্রেক্ষা ও রূপক অলঙ্কাব প্রধান। রামেশ্বরের কাব্যের বন্দনা অংশে শিবের রূপে আলঙ্কারিক উপমান প্রায় নেই বললেই চলে। তবে আখ্যানের সরসতা সৃষ্টি কবতে গিয়ে ভগবতীর সঙ্গে শিবের যে কৌতুকচিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তাতে ব্যাঘ্রমূর্তিধারী শিবের ছদ্মরূপ অত্যন্ত মনোরম,

বেত-আঁছাড়িয়া বাঘ বেত বন হতে।
ডাক ছাড়ি ডিঙ্গা মারি দাঁড়াইল পথে॥
পুড়া পাবা মস্তক পাবক পারা আঁখি।
এমন বিপাক্যা বাঘ বিশ্বে নাহি দেখি॥
দব্যাখানি মূলা যেন দন্ত দুই পাটি।
বিদারে বিংশতি নখে বসুধাব মাটি॥
ফলঙ্গে ফিবায লেজ ফুলাইয়া গা।

কাহিনীতে কৌতুকরস সৃষ্টির আগ্রহে দেবাদিদেব শিবকে স্বর্গ-সংস্থা থেকে চ্যুত করে এমন চতুষ্পদ প্রাণীর মূর্তিতে হাজির করার দুঃসাহস একমাত্র পল্লী-কবির বাসনায় সম্ভব। ছদ্মব্যাঘের রূপাঙ্কনে অপূর্ব প্রাণবেগ সঞ্চারিত।

রামকৃষ্ণের একটি কৃষ্ণবন্দনা পদ উদ্ধৃত করি। বৈষ্ণবকবিতার প্রভাবে এ কবিতার ভাষায় পর্যন্ত ব্রজবুলির ছাপ। অবশ্য এও হতে পারে, কৃষ্ণবন্দনার জন্যেই কবি হয়ত বিশেষ করে এ ভাষার আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু পূর্বোধৃত শিববন্দনার পদেও কবির ভাষা ও ছন্দোভঙ্গি ব্রজবলি-প্রভাবিত।

নীল সমীপ নীল নব-নীরদ
তড়িতলতা তথি সঙ্গ।
রাধা অঙ্গে অঙ্গ অবলম্বন
পীতাম্বর তিরিভঙ্গ ॥
বন্দহুঁ বৃন্দাবনে ব্রজবেশ।

নয়ন ইন্দীবর মুখশশী সুন্দর
চন্দ্রক চুম্বিত কেশ ॥
পবিসর হৃদয় সদয় করুণাময়
লোমাবলী অলি পাঁতি।
কেশরী সরু কটি তুন্দ বন্ধ ধটী
প্রকটিত নটবর-ভাতি ॥

রূপাঙ্কনে কবির নিজস্বতা নেই। গোবিন্দদাস ইত্যাদি পদকর্তার বহু-অঙ্কিত চিত্রের নির্যাসে ছত্রগুলি রচিত। তবু স্বয়ং বৈষ্ণব পদকর্তা না হয়েও কবি নিষ্ঠার সঙ্গে বজসুন্দরের চিত্র অঙ্কন করতে পেরেছেন। অভিজাত রূপাঙ্কনের প্রতি কবির অধিকতর মনোযোগের এ আর একটি প্রমাণ। কবি রামেশ্বরও প্রথাবদ্ধ রূপরচনায় প্রয়াসী হয়েছেন বাগ্‌দিনীর (ছদ্মবেশিনী উমা) দেহবর্ণনার প্রসঙ্গে। কিন্তু তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত লোককল্পনা প্রথাবর্ণনার অবকাশ-স্থানগুলি অধিকার করেছে। বাসরে কাত্যায়নীর বাগ্‌দিনী বেশ,

নবীন নীরদ তনু তরুণ তিমির ভানু
রূপে আল কৈল কালসোনা ॥
ভুবন মোহন খোঁপা সন্ধী সালুকের ঝাঁপা
পেট্যা পাড়ি পরেছে সিন্দূর ॥
কমল কলিকা কুচ বুকেতে হয়েছে উচ
কদম্ব কুসুম কর্ণপব ॥

....
শুধু অঙ্গ সুধাময় অনঙ্গ তরঙ্গ বয়
মহামেঘে যেমন বিজুরী ॥
রামরম্ভা সম উরু নিতম্ব যুগল গুরু
কৃশ কটি ভ্রূকাম-কামান।

এ দেহরূপের মুখবন্ধে আছে,

দুহাতে দুগাছি মেঠে কাপড় পড়েছে এঁটে

বর্ণনায় প্রথার নির্মোক থাকলেও এর অন্তর-পরিচয় লোকভাবনাগত। এ বিষয়ে উদ্ধৃতির কতকগুলি শব্দ ও বাক্যাংশ লক্ষণীয়। 'কালসোনা', 'পেট্যা পাড়ি পরেছে সিন্দূর', 'বুকেতে হয়েছে উচ' ইত্যাদি বাক্যাংশ অভিজাত রূপাঙ্কনে সুলভ নয়। তাছাড়া এ উদ্ধৃতির পূর্বগামী ছত্র 'দুহাতে দুগাছি মেঠে' তো পুরোপুরিভাবেই লোকরূপের ছবি। কবি রামেশ্বর ভদ্রকাব্য রচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সে প্রতিশ্রুতি পালিত হয়েও এ কাব্য লোককল্পনার রঙে-রসে পূর্ণ।

রামেশ্বরের কাব্যে বন্দনাংশ সংক্ষিপ্ত। চৈতন্যবন্দনার সামান্য একটু অংশ,

> বরিষে চৈতন্য মেঘে হরি-রসধারা।
> প্রেমবন্যা পৃথিবী প্লবিত কৈল সারা।।

উপমানে কবির একনিষ্ঠ চৈতন্যভক্তির চিহ্ন। সৌন্দর্যের প্রশ্ন এখানে অবান্তর।

রামেশ্বরের রচনায় কিছু প্রথাবদ্ধ উপমান আছে। তবে সেগুলির প্রতি কবির মনোযোগ গভীর নয়, এবং তাদের উৎকর্ষ বাড়াতে কবির কোন তৎপরতা নেই। গৌরীর বাল্যলীলা,

> দিনে দিনে বাড়ে কন্যা যেন শশধর।
> শোভা করে কলান্তরে যেন জ্যোৎস্নান্তর।।
> সুবলিত ভুজে সাজে সুবর্ণের চুড়ি।
> সূর্য রহিলেন যেন সৌদামিনী বেড়ি।।
> রজতের কঙ্কণ রহিল তার কোলে।
> হাটক জড়িত হীরা দপ্ দপ্ জ্বলে।।

রতির রোদন,

> পদ্মহীন সরো যেন শশীহীন নিশি।
> স্বামী বিনা সীমন্তিনী সেইরূপ বাসি

শিবের কোচনীপাড়ায় প্রবেশ,

> এমতি যুবতিগণ পেয়ে চন্দ্রচূড়।
> বেড়িয়া বিহার করে পরম নিগূঢ়।।
> কোচনী সকল হৈল কুসুম উদ্যান।
> শঙ্কর ভ্রমর তায় করে মধুপান।।

উমার গৃহিণীরূপ। সপুত্র শিবের ভোজন,

> দিতে নিতে গতাযাতে নাহি অবসর।
> শ্রমে হইল সজল কোমল কলেবর।।
> ইন্দুমুখে মন্দ মন্দ ঘর্মবিন্দু সাজে।
> মৌক্তিকের পঁক্তি যেন বিদ্যুতের মাঝে।।

রাজগণের সহিত যুদ্ধ,

> মাংস হইল কর্দ্দম রক্তেব বহে নদী।
> অস্থি হৈল বালুকা মজ্জাব ভাসে দধি।।
> ধনুক তবঙ্গ তাতে কুর্ম্ম ছত্র ঢাল।
> হস্তী-হস্ত হৈতে জোঁক কুন্তল শৈবাল।।
> মকব কুম্ভীব বীব উরু অঙ্ঘ্রি কর।
> হাজাব হাজাব হাতী ঘোড়া ভাসে ঘব।।
> কাটা মাথা হৈল তথা কমলেব বন।
> কাটাকাটি ছুটাছুটি কবে বীব গণ।।

প্রথম দৃষ্টান্তে 'শোভা করে কলান্তরে যেন জ্যোৎস্নান্তর' বক্তব্যটি রমণীয়, কিন্তু তৎসম শব্দের আতিশয্যে প্রকাশভঙ্গি আড়ষ্ট। কন্যার রূপ শশধরের মত হলে চুড়ি-পরা হাতের শোভার কথায় সৌরকরোজ্জ্বল সৌদামিনীর উপমান লক্ষ্যভ্রষ্ট। শেষ ছত্রে হীরার দপ্ দপ্ করে জ্বলার ধ্বন্যুক্তি লোকবাসনার অতিকৌতূহলজাত। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে পতিহীনা রতির চিত্র। এ ছবি যদি প্রথাবদ্ধই হয়, তবে কেন কালিদাসের রূপাদর্শ কবি অনুসরণ করেন নি। আমাদের প্রশ্ন, এত সংক্ষেপে এবং সামান্যদ্যুতি অলঙ্কারে কবি এ রূপ-নিষ্পত্তি কেন করলেন। এ প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণের বর্ণনা অনেক উপভোগ্য,

> রতি বড় রূপবতী   বিজুলী খেলায় জুতি
> পতিব পতনে দেখি ধায়।
>
> ....
>
> বিলাইয়া রূপগুণ   লোটাইয়া পুনঃ পুনঃ
> কান্দে রতি করিয়া বিলাপ।
> ভস্মরাশি করি কোলে   ধম্মিল্ল ধূসর ধূলে
> শিখী যেন বিতপে কলাপ।।

পতিবিয়োগের মর্মান্তিক বেদনা কলাপশোভার বিস্তারে কবি নিপুণ করে দেখিয়েছেন। রামেশ্বরের তৃতীয় দৃষ্টান্তে নারী-পুরুষের বিহার-চিত্র। ভ্রমর-কুসুমের উপমান সংস্কৃত ও বাঙলা কাব্যের সর্বত্র। চতুর্থ দৃষ্টান্ত গৃহকর্মে শ্রান্ত উমার ছবি। প্রথম ছত্রেই কর্মব্যস্ততার রূপ। কিন্তু অলঙ্করণের ঝোঁকে মুখ ও ঘর্মবিন্দুর যৌগিক উপমান হিসেবে বিদ্যুতের মাঝে মুক্তাপঙক্তির রূপ বাস্তবতাহীন। পঞ্চম দৃষ্টান্তে যুদ্ধবর্ণনা। সংস্কৃত মহাভারতে রূপকে-গাঁথা এ যুদ্ধদৃশ্য একাধিকবার, বাঙলা মহাভারতেও তার রূপানুসরণ, কিন্তু সেক্ষেত্রে রূপনির্ণয় আরও বাস্তব। আলোচ্য দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় ছত্রে 'অস্থি হৈল বালুকা মজ্জার ভাসে দধি' জাতীয় নয়। প্রথারূপের প্রতি আগ্রহ আছে, কিন্তু তাদের প্রয়োগের ব্যাপারে কবির সতর্ক মনোযোগ নেই,

রূপবর্ণনায় রামকৃষ্ণের প্রথানুসরণ তুলনায় অনেক সুচারু। গৌরীর একাধিক বর্ণনায় কবি নিষ্ঠার সঙ্গে কালিদাসের কুমারসম্ভবের উমারূপের অনুগত হয়েছেন। বিবাহ প্রস্তাবে পার্বতীর লজ্জা।

> হেনকালে পার্বতী গাঁথিয়া পুষ্পমালা।
> গণেন কমলপত্র করি আন ছলা॥

কালিদাসের রচনা,

> এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
> লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী॥

এবার একে একে কবি-বর্ণিত গৌরীর রূপের বিচিত্র বর্ণনা উপস্থিত করব। ছদ্মবেশী শিব-বর্ণিত তপস্বী উমার রূপ,

> তুমি ত সুন্দরী উমা রূপে রত্নাকরসমা
> জটাজূট সমান শৈবল।
> লাবণ্য তরঙ্গ তনু ভ্রূযুগ সারঙ্গ ধনু
> নেত্রযুগ সফরী চঞ্চল॥
> বদন তোমার ইন্দু বচন অমৃত বিন্দু
> মাণিক্য সদৃশ ওষ্ঠাধর।
> দশন মুক্তার শ্রেণি কণ্ঠশোভা কম্বু জিনি
> ক্রোধে তুমি বাড়ব আনল॥

গৌরীর রূপ,

সিন্দূব তিলক ভালে যেন অবস্থিতা কালে
সীমন্তে না দেখি তাব বেখা।
দেখিয়া উজ্জ্বল রঙ্গ অরুণেব উরুভঙ্গ
উড়িতে নাহিক আখাপাখা ॥
অমবনাথ, মালঞ্চে দেখিল কমলিনী।
কুন্দল কনক কান্তি কুঙ্কুম কুসুম ভ্রান্তি
কি বর্ণিব সে ববর্বর্ণিনী ॥

গৌরীর প্রসাধন,

বেশ বিন্যাস সভে কবে মনোসুখে।
অন্ধকারে আলো কবে পার্বতীর মুখে ॥
বেণী বিনাঞ্জা পিঠে পেলিল তাঁহাব।
মণি উগাবিয়া যেন ফণী কবে চাব ॥

গৌরীর বিচিত্র অবস্থার রূপ-সন্নিবেশ। সবগুলিই প্রথাবদ্ধ অলঙ্কারের রীতি-পীড়নে জীর্ণ। ক্ষীয়মাণ উপমানকে নবীভূত করার কোন বাসনা কবির নেই। অবশ্য তিনি সর্বত্র এভাবে প্রথার দাসত্ব কবেন নি। পার্বতীর বিবাহসজ্জা,

বেশ বনাইল পরাইয়া রক্তবাস।
সিন্দূরিয়া মেঘে যেন বিজুলী প্রকাশ

দক্ষালয়ে সতীর রূপ,

দেখিয়া তাঁহারে কেহ না কৈল সম্ভাষ।
অধিক মানিনী সতী ছাড়িলা নিঃশ্বাস ॥
কম্পিত কপোল আঁখি করে ছলছল।
কমলের দলেতে তরল যেন জল ॥

বরদর্শনে রমণীগণের মনোভাব,

বালক পেলিয়া ঘরে চলিল কামিনী।
ভাদ্রের সরিৎ যেন সমুদ্র-গামিনী ॥
....
এ জন্মে শিবের আশা করহ বৃথায়।
সমুদ্রের ঢেউ যেন সমুদ্রে মিলায় ॥

নারদ দৃষ্ট দুর্গার দুঃখ,

নারদ বলেন মামী দেখি মনোদুঃখী।
সজল কমলপত্র হেন দুই আঁখি।
পতির সমান ব্রতে হইয়াছ ব্রতী।
নাহিক বিলাস ভোগ যোগে পশুপতি।।

প্রথম দৃষ্টান্তে গৌরাঙ্গী পার্বতীর দেহে রক্তবসন, যেন সিন্দূরবর্ণ মেঘের বিস্তারে বিদ্যুতের তনুরেখা, গৌরবে ও চারুত্বে কবির স্বকীয়তা গোচর করে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে অপমানিতা সতীর রূপ। বিগলিত অশ্রুবিন্দু কপোলে ঝরছে, যেন সিক্ত কমলের ঢল ঢল শোভা। তৃতীয় দৃষ্টান্তে তরঙ্গিণীর বিচিত্র প্রবাহে নারীমনের দ্বিবিধ ভাবাবেগের রূপ। নারীর সঙ্গে নদীর সাধর্ম্য-কল্পনা চিরকালের। চতুর্থ দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের সদৃশ। কবি রামকৃষ্ণ প্রথারূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে যখন একটি কি দুটি উপমানের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত শোভা প্রদর্শন করেন, তখন তাঁর সমস্ত শিল্প-মনোযোগ ঘনীভূত হয়ে বর্ণনায় মুগ্ধতা সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রথার বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ রূপাঙ্কনে তাঁর কবি-সংযম তরলিত (diluted)। বামনাবতারের রূপবর্ণনা,

নাভিতে দেখিল নভ উদরেতে সিন্ধু।
হৃদয়ে দেখেন মনরূপে আছে ইন্দু।।
নাড়ীরূপে শরীরেতে দেখে নদ নদী।
লোমকূপে দেখে বৃক্ষ যতেক ওষধি।।

দিবস রজনী তাঁর উন্মেষ নিমেষে।
আকাশ মস্তকরূপে মেঘ তাঁর কেশে।

বিষ্ণুর এ বিশ্বরূপ সংস্কৃত মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত আছে। এ বিস্ময়বোধক রূপমূর্তি স্রষ্টা সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতিকে তত্ত্বমণ্ডিত করে।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিল্পভাবনা একান্তভাবে গৃহমুখী। শিবদর্শনে শ্বাশুড়ীদের জামাই-নিন্দার প্রসঙ্গ স্মরণ করি,

নিরন্তর থাকি দেখি নহি সতন্তরা।
হাড়ির মুখের মত হয়ে গেল সরা ॥
ভাগ্যবানের বেটি ভাগ্যবানেব পো।
সোনায় সোহাগা যেন মিলায়ন গো ॥

গৃহস্থালীর নানান উপকরণে ঘরগড়া প্রীতি-মমতার সম্পর্ক দরদ দিয়ে এঁকেছেন কবি। মেনকার বিলাপচিত্র,

ঝি-সোহাগী মাগি কবে ঝিয়েব বড়াই।
চাঁদেব গায মলিন আছে বাছাব গায নাই ॥
আকুল হযেছে প্রাণ উঠেছে উদ্বেগ।
চক্ষু দুটী স্রবে যেন শ্রাবণেব মেঘ ॥

কন্যার দুর্ভাগ্য-কল্পনায় জননীর কাতরতা। মা-মেয়ের স্নেহ ও আবেগের মধ্যে সমস্ত বিশ্বসংসার লুপ্ত। রামেশ্বর ব্যাপক রূপাঙ্কনেব প্রয়াসী ছিলেন না। জীবন ও জগৎকে ঘরোয়া মানুষের বারোমাসী সুখ-দুঃখের গভীরে মগ্ন একটি বিন্দুব মত নিটোল করে দেখেছেন তিনি। শিবের কৃষিযন্ত্র নির্মাণে বিশ্বকর্মাব শূলভঙ্গের চেষ্টা,

দড়বড়ে দৃঢ় কবে দিলেক দ্বিগুণ।
ফোঁস ফোঁস কবে জাঁতা ফুকবে আগুণ ॥
দডবড তুলে পাড়ে দেয় দুমদাম।
দবদব দেহ বেযে পড়ে কালঘাম ॥
শ্রমভবে বাবেবাবে ছাড়ে হুহুঙ্কাব।
নাসাপুটে ঝড ছুটে বটে মাব মাব ॥
কর্ম্ম করি কামিলা কবিল হাঁই ফাঁই।
সারাদিন পিটে শূলে দাগ বসে নাই ॥
ছড নাহি গেল শূলে গড কবি ছাড়ে।
কব দিয়া কাঁকালে কামিলা কোঁত পাড়ে ॥

নারদের কৈলাস গমনোদ্যোগে ঢেঁকির সজ্জা,

কুন্দলের ধূকড়ি ঢেঁকির পিঠে জিন।
কসনি কুশের দড়ি লাগাম বিহীন ॥
রেবাক বাবুই বাসা বাঁধে দুই পাশে।
কোট্যেক কন্দল যার কটায় নিবাসে ॥

শুখান শোনের শুঁটি ঘাঘবেব ঘটা।
শিরীষের শুঁটি সব শোভা পাইল পাটা।।
তিতপলা পুরুলের ছোটবড় ঘাটা।
মনোহর গজকা মাথায় মুড়া ঝাটা।।
ছোট বড় থোপ দিল থুপি ঝিঙ্গাব জালি।
দুটি চক্ষু দান দিল দিয়া চূণ কালী।।
পুবাতন কুলাব কবিয়া দুই কান।
হবষিত হয়ে ঋষি হেসে পাক যান।।
ঢেকি বলে বিলক্ষণ সাজিলাম আমি।
অতঃপব আপন সাজন কব তুমি।।

প্রথম দৃষ্টান্তে কোন উপমান নেই। কেবল কথাব কথায কামারশালাব ঘর্মাক্ত কর্মোদ্যোগের জীবন্ত ছবি ফুটেছে। লোকবাসনার নিবিড় গণ্ডীতে ধরা পড়ে রূপের প্রত্যক্ষতা অনেক বেড়েছে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে নারদমুনির বাহন ঢেঁকিকে অশ্ব কল্পনা কবে তার সাজসজ্জায পল্লীব প্রিয অথচ হাস্যকব উপমান সংগৃহীত। 'শুখান শোনের শুঁটি', 'মুড়া ঝাটা,' 'চূণ কালী', 'পুবাতন কুলা' ইত্যাদি নিত্যদৃশ্য বস্তু। সৌন্দর্যবৃদ্ধিব বদলে এগুলি ঈষৎ-স্থূল উপভোগ্যতা এনেছে। আসলে ঢেঁকিকে ঘোড়া বানিয়ে তোলাব পরিকল্পনা লোককৌতুক-জনক। উপমান-চয়নও কবি-ইচ্ছার যোগ্য।

অপ্রধান মঙ্গলকাব্য

রায়মঙ্গল কমলামঙ্গল শীতলামঙ্গল কাব্য কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী-ধৃত। ষষ্ঠীমঙ্গল এ কবির রচনা। সেখানে উপমার প্রসারিত ভাবাষঙ্গ নেই। অন্নদামঙ্গল কাব্যখানি বিবিধ বিদ্যাসুন্দর অলোচনার পর্বভুক্ত করেছি।

আলোচ্য তিনখানি কাব্যে যে দু'চারটি উপমা পাওয়া যাচ্ছে, তাদের ব্যাপক কোন ভাবমণ্ডল নেই। রূপাঙ্কনের ক্ষেত্রগুলি প্রায়ই শ্রেষ্ঠ কোন না কোন মঙ্গলকাব্যের রূপাদর্শে গড়া। এমনকি কাহিনী গঠনেও (যেমন, দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্যগমন, কমলেকামিনী-কথা, পুত্রের দ্বারা পুনরুদ্ধার ইত্যাদি) প্রধান কাব্যগুলির অনুকরণচিহ্ন ধরা পড়ে। মধ্যযুগীয় কাব্যপর্বে এমন অনেক ক্ষণজীবী 'মঙ্গল' লেখা হয়েছিল।

কবি কৃষ্ণরাম দাস দক্ষিণরায়ের রূপবর্ণনা করেছেন। বন্দনাকারে এ বর্ণনা একাধিকবার পাওয়া যায়,

> পূজিয়া দক্ষিণ রায় করেন স্তবন॥
> ইন্দু নিন্দি বদন মদন জিনি রূপ।
> তোমা বিনা কেবা আছে দক্ষিণের ভূপ॥

বন্দনায় রূপের আতিশয্য কবিকে বাস্তবতাভ্রষ্ট করেছে। মুকুন্দরামের কাব্যে বাঘের যথাযথ রূপবর্ণনা স্মরণ করি। অন্যত্র কবি তাঁর এ রূপ-ভ্রান্তি সংশোধন করেছেন,

> সোনার বরণ তনু অশ্বিনী নাগর জনু
> নিসাদনি অশনি বিজয়।
> বিশাল লোচন জোড় শ্রবণ অবধি ওর
> চাহনি চমকে রিপুচয়॥

এরপরই বড় খাঁ গাজীর বিরুদ্ধে সজ্জিত ব্যাঘ্ররূপের পরিচয়ে কবি আরও সম্ভাব্যতার অনুগত,

> দুইটা চক্ষু দিযটী করিয়া ভ্রূকুটি
> চলিল ছুটিয়া ঘোড়া।
> যেন পড়ে উলুকা লাপে লাপে লম্ফা
> লেজ যেন সুন্দরিয়া কোড়া॥

....

বড় বাঘ দারিয়া হাতি ফেলে মারিয়া
হাত তার যেন কুলা।
জুড়ি নাহি অলপে বিদ্যুৎ ঝলকে
মুড়িফাল দন্তগুলা ।।

দু'একটি রূপের উপমান যা পাই (যেমন, হাত যেন কুলা, চক্ষু দেউটি, লেজ স্থন্দরিয়া কোড়া ইত্যাদি), তাতে প্রথার অনুগমন নেই, প্রকাশভঙ্গি অনেকাংশেই লৌকিক।

এবার অন্য প্রসঙ্গ। পিতা দেবদত্ত কমলেকামিনীর কুহকে পড়ে দক্ষিণ পাটনে রাজদ্বারে বন্দী। পুত্র পুষ্পদত্ত দৈবানুগ্রহে সে মায়াকুহক ভেদ করেছে। সম্প্রতি দক্ষিণ পাটনের অধিকারী রাজার কন্যাকে বিবাহ করে রাজসুখভোগে আত্মবিস্মৃত সে। অকস্মাৎ দেবতার প্রসাদে তার দায়িত্বচেতনা ফিরে এল। ব্যথিত পুত্রের মর্মগ্রাহী চিত্র কবি এঁকেছেন,

আছে কি না আছে মোর বৃদ্ধ দুই মাতা।
স্ত্রীর বাধ্য হইয়া কৌতুকে আছি এথা ।।
রাজকন্যা রত্নাবতী শুয়েছিল কোলে।
তিতিল তরুণী তনু পতি নেত্র জলে ।।

এখানে একটিও উপমা নেই, শেষচত্রে সামান্য একটু অনুপ্রাস। কিন্তু কথার কথায় মানুষের বেদনাবোধ কত গভীর।

অল্পায়তন কমলামঙ্গল কাব্যে কবি কৃষিশ্রীর লক্ষ্মীমন্ত রূপব্যঞ্জনা দিয়েছেন। বিপদসৃষ্টির দ্বারা ভক্তকে পরীক্ষা করার কালেও সেই কৃষি-সমৃদ্ধির স্মৃতি ছবির পট থেকে মুছে যায়নি।

পাইয়া মনুষ্যগন্ধ তুলিলেক ফণা।
....
বেগেতে ধাইয়া আসে মুখখান মেলি।
বিস্যা দুই ধান্য ধরে যেন বড় ডুলি ।।

অজগর সাপের মুখগহ্বরের উপমান চয়নে কবি ধান মাপার পাত্রের শরণ নিয়েছেন। আর একটি দৃষ্টান্ত,

ছট্‌ফট্‌ করে সর্প উগারে গরল।
গোটা তিন তালগাছ জিনিয়া দিঘল।।

সাপের দৈর্ঘ্য বর্ণনাকালে পল্লীর নিজস্ব বন-সম্পদের কথা। এ রূপে সৌন্দর্যের অতীন্দ্রিয়তা নেই, কিন্তু লোকবাসনায় বিমণ্ডিত সরল একটি দৃষ্টি ফুটে ওঠে।

ঘটনান্তরে রাক্ষসীর অবরোধ থেকে রাজপুত্র কর্তৃক মুক্ত রাজকন্যার পুলকিত মনের ছবি,

বজনী বঞ্চিল শুভ পতিব সহিত।
উদয তিমির পদ্ম হইল বিকশিত।।

উপমাক্রিয়া নিঃসন্দেহে উচ্চাঙ্গের। পদ্মের কুঁড়ি যেমন আপন শোভার গহনে বসে তার পূর্ণ বিকাশের প্রতীক্ষায় অবরোধের দিন গোনে, রাজকন্যার অদৃষ্ট-তিমির যেন তেমন করেই সকাতরে একটি প্রভাতলগ্নের কাল গণনা কবেছিল। উষার আলো এসে যেমন শতধারায় আপনাকে মেলে ধরে, তেমনি করেই ভাগ্যের উন্মুদ্র কমলকোষ আপনাকে শতদলে বিকশিত করেছে। এ রূপ-কথা প্রথাবদ্ধ। কিন্তু প্রভাতকল্পা শর্বরী অথবা বিকচোন্মুখ শতদল,—কোনটি যে রাজকন্যার ভাগ্যপট-বদলের উপমান, তা যেন ধরার উপায় নেই। মনে হয়, নিগূঢ় এক কার্যকারণেব যোগে এ দুটি রূপ একত্রে রাজকন্যার নবলব্ধ সৌভাগ্যকে স্বাগত জানিয়েছে।

কমলার ধান্যময়ী রূপবর্ণনা। ধান্যের বিবিধ বর্ণ ও প্রকার যে এভাবে দেবীর বিবিধ ভূষণ-আভরণ হতে পারে, এ রচনায় তা প্রথম উন্মোচিত হল,

কমলা দেবীব মায়া দেখ সর্বজন।
....
আভবণ ধান্যের পবিযা নববঙ্গে।
....
তবে ত কনকচুব পবিলেন পাসুলি।
নূপুর গরুড় ধান্য সিতভোগগুলি।।
....
পারিজাত ধান্যের পরিলা বক্ষহার।
....
সূর্যভোগ চন্দ্রমণি কোমরে পরিল।
নয়ানে অঞ্জনলক্ষ্মী কাজল করিল।।

মুক্তাশালী সিতায় সিন্দূর শোভা পায়।
কবরী আঁটিল ধান্য কামিনী জটায়॥
....
মুক্তাঝুরি পাটখোপ পিঠেতে দুলিল॥

দেহের এক এক অংশে আভরণ-যোজনার জন্য ধান্যের ধ্বনিময় নাম নির্বাচনের কি অপূর্ব দক্ষতা! কনকচূড় ধান্যের পাশুলি, পারিজাত ধান্যের বক্ষহার, অঞ্জনলক্ষ্মী ধান্যের কাজল, মুক্তাশালী ধান্যে সিথির সিঁদূর,—এগুলি শোনার পর মনে হয়, এ সব ধান্য-নামের ধ্বনিঝঙ্কার শুধু দেবীদেহের লক্ষ্মীমন্ত ভূষণ হবার জন্যেই যেন রচিত হয়েছিল। এ ছবিতে আপক্কধান্যভারনম্রা দেশমাতার প্রতীক রূপ আভাসিত। দেশমাতৃকার এমন লাবণ্যময়ী মূর্তিকল্পনা মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে আর নেই।

শীতলামঙ্গল কাব্য থেকে দুটি উপমা সংগ্রহ করেছি। পল্লীশ্রীর স্মৃতি-তন্ময়তা কাব্যের চরণগুলিতে মাখামাখি হয়ে আছে। দেবী শীতলার বন্দনা,

কটিতে কিংকিণী চরণে নূপুর
ধান-চারা বিরাজিত অঙ্গ।

'স্তবকচমালায়' শীতলার ধ্যানমন্ত্রে পাই, 'পয়োদবদনাং বন্দে'। সম্ভবত দেবীর কৃষ্ণাঙ্গ রূপের কথাই উদ্দিষ্ট। এখানে কবি 'ধান-চারা বিরাজিত অঙ্গ' এই ছত্রে দেবীর একাধারে দেহবর্ণ ও দেহলাবণ্যকে প্রকাশ করতে চান বলেই আমাদের ধারণা। চারা ধানের রঙ কচি কলাপাতার মত হাল্‌কা সবুজ। তদুপরি তার প্রাণের সতেজ লাবণ্য। কবি হয়ত উক্ত বর্ণ এবং তার রূপলক্ষণের থেকে ছানিয়ে নিয়ে শীতলার কান্তি নির্মাণ করেছেন। ভক্তকে পরীক্ষা করার কালে ব্যাধির প্রকোপে পীড়িতের রূপ,

কৌতুকে পরিল গলে প্রবালের হার।
রক্তদল বসন্তেতে প্রাণ যায় তার॥

প্রবালের হার পরা এবং রক্তদল বসন্ত হওয়া যেন স্বতন্ত্র ঘটনা নয়। বক্তব্য দুটি এতই সন্নিহিত যে, মনে হয় যেন প্রবালের হারই রক্তদল বসন্ত। 'প্রবালের হার' কবির আহৃত উপমান। 'কৌতুকে পরিল' বাক্যাংশটি না থাকলে আমরা বিনা দ্বিধায় সেকথাই বলতে পারতুম। এখানে কবির প্রকাশভঙ্গিগত অর্থ সংশয়াত্মক হওয়ায় রূপসঙ্কেত বেশ সূক্ষ্ম। সৌন্দর্যের ব্যাপক পরিধি না থাকলেও দু'একটি ক্ষেত্রে কবি শিল্পশোভার গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছেন।

অষ্টম অধ্যায়

সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী কাব্য

দৌলৎ কাজীর সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী রাজসভার পোষকতায় রচিত কাব্য। গৌড়দেশে প্রচলিত লৌকিক প্রণয়কাহিনী স্থানান্তরিত হতে হতে সুদূর আরাকান রাজসভায় পেঁাছেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে রোসাঙ্গরাজের প্রশস্তি দিয়ে কবি কাব্য সুরু করেছেন,

একদিন ইচ্ছা হৈল সুধর্ম রাজাব।
সসৈন্য সমস্ত চলে বিপিন বিহাব।।

....

নানাবর্ণ নৌকা সব দেখি চারিপাশে।
নব শশিগণ যেন জলে নামি ভাসে।।

....

দশদিন পন্থ নৌকা একদিনে যায়।
সুবর্ণের হংস যেন লহবী খেলায়।।
বজতেব বৈঠা সব শোভন নৌকাব।
জল সিঞ্চে স্বর্ণ পাখী পক্ষ যে রূপাব।।
দেব সিংহাসনে যেন ইন্দ্র শোভা কবে।
দীপ্তিমন্ত নৌকা যেন বিজলি সঞ্চাবে।।

....

বনে ভ্রমে বাজসেনা বিচিত্র-বসন।
বিকচ কুসুম যেন শোভে বৃন্দাবন।।

রোসাঙ্গরাজ সুধর্মের নৌবিহার। স্বর্ণখচিত নৌকাগুলি জলে ভাসছে, দেখে মনে হয় আকাশের এক চাঁদ অনেক হয়ে জলে নেমেছে। নৌকার গতিভঙ্গি মরালের মত সম্ভ্রমপূর্ণ। দু'পাশে রূপোর বৈঠা পড়ছে তালে তালে, যেন সোনার পাখি রূপোর পাখনা ছড়িয়ে জল ঝাড়ছে। রূপাঙ্কনে স্বর্ণ-রৌপ্যেব রাজৈশ্বর্য-ছটা যেমন, তেমনি নিপুণ উপমান-বিন্যাস। নৌকার দু'পাশে একাধিক বৈঠা যখন তালে তালে ওঠানামা করে, তখন পাখির ডানা নাড়ার ছন্দে আমাদের রূপস্মৃতি কম্পিত হয়ে ওঠে।

রাজবৃত্ত এ কাব্যের রূপবর্ণনার মূলকথা আভিজাত্যগৌরব। এ রচনার পোষ্টা রাজ-অমাত্য, ভাবাষঙ্গ রাজ-পরিমণ্ডল, বিষয়বস্তু রাজকীয় জীবনকাহিনী। ফলে লোকায়ত রূপভাবনার বদলে এ কাব্যে প্রথাদর্শ বড় হতে বাধ্য। 'কথারম্ভে' ময়নাবতীর রূপবর্ণনা,

কি কহিব কুমারীর রূপের প্রসঙ্গ।
অঙ্গেব লীলায় যেন বান্ধিছে অনঙ্গ।।

....

চঞ্চল যুগল আঁখি নীলোৎপল গঞ্জে
মৃগাঞ্জন শবে মৃগ পলায় নিকুঞ্জে।।

. ...

ঘন-চয-রুচিকেশ শিরেতে শোভন।
প্রভা ছাড়ি ভানু যেন তিমির-শবণ।।

. ...

নির্মল বাতুল অঙ্গ কেতকী সমান।
ভবমে ভ্রমর-পাঁতি ধবএ যোগান।।

প্রত্যঙ্গবাচী দেহবর্ণনার অংশবিশেষ। প্রথাবদ্ধ উপমানে রূপের রাজকীয়তা স্পষ্ট। বাজা লোরের বনগমনে রাণী ময়নার বিরহ,

বাজাব বমণী কামেব কামিনী
সেই হৈল একাকিনী।
যৌবন জঞ্জালে বান্ধি চিত্তানলে
তেজিতে চাহে পবাণী।।

বিরহিণী রাণীর অন্তরের অভিযোগ,

পুরুষ ভ্রমব কঠিন কলেবব
অন্তবে বাহিবে কালী।

পরিত্যক্তা বধূর যৌবন আবর্জনার মত। সতী ময়না চিত্তের অনলে ব্যর্থ প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্যত। কাব্যকাহিনীর অন্য নায়িকা চন্দ্রানীর মত স্বতন্ত্রা নারী সে নয়। একদিকে পতিবিরহ এবং অন্যদিকে সতীত্বরক্ষার রূপচ্ছবি এ কাব্যের ভাববস্তু। পুরুষ চরিত্রের প্রতি ময়নামতীর অভিযোগও আমরা শুনি। ভ্রমরের উপমান, পুরুষচিত্তের প্রসঙ্গে ময়নার তৎকালীন দুর্ভাগ্য বিচার করে সার্থক প্রয়োগই বলব।

কিন্তু ময়নার দুর্ভাগ্য একক নয়। আর একজন পুরুষ (ছাতন) তার প্রণয় কামনা ক'রে দূতী নিয়োগ করেছে। ছাতন প্রতিবেশী রাজার ছেলে। কিন্তু ময়না মনেপ্রাণে সতী। কবি অল্পকথায় দূতীর চরিত্রের সাঙ্কেতিক রূপ-পরিচয় দিয়েছেন,

তাহাতে দুর্মতি দূতী রচিয়া কপট উক্তি
সদায় না তেজে ময়না পাশ।
যেন শুক বধ আশে মার্জার খোপেতে বৈসে
শিবা যেন মৃগের বিনাশ।।

বিড়ালের ধৈর্য্য, কপট সাধুতা ও গোপন আক্রমণের সন্ধানতত্ত্বকে উপমান করে কবি এই দুষ্টা দূতীর অভিপ্রায়ের রূপাঙ্কন করেছেন। সতী ময়নার বারোমাসী দুরদৃষ্টের সঙ্গে এই দুষ্ট গ্রহটিও একাত্ম হয়ে আছে। ভোগের প্রলোভনচিত্র রচনা করে সে তাকে উত্তেজিত করতে চায়,

আইল শ্রাবণ মাস দেখলো বিদিত।।
শ্যামল সুন্দর ঋতু ঘন-চয-রুচি।
নিত্য নব নীর বর্ষে সুনির্মল শুচি।।

তিতিল সকল দেহ কুচে ধারা বহে।
ঊর্দ্ধ কুম্ভ মুক্ত যরি যেন বৃষ্টি সহে।।
তিতিল অঙ্গেত যদি পাটম্বর শাড়ি।
অঙ্গে বস্ত্র লাগে যেন বস্ত্রহীন নাবী।।
তাতে নাবী পুরুষেব জর্ময বিগাব।
দোহ মেধ্যে না বহয় বসন লজ্জাব।।

ময়নামতীর সকরুণ উত্তর,

শাঙন-গগন সঘন ঝবে নীব।
তবে মোর না জুড়ায এ তাপ শবীব।।
মদন-অসিক জিনি বিজলীব রেহা।
থরকএ যামিনী কম্পয় দেহা।।
না বোল না বোল ধাই অনুচিত বোল।
আন পুরুষ নহে লোব সমতুল।।

মালিনীর সম্ভোগচিন্তা স্থূলের ইঙ্গিতবহ। এ নারী বিরহকে কেবল সম্ভোগার্তি বলেই জানে। আকাশের যে বিদ্যুৎ পৃথিবীর তাবৎ বস্তুর শোভাবৃদ্ধির সহায়ক, ময়নামতীর দৃষ্টিতে তা মদনের অসিপ্রহারের মত যন্ত্রনাদায়ক। রূপবর্ণনার মাধ্যমে প্রেম বিষয়ে দূতী-দৃষ্টি ও বিরহিণী-দৃষ্টি স্বতন্ত্র স্বরূপে আবিষ্কৃত। দূতী সম্ভোগকেই চেনে, সতী জীবনের পরম মূল্যের সন্ধান রাখে। তথাপি দূতীর এ নাগরালির শেষ নেই,

ধন নষ্ট হৈলে পুনি উপার্জনে পায়।
অগ্নিশেষ হৈলে পুনি পাথবে জন্মায়॥
চন্দ্র সূর্য অস্তংগতে পুনি উগি যায়।
যৌবন চলিয়া গেলে পলটি না পায়॥

যেহেতু,

জোয়াবেব পানি যে নাবীব বয়স।
যাবৎ না পড়ে ভাটি ভুঞ্জ বতিবস॥

মালিনী দূতীর শেষ উক্তি,

শুনহ উকতি কবহ ভকতি
মানহ সুবতি বাই।
নাগব সুজন মিলাইয়া দেম
(যেন) রাধাব কোলে কানাই॥

একাধিক দৃষ্টান্তে অবাধ্যকে বশীভূত কবাব উপমান। কিন্তু জীবনের গহন স্বরূপ যে একবার জেনেছে, মবণের চূড়ান্ত আঘাতেও তার স্খলন নেই।

দিনে দিনে পীড়া বাড়ে বিবহেব শোকান্তবে
চন্দ্র কলা যেন যায় জবি॥

একনিষ্ঠ পতিপ্রেমেই ময়না সতী। বাবোমাসেব নিসর্গপীড়ায় সে প্রেম অগ্নি-শুদ্ধ।

এ কাহিনীতে রূপের কথা প্রথানুগত। সেই প্রথারূপকে পুনরঙ্কিত করতে কবির নিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য। আব তাতেই অনতিজটিল জীবনকথা সুন্দর আত্ম-পরিচয়ের পথ পেয়েছে।

পদ্মাবতী কাব্য

কবি আলাওলের পদ্মাবতী আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত আর একখানি কাব্য। মালিক মহম্মদের 'পদুমাবৎ' প্রণয়কাব্যের ক্বচিৎ-স্বাধীন ক্বচিৎ-মূলানুগত অনুবাদ। রাজসভার গৌরবদীপ্তি তৎসহ কবির রসশাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য মিলে এ কাব্যের প্রসাধন একটু বেশিমাত্রায় উপমাপিষ্ট। তবু এমন বিশদ ও নিপুণ রূপবর্ণনা মধ্যযুগীয় বাঙলাকাব্যের কোথাও নেই। প্রথাবদ্ধ প্রাচীন বর্ণনা কবিকে নতুন নতুন রূপ-উন্মেষে উদ্দীপ্ত করে দিয়েছে। মালিক মহম্মদের কাব্যে 'স্ত্রীভেদবর্ণন খণ্ড' বাদ দিলেও পদ্মাবতীর দেহরূপের 'দ্বাদশ লক্ষণ' বর্ণনা অথবা রতি-বিহারের বিচিত্র পদ্ধতি-বর্ণনা আলাওলের কামশাস্ত্রীয় জ্ঞানের পরিচায়ক। কাব্যের শেষে জায়সী কাহিনীর আধ্যাত্মিক রূপক-নির্মোক ভেঙে দিয়েছেন। চৌদ্দ ভুবনের সব কিছু আছে মানুষের ঘটে। চিতোর মানবদেহ, রাজা রত্নসেন মন, সিংহল হৃদয়, পদ্মাবতী (পদ্মিনী) বুদ্ধি, শুক পথনির্দেশকারী গুরু, রত্নসেনের প্রথমা পত্নী নাগমতী দুনিয়া-ধান্ধা, রাঘবচেতন শয়তান, আলাউদ্দীন-সুলতান মায়া। কবি বলেছেন,

> প্রেম-কথা এহি ভাঁতি বিচারহু
> বুঝি লেহু জৌ বূঝৈ পাবহু।

সূফীসাধক আলাওলের রচনায় এ রূপকটীকা বাদ পড়া সম্ভব ছিল না, হয়ত বাঙলা পদ্মাবতী পাঁচালীর লুপ্ত শেষাংশে সেটুকু ছিল।[১]

স্বষ্টিরহস্যের বর্ণনা দিয়ে কবি আলাওল কাব্যারম্ভ করেছেন,

> সুখ মর্ম দুঃখ বিনে না জানে রাজন।
> বন্ধ্যা জনে নাহি জানে প্রসব-বেদন।।
> যৌবনের মর্ম জানে যার জীর্ণ কায়।
> সুস্থ মর্ম না জানে অসুস্থ যার গায়।।

অধ্যাত্মরহস্য অনুভূতিসাপেক্ষ,—এই কথাটি কবি তত্ত্বপ্রকাশক উপমানের দ্বারা কাব্যে হাজির করেছেন। রূপকাব্যের উপমা বর্ণনার আগে সকল রূপের মূল অনাদি দেবতার মহাত্ম্য কবি স্মরণ করেছেন,

---

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, শ্রীসুকুমার সেন।

প্রভুর স্বজিত রূপ কহিতে অনন্ত।
তাহাতে কবিল বিধি নানা গুণবন্ত ॥
আরবি ফারসি আর মঘা হিন্দুয়ানি
নানা গুণে পুরাণ সঙ্কেত জ্ঞাতা গুণি ॥
কার্ব্ব অলংকার জ্ঞাতা হস্তেক নাটিকা।
সিল্পগুণ মহৌষধ নানা বিধি সিক্ষা ॥

কবি পরোক্ষে আপন বহুভাষাজ্ঞানের পরিচয় সবিনয়ে নিবেদন করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন,

কাব্যরত্ন জতেক লুটিল অগ্রগামি।
পিষ্টগামি হৈয়া তথা কি পাইব আমি ॥

তথাপি রসোপলব্ধির বলই এ কবির রচনার সম্বল। কাব্য প্রকৃতপক্ষে কি, উপমায় কবি সে পরিচয় দিয়েছেন। 'সিঙ্গল দিপের বয়ান',

কাব্যকথা সকল স্নুগন্ধি ভরিপুর।
দুরেত নিকট হয় নিকটেত দুর ॥
নিকটেত দুর জেনো পুষ্পেতে কলিকা।
দূরেত নিকটে মধু মাঝে পিপীলিকা ॥
বনখণ্ডে থাকে অলি কমলেতে রস।
নিয়রে থাকিয়া ভেকে না জানয় রস ॥

প্রকাশভঙ্গি ভাবগভীর। পুষ্পমুকুল প্রস্ফুটিত পুষ্পের পূর্বাবস্থা হলেও তাদের বর্ণে-গন্ধে, আকারে-প্রকারে কত ভেদ। অথচ এই মুকুলের মধ্যেই পুষ্পবিকাশের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি। সব মানুষের প্রাণেই কাব্যভাবের মুদ্রিত মুকুল আছে, কিন্তু প্রকাশের শক্তি যার করায়ত্ত, সে-ই কেবল অন্তরকথাটি কবিতার শতদলে মেলে ধরতে পারে। কাব্যশক্তি এবং তার সৌরভ-রহস্য বড় বিচিত্র। দূর বনের মধুকর মধুলোভে কাছে আসে কিন্তু অতি নিকটের ভেক তার সন্ধান পায় না। তুলসীদাস বলেছেন, পদ্মের পাপড়িতে রুদ্ধ থেকে অরসিক ভ্রমর তার সুন্দর পরাগ ছিন্ন ভিন্ন করে, কিন্তু ক্ষণিকের মধুকর এ মাধুরীর সুরভিরস পান করে। কবি আলাওল উপযুক্ত কবিত্ববোধ নিয়ে এ প্রণয়কাব্য রচনা করেছিলেন। সরোবরের শোভা বর্ণনা,

দিগি পুস্কর্ণি কূপ দেখিতে শোভাকার।
মথন তরাসে লুকাইছে পারাবার ॥
....

প্রফোল্লিত কুমুদিনী অতি মনোহরা।
জেনো দেখি শুশোভিত গগনের তারা
সরোবরে নামি জল তোলয় জিম্বুত।
উথলয় মৈৎস্ব জেনো চমকে বিদ্দুত॥
হংস চক্রবক আদি চবে জলচব।
শ্বেতাশ্বেত রক্ত পিত নানা বর্ণধব॥
নিশির বিচ্ছেদে চক্রবাক মৌন মুখে।
দম্পতি দিবসে কেলি কবে মন শুখে।

সমুদ্রের মন্থনভীতি প্রকাশের ছলে কবি পুষ্করিণীর বিশাল আয়তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। স্বচ্ছ জলতলে ক্রীড়াশীল মৎস্য চকিত অশনি-কশার মত দীপ্ত। এ রূপে প্রথাচিহ্ন আছে, কিন্তু প্রকাশের অবলীলায় তা কবির নিজস্ব।

পদ্মাবতীকে গর্ভে ধারণ করে জননীর অপরূপ দীপ্তি কবি বর্ণনা করেছেন,

দুতিযার চন্দ্র জেন নিত্য বাড়ে কলা।
দিনে দিনে দেবির শবিব নিবমলা॥
অঞ্চল অন্তরে জেন দিপেব উজ্জ্বল।
তেহেন দেবিব হিযা হইল নিবমল॥
সম্পূর্ণ হইল জদি স্বভ দশ মাস।
জন্মিলেক পদ্যাবতি জগতে প্রকাশ॥

মাতৃগর্ভে পদ্মাবতী, যেন আঁচলের আড়ালে দীপশিখা আসন্না নারীর রূপ-বর্ণনাকালে পদ্মাবতীর রূপ-সম্ভাবনা পরোক্ষে ব্যক্ত। পদ্মাবতীর শৈশবের রূপবর্ণনা প্রথাবদ্ধ,

লাজে পূর্ণ চন্দ্র দিনে ২ হয ক্ষিন।
সংসার ছাড়িয়া লুকাযন্ত দুই দিন॥
অল্পে অল্পে বাড়ি পুনি হয় পূর্ববিত।
নিস্কলঙ্ক তাব তুল্য নহে কদাচিত॥

চন্দ্রকলার উপমানে পদ্মাবতীর রূপবৃদ্ধির ক্রম বর্ণিত। এই রূপবতী পদ্মা-বতীই যৌবনে পদার্পণ করল,

কামধনু জিনিল ইশিচত ভুরু ভঙ্গে।
কটাক্ষে হরয় প্রাণ নয়ন-কুরঙ্গে॥
স্বক চঞ্চু নাসিকা কমল মুখে চাহে।
পদ্মিনির দেখি মখ জগমন মোহে॥

অধর মাণিক্য তুল্য দন্ত যেন হির।
হৃদয় হইল কুচ কনক জামিব'* ।।
সে করি জিনিয়া কটি মর্ত্ত গজ গামি ।।
সুব শশী দেখিয়া মস্তকে ধবে ভূমি ।।
সংসারে নাহিক দৃষ্টি নয়ান আকাশে।

*জামির-এক জাতীয় ফল, দেখতে বাতাবী লেবুব চেযে একটু ছোট আকাবেব।

রূপবর্ণনা প্রথাবদ্ধ। বক্ষোদেশের উপমানটি প্রথাপিষ্ট নয়। শেষ ছত্র কবির স্বকীয়তার পরিচায়ক। কবি এখানে প্রথাব অনুগত নন, তাহলে এ নয়নকে নক্ষত্রের সঙ্গে উপমিত করতেন। প্রথা থেকে মুক্ত হয়ে এ রূপাঙ্গ এক অনির্ণেয় উপমানের ব্যঞ্জনা দিয়েছে। সেই সঙ্গে একটি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক গৌরবছটা মৃদুভাবে ফুটেছে। পদ্মাবতীব সায়রলীলা,

সববব মোহিত কন্যাব রূপ হেবি।
পদ দবশন হেতু কবয লহবি ।।
....
কুবলয কেশ জেন ব্রিসধব গণ।
বযান কমল মাঝ নযানে খঞ্জন ।।
... ...
এক চন্দ্র দেখ গগনে নিসাকালে।
দিবসে দোসব চন্দ্র প্রবেসিল জলে ।।

প্রথম ও শেষ স্তবক মনোহারী। সরোবর পদ্মাবতীর রূপের খাতিবে কতাকাংশে মানবায়িত। স্বাভাবিক জললহরীব মধ্যে মানব-ব্যাকুলতার নির্যাসটুকু ধরে দিয়ে চরণের মনোহারিতা সঙ্কেতিত। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের অনুসরণে বলেছিলেন, 'অশোক শাখা উঠতো ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে।' এখানে যেমন চরণের নিজস্ব রূপশোভার কথাটি উক্ত নেই, অশোক শাখার শোভায শোভমান, তেমনি আলোচ্য অংশে সায়রের কাতরতায় কন্যার পদশোভা ব্যক্ত। শেষ স্তবকের রূপনির্মাণ আরও অভিনব। মুখের জন্যে চন্দ্রের উপমান প্রথাবদ্ধ। কিন্তু সেই প্রথাই রূপের এক নতুন জগতে আবিষ্কৃত। পদ্মাবতী জলে নেমেছে, তার মুখচন্দ্রের প্রতিচ্ছবি ভাসছে জলে, দেখে মনে হল যেন রাত্রির একটি চাঁদই দুটি হয়ে সকালে জলে নেমেছে। এই ধরনের ছবি,

The swan on still St. Mary's Lake
Float double, swan and shadow ![১]

পালিত শুকপক্ষী উড়ে যাওয়ায় সায়রবর্তিনী পদ্মাবতীর শোকমূর্তি,

শুনি পদ্যাবতি মুখ হইল মলিন।
রাহুয়ে গ্রাসিল যেনো চন্দ্র প্রভাহিন ।।
নযানেব জলে হৈল পূর্ণ সববব।
কমল ডুবিল উড়ি গেলো মধুকব ।।
কান্দিযা উঠিল কন্যা না শম্ববি চুল।
আগে পাছে শবে পূর্ণ মুকুতা বহুল ।।

তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্রে পদ্মাবতীর নযন-সরসীব প্লাবনে বিকশিত মুখকমল আবৃ এবং চক্ষুতারকা-রূপ মধুকর অন্তর্হিত হল। 'সরোবর' পদ্মাবতীর নয়নে উপমান অথবা প্রাকৃত সবোবব,—সে বিষয়ে কবি একটি মনোরম সংশয় রে দিয়েছেন। চণ্ডীদাস রাধার নয়নকে কালিন্দী প্রবাহেব সঙ্গে তুলনা করেছেন এখানেও অশ্রুভরা নযনদুটিতে উদ্বেল সবোবরেব রূপ। এরপর শেষ দু চরণ। কেবল অশ্রুতেই মুক্তো ছড়াচ্ছে না, কন্যার সিক্ত চিকুরের জলধারা তার গৃহগমনের পথে মুক্তো ছড়িয়ে দিচ্ছে। মুক্তো আসলে অশ্রুরই উপমান প্রথা সত্ত্বেও কবির রূপানুভূতির নিজস্বতা লক্ষণীয়। বৈষ্ণব কবিতার রূপাঙ্ক রীতি এখানে লক্ষ্য করা যায। প্রসঙ্গান্তরে পদ্মাবতীব রূপেব আরও একা অংশ কথা,

আপদ মস্তক কেশ কস্তবি সৌবভ।
মহা অন্ধকাব মন দৃষ্টি পবাভব ।।
....
তাব মধ্যে শ্রীমন্ত খর্গেব ধাব জিনী।
বলাহক মধ্যে জেন স্থিব সৌদামিনী ।।
স্বর্গ হৈতে আসিতে যাইতে মনোবথ।
সৃজিল অরণ্য মধ্যে মহা সূক্ষ্ম পথ ।।
....
কাব সক্তি আছে সেই পন্থে জাইবাব।
[illegible]

১ Yarrow Unvisited, W. Wordsworth

পদ্মাবতীর সীমন্ত-শোভা,—কালো মেঘে ঋজুরেখা বিদ্যুতের মত, গভীর অরণ্যে সরল পথরেখার মত। আবার এ সীমন্তের পবিত্রতা বর্ণনা করতে কবি একে স্বর্গের সঙ্গে সংলগ্ন করে দিয়েছেন। কন্যার দীর্ঘ সীমন্ত-প্রান্তে সিন্দূর-স্পর্শ, যেন শত্রুনাশকারী উদ্যত অসিফলক। উপমানে সৌন্দর্য, শৌর্য এবং শুদ্ধির ব্যঞ্জনা। আর একস্থানে পদ্মাবতীর চরণশোভার বর্ণনা,

পদ পরশেতে রেণু রক্তবর্ণ হয়।
সিন্দুর বলিয়া কুলরমণি পরয় ॥
অতুল মানস পরসিতে নারে হাতে।
পুষ্প বলি ভ্রমে সবে খুইতে চাহে মাথে ॥

এ যেন বাংলা ভাষায় কালিদাসের রচনা। পদস্পর্শে পথরেণু যেন সিন্দূরে মাখা, কুলরমণীর বিভ্রম ঘটায়। আবার সে সিন্দূরের স্বর্গীয়তায় মর্তভূমির অবলেপ সম্ভব নয়। তাই নায়িকা যেখান দিয়ে পা ফেলে ফেলে চলেছেন, সেখানে পদচিহ্নগুলি যেন এক একটি ফুল হয়ে ফুটে উঠছে। বৈষ্ণবকবির বর্ণনা স্মরণযোগ্য। প্রগাঢ় অনুরাগে পদ্মাবতীর রূপ বর্ণিত। বিশদ হলেও এ ছবিতে শিল্প-জড়তার চিহ্ন নেই।

প্রথার অনুসরণ কবিমনে আলস্যস্থষ্টির বদলে কখনো কখনো উৎসাহ সঞ্চার করে,

মৃগরাজ জিনি কুটি পরম শুন্দর।
হরের ডুম্বরু পুনি নহে সমশ্বর ॥
পিপিলিকা ভৃঙ্গ কটী জিনি অতি ক্ষিণ।
ভাঙ্গিয়া পরয় কিবা উদ্ধ গিরি চিন ॥

'ডম্বরুকটি' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে। পিপীলিকার উপমা তুলসীদাসের ছবি স্মরণ করায়। অবশিষ্ট 'মৃগরাজ' এবং 'ভৃঙ্গে'র উপমান প্রচলিত। প্রথাবদ্ধতা সত্ত্বেও তার বৈচিত্র্যের প্রতি কবির অসীম কৌতূহল। অতঃপর পদ্মাবতীর বিবাহোত্তর জীবনের ছবি। প্রথমে দেহরূপের 'বারো লক্ষণ' বর্ণনা।

বেদ পক্ষি বেদ পশু ফল গোটা চারি।
তেন মতে অনুমান পদ্যাবতি নারি ॥
চারি পশু চারি পক্ষি আর চারি ফল।
এ দ্বাদশ চিহ্ন শরিরে সকল ॥
সিংহ কটী গজগতি চিকুর চামরি।
এবে শুন শবদশ গিঙ্গরে বেকত ॥
চারি দির্ঘ্য চারি লঘু চারি স্থূল ক্ষিণ।
চারি গুরু রব স্ত্রিয়া শরিরেতে চিন ॥
দির্ঘ কেশ অঙ্গুলি দিঘল গিম আঁখি।
দশন কপাল নাভি লঘু হেন দেখি ॥

কুরঙ্গনয়নী রামা কহিলা বিচারি ।।
গৃধিণী লম্বিত কর্ণ নাসা সুকবর।
নিল কন্ট তাম্র চুড়া পিক কন্টস্বর।
বিম্বুফল অধর ডালিম্ব সুদর্শন।
কুচ শ্রীফল জাঙ্গ কদলি লক্ষণ ।।
ক্ষিণ নাসা অধর আর জে কটি ক্ষিন।
চতুর্থে উদর জেন নহে আন্ত চিন ।।
উরজ নিস্তম্ভ স্থল আব ভুজ উরু।
বখসিল সরদল সিঙ্গরে সুচারু ।।

দৃষ্টান্তের প্রথমাংশে প্রতিষ্ঠিত নারীরূপের প্রতীক-কথা। সর্বাঙ্গসুন্দর নারীদেহের চারটি অঙ্গ চার রকমের পশুর মত, চারটি অঙ্গ চার রকমের পাখীর মত এবং আর চারটি অঙ্গ চার রকমের ফলের মত। আলঙ্কারিকের নির্বাচিত উপমান একত্র করে কবি আলাওল চট্টগ্রাম অঞ্চলের কথোপকথনের এই বিচিত্র উপমা-ভঙ্গি কাব্যে আমদানী করেছেন। দৃষ্টান্তের এ অংশে আলঙ্কারিক বৈদগ্ধ্য, অন্যদিকে নারীদেহের আকারপ্রকারগত জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশিত। শেষাংশে কবি নারীদেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের কোন্ কোন্ অংশ দীর্ঘ, লঘু, স্থূল অথবা ক্ষীণ, তার কথাও সবিস্তারে বলেছেন। নারীর শরীরের অস্থি-সন্ধি জানা ছিল বলে উপমান চয়নে কবির এই অনায়াসপটুত্ব। যে নারী-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে শিল্পী-কবির রূপবিস্ময়ের অন্ত নেই, তাকেই আলাওল যেন অতি সহজে শুভঙ্করের গণিত-আর্যার ছকে বেঁধে দিয়েছেন। আলাওলের রূপবৈদগ্ধ্য একদিকে, অন্যদিকে রূপাবস্থান বিষয়ে রসশাস্ত্রীয় অধিকাবেব পরিচয়। সৌন্দর্যরস এবং সৌন্দর্য-শাস্ত্র, সব্যসাচী আলাওলের প্রতিভার দুটি দিক।

বাঙলা কাব্যে নারীর রূপবর্ণনায় নিসর্গ প্রকৃতির ভূমিকা অত্যন্ত মূল্যবান। বৈষ্ণব কাব্যের আলোচনায় বলেছি, নিসর্গ প্রকৃতির নিরপেক্ষ রূপ-পরিচয় মধ্যযুগের রচনায় দুর্লভ। আসলে, নিসর্গ প্রকৃতি পরোক্ষভাবে সমস্ত কাব্যের মধ্যেই কমবেশি বর্ণিত। কবিরা নিসর্গ ও নারীকে উপমান-উপমেয়ের সম্পর্কে একযোগে প্রকাশ করেছেন। প্রধানত উপমান হিসেবেই বাঙলা কাব্যে নিসর্গের রূপবিস্তার। নিসর্গ বর্ণনার এবম্বিধ রীতিতে কাব্যের দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। এক, মানব-প্রতিবেশ (human environment) রচনা। দুই, কোথাও কোথাও মানব-প্রতীকরূপে (human symbol) প্রয়োগ। নিসর্গের স্বতন্ত্র রূপাবস্থান না থাকলেও এর ফলে ব্যাপক জীবৎ চেতনার (animation) আভাস মিলেছে।

রাজা রত্নসেনের সঙ্গে পদ্মাবতীর সম্ভোগবিহার। বর্ণনা বিশদ, অলঙ্কারের কলাকৌশল প্রত্যক্ষতার ইঙ্গিতবাহী।

রতি বিপরিত হৈলে কাল বিপরিত।
একাত্রে গ্রহণ হৈল চন্দ্রমা আদিত ।।

সঘন মেদনি কাম্পে বায় খরতব।
উলটিয়া বহিল স্থমেরু ধরি ধর॥
মেঘবস্তা কবিয়া করিল অন্ধকার।
শমজল সদত বরিষে বৃষ্টিধাব॥

বিপরীত সম্ভোগের পারম্পর্য। নিসর্গ-দুর্যোগের কথায় চিত্রিত। অলঙ্কারের সাহায্যে কবি কামমত্ত নায়ক নায়িকার স্খলিত বসনের বাস্তব নগ্নতা নায়িকার চিকুররাশির আড়ালে ঢেকে দিয়েছেন। কবি সবই বলেছেন, কিন্তু বাচনভঙ্গির নিপুণ কৌশলে তাঁর রসদৃষ্টি কোথাও স্থূল নয়। এ বর্ণনা বিদ্যাপতির রচনা স্মরণ করায়।

রাজসভার প্রণয়কাব্যে দেহতাপ প্রবল হবেই। কালিদাস, জয়দেব, ভারতচন্দ্রে তার সাক্ষ্য। কিন্তু কামনার বিহ্বলতা কবিকে পরিমাণ ভোলায় নি। বৈদগ্ধ্য ও রূপরসিকতা,—এই দুইএ মিলে এ কাব্য রাজবেশ ধরেছে।

নবম অধ্যায়

গোর্খবিজয় ও গোপীচন্দ্রের গান

যে কাব্য দেহকে তত্ত্বে রূপান্তরিত ক'রে রূপবির্জনের কাহিনী গড়ে, সেখানে বস্তুজগৎ ও বস্তুজীবন সম্বন্ধে অনুরাগের কথা গৌণ। গোর্খবিজয় ও গোপীচন্দ্রের গান মানবজীবনের কাহিনী। কিন্তু রূপবান মানুষ যেখানে স্বয়ং রূপবিনাশের উদ্যোক্তা, বস্তুজীবনের উপাখ্যান হওয়ার পরও সেখানে ভোগানুকূল রূপের রচনা নিষিদ্ধ। তার ওপর এ সাধকগোষ্ঠীর আদর্শশাসন। তবু যেটুকু শোভার কথা এ কাব্যে পাবো, কোথাও তা নামমাত্র, কোথাও বা রূপবর্জনশিক্ষার নামান্তর মাত্র।

কাহিনীকাব্যদুটিতে মানবজীবনের আদর্শ বিষয়ে দুটি ভাবের দ্বন্দ্ব আছে। এ দ্বন্দ্ব ঘটনায় ন্যস্ত হওয়ার ফলে তার মর্ম স্পষ্ট। চর্যাগানের আলোচনায় 'চিত্ত' অধ্যায়ে মানবচিত্তের দুটি ভাগ আমরা দেখিয়েছি। যোগনিরত সাধক চিত্ত এবং যোগবিরত প্রাকৃত জনচিত্ত। সেখানে দ্বিবিধ চিত্তাবস্থা রূপকের মাধ্যমে প্রকশিত। বর্তমান কাব্যাংশে সেই একই চিত্ত চরিত্ররূপে ঘটনার আকারে পরস্পর যুধ্যমান। যোগনিরত সাধকচিত্তের মানবরূপ গোর্খনাথ, ময়নামতী। যোগবিরত প্রাকৃত জনচিত্তের মানবরূপ কদলী নারী, গোপীচন্দ্রের মহিষীদ্বয়, বারাঙ্গনাগণ। এ কাব্যের ঘটনায় ত্রিকোণ-সমস্যা আছে বলে চিত্তের আরও একটি রূপাবস্থা পাই। তা হল, যোগভ্রষ্ট যোগীচিত্ত। মীননাথ সে চিত্তের অধিকারী। গোপীচন্দ্রের চিত্তসমস্যা ভিন্ন প্রকৃতির। যোগ অথবা ভোগ, মায়ের আদেশ অথবা স্ত্রীর অনুনয় কোনটি রক্ষণীয়, এই তার প্রশ্ন। চর্যাগানে যোগীজীবনের যে সমস্যা সঙ্গীতে মগ্ন থেকে রূপপ্রকাশের স্বচ্ছ পথ পায়নি, গোর্খবিজয় ও গোপীচন্দ্রের গানে জীবনের ঘটনায় স্থাপিত হয়ে তা রূপে প্রত্যক্ষ। সম্প্রতি আলোচ্য এ দুটি কাহিনীকাব্য চর্যার গীতিভাবের গল্পভাষ্য।

এবার কাব্যদুটি থেকে উপরোক্ত আলোচনার প্রামাণ্য রূপাংশ বিচার করব। একদিকে ভোগের প্রলোভন,

> কদলীএ কৈল বেশ   শিরেতে লম্বিত কেশ
> কবরী বান্ধিল ঠমকে,
> পরিধান পুষ্পমালা   কবরী শোভিছে ভালা
> যেন দেখি বিজুলি চমকে।

তারা মীননাথকে প্রশ্ন করেছে,

কোন দেশে তোমার ঘর মাগি খায় নিরন্তর
কি লইয়া কর গৃহবাস,
এমন বয়স কালে না থাক কামিনীর কোলে
অঙ্গেতে দিয়াছ ছালি পাশ।
. ...
এড়হ ভিক্ষুক বেশ ভুঞ্জ এই রাজদেশ

তারই ফলে,

ভোলেতে পড়িল মীন বর্জিল গুরুর চিন
কদলীতে গেল মন মজি,

এ যেমন চিত্তাবস্থার একটি দিক, তেমনি এর অন্যদিকও আছে। কদলী নারী গোর্খনাথকে যখন গৃহবাসী করতে চান,

নিতি নিরামিষ্য খাই ব্রাহ্মণী যোগিনী হই
চল যোগী আমার বাড়িত।
আহ্মারে কাটিমু সুতি তুহ্মি যে বুনিবা ধূতি
হাট হৈলে বেচিলে হবে কড়ি,
যখনে সমাজে যাইবা মৈদ্য ঘাটি মান্য পাইবা
কথা কইবা দুই হাত নাড়ি।

গোর্খনাথের প্রত্যুত্তর,

ধর ধর যোগিনী অলংকার ধর।
ইহানে পরিয়া তুমি চলি যায় ঘর॥
ঝুলিত লাগিয়া দিল অষ্ট অলংকার।
অলংকার পাইয়া দেবী হরিষ অপার॥

রূপাক্ষিপ্ত কোন কাব্যালঙ্কার এখানে নেই, এ কেবল ভূষণের জন্য বস্তু-অলঙ্কার মাত্র। অন্যত্র গোর্খনাথের ভোগবর্জনের ছবি,

স্ত্রী পুরুষ নহি আহ্মি নাই বীর্য বল।
শুখনা কাঠের মত শরীর সকল॥
গন্ধহীন পুষ্প আমি মান্দারের ফুল।
শরীরেতে রস নাই কাষ্ঠ সমতুল॥

উপমানগুলি রূপাশ্রিত কথোপকথনের অঙ্গীভূত। দেহের প্রলোভন এ কাব্যে কোথাও কোথাও এত প্রবল যে, চিত্ত যদি যোগসাধনার দ্বারা সম্যকরূপে দীক্ষিত না হয়, তবে অনায়াসেই যোগীর পদস্খলন সম্ভব,

আগে আগে চল তুহ্মি পাছে পাছে আসি আহ্মি
কথা কইবাম বাটে বাটে।
জোয়ানে জোয়ানে কথা হেট কেনে কর মাথা
হাসি কেনে না চায়সি মুখ,

কদলীনারীর কথায় কোন অলঙ্কার নেই, কিন্তু অভিধাবাক্যে প্রকাশভঙ্গির কি প্রবল উদ্দেশ্য-ব্যঞ্জনা!

এই যখন পরিস্থিতি, তখন হঠাৎ খবর পাওয়া গেল,

দেখিলাম মীননাথের বল শক্তি নাই।
বগুলাটি ঝুরে যেন আহার খেযাই॥

অনশনক্লিষ্ট বকের উপমানে ভ্রষ্ট মীননাথের তপঃশ্রীহীন ছবিটি উপভোগ্য। আদর্শগত পতনের রূপাঙ্কনে কবি প্রায়ই এ কাব্যে পশুস্তর থেকে উপমান চয়ন করেছেন। গোপীচন্দ্রের গানেও তাই, চর্যাগানের রূপকেও তাই। হয়ত প্রাকৃত চিত্তের এই স্থূল ও অবোধ ভোগাবস্থাকে পশুর উপমানেই সর্বাপেক্ষা রূপবান করা যেতে পারে বলে সাধক কবির ধারণা ছিল।

এরপর গোর্খনাথ কদলী রাজ্যে গেলেন। সেখানে অনেক কষ্টে ভোগাসক্ত গুরুর দেখা মিলল। গুরু উদ্ধারে গোর্খের নটীবেশ,

অলঙ্কার পরিয়া নাথ করিল ভূষণ,
একে একে পরিলেক যথ আভরণ।
গলাতে দিলেন নাথ সাত ছড়ি হার,
করেতে কঙ্কণ দিল অতি শোভাকর।
....
পায়েতে নূপুর দিল কনক উঝটি,
গায়েতে কাঞ্চলি দিল কোমরে কাছটি।

কাহ্নু রচিত ডোম্বী-হেরুক চর্যা[১] স্মরণযোগ্য। ভূষণ সত্ত্বেও দেহের শোভা-পরিচয় নেই। নটী সাজলেও গোর্খকে যতি বলে চিনতে বিলম্ব হয় না। সমুদ্র মন্থনের পর বিষ্ণু মোহিনীমূর্তি ধারণ করে অমৃত বণ্টন

১ চর্যাগীতি পদাবলী, শ্রীসুকুমার সেন।

করেছিলেন। সেখানে দানবের রূপমুগ্ধতার সঙ্গে পাঠক হিসেবে আমাদেরও রূপমুগ্ধতার অবকাশ ছিল। অলঙ্কারের ছদ্মবেশে বিভ্রম থাকলেও মোহ-সৃষ্টিতে কোন ছলনা ছিল না। এখানে গোর্খ যোগীরূপেই প্রতিভাত। কেবল অবোধ কামনা বাসনাকে প্রতারিত করার মত যৎকিঞ্চিৎ ভূষণ ধারণ করেই তার সকল উদ্দেশ্যে সিদ্ধ। কবির নিজস্ব রূপতৃষ্ণা এ নটী-পরিচয়কে স্থায়ী সৌন্দর্যের ভিত্তি দেয়নি। গুরুকে সঙ্কেতে গোর্খনাথ বহু উপদেশ দিয়েছেন,

> ষোল শত যুবতীএ তোমা বাখে বেড়ি,
> মবা গরু যেন শকুনে না যায় এড়ি।
>
> ....
>
> শুকাইল বালুচব গাঙ্গে নাই পানি,
> নৌকাখানি ডুবাইলা শুখনাতে আনি।
> দাড়ি মাঝি এড়ি গেল নৌকা বৈল পড়ি,
> আপনা ডুবাইলা ভবা কি দোষ কাণ্ডারী।
> বিঘাটে চাপাইযা নৌকা বৈলা কোন সুখে।
> জল ছুটি গেলে নৌকা দাড়ি মাঝি দেখে।।

নৌকা ও নাবিকের উপমানে গুরু মীননাথেব পদস্খলনের রূপ। তরী উত্তরণের প্রতীক, যোগ্য নাবিক পথের দিশারি এবং নদীপ্রবাহ দুঃখময় ভবপ্রবাহ, চর্যা-গানের সেই একই ছবি। 'ভবনঈ গহন গম্ভীব বেগেঁ বাহী।' অপটু নাবিকের ভ্রান্তি-চিত্রে মীননাথেব ভ্রষ্ট পরিচয় মর্মগ্রাহী। সমগ্র কবিতাংশের রূপকে সুশৃঙ্খলভাবে জীবনের একটি বিশেষ অবস্থা প্রকটিত। গোর্খনাথ গুরুকে আরও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন,

> মৎস্যেব প্রহবী তুমি বাখিয়াছ উদ,
> বিড়াল প্রহবী দিলা ঘন আউটা দুধ।
>
> ....
>
> ব্যাঘ্রেব মুখে তেন সপিযাছ গরু
> সর্পেব মুখেতে ভেক কৈলা সমর্পণ।
>
> ....
>
> ধান্য প্রসরি তুমি রাখিছ উন্দুব,
> পাকনা কদলী দিলা শৃগালে প্রচুব।
> সায়চান শকুনেত কৌতরে সপিয়াছ,
> আনলেতে সপিয়াছ শুখনা যে গাছ।

উপদেশার্থক ছবিতে পশুর উপমান। চর্যাগানের আলোচনা প্রসঙ্গে কবীরের কয়েকটি 'উলট্‌বাঁশিয়া' দোহাপদ উদ্ধৃত করেছি। সেখানে এই একই পশু-উপমানের দ্বারা কার্যকারণের বিপরীত সম্বন্ধে যোগীর উল্টা রীতির কায়া-সাধন প্রহেলিকায় প্রকাশিত। এ ছবি চর্যায়, বেদ ও উপনিষদেও আছে। কিন্তু আলোচ্য দৃষ্টান্তে সেই একই উপমানের উপস্থাপনা স্বতন্ত্র। এখানে যোগ-ভ্রষ্ট চিত্তকে পুনরায় সাধনমুখী করার জন্যে উপমানগুলি নিযুক্ত। কবীরের পদে উপমানের স্বভাবধর্ম বিকৃত ও বিপরীত। যেহেতু সেখানে সিদ্ধযোগীর প্রক্রিয়ারহস্যকে গোপন করার চেষ্টা। এখানকার উপমানে প্রাকৃত চিত্তাবস্থার প্রতি হিতোপদেশ, কবীরের পদে যোগদীক্ষিত এবং উদ্বুদ্ধ চিত্তাবস্থার রহস্য-ময় আনন্দপ্রকাশ। প্রসঙ্গপট বদল করলে একই উপমান রূপের তাৎপর্যজ্ঞাপনে কত পৃথক হয়। গোর্খ আবার বলে,

> প্রদীপ নিবিলে গুক কি করিব তৈলে,
> আইল্‌ বান্ধি ফল নাই জল শুখাই গেলে।
> শিকড় কাটিলে বাএ উফাবএ গাছ,
> বিনি জলে কোখাতে প্রাণে জীএ মাছ।

গোর্খনাথের হিতকথা অলঙ্কারাশ্রিত। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবার পথে,

> মীনের কোলেতে তবে বিন্দুনাথ দিগা,
> মঙ্গলা কমলা বৈসে দুই দিগে চাপিযা।
> .. . .
> দেখিযা কদলী মীন আন নাহি ভাএ,
> পিছে থাকি গোর্খনাথে বলে হাএ হাএ।

তথাপি গোর্খনাথ প্রাণপণে এই সংসার বাসনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন,

> পুকুরেতে জল নাই পাড় কেন বোড়ে,
> বাসাব মধ্যে ছায থুই আড়ি-মুইডা কবে।
> নগবে মনুষ্য নাই ঘব চালে চালে,
> আন্ধলে দোকানী দেএ খরিদ কবে কালে।

উল্টা-সাধনার যোগকথা। কর্ম এবং ফলের বিপরীত সম্পর্কে শিষ্য গুরুকে সাধনার সিদ্ধিমন্ত্র অনুভব করিয়ে দিতে চান। কিন্তু,

> ভোলা মোছন্দর গুরু পড়িলেক ভুলে,
> কামিনী এড়িয়া যাইতে মন নাহি চলে।
> তিথি অবশেষ যেন স্রোত নাহি গাঙ্গে,

তবু গোর্খনাথ হাল ছাড়েন না,

পবন ঘোড়া মন সওয়ার করিয়া,
ঘোড়া রাখি বাহুত না যাইব এড়িয়া।
চৈতন্যের দড়ি দিযা ঘোড়া কব বন্দী,
এহি সে জানিও গুরু জীবনেব সন্ধি।

তখনও গুরুর দুশ্ছেদ্য ভোগবন্ধন শিথিল হয় না,

মীনে বলে শুন পুত্র পণ্ডিত গোবখ,
যত সব কহ পুত্র সকল প্রত্যক্ষ।
মঙ্গলাব মাযাএ আমাব জড়িল শবীব,
তাহাবে দেখিলে মোব প্রাণ নহে স্থিব।

যোগী গোর্খনাথ গুরু উদ্ধাবেব আব কোন পথ পান না। বৈবাগ্যের সব শক্তিই এ প্রবল অনুবাগেব সংসাবে হার মেনেছে। গোর্খের শেষ ভরসা, 'তবে আমি সিধার সঙ্গতি কিছু ধরি।' গুরু উদ্ধারে শেষ অস্ত্রটি প্রয়োগ করলেন,

এ বলিআ যতিনাথে হাতে মাবে তুড়ি,
বাদুব হইয়া (সব) কদলী গেল উড়ি।
কদলী সকল গেল মীননাথ এড়ি,
উড়িল কদলী সব শূন্য হইল পুবী।
মীনেব কানে কহিলেক গুরুর ম[illegible],
ভ্রম দূব হইআ মীন হইল চেতন।
স্বপ্ন হতে মীন যেন উঠিল জাগিআ
আসনে বসিল মীন বুদ্ধি স্থিব হইআ।

প্রবল সংসারবুদ্ধি এইভাবে বর্জনধর্মী সাধনাব ইন্দ্রজালে অদৃশ্য হল। রূপের জন্মস্থান আমাদের অনুবাগেব ভোগগৃহ, মানুষেব সহজাত অধিকাবের ধন। বৈরাগ্যতত্ত্বের গভীর সাধন-প্রচেষ্টা যাকে শত চেষ্টাতেও পরাস্ত করতে পারেনি, ইন্দ্রজালের সস্তা কারসাজিতে তাব পবাজয় সম্ভব নয়। এ কাব্যেব ঘটনায় গোর্খবিজয় হয়ত ঘটেছে, কিন্তু ভাবধর্মে যোগেব পরাজয় সূচিত। তুড়ি দিয়ে সংসারমোহ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আসলে যোগীসম্প্রদায় যোগবলে আপন সর্বশক্তিমত্তার একটা কল্পনামাত্র করেছিল, অসম্ভব বলেই সে কাল্পনিক ক্ষমতা তার করায়াত্ত হয়নি। চর্যাগানে আত্মমনোরম বাসনার আভাস আছে, গোর্খ-বিজয়ে তারই জীবনানগত পরিচয়।

এবার আলোচনার বিষয় গোপীচন্দ্রের গান। এ কাব্যের তিনটি ভাগ। গোপীচন্দ্রের গান, গোপীচন্দ্রের পাঁচালী এবং গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস স্কুর মামুদ বিরচিত। তিনটি অংশে একই কাহিনীর প্রবাহ। এ কাব্যও ভোগমোহ এবং চিত্তনিরোধের দ্বন্দ্বময় ঘটনালেখ্য। 'বুঝান খণ্ডে' গোপীচন্দ্রকে যোগী করার জন্যে জননীর তৎপরতা,

নাকসিরিয়া বন্নের বাঘ তোক নইলে ঘিরিয়া।
খাইলে কলাগাছের মধু বগদুলে চুষিয়া ।।
সরু সরু কথা বধু তোর কানের কাছে কয়।
হাড় মাংস ছাড়ি তোর পরাণ কাড়ি লয় ।।
জে দিন ভাড়ুয়া জম তোক বান্দি লএয়া জাবে।
অদুনা রাণীর কান্দনে কি জমে ছাড়ি জাবে ।।

নারীর রূপমোহ হিংস্র ব্যাঘ্রের উপমানে বিশেষিত। বধূর 'সরু সরু কথা'য় যেন উচ্চারিত শব্দের আকার উল্লিখিত। মোহিনী নারীর রূপের উপমানে ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রের ছবি গোর্খবিজয়েও পাই,

বাঘিনী তোমাব গুরু তুমি হইল শিষ।
যোগ কথা শুনিযা তোমাব লাগে বিষ ।।

গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস পরিচ্ছেদে এই একই নারীচিত্র দ্বিবিধভাবে প্রকাশিত,

শশধর জিনিযা তাব রূপে অনুপাম ।।
নাসিকায শোভে যেন কানুব হাতেব বাঁশী।
ভুবন মোহিত কবেন চন্দ্রেব মুখেব হাসি ।।
কোকিল জিনিয়া যেন মধুব কথা কয।

সিংহেব আকার নাবীব বাঘেব মত চায়।
হাড় মাংস থুয়্যা বাছা মহারস লয ।।
পুরুষের ধন লয় স্ত্রী বেপার করে।
লোভেতে থাকিয়া পুরুষ বেগার খাটে মবে ।।

যেখানে হিংস্র পশুর উপমানে নারীরূপ অঙ্কিত সেখানে সৌন্দর্যের প্রত্যাশা বৃথা। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙলা কাব্যের নারীরূপ বর্ণনায় আমরা কেবল উপভোগ্য শোভার উপমানই পেয়ে এসেছি। আলোচ্য চিত্রে নারীবর্ণনার এক নতুন পরিচয় পাওয়া গেল। রাণী ময়নামতী নিরন্তর পুত্র গোপীচন্দ্রকে বুঝিয়ে চলেছেন,

কচুপাতার পানি যেন করে টলমল।
তেনমতে হবে তোমার যৌবন সকল॥
নল খাড়া কাটিলে জেহেন পড়ে পানি।
তেনমতে হৈব বাপু তোমাব জোওানি॥

....

চাবি বধূব রূপ দেখি চিত্ত হইল বোল।
কিছু নহে গুবিচান্দ হলদিব ফুল॥
একগাছে গোনীচান্দ দুই শ্রীফল ধবে।
তাহাবে দেখিযা তোমাব প্রাণ ব্যাকুল কবে॥
এহি ফল খাইলে বাপু পেট নাহি ভবে।
মাঞ্জা জালে বন্দী হৈযা সব পড়ি মবে॥

তখনও গোপীচান্দের সংসার-মোহ। জননীকে সে জিজ্ঞাসা করে,

মাএ পুত্রে কথা কৈতে কোন দোষ নাই।
দশ মাস দশ দিন গর্ভে দিছ ঠাঁঞি॥
ঘৃতেতে বাখিযা চাও প্রদীপেব ঘব।
সহজে উনাহি পড়ে প্রদীপ পশব॥
অগ্নিব প্রসনে গিহ উনাই পড়ে পুনি।
কেমতে বাখিতে পাবে ভাণ্ডেত লবনী॥

এখানে গোখবিজয় থেকে যতি গোর্খনাথের গুরুর প্রতি একটি উক্তি উদ্ধৃত করি,

প্রদীপ নিবিলে গুরু কি কবিব তৈলে।
আইল বান্ধি ফল নাই জল শুখাই গেলে॥
শিকড় কাটিলে বাএ উফাবএ গাছ।
বিনি জলে কোথাতে প্রাণে জীএ মাছ॥

জীবনের নশ্বরতা বোঝাতে যে সব উপমান আহৃত, সেগুলিতে শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গরের মত নিষেধাত্মক রূপাঙ্কন। গোপীচন্দ্রের প্রশ্নের উপমানগুলি আরও সুন্দর। জীবনদীপ উর্ধ্বশিখা করাব কালে যদি ঘৃতের মধ্যে সলতেটি নিমজ্জিত রাখা হয়, তাহলে কেবল ঘৃতটুকুই উপচে পড়ে, ঘর আলোকিত হয় না। যদি পুত্রকে যোগী করারই বাসনা ছিল, তবে মা কেন একাধিক (চারজন) নারীকে তার জীবনসঙ্গিনীরূপে ঘরে এনেছিলেন। প্রযাণের বিরুদ্ধে প্রাণের বলিষ্ঠ অভিযোগ। এখানে প্রদীপ অর্থে জীবন এবং ঘৃত বা লবনী অর্থে স্নেহ-পদার্থ রক্তরসাদি।

এ কাহিনীর একদিকে সন্ন্যাসের মন্ত্রণা ও গোপীচন্দ্রের ক্রমিক আগ্রহ, অন্যদিকে অভাগিনী স্ত্রীগণের সকরুণ বিলাপধ্বনি,

ধান চাউল বসন নহে গোলা বান্ধি থুইমু।
রাজায় রাজায় যুদ্ধ নহে মাল জোগাইমু।।
মালী ঘবেব পুষ্প নহে বলিয়া গাথিমু।
তেলী ঘরেব তেল নহে বাজাবে বেচিমু।।
আবের কাঞ্চলি নহে দুই তন ঢাকিমু।
স্থতাব কাপড় নহে ঝাড়া বদলিমু।।
ধর্মঘটী যৌবন মুছি কিরূপে রাখিমু।

সতী সীমন্তিনীর অশ্রুজলে কাব্যভূমি সিক্ত। বৈধী স্ত্রীর যৌবন ধর্মসঙ্গতভাবে স্বামীসেবায় নিযুক্ত। এ নাবী রূপোপজীবিনী নয়, ভোগের সঙ্গত প্রার্থনা তার কণ্ঠে। এ ভোগ্য যৌবনেব একটা স্বতন্ত্র এবং সাংসারিক পবিত্রতার দিক আছে। বিলাপ-ভাষার ভূষণ হৃদয় স্পর্শ করে। কত বিচিত্র রূপের কথায় স্ত্রীগণ স্বামী গোপীচন্দ্রকে আপনাদের দুঃখ বোঝাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এত সত্ত্বেও গোপীচন্দ্র ক্রমে ক্রমে যোগসাধনার প্রতি আকৃষ্ট,

চাবি চকবি পুকুবখানি মা মধ্যে ঝলমল।
কোন বিবিখেব বোটা আমি মা কোন বিবিখেব ফল।।

....

কোনঠে বইল বড়সি মা কোনঠে বইল স্থতা।
কেনঠে বইল বড়সিব ছিপ কোন খানি ফুলতা।।

....

দুই বিবিখেব একটি ফল কোন বিবিখে ধবে।
জখনে আছিলাম মা জননিব উদ্দবে।।

চাবি চকবি পুকুব: বৌদ্ধমতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, এই ধাতু-চতুষ্টয় থেকে চবাচরের রচনা কল্পিত। প্রাচীনগণেব মতে পৃথিবী চতুষ্কোণ।

মধ্যে ঝলমল: সাঙ্খ্যাচার্যেবা বলেন, জগতেব অব্যক্তাবস্থা প্রকৃতি এবং তাবই ব্যক্তাবস্থা জগৎ। বোধ হয়, ঝল্মল্ শব্দে এই ব্যক্তাবস্থাই লক্ষিত হয়েছে।

কোন বিবিখেব বোটা: আমাব নিমিত্ত ও উপাদান কাবণ কি?

বিবিখ: বৃক্ষ, যথাক্রমে মন ও তনু।
বড়সি: বড়সি শব্দে নাড়িত্রয়ের অন্যতম স্থষুম্না লক্ষিত হয়ে থাকবে।

স্থতা = বায়ু। বড়সিব ছিপ = মেরুদণ্ড। ফুলতা = ফাত্না।

দুই বিরিখের একটি ফল: পিতার রেত ও মাতার রজে সন্তানের উৎপত্তি এবং মাতৃগর্ভে স্থিতির কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উত্তরে জননী ময়নামতী যোগভাষায় বলেছেন,

মিরডারা তোব বস্‌সিব ছিপ পবন হৈল ডোব সুতা।
মূল কণ্ঠ তোব বস্‌সিব পোটে দুই বাঙ্কি ফুলতা ॥
জে দিন ফুলতা তোব জলে ডুবিবে।
জননি মাএব প্রাণ অনাথ হইবে ॥

মিরডাবা = শিরদাঁড়া। ডোব = দোব। সুতা = কটিসুত্র। পোটে = ভিত্তি। বাঙ্কি = আঁখি।

চতুষ্কোণ সরোবরে মৎস্য শিকারের আয়োজনে এ ছবির উপমান গড়া। এ রূপের প্রাকৃত আবেদনে উপভোগের বস্তুজগৎ ব্যক্ত। অথচ যোগের রূপক-সঙ্কেতে এক অজ্ঞাত সাধনপ্রক্রিয়া আভাসিত। রূপ এখানে রচয়িতার প্রকাশ-আগ্রহের বিষয় নয়, আপন গোষ্ঠিগণ্ডীর দীক্ষিত সতীর্থদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পরিভাষানির্ভর উপায়। ময়নামতীর উত্তর সম্বন্ধে সেই একই কথা বলা চলে।

আর একটি উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক রূপদৃশ্য। একদিকে অবসিত কামনার নিরুত্তেজ রূপ, অন্যদিকে প্রবল বাসনার নিষ্ফল হাহাকার। গোপীচন্দ্রের পত্নীগণ প্রশ্ন করেছে,

কান্দিয়া অদুনা কহে রাজার চরণে।
নারীর যৌবন প্রভু স্বামীর কারণে ॥
তাঁতীর বাড়ীর কাপড় নয় যে ধুবির বাড়ী দিব।
ধুবির বাড়ীর কাপড় নয় যে ভাঙ্গিয়া পরিব ॥
ধানের বাড়ীর সেন্দুর নয় যে রাখিব কৌটায় পুরিয়া।
....
অষ্ট অলঙ্কার নয় যে পোটারি ভরিব।
ধন সম্পদ নয় যে মোহর বান্ধিব ॥

এই চারজন রাণীই শৃঙ্গারসজ্জায় সজ্জিতা,

অধর পদ্মের ফুল দশন মুক্তার তুল
কর্পূর তাম্বূল শোভা করে,
দেখিতে শাবিন্দার লীলা স্বুবর্ণ ঝারির গলা
হংসরাজ গ্রীবার গঠন।

এই মোহকারী রূপ এবং তার কাতর নিবেদন উপেক্ষা করে যোগী গোপীচন্দ্র বলেছে,

কহিতে লাগিল রাজা গুরুকে ভাবিয়া ।।
রাজা বলে শুনরে অভাগী নারী জন।
নিশির স্বপন জান নারীর যৌবন ।।
আষাঢ় শ্রাবণে গঙ্গা উথলে সাগব।
চৈত্র মাসেতে গঙ্গা দেয় বালুচর ।।
তেমনি জানিও রাণী নারীর যৌবন।
রজনী প্রভাতে মিথ্যা নিশির স্বপন ।।

সতী নারীর উত্তর,

মস্তকেব চুল কাটিয়া চামব ঢুলাইব।
জিহ্বা কাটিয়া আমবা পলেতা পাকাইব ।।
পৃষ্ঠেব চর্ম কাটি আমবা চান্দআ টাঙ্গাইব।
দশ নখ কাটিয়া আমরা দশ বাতি দিব ।।
পায়ের মালই কাটিযা মোবা প্রদীপ জ্বালাব।
সেবায় মানায়া (যমে) আমবা স্বামী বর লিব ।।

যৌবনকে যোগসহায়ক করে কেবল স্বামীসঙ্গের ব্যাকুল প্রার্থনা। কিন্তু যোগ-বদ্ধ চিত্ত কিছুতেই ভ্রষ্ট হবার নয়। এখন গোপীচান্দ শুধু মাতৃআজ্ঞাই শুনতে পায়,

দেহের মধ্যে গয়া গঙ্গা ত্রিবেণীর ঘাট।
কিনি বিকি কর বাছা শ্রীকলার হাট ।।
বাছিয়া খরিদ কব অজপা নামের ধ্বনি।
মুখে জপ নিজ নাম দুই কর্ণে শুনি ।।
পাঁচ মাণিক আছে বাছা নৌকাব ভিতব।
গুরুকে ভজিয়া কর রত্ন হস্তান্তর ।।

মেরুদণ্ডের পাশে রবি শশী। বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা, মধ্যে সুষুম্না। ভাগীরথী, যমুনা, সরস্বতী।
অজপা নাম: স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বাবা সাধ্য 'হং সঃ' মন্ত্র।
পাঁচমাণিক: যোগশাস্ত্রীয় ভাষা।

অদুনা রাণীর মিনতির উপমানে পল্লীর সবটুকু ভাব-সংস্কার নির্যাসের মত ধরা আছে। গোপীচন্দ্রের রাণীদের অনুরূপ একটি বিলাপচিত্র আমরা আগে আলোচনা করেছি। সংসারের ছবি এঁকে কবি এ কান্নার রূপ-কে মূর্তিদান

করেছেন। কিন্তু নবীন-তপস্বী গোপীচন্দ্র এসব কথায় আমল দেয়নি। বৈষ্ণব-কবি রাধার বিরহব্রত আঁকবার কালে দেখিয়েছেন, কৃষ্ণকে লাভ করার জন্যে রাধা কঠোর দেহযজ্ঞ শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেখানে দুঃখ-সাধনের পরিণামে মিলনেরই প্রত্যাশা। এখানে আপন অঙ্গ আহুতি দিয়ে স্বামীকে কেবল সন্ন্যাস থেকে ঘরে ফিরিয়ে আনার ব্যাকুলতা। এখানকার উপমানগুলি হয়ত রূপের আলোকে স্থূল, কিন্তু আত্মাহুতি দানের তিল তিল দুঃখবরণ-কথা কত প্রত্যক্ষ। তপস্যায় মৃত্যুদেবতা যমকে তুষ্ট করার পেছনে আত্মসুখের কোন স্বপ্নপ্রত্যাশার চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে স্বামীর জীবনলাভের ব্যাকুলতা।

জীবনের দানও আছে, দণ্ডও আছে। দেহযোগী নিবৃত্তির পথে জীবনের চূড়ান্ত আঘাতকে পাশ কাটাতে চেয়েছেন। জীবনভীরু এই সাধক তাই জীবনের কাছে পরাজিত, অপরাজেয় নয়। এই পরাজয়ের কথাই কাব্যের সর্বত্র কথিত। গোপীচন্দ্রের রাণী বলেছেন, 'সেবায় মানায়া (যমে) আমরা স্বামী বর লিব।' অথচ স্বামীর জীবন ফিরে পাবার জন্যে ময়নামতী যমকে ঘুষ পর্যন্ত দিতে উদ্যত,

> পাশ্‌শ টাকা দিলাম বেটা তোক নাড খাইবাব।।
> ঝা ঝা গোদা বেটা তুই পাশ্‌শ টাকা ধবিযা।
> আমাব সোযামিব জিউ আমাব ঠে জা তুই খইরাত কবিযা।।

অন্যত্র সেই একই কথা, 'অদুনা নারীর কান্দনে কি জমে ছাড়ি জাবে।।' মৃত্যু সম্বন্ধে এই আকুল আতঙ্কই যোগীকে নিবৃত্তির পথে প্রবর্তনা দেয়, আধ্যাত্মিক কোন ভাবপ্রেরণা এখানে নেই। মৃত্যুর নিষ্ঠুর আঘাতকে দূরে রাখতে গিয়ে যোগী জীবনের পরমলাভটুকু বিসর্জন দিয়েছেন। আর যে সাধকগোষ্ঠীর সমস্ত মন জীবনের সবকিছু ভালমন্দকে ত্যাগ করে পলায়ন করে, তার আত্মকথায় অনুরাগের মোহ থাকতে পারে না। পারে না বলেই সে যোগশরীর রূপরিক্ত।

দশম অধ্যায়

মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা

কল্পনার অতীন্দ্রিয়তা বৈষ্ণব কাব্যে রূপরচনার মূল। মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকায় কল্পনার সহজ অবলীলা জনপদ-জীবনের আশা-বাসনায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। রূপকথায় রাক্ষসীর রূঢ় দৌরাত্ম্য প্রকাশভঙ্গির কেবল-মধুর মন্ত্রে যেমন নম্র, গোটা রূপকথা-প্রীতির সঙ্গে সেটুকু যেমন অনায়াসেই একাত্ম, এ কাব্যদুটির প্রকাশভঙ্গি তেমন ধরনের। বলা বাহুল্য, কাব্যদুটিকে আমরা রূপকথা বলি না। এ গীতিকাহিনীতে দারিদ্র্য আছে, সমাজবাধা আছে, প্রেমের প্রতারণা আছে, বিরহ-দুঃখ আছে, মানুষের শঠ স্বার্থবুদ্ধির কলঙ্ক-চিহ্নও আছে, কিন্তু সঙ্কীর্ণ জীবনকথার কোন সীমাতেই এ কাব্যের সৌন্দর্য বাধা পায়নি। জীবনের পটখানিকে ভাষার সুরে, ছন্দের দোলায় ও প্রকাশ-ভঙ্গির কমনীয়তায় সর্বতোমধুর করে তোলা গিয়েছিল বলেই তার ওপরে উপমার রঙ-তুলির টান এমন জোরালো। রূপের এমন দুষ্পূর পিপাসা বাঙলা কাব্যে অন্যত্র নেই। মিথ্যা কলঙ্কের জ্বালায় অভিমানিনী নায়িকার আত্মহত্যা,

> পূবেতে উঠিল ঝড় গর্জিয়া উঠে দেওয়া।
> এই সাগরের কূল নাই ঘাটে নাই খেওয়া॥
> ডুবুক ডুবুক ডুবুক নাও আর বা কত দূর।
> ডুইব্যা দেখি কতদূরে আছে পাতালপুর॥
> পূবেতে গর্জিল দেওয়া ছুটল বিষম বাও।
> কইবা গেল সুন্দর কন্যা মন-পবনের নাও॥[১]

বর্ণনায় তেমন কোন উপমা নেই। ভাষা ও ছন্দোনির্ভর প্রকাশভঙ্গির ইন্দ্রজালে এ কবিত্ব সুন্দর। বাস্তব ঘটনা হিসেবে এ আত্মহত্যার দৃশ্য সকরুণ। সমস্ত কল্পনাপুলক সঙ্কুচিত করে এ বৃত্তান্তকে বেদনায় ঘনীভূত করে তুললে ছত্রগুলির বাস্তবতা ফুটতো। কিন্তু দৃষ্টান্তে তা ঘটেনি। 'ডুবুক ডুবুক ডুবুক নাও আর বা কতদূর।'—কথাটিতে ভাঙা নৌকায় চড়ে ডুবে মরার সামান্য অর্থ

---

১ মলুয়া

আছে, কিন্তু শব্দ ব্যবহার এবং ছন্দোশক্তিতে প্রকাশের মনোহারিতা এত বেশি যে অপমৃত্যুর করুণ নৈরাশ্যপট রূপমুগ্ধতার আবরণে অদৃশ্য। যেন মনে হয়, পাতালপুরী দর্শনের রোমান্টিক কৌতূহলের বশেই নায়িকা আত্মহত্যার সঙ্কল্প নিয়েছে। শেষ ছত্রে জীবনে প্রত্যাশিত শূন্যতার বদলে মন-পবনের পালতোলা নৌকাখানির স্মৃতিলাবণ্য অবশিষ্ট মাত্র।

অন্নাভাবের দুঃখ বর্ণনা করেছেন কবি। প্রাণধারণের দুর্ভাবনায় বিনিদ্র রজনী ভোর হয়ে যায়।

কুড়ায় ডাকে ঘন ঘন আষাঢ় মাস আসে।
জমীনে পড়িল ছায়া মেঘ আসমানে ভাসে।।
গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে জিঙ্কি ঠাডা পড়ে।
অভাগী জননী দেখ ঘরে পুইরা মরে।।১

ভাগ্যহীনা জননী অন্নের দুশ্চিন্তায় ঘরে পুড়ে মরছে। চরম দারিদ্র্যের বাস্তব দুঃখ কিন্তু কবিতার ভাবে ধরা পড়েনি। পরিবর্তে আকাশজোড়া বর্ষার মেঘে এক মেদুর নিসর্গরূপ পাঠকের চেতনাকে অধিকার করে।

হোমরা বেদের আদেশে মহুয়া চলেছে তার প্রিয়তমকে হত্যা করতে। একদিকে আদেশপালনের বাধ্যতা, অন্যদিকে অক্ষম মমতার অশ্রুজল। কবি লিখেছেন,

ডুবিল আসমানের তারা চান্দে না যায় দেখা।
সুনালী চান্নীর বাইত আরে পড়ল ঢাকা।।
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা কি কাম করিল।
বাপের হাতের ছুরি লইয়া ঠাকুরের কাছে গেল।।

এবং তারপরে,

পাষাণ আমার মাও বাপ পাষাণ আমার হিয়া।
কেমনে ঘরে যাইবাম ফিইরা তোমারে মারিয়া।।

অলঙ্কারের দ্বারা উদ্দীপ্ত অপরূপ কোন রূপচ্ছবি এখানে নেই। অথচ গোপন হত্যার উত্তেজনা এবং মানসপ্রস্তুতি এখানে কৈ। অথবা মহুয়ার উচ্চকণ্ঠ

১ মলুয়া

বিলাপধ্বনিই বা কোথায়। শেষ দুটি ছত্রে নায়িকার উক্তিতে ব্যথার স্পর্শ লাগলেও তা বাস্তব দুঃখ গোচর করে না। আসলে বাস্তব দুর্বৃত্তির বিবরণটুকু কবি নিসর্গের রূপক-ব্যঞ্জনায় পরোক্ষভাবে প্রকাশ করলেন,—'সুনালী চান্নীর রাইত আবে পড়ল ঢাকা।।' নদের চাঁদ ও মহুয়ার জীবনে সোনালি সুখের আশা-জ্যোৎস্না হঠাৎ-দুর্ভাগ্যের কালো মেঘে ঢাকা পড়ে গেল। মানব অভিপ্রায়ের দৈন্য রমণীয় প্রকৃতিশোভার মধ্যে গোপন রইল। প্রণয়দ্বন্দ্বে নায়ক গোপন মারণাস্ত্রের আঘাতে মুমূর্ষু। কবি বর্ণনা করেছেন,

পুষ্পের সমান বুকে তীর না মারিল।
দারুণ বিষের তীর পৃষ্ঠে বাহিবিল।।
নিবিল ঘরের বাতি আচম্‌কা বাতাসে।
নগর-কাণা কালা মেঘরে উড়িল আকাশে।।

শেষ দুটি ছত্রের আলঙ্কারিক বর্ণনায় মৃত্যুর অন্তিম যন্ত্রণাবোধ বা বিরহ বিলাপের বস্তু-সাক্ষাৎকার ঘটেনি। তৃতীয় ছত্রে 'বাতি' অর্থে জীবন। 'ঘর' অর্থে দম্পতির সুখাশ্রয়। 'আচম্‌কা বাতাস' আকস্মিক দুর্ঘটনা। 'নগর-কাণা কালা মেঘরে উড়িল আকাশে।।' এ ছবির শোভায় পার্থিব ব্যথার একটি চিত্র-পরিণাম রচিত মাত্র। তবু মৃত্যুর মত মর্মান্তিক অপচয়ের পরিতাপ 'নগর-কাণা' মেঘের রূপে যতটা ছবির বিষয়, ততটা হৃদয়ভাবের বিষয় নয়।

এ কাব্যে মানবজীবনের মর্মগত প্রার্থনাটি লক্ষ্য করার বিষয়। অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যেও মানুষ বাস্তব স্বাচ্ছন্দ্যের প্রত্যাশী নয়। তার বড় কাম্য, মানস-জীবনের একটি আত্মমনোরম সুখপ্রচ্ছায়। লোককাব্য হলেও এ ঠিক মানুষের ঘরের কথা নয়, হৃদয়ভাবের কথা। আবার একদিক থেকে ঘরের কথাও বটে, যেহেতু এ কাব্যে মানবহৃদয়ই মানবগৃহের বিকল্প। কেননা সহজে পাওয়া ঘরের প্রতি নায়ক-নায়িকার আকর্ষণ এ কাহিনীর আসল কথা নয়। দুঃখের মূল্য দিয়ে আপন আদর্শের ঘর গড়াতেই এখানকার সত্যিকারের সুখ। মলুয়া বলেছে,

রাজার হালে থাকে যদি আমার বাপের বাড়ী।
মলুয়া নহেত সেই সুখের আশারী।।
শাক ভাত খাই যদি গাছ তলায় থাকি।
দিনের শেষে দেখলে মুখ হইবাম সুখি।।

এ রচনায় সংসার যে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত, তা নয়। কিন্তু যে দৃষ্টিতে এ সংসার-যাত্রা নির্বাহ হয়, তা হিসেবী বৈষয়িক বুদ্ধি নয়, তা হল মানস-আদর্শের প্রেরণা। তাই শাক-ভাত খেয়ে গাছতলায় দিন কাটিয়েও মানুষ তার আপন আদর্শকে জীবন-ধারণের পাথেয় করে। এ কাব্যে যে সুখের অন্বেষণ, তা সংসারের উপকরণ-বাহুল্যগত সুখ নয়, আদর্শসিদ্ধির সুখ। এ কাব্যেব কাহিনীতে ভাঙা ঘর নতুন করে গড়ে উঠতে খুব কমই দেখা গেছে, বরং গড়া ঘর ভেঙে পড়ার ছবিই সর্বত্র। ঘরের সুখ পরিজনদের মিলিত মতেই গড়ে ওঠে। কিন্তু হৃদয়াদর্শের যে সিদ্ধি-পথ, সেখানে একলাই চলতে হয়। সংসারের নিশ্চিত আশ্রয়কে তুচ্ছ করে এ কাব্যের নায়ক-নায়িকা আপন অন্তরের প্রবর্তনার পথে নিরুদ্দেশযাত্রা করেছিল বলেই এর প্রতিটি কাহিনী রোমান্টিক পরিমণ্ডল লাভ করেছে। আর সেই কোমল রোমান্টিক বায়ুমণ্ডলে মানুষগুলির বাস্তব চেষ্টা-নিষ্ঠার সবটুকু সীমা অভিনব সৌন্দর্যে মুক্তি পেয়েছে। মেঘদেবতার কাছে মানুষের বৃষ্টি প্রার্থনা,

কানা মেঘারে তুইন আমার ভাই।
একফোটা পাণী দে সাইলের ভাত খাই॥
সাইলের ভাত খাইতে খাইতে মুখে হইল রুচি।
মা লক্ষ্মীর নিয়ড়ে ধান এক খুচি॥
আসন পাতিয়া তাতে দিও পদ্মের আশি।
এইখানে গাইবাম গান কমলার বারমাসী।

যেখানে ধান্যমুষ্টির করুণ কৃপা-প্রার্থনা, সেখানেও কবিকল্পনার দৈন্য নেই। রূপের লক্ষ্মীশ্রী যেন সবকিছু পরিপূর্ণ করে রেখেছে। 'কানা মেঘারে তুইন আমার ভাই।' মেঘের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের মধ্যে একদিকে কথার সোহাগ, অন্যদিকে অদৃষ্টের সত্য রূপ। মেঘের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা-কামনার ছবিতে অভিসারী কল্পনা শ্রোতার ভাবনাকে সুদূর এক রোমান্টিক জগতে নিয়ে যায়। অতিবাস্তব ঘরের কথায় কবি রূপের শক্তিকে এত বেশি অধিকার দিয়েছেন যে জীবনের তুচ্ছ সীমা সংসার-পরিচয়ের কোন সুযোগই পায়নি।

এ গীতিকাব্যে কবির শব্দপ্রয়োগের একটা নিজস্ব দিক আছে। যেমন 'সোনা' শব্দটি। প্রায়ই দেখতে পাবো, ঐশ্বর্য-অর্থ এবং রূপ-অর্থ ছাড়াও আদর ও অনুরাগের একটা মমতাময় অর্থ সন্নিহিত বিশেষ্যে লগ্ন। দৃষ্টান্ত উদ্ধার করি,

সোনার ভোমরা তুমি (ধোপার পাট); ভিজিল সোনার অঙ্গ (ধোপার পাট); সোনার বরণ পরভাতরে (ধোপার পাট); সোনার বরণ পাখা (ধোপার পাট); সোনার বৈঠা

সোনার নাও সোনার নিশান তায় (ভেলুয়া) ; সেইত না নদীর গো পাবে কোন বা সোনার দেশে। রসাইয়া সোনার মানুষ সেই না দেশে বইসে।। (আন্ধা বন্ধু) ; সোনার যৈবন কন্যা লো (আন্ধা বন্ধু) ; সোনার কুইল কু ডাকে (মহুয়া) ; সুনালী চান্নীব বাইত (মহুয়া) ; সোনাব তকুয়া বন্ধু (মহুয়া) ; সুবর্ণ কপোতী মাযের হৃদয়ের নলী (রূপবতী) ; ছিল লীলার সোনাব যৈবন (কঙ্ক ও লীলা) ; আসমান জুইব্যা ফুট্যা আছে সোনাব চাম্প ফুল (কমলাবাণীব গান)

বিশেষণগুলি বহু স্থানে ব্যবহৃত হযে বর্ণনীয় বিশেষ্যের রূপ সোনায় সোনা করে দিয়েছে। আমাদের দেশীয় শব্দার্থ-সংস্কারে 'সোনা' শব্দ অপূর্ব এক আদরের ধ্বনি। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণের মধ্যে সঞ্চিত স্নেহ ঢেউ খেলিয়ে ওঠে। ভাবের ক্ষেত্রে শব্দটি পরিপূর্ণতার প্রতীক।

এইভাবে 'রাঙা' শব্দটির বিশেষণরূপে বহুবার প্রয়োগ পাই। কথায় বর্ণাভাস জাগানো ছাড়াও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মানবপ্রীতির ব্যঞ্জনা এতে ফুটেছে,

রাঙা সূরুয ডুপিল সাইগরে (কাকেন চোবা) ; বাঙা ঠোঁট যেন তাব (ভেলুযা) ; আগবাড়িযা সাইলেব ধান (মহুযা), বাঙা জামাই ঘবে আনতে বাপের হইল মনে (মলুয়া) ; বৈকালীব বাঙা ধনু মেঘেতে লুকায (কঙ্ক ও লীলা)

এছাড়া শব্দের বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গির দিক আছে। শব্দ কখনো পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণের টানে একটা ললিত ঝঙ্কার সৃষ্টি করেছে, কখনো বা প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যে সুপ্ত রূপচেতনা উদ্দীপ্ত করে দিয়েছে,

আজল কাজল মেঘ আকাশেব গায (রূপবতী) ; দাগল দীঘল কেশ (কমলা) ; মন পবনেব নাও (মলুযা) ; সেই কেশ লইযা বিনোদ মেঘুবী খেলায (মলুযা) ; আসমানেতে চৈত্যার বউ ডাকে ঘনে ঘন (মহুয়া) ; আগল ডাগল আঁখি বে (মহুযা); চিক্কণী যৌবন (আন্ধা বন্ধু) ; নগর-কাণা কালা মেঘবে (শীলাদেবী) ; চাঁপালিযা হাসি কন্যা (শীলাদেবী) ; ফুর্ ফুর্ ফুল নযলো দূতী বাযেতে মিশিযা (কমল সদাগবেব কাহিনী) ; পূবালী বয়াযে সাধু (আযনা বিবি) ; বাইতের নিশি হৈল যখন ভাতঘুমার সময় (হাতীখেদাব খান) ; তেল-ফুবাণ্যা বাত্তিব মতন তারা নিপি যায় (ভেলুয়া) ; মৌচালা পিবীত (মাণিকতাবা বা ডাকাতেব পালা) সনকাঁইচ বরণ কন্যার (ভেলুয়া) ; ঘুমাইন্যা নাগবে কন্যা ডাকিয়া জাগায় (ভেলুয়া) ; বনেলা পঙ্খীর মত (মইষাল বন্ধু) ; কন্যার মুখ পিউরী দিয়া গাঁথা (মইষাল বন্ধু) ; লীলারী বাতাসে মোব অন্তর পুড়্যা গেছে (মইষাল বন্ধু) ; তারা হইল নিমি ঝিমি রাত্র নিশাকালে (ধোপার পাট) ; সোনার বরণ পরভাতরে আবের চাকামাখা (ধোপার পাট)

দৃষ্টান্তগুচ্ছে শাব্দী-ব্যঞ্জনার মনোহারিতা লক্ষণীয়। প্রতি মানুষেরই গহন চৈতন্যে কতকগুলি চিত্র-সংস্কার সঞ্চিত থাকে। উপযুক্ত শব্দের আঘাত পেলে মগ্ন-চৈতন্য উদ্ভিন্ন করে সেই চিত্রস্মৃতি জাগ্রত হয়। 'কনে-দেখা আলো' অথবা 'গোধুলি লগ্ন' বললে রসিকের 'বাসনালোকে' যেমন রূপের আলোড়ন সুরু হয়ে যায়। এ কাব্যের অনেকক্ষেত্রে তেমনই একটা ব্যাপার ঘটেছে।

ভাষা ছন্দ এবং প্রকাশভঙ্গির সাহায্যে কবি এ দুটি কাব্যে রূপের ছটামণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। উদ্ভাসিত রূপলোকে জগতের স্থূল তুচ্ছ কোন সংবাদই সামান্য থাকতে পারেনি। আর সেই সমুখ কল্পনাভূমিতে উপমার বিন্যাস এক অপরূপ পার্থিবতার পরিচয় রচনা করেছে।

এবার উপমানির্ভর দেহবর্ণনার প্রসঙ্গ। এ প্রসঙ্গে দেহরূপের কথায় প্রকৃতি-সান্নিধ্য বড় কথা। এ কাব্যে নিসর্গের শোভা কেবল উপমানরূপেই দেহে আরোপিত নয়। প্রকৃতির অখণ্ড রূপাবস্থা মানুষের সঙ্গে নিবিড় প্রীতিরসে যুক্ত। যে পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে গ্রামজীবনের নিত্য যোগাযোগ, এ সেই চেনাজানা প্রকৃতিরই পরিবর্তমান ছবির শোভা। মানুষের রূপের আশেপাশে নিসর্গ আপন রূপের অনুকূলতা বিছিয়ে একটা রমণীয় পরিবেশ রচনা করে দিয়েছে। লোককাব্যের রূপ-কথায় এটিই বড় বৈশিষ্ট্য।

কাউয়া কালা কোকিল কালা কালা দইবার পানি।
তাও হইতে অধিক কন্যার কেশের ...।।
আগল পাগল কালা মেঘ বাতাসেতে উড়ে।
ছান করিবারে কন্যা গেল নদীর পারে।।[১]

আসমান জুড়্যা কালা মেঘ উড্যা উড্যা যায়।
নীলাম্বরী পর্যা কন্যা জলের ঘাটে যায়।।
নদীতে উঠে খৈয়া ঢেউ লীলুয়ারী বাতাসে।
মৈষাল শুইয়া ভাবে কন্যার দীঘল লম্বা কেশে।।
জলের উপর পউদের ফুল চারিদিকে পাতা।
মৈষাল ভাবে কন্যার মুখ পিউরী দিয়া গাঁথা।।

১ মইষাল বন্ধু।

জলের যে ঘাট তাতে হইল পশর।
চান্দ যেমন ঝিলমিল করে পানির ভিতর রে ।।
তস্‌বীরে এমন রূপ আঁকা নাহি যায়।
অঙ্গের লাবনি যার মাটি বহিয়া যায় ।।১

কাঞ্চানা সোনার অঙ্গবে যেমুন ঝলমল।
একক কন্যা আছে রাজার দশ না বচ্ছুবের বে
কাঞ্চা ববণ কন্যাবে।
হাটু বাইয়া পড়ে কেশবে যে দেখে নয়ানে।
আসমানেব মেঘ যেমুন লুডায জামিনেরে
মেঘেব ববণ কেশবে ।।
ডালুমের দানা যেন বে দন্ত সাবি সারি।
চাঁপালিযা হাসি কন্যা ঠোটে রাখে ধবিয়ে
মেঘেব ববণ কেশবে।
দুই আঁখি দেখি কন্যাব পবভাতেব তাবা।
গোলাপী ছুবত কন্যাব না যায় পশুযাবে
মেঘেব ববণ কন্যাবে ।।২

প্রথম দৃষ্টান্তে প্রেয়সীর রূপদর্শন। উপমেয়-উপমানের সাদৃশ্যযোগে শুধু সুলভ রূপনিষ্পত্তির কথা এখানে নেই। বিক্ষিপ্ত কালো মেঘে 'আগল পাগল' এই শাব্দী ব্যঞ্জনার রূপধ্বনি। উপমান চয়নের এ যেন চক্রবৃদ্ধি পদ্ধতি। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে মৈষালের প্রেয়সী-কল্পনা। অংশটিতে আবেগের মনোহারী লীলা। কালো মেঘ আর নীলাম্বরী কন্যার গমন রূপের একটিমাত্র ছন্দে প্রকাশিত। বিশদ নিসর্গ-বিবৃতির ফলে কন্যার রূপ যে কোন পদ্মের সঙ্গে উপমিত মাত্র নয়। প্রতি পাপড়ির রূপে গাঁথা সৌন্দর্য-শতদলের মত কন্যার পরিচয় তিলোত্তমা মূর্তিতে ফুটেছে। তৃতীয় দৃষ্টান্তে দেহের সঙ্গে চাঁদের উপমানগত সাদৃশ্য বড় কথা নয়। ঢেউ-দোলানো জলে ভাঙা চাঁদের ঝিকিমিকি আলোয় কন্যার রূপে ছটা লেগেছে। নিসর্গের একই রূপাধারে কন্যা ও চাঁদের শোভা একাকার। তৃতীয় ছত্রে আধুনিকতার প্রক্ষেপ। চতুর্থ ছত্রে বৈষ্ণব কবিতার সচেতন অনুস্মৃতি। চতুর্থ দৃষ্টান্তে 'চাঁপালিয়া হাসি কন্যা' এবং 'গোলাপী ছুরত কন্যার' অংশ দুটি ছাড়া বাকিটুকু প্রথাবদ্ধ। আকাশ-

১ ফিরোজ খাঁ দেওয়ান।
২ শীলাদেবী।

মাটির শোভা কন্যার কেশে বাঁধা পড়েছে। এ প্রকাশভঙ্গি অভিনব। ছন্দে ছড়ার ধর্ম প্রকাশিত থাকার ফলে দৃষ্টান্তের ব্যঞ্জনা রূপকথার 'কুঁচবরণ রাজকন্যার মেঘবরণ কেশ'এর স্মৃতি জাগায়। আরও কতকগুলি রূপবর্ণনা একগুচ্ছ করা যাক,

সোনার পালঙ্কে কন্যা ভালা শুইয়া নিদ্রা যায় রে।
সোনার মন্দির দেখে কন্যার রূপ যুড়ে।।১

মুখেত বান্ধিয়া রাখে কন্যা পুন্নিমার চাঁদে।
দুই না আঁখিতে কন্যা দুই তারা বান্ধে।।
বুকেত বান্ধিয়া রাখে কন্যা যোড় কুসুমের কলি।
রাঙ্গা ঠোঁটে ছাইন্দা রাখে কন্যা উজ্জ্যালা বিজুলী।।
সাড়িতে বান্ধিয়া রাখে কন্যা আর যত তারা।
একবার দেখিলে রূপ না যায় পাশুরা।।২

সাপের মাথায় যেমন থাক্যা জলে মণি।
যে দেখে পাগল হয় বাইদ্যার নন্দিনী।।
বাইদ্যা বাইদ্যা করে লোকে বাইদ্যা কেমন জনা।
আন্দাইর ঘরে থুইলে কন্যা জ্বলে কাঞ্চা সোনা।।
হাটিয়া না যাইত কন্যার পায়ে পরে চুল।
মুখেতে ফুট্যা উঠে কনকচাম্পার ফুল।।৩

এমন সোনার পান্সী তাতে মাঝি নাই।
যৌবন চলিয়া গেলে কেউ না দিব ঠাই।।৪

আশ্বিন মাসেতে যেমন পদুমের কলি।
বসনে ঢাকিয়া রাখে নাহি দেখে অলি।।
....
নবীন বয়স কন্যা প্রথম যৌবন।৫

প্রথম দৃষ্টান্তে কন্যার রূপ যেন সোনার মন্দির। এখানে মন্দিরের উর্ধ্বোত্থিত পবিত্রতা এবং উচ্চচূড় গঠনের মনোহর বর্তুলতার সাদৃশ্যব্যঞ্জনা। সচরাচর ব্যাধিমন্দির বা দেবমন্দিররূপে শরীরের তুলনা পাই। সে প্রকাশভঙ্গি ভাবাশ্রয়ী।

১ মুকুট রায়। ২ ভারইয়া রাজার কাহিনী। ৩ মহুয়া। ৪ ঐ। ৫ কমলা।

কিন্তু রূপমন্দির বললে বস্তু-আশ্রয় বোঝায়, অথচ সাংসারিক শুচিতারও ব্যঞ্জনা মেলে। উপমাটি নতুন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের রূপে ভারতচন্দ্রীয় নাগরালি। প্রকাশের সূক্ষ্মতা ও ইঙ্গিতচাতুর্য আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত। তৃতীয় দৃষ্টান্তে সুন্দরী বেদের মেয়ে মহুয়ার রূপ যেন সাপের মাথার মণি। বেদে জীবনের ভাবাষঙ্গে এ রূপ গঠিত। 'সাপের মাথার মণি'তে ভয়ঙ্কর-সুন্দরের যুগল রূপ-সমাবেশ। শেষ ছত্রে কনকচাঁপার সোনারঙ কন্যার মুখে, এ কথা বলেও যেমন, শুনেও তেমনি সুখ। চতুর্থ দৃষ্টান্তে নারীদেহ 'পান্‌সী'। সদাগর বাণিজ্যতরী থেকে মহুয়ার রূপ সম্বন্ধে এ উক্তি করেছে। পান্‌সীর উপমান সোনার হলেও সম্ভোগমিশ্র। দেহযোগশাস্ত্রে 'নৌকা' নারীদেহের প্রতীক। সদাগর জীবনের প্রতিবেশ থেকে নেওয়া এ রূপের প্রযোগফল যথাযথ। পঞ্চম দৃষ্টান্তে কমলার নবীন যৌবনের প্রতি কবির লক্ষ্য। বসনাবৃত পদ্মকলি কি নায়িকার বক্ষোদেশ, অথবা অবগুণ্ঠিত বদন, অথবা যৌবনভীরু দেহলতা। কবি সে বিষয়ে নীরব। কেবল ভ্রমরভীতির সঙ্কেত করেই তিনি পাঠকের কল্পনাকে মুক্ত অবকাশ দিয়েছেন। উপমাক্রিয়ায় লোকরুচি অপেক্ষা মার্জিত নাগরিক রুচির প্রাধান্য। পরিশেষে আরও কতকগুলি দৃষ্টান্ত গুচ্ছবদ্ধ করি।

আষাঢ় মাসে দীঘলা পানশীরে নয়া জলে ভাসে।
সেইমত সোনাইর যৈবন খেলায় বাতাসে ॥
....
নয় না বচ্ছরের সুনাইগো নবীন কিশোরী।
গিরের পবদীম সুনাই সুনাইগো আঙ্গিনা পশরি ॥[১]

শাউনিয়া নদী যেমন কুলে কুলে পানি।
অঙ্গে নাহি ধরে রূপে চম্পক বরণী ॥
ভাদ্রমাসের চান্নি যেমন দেখায় গাঙ্গের তলা ॥
বৃক্ষতলে গেলে কন্যা বৃক্ষতল আলা ॥
....
চাচর চিকণ কেশ লীলার বাতাসেতে উড়ে।
বর্ষাতিয়া চান্দে যেমন ক্ষণে আবে ঘিরে ॥
....
তার মধ্যে দন্ত লীলার নাহি যায় দেখা।
দুর্লভ মুকুতা যেন ঝিনুর মধ্যে ঢাকা ॥[২]

---

১ দেওয়ান ভাবনা ও দস্যু কেনারামের পালা। ২ কঙ্ক ও লীলা।

এই ত না ছিল লীলার সোনার যৈবন।
হেমন্ত নিয়ারে যেমন মরে পদ্মবন।।
গঙ্গার তরঙ্গ লীলার দীঘল কেশ পাশ।
যে কেশ শুকাইয়া হইল চাচুলীর আঁশ।।

....

বৈকালীর রাঙা ধনু মেঘেতে লুকায়।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু শয্যাতে শুকায়।।১

কন্যার গাওয়ে ফুট্যা রৈছে রে কনকচাম্পার ফুল।
সন্‌কাইচ বরণী কন্যা হায়রে লক্ষ টাকার মূল।
পিঠ ছাপাইয়া পড়ে রে কন্যার ঢেউ খেলান্যা চুল।
যৌবন ঝাঁপাইয়া উঠে ভাদ্রের গাঙ্গের কূল।২

'দীঘলা পানশী' দীর্ঘাঙ্গী নারীদেহের কথা। 'নয়া জল' নতুন যৌবন। 'যৈবন খেলায় বাতাসে' কথায় রূপের ক্রীড়াশীলতা আগের ছত্রটির উপমানে আবেগের দোলা দিয়েছে। শেষ দুটি ছত্রের উপমালোক স্বতন্ত্র। ঘরের প্রদীপের আলোয় রূপের লক্ষ্মীশ্রী ফুটেছে। দৃষ্টান্তের প্রথমাংশে মোহিনী রূপের লীলালাস্য। শেষাংশে কল্যাণী রূপের স্নিগ্ধতা। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নদীমাতৃক বাঙলাপল্লীর রূপবাণী। 'ভাদ্রমাসের চান্নি যেমন দেখায় গাঙ্গের তলা'.—ভাদ্রমাসের (শরৎকালের) জ্যোৎস্না যেমন নদীর তলদেশ পর্যন্ত প্রকাশ করে, লাবণ্যময়ী নায়িকার রূপদ্যুতি তেমনি রূপরহস্যের অতল পর্যন্ত উদ্ভাসিত করছে। 'শাউনিয়া নদী'র প্লাবনবেগে যৌবনগর্বিতা নারীর পরিচয় দেয়। শেষাংশের রূপারোপভঙ্গি নতুন। মুক্তো দাঁতের পরিচিত উপমান। কিন্তু রাঙা ঠোঁটের আবরণরূপে দুটি ঝিনুকের উপমা অভিনব। নদী-সাগরের সঙ্গে ঘর করে যে মানুষ, তার মনেই এমন ছবি জাগে। তৃতীয় দৃষ্টান্তে লীলার মুমূর্ষু রূপের কথা। এখানে উপমাক্রিয়া তিনপ্রকারের। প্রথমাংশের রূপ প্রথাবদ্ধ। হেমন্তের শিশিরে পদ্মশোভার অবসান। মধ্যাংশের বর্ণনায় 'চাচুলীর আঁশ' কবির প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতায় লৌকিক উপমা। শেষাংশে মেঘ মৃত্যুর, বৈকালীর রাঙা ধনু ক্ষীয়মাণ যৌবনশোভার উপমান। কালো মেঘ ও রামধনুর বর্ণাঢ্য সমাবেশের সবটুকু উপভোগ (enjoyment) লীলার ট্র্যাজেডির দ্বারা মৃত্যুমণ্ডিত। নিসর্গে মানুষে একাকার এমন রূপজ বেদনা,

১ কঙ্ক ও লীলা।
২ বাদ্যানীর গান, শ্রীসুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ) ধৃত।

মুমূর্ষুর এমন লীন শোভার প্রকৃতিপরিচয় বাঙলা কাব্যে দুর্লভ। চতুর্থ দৃষ্টান্তে মেওয়ার (মহুয়ার) রূপ। বর্ণনার শেষছত্র মূল্যবান। সদৃশ বর্ণনা পূর্বে লক্ষ্য করেছি। রবীন্দ্রনাথ গানে বলেছেন 'ভাদ্রদিনের ভরা স্রোতে রে।' 'ভাদ্রের গাঙ্গের কূল' আসলে প্রবাহবেগ ও পরিপূর্ণতার উপমান। আর 'ঝাঁপিয়ে ওঠা যৌবন' বললে উদ্যত কামনা বোঝায়। 'ঝাঁপাইয়া' এই অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপের passion ফুটেছে। বর্ণনার প্রথমাংশে কন্যার দুর্লভ রূপের সঙ্গে শেষাংশের কামতাপ যুক্ত। স্পর্শক্ষম দেহবর্ণনা এ গীতিকার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ইমেজের নদী-সংসর্গ লক্ষণীয়।

এ কাব্যদুটির আখ্যানভাগে নারীরই একচ্ছত্র ভাবাধিকার ও প্রেরণা-আধিপত্য। সে তুলনায় পুরুষ অনেক বেশি নিষ্ক্রিয়। কবি বা কাহিনী-সংশ্লিষ্ট নায়কের দ্বারা নায়িকা-রূপ বর্ণিত। পুরুষ নায়কের রূপচ্ছবি কেবল নায়িকার প্রেমার্তির মধ্যে কিছুটা পরোক্ষভাবে প্রকাশিত। দ্বিতীয় কথা, দেহবর্ণনায় নিসর্গশোভার মূল্য। অন্যান্য কাব্যে রূপবর্ণনার মত এখানে নিসর্গপ্রকৃতির নির্যাসটুকু মানবাঙ্গে নিষেক মাত্র করে কবি দায়িত্ব শেষ করেন নি। উপমাশ্রয়ী নিসর্গের এমন বিবৃত স্বভাব-পরিচয় প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলাকাব্যে আর নেই। আর একটি কথা। প্রথাশাসিত অঙ্গ-বর্ণনার ত্বরিত পরিচয় এ কাব্যে নেই। তবে গোটা গীতিকাদুটিতে দু'একটি ব্যতিক্রমও পেয়েছি। যেমন,

> জিনিয়া অপবাজিতা শোভে দুই আঁখি।
> ভ্রমরা উড়িয়া আসে সেইরূপ দেখি॥
> কাকুনি সুপারিগাছ বায়ে যেন হেলে।
> চলিতে ফিরিতে কন্যা যৌবন পড়ে ঢলে॥
> শ্রাবণ মাসেতে যেন কাল মেঘ সাজে।
> দাগল দীঘল কেশ বায়েতে বিরাজে॥[১]

ব্যতিরেক ও উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে উপমানের চকিত রূপনিষ্পত্তি। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ কাব্যের দেহরূপ দৃষ্টান্ত ও উল্লেখ অলঙ্কারে গড়া। উপমেয় ও উপমানের গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি ধর্ম যখন ফলিতার্থে এক না হয়ে সদৃশ হয়, এবং তাদের সাদৃশ্য প্রণিধানগম্য হয়, তখন আহৃত উপমানে রূপের সঞ্চার-শক্তি প্রকাশ পায়। এখানে রূপের ব্যঞ্জনা ধীরভাবে নীত হওয়ার পূর্বেই পরবর্তী বক্তব্যের আকর্ষণ দেখা দিয়েছে। আর একটি দৃষ্টান্ত,

---

১ কমলা, দ্বিজ ঈশান বিরচিত।

পালকি হইতে বাহির হৈল বিজলীর কণা।
ভেলুয়ারে দেখি কাজির হইল ভাবনা ।।১

'বিজলীর কণায়' চকিত রূপবিন্দুটুকু ভেলুয়ার শরীরে স্থির অবস্থান পাওয়ার আগেই কাজীর লোভে গ্রস্ত হল। প্রসঙ্গত লীলার মৃত্যুকালীন চিত্র স্মরণ করি। আরও একটি দৃষ্টান্ত,

কাছে গেলে দেখা যায়রে সোনার পত্তিমা।
আর সোনার লাগে ভেলুয়ার চক্ষের ভঙ্গিমা ।।
আঁখির তারা যে কন্যার অতি মনোহর।
পর্দ্দফুলের মাঝে যেন রসিক ভ্রমর ।।
হস্ত সোন্দর পদ সোন্দর যেমন কুন্দের শলা।
গায়ের রঙ যেন তার চিনি-চাম্পা কলা ।।
চান্নির মতন মুখ করে ঝলমল।
রাঙা ঠোঁট যেন তার তেলাকুচি ফল ।।২

এখানেও সেই একই ব্যাপার। ত্বরিত রূপনিষ্পত্তি। 'চান্নির মতন মুখ করে ঝলমল' বর্ণনায় চাঁদের জ্যোৎস্নাটুকু ছানিয়ে নিয়ে কন্যার রূপদেহে নিক্ষিপ্ত মাত্র।

মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রণয়মূলক রচনা। হৃদয়রূপের পরিচয় এ কাব্যের অন্যতর বৈশিষ্ট্য। সেই হৃদয়রূপে প্রকৃতির সহযোগ আমাদের সম্প্রতি আলোচনার বিষয়।

প্রেমিকা গৃহবন্দিনী। কন্যার অনুরাগ স্মরণ করে নায়ক বর্ষাভিসার করছে। সমাজশাসনে ক্লিষ্টা কুলনারী এইটুকুতেই খুশি। কুলের শাসন যতই নির্মম হোক, অন্তত একজন তার ভাবের দরদী,

সোনার ভোমরা তুমি খাইবা ফুলের মধু।
....
ভিজিল সোনার অঙ্গ রাত্রি নিশাকালে।
অভাগী নিকটে থাকলে মুছাইতাম কেশে ।।৩

এমনই হৃদয়সুখের কল্পনায় কন্যার মধুরাত্রি প্রভাত হল,

সোনার বরণ পরভাতরে আবের চাকামাখা।
কোন পাখী উড়িয়া আইল সোনার বরণ পাখা ।।

১ ভেলুয়া। ২ ভেলুয়া। ৩ ধোপার পাট।

জমীনে পড়িলে পাখী জমীনখানা বেড়ে।
আশমানে উড়িলে পাখী আসমান না জুড়ে ॥১

সূর্যোদয়ের চিত্র। পাখি এখানে সূর্যের উপমান। আবার ঘটনাপ্রসঙ্গে স্থাপিত এ পাখী প্রেমের রূপকমূর্তি। নায়িকার পুলকিত ভাবচিন্তায় প্রভাতের উদয়রাগ প্রণয়রাগে রূপান্তরিত। তবু এ প্রেম জয়ী হল না। নায়কের বহুবল্লভতা,

মেঘের সঙ্গে চান্দের ভালাই কতকাল রয়।
ক্ষণে দেখি অন্ধকার ক্ষণেক উদয় ॥
কুলোকের সঙ্গে পিরীত শেষে ঘ্বালা বটে।
যেমন জিহ্বার সঙ্গে দাঁতের পিরীত আর ছলেতে কাটে ॥২

কন্যার এ দুঃখের দিনে সখিরূপে কবি বলেছেন,

এক প্রেমেতে মারে কন্যা আর প্রেমে জিয়ায়।
যে প্রেমে কলঙ্ক ঘটে সে প্রেম কেবা চায় ॥
চক্ষের কাজল কন্যা ঠাই গুণেতে কালী।
শিরেতে বান্ধিয়া লইলে কলঙ্কের ডালি ॥

কন্যার এ দুর্ভাগ্য-ছায়া আকাশে মাটিতে ছড়ানো,

মেঘের মুখে চান্দের আলো তারার ঝিকিমিকি।
ক্ষণে ক্ষণে আন্ধাইর পথ চক্ষে নাহি দেখি ॥

কবি নিসর্গের রূপে শেষ দৃশ্যের ঘটনার কথা বলেছেন,

তারা হইল নিমিঝিমি রাত্র নিশাকালে।
ঝম্প দিয়া পড়ে কন্যা সেইনা নদীর জলে ॥

প্রেম সম্বন্ধে গভীর ধারণার কথা রূপাঙ্কিত। কুলোকের সঙ্গে প্রেমের পরিণাম চমৎকার লৌকিক উপমায় ফুটেছে। জিহ্বা কোমল, দন্ত ক্ষুরধার, একত্র অবস্থানের ফলে তাদের নিত্যমিলন বাস্তব। কিন্তু দাঁতের দুষ্টতা প্রীতির দোহাই মানে না। আকাশচারী কল্পনাকে হতবন্ব করে উপমাটি তাৎক্ষণিক সাদৃশ্যে মূর্তিমান। পরবর্তী উপমায় প্রেমের সঙ্গে কাজলের তুলনা। প্রেম বিষম বস্তু আর কাজল ব্যবহারের অসতর্কতায় কোন ক্ষমা নেই।

১ ধোপার পাট। ২ ধোপার পাট।

অপপ্রয়োগে কাজলও কলঙ্ক, প্রেমও তাই। একই বস্তু আধারভেদে পৃথক। অমনোযোগের ছিদ্রপথে প্রণয় পরিতাপের নামান্তর। বুদ্ধিদীপ্ত উপমা দুটির চতুরালি উপভোগ্য। 'তারা হইল নিমিঝিমি রাত্র নিশাকালে।' 'নিমিঝিমির' শাব্দী ব্যঞ্জনায় রূপনির্বাণের সঙ্কেত একদিকে, অন্যদিকে নির্জন নিশিরাতের ভয়ঙ্কর মোহ। বৈষ্ণবপদে পাই, 'রিমিঝিমি শবদে বরিষে।' এ ধ্বন্যুক্তির অর্থদ্যোতনা স্বতন্ত্র। নিসর্গচিত্রে অকৃতার্থ জীবনের ট্র্যাজেডি প্রতিফলিত। প্রেমের আব একটি রূপপর্যায়,

> ফাল্গুন মাসে চল্যা যাযবে চৈত্র মাসে আসে।
> সোনাব কুইল কু ডাকে বইস্যা গাছে গাছে ।।
> আগবাঙ্গিযা সাইলেব ধান উঠ্যাছে পাকিযা।
> মধ্যবাত্রে নদ্যাব চান উঠিল জাগিযা ।।
> শিবে ছিল আড়বাঁশিটি তুল্যা নিল হাতে।
> ঠাব দিযা বাজাইল বাঁশি মহুযাব আনিতে ।।
> আসমানেতে চৈত্যাব বউ ডাকে ঘনে ঘন।
> বাঁশি শুন্যা সুন্দব কইন্যাব ভাঙ্গ্যা গেল ঘুম ।।[১]

নদ্যার চাঁদের সঙ্গে মহুয়ার প্রেম পরিণামে অশুভ, কবি তা কোকিলের কুহুতানে ইঙ্গিত করেছেন,—'সোনার কুইল কু ডাকে।' বঙ্কিমচন্দ্রের 'বসন্তের কোকিল' স্মরণীয়। কিন্তু প্রেমের আহ্বান অন্ধ। নদ্যার চাঁদেব বাঁশি বাজলো। 'আসমানেতে চৈত্যার বউ ডাকে ঘনে ঘন।' এ চৈত্রবধূ আমাদের দেশের বউ কথা কও পাখি। নিসর্গের স্বভাববর্ণনার মধ্যে কবি আপন বক্তব্যের সূক্ষ্ম প্রতীক সন্ধান করেছেন। আমরা বুঝতেই পারি না, বাঁশিব সুরসঙ্কেত অথবা বউ কথা কও পাখির মিনতি, কিসে মহুয়ার ঘুম ভাঙলো। প্রেমের দুর্বার আকর্ষণ বহুগুণিত করে তুলতে প্রকৃতির নিবিড় অথচ শোভন সাহচর্য লক্ষণীয়। কিন্তু ভাগ্য বিপরীত। হোমরা বেদে নদ্যার চাঁদকে পছন্দ করে না। সে মহুয়াকে দিয়ে তাকে গোপনে হত্যা করাতে চায়। প্রকৃতিচিত্রে কবি বিষয়টি প্রকাশ করেছেন,

> ডুবিল আসমানের তাবা চান্দে না যায় দেখা।
> সুনালী চান্নীর রাইত আবে পড়ল ঢাকা ।।
> ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা কি কাম কবিল।
> বাপের হাতের ছুরি লইয়া ঠাকুরের কাছে গেল ।।

---

১ মহুয়া।

মহুয়ার কঠিন কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে কালো মেঘের আড়ালে প্রকৃতির রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা। মহুয়ার বিলাপ,

পাষাণ আমার মাও বাপ পাষাণ আমার হিয়া।
কেমনে ঘরে যাইবাম ফিইরা তোমারে মারিয়া॥
আলিয়া ঘীয়ের বাতি ফু দিয়া নিবাই।
তুমি বন্ধুরে আমার আর লইক্ষ্য নাই॥

পরিশেষে মুক্তির উপায় মিলল,

আবে করে ঝিলিমিলি নদীর কূলে দিয়া।
দুইজনে চলিল ভাল ঘোড়ায় স্বয়ার হইয়া॥

'ঘীয়ের বাতি' দাম্পত্য প্রেমের রূপক। আকাশের আলো তাদের পলায়নের পথ সুগম করছে। 'ঝিলিমিলি' শব্দটিতে কবি প্রকৃতির পুলকাভাস ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এত সত্ত্বেও তারা হোমরার হাতে ধরা পড়ে গেল। মহুয়ার বিলাপ,

আমার বন্ধু চান্দ সুরুজ কাঞ্চা সোনা জ্বলে।
তাহার কাছে সুজন বাদ্যা জ্যোনি যেমন জ্বলে॥
সোনার তরুয়া বন্ধু একবাব পেখ।
আমার চক্ষু তুমি নিয়া নয়ান ভইরা দেখ॥

নয়ন ভরে দেখার দৃষ্টিই প্রেমদৃষ্টি। নায়কের স্বতন্ত্র রূপবর্ণনা নেই। নায়িকার মহৎ প্রেমের আলোয় নায়কের 'সোনার তরুয়া' রূপ পরোক্ষে উদ্ভাসিত। কাহিনীর শেষ ছবি,

পালং সইএর চক্ষের জলে ভিজে বসুমাতা।
এইখানে হইল সাঙ্গ নদীয়ার চান্দের কথা॥

কবি বলেন নি, মহুয়ার আত্মহত্যায় পালং সই কাঁদছে। 'চক্ষের জলে' বসুমাতাকে সিক্ত করে তিনি বেদনার ব্যাপক ছবি এঁকে দিলেন।

প্রেমের আর একটি রূপপর্যায়,—'ঘরুয়া পিতলের কলসী সুতে ভাস্যা যায়॥'[১] এ ছত্র শুধু একটি কাহিনীর অন্তরকথা নয়, সমগ্র মৈমনসিংহ ও

---

১ মইষাল বন্ধু।

পূর্ববঙ্গ গীতিকার মর্মবাণী। নিসর্গের স্বভাবদৃশ্যে কবি রূপকের বস্তু-তাৎপর্য বুঝিয়েছেন। কিছু পরেই,

মনের বুঝাই কত মন না মানে মানা।
এ ভরা যৌবন কলসী দিনে দিনে উণা॥
রে বন্ধু দিনে দিনে উণা॥

ঘরের কলসী জলে ভেসে গেল। প্রেমের প্রেরণাই এমন, ঘরের সুখ ভুলিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রার প্রবর্তনা দেয়।

আমিত অবলা নারীরে বন্ধু হইলাম অন্তর পুড়া।
কূল ভাঙ্গিলে নদীর যেমন মধ্যে পড়ে চড়া॥
রে বন্ধু মধ্যে পড়ে চড়া॥
লীলারী বাতাসে মোর অন্তব পুড়্যা গেছে,
বে বন্ধু মোর অন্তর পুড়্যা গেছে॥

প্রেমের দাহ অলঙ্কারে রূপ ধরেছে। নদীর রূপ ও পরিণাম কবি নায়িকার এই বিশেষ মানস-অবস্থায় আরোপ করেছেন। নদী আর নারী। এরা পরস্পরের উপমেয়-উপমান। উপমালোকে আবহমানকাল উভয়ে উভয়ের সহচরী।

ছামনে চাইয়া কন্যা দ্যাহে বাস্থর ছুরত।
অন্তরে যে জইলা উঠল মৌঢালা পিরীত॥
সার্থক জন্নম ওরে বাইলাখালির জল।
এই না চান বুকে লইয়া পাওরে কত বল॥[১]

নারীর অনুরাগ-দৃষ্টিতে নদীর সৌভাগ্য সাপত্ন্য ঈর্ষা জাগায়। নিসর্গের সখ্যে প্রেমের পটভূমি প্রসারিত। আর এখানেই মানবপ্রেমের 'মৌঢালা' মিষ্টতাটুকুর যথার্থ আস্বাদ। আর একটি দৃষ্টান্ত,

কাঁদিতে লাগিল আয়বা মাড়ির মধ্যে পড়ি।
ধড় ফড় করে যেমন পাগভাঙা কৈতরী॥
না দিব পরাণের খসম না দিব ছাড়িয়া।[২]

---

১ মানিকতারা বা ডাকাতের পালা।

২ কাফেন চোরা।

আর সেই বিরহ-বেদনার রক্তাক্ত হৃদয়রূপ প্রতিফলিত হল,

> হাঁজের কালে রাঙা সূরুয ডুপিল সাইগরে।
> সোনালী ছড়ক পৈল ঢেউএর উপরে।।

আয়রার বিলাপে ভগ্নপক্ষ কপোতীর যন্ত্রণা। সাগরজলে অস্তসূর্যের শেষ রক্তসঙ্কেত সে বেদনারূপের পরিধি বিস্তৃত করল।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণযোগ্য। দর্শনশাস্ত্রে নারী প্রকৃতিরূপা। কাব্যশাস্ত্রে প্রকৃতি নারীরূপা। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ধারকরা হলেও এ অনুভূতি মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যে প্রবল। শুধু আলোচ্য গীতিকাদুটিতে নয়, দীর্ঘ আলোচনা-পরিধি জুড়ে নিসর্গপ্রকৃতির এই রমণীরূপের অবলীলা। আমাদের কাব্যে নিসর্গপ্রকৃতি উপমালোকের অধিবাসিনী, বস্তুলোকের নয়। মঙ্গলকাব্যের কিছু ছবির কথা বাদ দিলে বাকি সর্বত্রই প্রকৃতি ব্যঞ্জনাময়ী, অভিধাময়ী নয়। এ বিন্যাসরীতিতে কাব্যচিত্র সূক্ষ্ম হয়েছে। প্রকৃতের (actual) সঙ্গে প্রতীক (symbol) মিলিত হওয়ার ফলে কাব্যের চরিত্রসৃষ্টি পুথির প্রত্নসীমা পার হয়ে গেছে। 'আন্ধা বন্ধু'র কাহিনীতে নায়িকার গভীর প্রেমের ছবি,

> নয়ানের কাজল কৈরা নযানেতে থুইব।।
> বসন কইরা অঙ্গে পরব মালা কইরা গলে।
> সিন্দূরে মিশাইয়া তোমায় মাখিব কপালে।।
> চন্দনে মিশাইয়া তোমায় করব দেহ শীতল।
> সুখে দুঃখে করব তোমায় দুই নয়নেব কাজল।।
> দুই অঙ্গ ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হইব।
> বলুক বলুক লোকে মন্দ তাহা না শুনিব।।
> আমার নয়ানে বন্ধু দেখিবা সংসার।

প্রসাধন রমণীর আদরের সামগ্রী। প্রেমিকা প্রিয়তমকে প্রসাধনরূপে অঙ্গে ধরতে চায়। আসলে পতিই সতীর ভূষণ, সামাজিক জীবনের এই লক্ষ্মীমন্ত স্মৃতিটি কবিমনে সজাগ ছিল। সাধ্বী নারীর এ জাতীয় প্রেমরূপ,

> চক্ষুর জলে ধুইয়ারে পাও বন্ধুরে কেশেতে মুছাব।
> সিথানের সিন্দুর দিয়া চরণ রাঙ্গাইব।।
> না জ্বালিলাম ঘরের বাতিরে বন্ধু অন্ধ আমার আঁখি।
> হাত বুলাইয়া বন্ধু তোমার মুখখানি দেখি।।[১]

---

১ শ্যামরায়ের পালা।

প্রসাধনের কথা নয়, আপন দেহের দুঃখে প্রিয়তমকে সুখাশ্রিত করার প্রাথনা। ঘরের বাতি না জ্বালানোর ফলে আঁখির অন্ধতা বাস্তবিক। কিন্তু অন্ধ প্রেমের তিমিরেই নায়িকা প্রণয়ীকে বরণ করে। এইটুকুই এখানকার রূপকর্ম। 'আন্ধা বন্ধু'তে অন্ধ প্রণয়ীকে নায়িকা আপন আঁখির দৃষ্টি দান করতে চায়। প্রথম ক্ষেত্রে অন্ধতা বাস্তব, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভাবগত। অথচ এই প্রেমের পরিণাম,

ফাগুনেব ফুলেব কলি চৈতে উঠে ফুটি।
দিনে দিনে শুক্না গাঙ্গে ধবিলেক ভাটি।।
মধুমাস চল্যা যায় সেও গ্রীষ্ম আইসে।
বৃক্ষ হইতে শুক্নো পাতা আস্তে আস্তে খসে।।[১]

নিসর্গের স্বভাববর্ণনা, কিন্তু পরোক্ষে উপান্তযৌবনার রূপপ্রসঙ্গ।

এবার নিসর্গপ্রকৃতির দুটি একটি চিত্র লক্ষ্য করা যাক,

জলের যৈবন লইয়া আষাঢ় মাস আইল।।
কান্ধে কলসী মেঘেব রাণী ফিরুন পাড়া পাড়া।
আসমানে খাড়াইয়া জমীনে ঢালে ধাবা।।[২]

মানবায়িত প্রকৃতি সুখদুঃখের নিয়ত সহচর। মেঘকন্যার কুলবধূমূর্তি আমাদের ঘরের আঙিনায় প্রত্যক্ষ। নিসর্গেব আর একটি চিত্র,

পূব সায়বে নাইমা ভানুবে ভোবেব ছান কবে।
ঐন্যা বথে উঠ্যা ভানু যাইবাইন নিজ পূবে।।
দুধের ববণ ঘোড়া গোটা আগুন ববণ পাখা।
(আরে) বাতাসের আগে ছুটে ঘোড়া নাই সে যায় দেখা।।
আবেব বাড়ী আবেব ঘব কবে ঝিলিমিলি।।[৩]

সূর্যোদয়ের ছবি। মানবকথায় উজ্জ্বল প্রভাত-বণনা। ছবিতে Mythএর প্রভাব স্পষ্ট। বর্ণনায় প্রকৃতির প্রভাব, পল্লীপ্রাণতা, Myth-ধর্মী কল্পনা, উপমায় নিবিড় গৃহভাবনা, রূপাঙ্কনের নম্র মাধুর্যে আচ্ছন্ন জীবনের বাস্তব রিক্ততা,--রূপকথার এইসব লক্ষণ এ কাব্যদুটিতে আছে। তাছাড়া এ কাব্যের 'কাজলরেখা' কাহিনীটি রূপকথা।

১ আন্ধা বন্ধু। ২. আয়না বিবি। ৩ কমলারাণীর গান।

এখন এ কাব্যে নায়ক-নায়িকার দু'একটি সংলাপ পরীক্ষা করব,

বান্ধিয়া সোনার ঘব আগুণে না পোড়।
মনেবে সম্ববি কন্যা যাহ নিজ ঘব ॥

* *

সত্য কথা প্রাণবন্ধু কহি যে তোমাবে।
তোমাব দারুণ বাঁশী আমায় থাকতে না দেয় ঘরে ॥

* *

শুন অল্পবুদ্ধি কন্যা কহি যে তোমারে।
বিসর্জন দিলাম বাঁশী তুমি যাও ঘরে ॥
আর না বাজিবে বাঁশী কানে লো দংশিয়া।
ঐ দেখ যায় বাঁশী ঢেউএ ভাসিয়া ॥

* *

বাঁশী নাই তুমি ত আছ আমাব হৃদেব বতন।
আমাবে না লহ সাথে কেবল লইয়া যাও মোব মন ॥

* *

জাগ চন্দ্রমুখী কন্যা কত নিদ্রা যাও।
ভোবেব কলি ফুটল কন্যা আঁখি মেল্যা চাও রে।
গলাব বাসি ফুলেব মালা ছিঁড়িয়া ফালাও বে ॥
আইজ কুঞ্জে ॥[১]

জলভব সুন্দবী কইন্যা জলে দিছ মন।
কাইল যে কইছিলাম কথা আছে নি স্মরণ ॥
জল ভব সুন্দবী কইন্যা জলে দিছ ঢেউ।
হাসি মুখে কও না কথা সঙ্গে নাই মোব কেউ ॥

* *

নাহি আমাব মাতাপিতা গর্ভ সুদব ভাই।
সুতেব হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই ॥
এ দেশে দরদী নাই বে কাবে কইবাম কথা।
কোন জন বুঝিবে আমাব পুবা মনের বেথা ॥

* *

কঠিন আমার মাতাপিতা কঠিন আমার হিয়া।
তোমার মত নারী পাইলে কবি আমি বিয়া ॥

---

১ আজ্ঞা বন্ধু।

লজ্জা খাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাই রে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর।।

* *

কোথা পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি।।১

প্রণয়মূলক সংলাপচিত্র। উভয়ত জীবনের তুচ্ছ-মহৎ, ছোট-বড় সব রকমের বাস্তব সমস্যা। কুলের কলঙ্ক, সমাজের বাধা, ব্যক্তিগত পছন্দের প্রশ্ন সব কিছুই। এ সংলাপের ভাবাংশে একদিকে প্রেমের মূল্য অন্যদিকে শিল্পের সৌন্দর্য। প্রায় নিরলঙ্কার বাক্যগুলিতে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সম্মতি-আপত্তির নাটকীয় প্রত্যক্ষতা, অথচ প্রাকৃতিক আবেষ্টনে রূপের অচ্ছেদ্য ভূষণ। কেবল ভাষায়, কেবল ছন্দে, অথবা কেবল অলঙ্কারে এ কাব্যের মাধুর্য নয়। রূপের দুষ্পূর পিপাসায় কাহিনীতে এক ধরনের মুগ্ধতা সৃষ্টি করে এ কাব্য কৃতার্থ।

এবার আরও দু'একটি সাধারণ দেহবর্ণনা উদ্ধৃত করি। এ বর্ণনা প্রেমসম্পর্করহিত স্বতন্ত্র ভাবাষঙ্গের,

ডাঁহর ডাঁহর কান যেমন দুইয়ান কুলা।
দাঁতাল হাতীর দাঁত দুইটা মাঘ মাস্যা মূলা।।
ঢেঁকির সমান ছোড়তা তার মাথা সদাই হেট।
ছোড ছোড চোগ হাতীর ডোলর মত পেট।।২

পাণ্ডুবর্ণ দেহখানি রক্ত নাহি তায়।
পুরুষের মত কেশ হাত আর পায়।।
কুড়ি বছর বয়স হৈয়ে বৈলতে লজ্জা পাই।।
যৌবন জোয়ার তবু গাঙ্গে আসে নাই।।
ডালিম্বের গাছে হায়রে ধরে নাই ফল।

....

আষাঢ়ে মেউলার মত লাগে মুখখানি।
সে মুখের বাণী যেন চিরতার পানি।।৩

কিষ্ট বর্ণ শরীলখানি ত্যাল ত্যালা তার গাও।
খাটাখুটা নাকাগোফা ফাটা ফাটা পাও।।
কুতকুতিয়া চায় কবিরাজ গুর্‌গুরাইয়া যায়।
পাছে পাছে বাসু নাই উপ্তা হোচট খায়।।৪

---

১ মহুয়া। ২ হাতীখেদার গান। ৩ ভেলুয়া। ৪ মানিকতারা বা ডাকাতের পালা।

কুলার মত কান, মাঘ মাসের মূলার মত দাঁত এবং 'ডোলর' মত পেট নিয়ে হাতীর ছবি লোকবাসনার বিষয়। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে রিক্তযৌবনার কুৎসিত ছবি। 'আষাঢ়ে মেউলার মত' মুখের বর্ণনায় বাস্তবতাও আছে, প্রকৃতিব্যঞ্জনাও আছে। তৃতীয় দৃষ্টান্তে 'কবিরাজে'র হাস্যকর রূপচ্ছবি। কতকগুলি উদ্ভট শব্দের আঘাতে কৃষ্ণকান্ত, খর্বকায়, মেদস্ফীত এ চিক্কণদেহী মানুষটির ছবিই শুধু নয়, তার গতিভঙ্গি পর্যন্ত প্রকাশিত। লোকশিল্পীর তুলিতে ছুৎমার্গের প্রভাব কিছু কম।

এবার এ কাব্যে সাধারণ মানুষের বারোমাসী সুখদুঃখের পরিচয় নেওয়া যাক,

এক বাস্তুক নইযা নাবী কুইড়া ঘব না ছাড়ে।
পংখী যেমুন পাংখাব তলে বাচ্ছা পহব পাড়ে।।

ত্যক্ত হইযা মাইজান বউ ডাইলে মাবে ঘাও।
চবকা যেমুন ঘ্যাগব ঘ্যাগব কববাব নইল বাও।।

মানুষেব মনবে জাইন্য কচুপাতাব জল।
লাডাচাডা খাইলে ভাইবে কবে টলমল।

পলায় সব বুডাবুডি, দৌডাদৌডি, হাতে লযে লডি।
মুসলমান ফকিব পলায মুখে পাকা দাড়ি।।

....

বলে প্রাণ যায, হায় হায, কি বিপদ হৈল।
কালুসেখেব মা বলে, আমাব মুবগী কোথা গেল।।

দা কিনিযা ন ধাবাইলে জামাব ধবি যায।
খাইল্যা ভুঁইএ দুন্যাইব যত আগাছা গাছায।।
পাতিলাব ভাত ঠাণ্ডা হৈলে খাইতে মজা নাই।
হেলি পৈলে সোনাব যৈবন কি কবিবা আ-ই।।

প্রথম দৃষ্টান্তে পাখির অবোধ বাৎসল্যের ছবিতে মাতাব সন্তান পালনের কথা। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে রন্ধনকার্যের ছবি। তুচ্ছ এ ঘরোয়া ছবি কবির অভিজ্ঞতায় রূপবান। চরকার একঘেয়ে শব্দের কর্কশতায় বধূচিত্তের ভাব প্রকাশিত। 'কল্পনার সঙ্কীর্ণতার দ্বারাই সে আপন প্রতিবেশীবর্গকে ঘনিষ্ঠ সূত্রে বাঁধিতে পারিয়াছে, এবং সেই কারণেই তাহার গানের মধ্যে, কল্পনাপ্রিয় একক কবির নহে পরন্তু সমস্ত জনপদের হৃদয় কলরবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।'[১]

১ লোকসাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বর্ণনায় তূরীয় শিল্পশোভার আশে পাশে এইসব বাস্তব রূপচয়ন এ কাব্যকে কথঞ্চিৎ ভূমিস্পর্শ দিয়েছে। তৃতীয় দৃষ্টান্তে 'লাড়াচাড়া' কথাটির ব্যঞ্জনা হ'ল, পৃথিবীতে বিচিত্র লোভের টানাপোড়েন। এখানে কবি অনিশ্চিতমতি মানবের রূপাঙ্কনে এটি প্রয়োগ করেছেন। রূপাঙ্কনের ক্ষেত্রে যে উপমান বৈরাগ্য-বোধক ছিল, এখানে তা মানুষের মনস্তত্ত্ব-গোচরের কাজে নিযুক্ত। চতুর্থ দৃষ্টান্তে সাঁওতাল হাঙ্গামায় সন্ত্রস্ত মানুষের পলায়ন-দৃশ্য। কালুসেখের মা মুরগীর জন্যে বিলাপ করছে। সম্প্রতি দেশবিভাগের ফলে উদ্বাস্তু অভিযানের সময় ঘরের তুচ্ছ সামগ্রীর প্রতি মমতার এই অলিখিত অশ্রুজলের ইতিকথা আমাদের মনে আছে। বিশেষত নারীর সংসারপ্রীতির রূপসঙ্কেত এখানে অত্যন্ত সুন্দর। পঞ্চম দৃষ্টান্তে ব্যর্থ যৌবনের কথা। প্রথম দুটি উপমান নতুন, ফলে সজীব। তৃতীয় উপমান শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও অন্যান্য কাব্যে আছে। ঘরের ছবিতে এ পর্যায়ের উপমাভাষা কিছুটা স্থূলের লক্ষণাক্রান্ত। আর এক গুচ্ছ সাধারণ রূপের দৃষ্টান্ত,

মনের মাঝে নানান কথা নানান ভাবে উঠে।
হরা চাপা দিলে রে ভাত যেমন করি ফুটে॥

দেশেতে ভমরা নাই কি করি উপায়।
গোলাপের মধু তায় গোবরিয়া খায়॥

সুবর্ণ কপোতী মায়ের হৃদয়ের নন্দী।
কেমনে উড়াইয়া দিব খোপ কইরা খালি॥

মাও নাই বাপও নাই গর্ভসোদর ভাই।
আসমানের মেঘ যেমন ভাসিয়া বেড়াই॥

সতি পুতেরার লাগ্যা রহিল বসিয়া॥
বগা যেমন চউখ বুঞ্জ্যা পগারের ধারে।
সাধু অইয়া বস্যা থাক্যা পুডী মাছ ধরে॥
মনসুর বয়াতী কয় সেই মতন রইয়া।
বিবি রইল যেমন খাপ ধরিয়া॥

আমার মতন নাইরে আর অভাগিনী।
ভরা ক্ষেতের মধ্যে আমার কে দিল আগুণি॥
এমন না খসম গেল মোরে ফাঁকি দিয়া।

প্রথম দৃষ্টান্তে প্রেমিকের উদ্বেগ। সরা-চাপা-দেওয়া ভাত-ফোটার ছবিতে হৃদয়ের অবস্থা ব্যক্ত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সদৃশ দৃষ্টান্ত আলোচিত। ভবভূতির উত্তররামচরিতে পাই, 'পুটপাকোহপ্রতিকাশো রামস্য করুণো রসঃ।' ভবভূতির এ রূপপ্রয়োগ লোকভাণ্ডার থেকে গৃহীত। আমাদের আলোচ্য দৃষ্টান্তেও সেই একই প্রকাশ। গৃহস্থালীর পরিচিত রূপসাদৃশ্যে বর্ণনা আলোকিত। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে মলুয়ার রূপদর্শনে কাজীর লোভ। কবিওয়ালা গোপাল উড়ের সমজাতীয় পদ,

কে শিখাল তোরে এই বিদ্যে ;
গোবরা পোকা হয়ে বসিলি পদ্মে
থাক থাক থাক হয়ে দাঁড়কাক
ঠোকর দিলি শিব-নৈবিদ্যে ॥

তৃতীয় দৃষ্টান্তের উপমানে বাৎসল্যের রূপশোভা। 'কপোত' গার্হস্থ্য শান্তির প্রতীক এবং কোথাও কোথাও গোপন প্রেমের পত্রদূত। চতুর্থ দৃষ্টান্তে অনুরাগ-প্রত্যাশিনী কাজলরেখার আত্মকথা। উপমায় জীবনের নিরুদ্দিষ্টতা প্রকাশিত। 'মহুয়া'র সমজাতীয় অসহায়তা, 'সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই।' বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহকথায় স্রোতের শৈবাল উপমিত। পঞ্চম দৃষ্টান্তে সপত্নী-পুত্রদের জন্যে সৎমার প্রতীক্ষা। পুকুরের পাড়ে চিত্রার্পিত বকের উপমা মনস্তত্ত্বজ্ঞাপক এবং নাটকীয়। ষষ্ঠ দৃষ্টান্তে বিরহিণীর শোকচিত্র। উপমানটি আমাদের দেশের কৃষি-বিভ্রাটের পরিচয় বহন করে। শত্রুতাবশে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে অগ্নিসংযোগ করা পল্লীরই উপদ্রব-দৃশ্য। এসব ছবির সঙ্কুচিত ব্যঞ্জনা-মণ্ডলে মাটির গন্ধস্পর্শ মেলে।

এ কাব্যের ভাষাভঙ্গিতে পল্লীজীবনের নিয়ত রূপলীলা। কয়েকটি উদাহরণ,

'বাইদ্যার তাম্‌সা করাইতে কয়শ টেকা লাগে।'
'বাইদ্যার তাম্‌সা করাইতে একশ টেকা লাগে ॥'

আগন মাসে রাঙ্গা ধান জমীনে ফলে সোনা ॥
রাঙ্গা জামাই ঘরে আনতে বাপের হইল মনে।

গাছের শোভা পাতা রে ভাই
পাতার শোভা ফুল।
মাথার শোভা সিঁথার সিঁদুর
কানের শোভা দুল ॥

জোন পহর উইট্যে ভালা দক্ষিণালী বায়।
আমিনা বেড়াই খৈল্ল নছরের গলায়।।

ঝড় পড়েরলে লোছালোছা উজানি উড়ের কই।
কুছুম কুছুম শীতরে পড়ের গায়ত দিলাম কেথা।
কন দাবাইয়ে যাইব আমার বুকের হাড্ডির বেথা রে।।

দেশে দেশে চাম্পার ফুল ফুট্যা থাকে গাছে।
সেও চাম্পা মৈলান হবে এই চাম্পার কাছে।।

আমার না, মাঞ্জুর মা রে, আরে ভালা নয়নের কাজল।
আমার না, মাঞ্জুর মা রে, আবে ভালা গঙ্গানদীর জল।।
ইত্যাদি ইত্যাদি।

একেত কার্তিক হারে মাসে শান্তি আমন ধানের ক্ষীর।
শান্তি নারীব যৈবন দেইখে আমার প্রাণ করে অস্থির।।
এহিত বৈশাখ হাবে মাসে শান্তি দুখে বান্ধে সর।
খাও না বিলাওরে শান্তি তোমাব যৈবন কাল।।

সন্‌কাঁইচ বরণ কন্যা যেই দেশে পাও।
ডিঙ্গা বাহিয়া সাধু তথায় শীঘ্র চইল্যা যাও।।

অন্ধকাইরা রাত্রির নদী সাঁ সাঁ করে পানি।
তার উপরে ভাসে ভাইরে পবন ডিঙ্গাখানি।।

ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা কি কাম করিল।
বাপের হাতের ছুরি লইয়া ঠাকুরেব কাছে গেল।

জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ মন।
কাল যে কইছিলাম কথা আছে নি স্মরণ।।
জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ ঢেউ।

উদ্ধৃতিগুলি পাঠের সুরগত ছন্দ-ধ্বনি লক্ষ্য করা যাক। প্রথম কথা, ছন্দে বক্তব্যের আরোপভঙ্গি ললিত। শব্দগঠনের বিশিষ্টতায় ছন্দের মনোহরণ তানপ্রবাহ। কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ উল্লেখ করি। সংলাপে একই বাক্যের পুনরাবৃত্তি। কোথাও শব্দগত পুনরাবৃত্তি। শব্দ বা শব্দগুচ্ছে গানের ধুয়াপদ্ধতি। গল্পঘটনার যোজক বাক্যাংশে বিশিষ্ট গ্রাম্যতা, 'কি কাম করিল।' আঞ্চলিক বাক্‌রীতির নতুন স্বাদ। ছন্দে ছড়ার ধর্ম। ছড়ার খেয়ালী শব্দার্থে প্রতিষ্ঠিত কল্পনাপদ্ধতি কখনও কখনও বিমূঢ়। একটি ছন্দে

নিসর্গরূপের কথা, পরের ছত্রে গল্পের কথা, অথবা বিপরীত ভঙ্গিতে বাক্যবন্ধ (Sentence Unit) সম্পূর্ণ।

মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকায় নায়িকার প্রণয় বন্ধন-অসহিষ্ণু। প্রেমের বন্যায় সমাজের জীর্ণ নিয়ম ভেসে গেছে। 'ঘরুয়া পিতলের কলসী সুতে ভাস্যা যায়।' এখানে আর একটি কথা আছে। এ দুটি কাব্যের কোন নায়িকাই প্রায় অভিজাত সমাজের মানুষ নয়। অভিজাত হলে ঘর ছাড়ার কালে তাদের অন্তরস্থিত সমাজ-সংস্কাবের একটা দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া যেত। ফলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মানবীয় বাসনার এ রূপ যেহেতু সমাজের এলাকা-বহির্ভূত, সেইহেতু ভ্রষ্ট। কিন্তু কবিও সেদিক থেকে সাবধান। কখনো নায়িকার মুখে, কখনো বর্ণনার মাধ্যমে এই প্রেম-বাসনাকে বৈধী আদর্শের অন্তর্গতরূপে বর্ণনা করেছেন,

বাজাব হালে থাকে যদি আমাব বাপেব বাড়ী।
মলুয়া নহেত সেই সুখেব আশাবী ॥
শাক ভাত খাই যদি গাছতলায় থাকি।
দিনেব শেষে দেখলে মুখ হইবাম সুখি ॥

পতি যেমন আন্দাইব ঘবেব প্রদীপ অইযা জ্বলে।
সাপেব মাথায মাণিক পতি সতীব কপালে।।
নাবীব কাছে পতি যেমুন আন্দলেব নযন।
পতি অইল চাইকেব মধু বিবিক্ষিতে যেমুন।।

দুই অঙ্গ ঘুচাইযা এক অঙ্গ হইব।
বলুক বলুক লোকে মন্দ তাহা না শুনিব।।
আমাব নয়ানে বন্ধু দেখিবা সংসাব।
অমন হইলে ঘুচবো তোমাব দুই আখিব আঁধাব।।

নদীব মধ্যে বন্দিযা গাই গঙ্গা ভাগীবথী।
নাবীব মধ্যে বন্দিয়া গাই সীতা বড সতী ॥
বৃক্ষেব মধ্যে বন্দিযা গাই আদ্যেব তুলসী।
তীর্থেব মধ্যে বন্দিয়া গাই গয়া আর কাশী ॥

কবির বর্ণনা ও বন্দনায়, নারীর চিত্তসঙ্কল্পে এবং বাসনা-অনুসরণে গভীর আত্ম-নিষ্ঠার পরিচয়। সমাজের সর্বজনীন বিধিসূত্র সম্মানিত না হলেও ব্যক্তিগত প্রণয়াদর্শে এ কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলি কোথাও পদস্খলিত নয়।

এমন লোভন দেহবর্ণনার বিস্তৃত অবকাশেও কবি মুহূর্তের জন্যে কোথাও সংযম-ভ্রষ্ট হননি। বিনগ্ন ও প্রত্যঙ্গবাচী রূপবর্ণনার মধ্যযুগীয় কাব্যরীতি এখানে নেই। পল্লীর সমস্ত রূপ মন্থন করে কবি নায়িকার নয়ন ও কেশের অবধি খুঁজেছেন। প্রেমের অনুরাগে ও মাধুর্যে নায়িকার তনুদেহ রচিত। এ কাব্যের অলঙ্কারে রূপোদ্বোধনের দায়িত্ব আংশিক। সমগ্র উপস্থাপনাটিই এমন যে, কোন একটিমাত্র শৈলীতে তার সবটুকু ব্যক্ত করা যায় না। সেক্ষেত্রে অলঙ্কার যেমন আছে, তেমনি আছে শব্দ, ভাষারীতি, ছন্দ, নিসর্গপ্রকৃতি, প্রকাশভঙ্গি ইত্যাদি। উপমার এমন বিবৃত, ধীরোন্মোচিত প্রকাশ অন্যত্র দুর্লভ।

একাদশ অধ্যায়

বাউল সঙ্গীত

বৈষ্ণবের পরকীয়া তত্ত্ব এবং সহজিয়া ভাবসাধনার সঙ্গে সূফীমতের মিশ্রনে এক অপরূপ গীতি গড়ে উঠেছিল অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এই নর্মগীতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন :

> ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তার আপন স্থানে
> সকল বেড়ার বাইরে
> সহজ ভক্তির আলোকে,
> নক্ষত্রখচিত আকাশে,
> পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
> দোসর-জনার মিলন-বিরহের
> গহন বেদনায়।[১]

বৈষ্ণবীয় কান্তা-কান্ত প্রেম বাউলের সুরে অচিন এক 'মনের মানুষ' হয়ে উঠেছিল,

> দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের-ধারা বেয়ে
> মনের মানুষকে সন্ধান করবার
> গভীর নির্জন পথে।[১]

বাউলের কথাও গোষ্ঠিগণ্ডীতে বদ্ধ। যোগ ও দেহতত্ত্বের আশ্রয়ী চর্যাগানের মত উত্তরাপথের অন্ত্যজ সমাজবাসী কখনো প্রত্যক্ষে কখনো অগোচরে সদৃশ এক সাধনপদ্ধতিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আমরা একথা অবশ্যই বলি না যে বাউল গান চর্যাগানেরই রূপান্তরিত সংস্করণ। তবে এটুকু বলি, সাধনার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় এবং তত্ত্বপ্রকাশের বিশিষ্ট রূপকভঙ্গিতে এই দুই ভাবধারার সাদৃশ্য আছে। বাউল যেমন অন্ত্যজ মন্ত্রবর্জিত, চর্যাসাধকও তেমনি। গুরুপদাশ্রয় এবং গোষ্ঠিপ্রীতি উভয়ত সমপ্রকার। তত্ত্বপ্রকাশক উপমায় সেই একই আলো-আঁধারী 'সন্ধ্যা' ভাষারীতি। তথাপি মূল দৃষ্টিভঙ্গিতে বাউলের সঙ্গে চর্যাসাধকের পার্থক্য আছে। বাউলের সাধনায় জগৎ ও জীবনের প্রতি প্রেমপূর্ণ মাধুর্য, ছোট ছোট ঘটনার ছবিতে তার প্রাণের প্রসন্নতা প্রকাশিত। সমগ্র উত্তরাপথের সহজিয়া সাধকের মধ্যে এই একই ক্ষমাসুন্দর শান্তি। চর্যাগানের ছবিতে

---

১ পত্রপুট, রবীন্দ্রনাথ।

দেখেছি গূঢ় দ্রোহবুদ্ধি এবং পরমত-অসহিষ্ণুতা, সঙ্গে সঙ্গে আপন আত্মার বিষয়ে এক গভীর আতঙ্ক। সহজিয়া তত্ত্বের ঐতিহাসিক সে পার্থক্যের বিস্তারিত আলোচনা[১] করেছেন। ফকির লালন বলেন,

মুক্তিপদ ত্যজিয়ে সদায়
ভক্তিপদ রেখে হৃদয়,
শুদ্ধ প্রেমের হবে উদয়,
সাঁই রাজী যাতে।।[২]

প্রেম নির্মূল করে চর্যাসাধকের তথা মহাযানী বৌদ্ধসাধকের কথারম্ভ। শুধু বাউল গান নয়, উত্তর ভারতের অন্যান্য ভক্তি সঙ্গীতের আদর্শ স্বতন্ত্র, সেখানে জীবন ও জগতের প্রতি অনুরাগী মনের পরিচয়ই সর্বাগ্র।

বাউল প্রেমের সাধক। এ প্রেমের দুটি দিক। একদিকে ভালবাসার ঘরোয়া আবেগ। অন্যদিকে সাধকের নির্জন অনুভূতির মধ্যে অরূপতত্ত্বের অনির্ণেয় পুলকাবেশ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

সেই ভালোবাসার একটা ধারা
ঘিরেছে তাকে স্নিগ্ধ বেষ্টনে
গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মতো।[৩]

এ হল বাউলগানে ঘরোয়া ভালবাসার দিক। তাছাড়া,

ভালোবাসার আর একটা ধারা
মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিতবাহিনী।[৩]

অরূপতত্ত্বের আশ্রয়ে ভালবাসার 'অসীম শ্রীলোক' উদ্‌ঘাটিত। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্পর্শ বাদ দিয়ে প্রেমের এ দুটি দিক বাউলের গানে কিভাবে প্রকাশিত, আমরা তার পরিচয় নেব,

কুলের বৌ হয়ে মন আর কত দিন থাকবি ঘরে।
ঘোমটা খুলে চলনারে যাই সাধ-বাজারে।।
কুলের ভয়ে কাজ হারাবি, কুল কি নিবি সঙ্গে করে।[৪]

---

১ Obscure Religious Cults, Dr. S. B. Das Gupta M. A., Ph. D.
২ লালন গীতিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩ পত্রপুট, রবীন্দ্রনাথ। ৪ লালন গীতিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

আ মরি কি রূপের ছটা,
কয়লা হতেও ময়লা সেটা, (হায় লো)
তার সঙ্গে তোর প্রেমের ঘটা,
লাজে মরে যাই লো ।।
আঁকা বাঁকা অঙ্গখানা,
ভঙ্গী দেখে যম ছুয়ে না, (তায় লো)
দাস পীতাম্বরের সেই সাধনা, কবিছে সদাই লো ।।১

তিওরি খিচিনু খিচুবি পাকানু, পাতিল বা ভাঙ্গিল,
তেওড়ি ভিজিল ।
কি হায়রে আল্লা অভাগীর কপালেব দোষে ।
কি হায়বে আল্লা অভাগীর নছিবের দোষে ।
নদীর কুলে বৃক্ষ লাগানু কি হায়রে আল্লা ছাঁয়াই দাঁড়াবার আশে,
কি হায়বে আল্লা ছাঁয়াই দাঁড়াবার আশে ।
পাত সে ঝবিল ডাল সে ভাঙ্গিল
কি হায়রে আল্লা অভাগীর নসিবেব দোষে ।
নগর বান্দিনু সাগর ছেঁচিনু, কি হায়বে আল্লা মাণিক পাবার আশে,
কি হায়রে আল্লা মাণিক পাবার আশে,
নগর ছিঁড়িল সাগব শুকাল, মাণিকও লুকাল,
কি হায়বে আল্লা অভাগীর কপালেব দোষে ।
কি হায়রে আল্লা অভাগীর নসিবের দোষে ।২

ওগো রাই-সায়রে নামলো শ্যামরায়
তোরা ধর গো হরি ভেসে যায় ।।
রাই প্রেমের তরঙ্গ ভারি
তাতে থাই দিতে কি পারবেন গো হরি
ছেড়ে রাজস্ব, প্রেমে ঔদাস্য
কৃষ্ণের চিন্তা কেঁতা ওড়ে গায় ।।৩

বন পোড়ে তো সবাই দেখে
মনের আগুন কেবা দেখে
আমার রসরাজ চৈতন্য বই ।

---

১ হারামণি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ২ ঐ । ৩ লালন গীতিকা ।

গোপীর এমনি দশা
ওকি মরণ দশা
অবোধ লালন রে তোর সে ভাব কই ।।১

দৃষ্টান্তগুচ্ছ বৈষ্ণবীয় পরকীয় প্রেমের লোক-সংস্করণ। কুলের জ্বালা, প্রেমের ও ছলনার জ্বালা, সব কিছুর ওপরে ভাবের আর্তিময় সে বৈষ্ণবীয় হৃদয়পট একালে অপসৃত। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর নাগরালীতে সে ভাবরস অনেক তরল, অনেক লৌকিক। বৈষ্ণবীয় প্রেম-রূপে এ তরলতার অবকাশ হয়ত ছিল, কিন্তু হৃদয়ের অকৃত্রিম নিষ্ঠায় সে পরিচয় স্বতন্ত্র। বাউল গানে বৈষ্ণবের পরকীয় প্রেম রূপের আবরণ মাত্র, ভাবের উদ্দেশ্য নয়। রাধাহৃদয়ের বিচিত্র বেদনার গতিভঙ্গি প্রদর্শন করা বাউলের দায়িত্ব নয়। আপন সাধনার তত্ত্বটিকে রূপক-মণ্ডিত করতে বৈষ্ণবীয় ঘটনা-কাহিনী আহৃত মাত্র। জীবনকথা যখন তত্ত্ব-প্রকাশক উপমানে রূপান্তরিত হয়, তখন তার মধ্যে তারল্যের লৌকিক অবলেপ প্রত্যাশিত।

তুচ্ছতাব আবরণে অনুজ্জ্বল
অতি সাধাবণ স্ত্রী-স্বরূপকে
কখনো কবেছে লালন, কখনো করেছে পবিহাস,
আঘাত কবছে কখনো বা ।২

প্রথম ছবিতে রক্ষণশীলতার অবরোধ ভেঙে স্বাধীন হৃদয়চর্চার অনুজ্ঞা। সমাজ-ভীতির কুল আর দেহ-সঙ্কোচের ঘোমটা নিয়েই কু[illegible]র দিন গেল। বাউল তাই সখীর মত আপন মনকে বুঝিয়েছেন, প্রেমের মানুষ খুঁজতে হলে ও দুটি বাধা কাটিয়ে ওঠা চাই। বৌ, কুল ও ঘোমটার উপমান সাধকের উদ্দেশ্যকে ইঙ্গিত করে দেবার পরও ঘরের একটি চেনাজানা ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। মনের মানুষের উদ্দেশ্যে কুলবধূব গোপন অভিসারের মতই অভিসার করতে হয়, এ কথাও পদকর্তা বুঝিযে-দিয়েছেন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে বাউলেব সখী-সম্ভাষণ। কালা রূপের রহস্য ও আকর্ষণ যেমন একজন নায়িকাই বোঝে, তেমনি সে অরূপ-মূর্তির সন্ধান নিভৃত একটি মনই পায়। তৃতীয় দৃষ্টান্ত জ্ঞানদাসের আক্ষেপানু-রাগের পদ 'সুখের লাগিযা এ ঘর বাঁধিনু' ইত্যাদির লোক-সংস্করণ। এখানে নায়িকারূপে ভক্তহৃদয় আপন উপাস্যকে না পাওয়ার ব্যর্থতা প্রকাশ করছে। এ রূপের আবেদন দ্বিভক্ত। প্রেমিকার হৃদয়-নৈরাশ্যের ছবি ও সাধকের আকূতি।

১ লালন গীতিকা।
২ পত্রপুট, রবীন্দ্রনাথ।

আবেদন দ্বিভক্ত হওয়ার ফলে চিত্ররসের উৎকর্ষ-প্রত্যাশা পাঠকের মনে একমাত্র হয়নি। অনুকরণাত্মক ছবিটি রূপের পরিচয়ে অনেক সামান্য হলেও সাধন-কথার রূপক হিসেবে একটা স্বীকৃতি পাবে। চতুর্থ দৃষ্টান্ত পরিপূর্ণভাবে বৈষ্ণব ভাবানুবাসিত হলেও হাল্‌কা কথার চালে আঁকা ভাব-গভীরতার রঙ গাঢ় হয়নি। দৃষ্টান্তটির প্রথমার্ধে বৈষ্ণবীয় প্রেমানুরাগ বড়, দ্বিতীয়ার্ধে বাউলের বৈরাগ্য। অনুরাগের ছবিতে যে বৈরাগ্যের স্বরূপ প্রকাশ করা হচ্ছে, দৃষ্টান্তের দ্বারাই তা লক্ষিত হয়। পঞ্চম দৃষ্টান্তের অনুরূপ রূপের কথা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই,

বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী।।

লালনের মনের মানুষ অনুসন্ধানের মধ্যে বিরহিণীর আক্ষেপানুরাগ। আবেগের প্রাবল্যে বাউল লালনের কাছে চৈতন্যই আপন মনের মানুষ। বাউল দর্শনের সঙ্গে বৈষ্ণব দর্শনের কেবল আদর্শগত নয়, রূপশিল্পগত ঐক্য ছিল, আলোচ্য পদে তার সাক্ষ্য।

লৌকিক অনুরাগের মধ্যে দিয়ে বাউল তার একজাতীয় প্রেমানুভূতি চিত্রার্পিত করেছে। সেই অনুরাগের মাধ্যমে শুধু জীবন নয়, জগতের 'তুচ্ছতার আবরণে অনুজ্জ্বল' অনেক ছোট ছোট ঘটনার কথা রূপাঙ্কিত। দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক,

ওরে আমার মন-গোয়াল।
দুবেলা তুই দুধ যোগাবি এ কথাটি আটাআটি।
দুধ তুই আমারে দিবি।
ঘরে আছে ধর্ম-গাভী তাহার দুধ দুইয়া লবি।
কামধেনুর দুধ দুইয়া খাবি, যখন চাবি তখন পাবি।
সাধুর সনে যাবি গোঠে আনবিবে দুধ নিকষ পটে।
অসৎসঙ্গে লাগিলে ছিটে নষ্ট হবে দুধ সব খোয়াবি।
দুধ থুই না আল্‌গা করে, হিংসা বিড়াল সদাই ঘুরে,
অপবিত্র পিঁপড়ে খাইলে, কত দেখাবি আর কত তাড়াবি।
গোঁসাই বলে অনন্তরে। ও তোর কাম বাছুরে দড়া ছিঁড়ে
কেমন করে বাঁধিবি তারে, এক ঘরেতে রইছে গাভী।[১]

দোকানী ভাই দোকান সার না, আর কত করবে বেচাকিনা।
ও তোর লাভের আশায় দিন কেটে গেল,
দোকানের সব মাল মসলা চোর ছজনে নিল।

---

১ হারামণি।

ও তোর ঘরের মাঝে সিঁদ কেটেছে, তাও কি একবার দেখ না,
পরেরে ঠকাতে গিয়ে নিজের ঠকালি
যা ছিল তোর আসল টাকা সব খোয়ালি।
ও যে মহাজনের কি করিবি, তাগাদার দিন বল না।
ফকিরচাঁদ কয় ফিকিরের কথা
এখন মহাজনের স্মরণ নিয়ে জানাও গে ব্যথা।
তিনি বড় দয়াল শুনলে আহওয়াল তোর নিদয় হবেন না।১

ক্ষেপা ঘুমিয়ে রইলি, ঘণ্টা পল, টিকিট কই নিলি।
ঐ দেখ বেড়িয়াছেরে ভাই সত্বরে সমত্য হয়ে,
সময় নাই ত আর।
এবার পড়বে পাকা, হবে ভেকা, ওবে বোকা তাই বলি।
গাড়ীর গার্ড সে গোলকপতি, ধন্য বলা যায় চল ইঞ্জিন,
চাপায়ে দিয়ে,
জীবকে চালায় সমুদয়।২

দেখ না এবার আপনারো ঘর ঠাওরিয়ে।
আঁখির কোণায় পাখির বাসা যায় আসে হাতের কাছ দিয়ে।।
ঘরে সবে তো পাখি একটা
তায় সহস্র কুঠরী কোঠা
....
মাঝখানে পাখি বসে আছে
আনন্দিত হয়ে।
তোরা দেখনা রে ভাই ধরার জো নাই
সামান্য হাত বাড়ায়ে।।
পাখি দেখতে যদি সাধ করো
সন্ধানী চিনে ধর,
দিবে দেখায়ে।৩

পারে কে যাবি নবীর নৌকাতে আয়।
রূপকাঠের নৌকাখানি নাই ডোবার ভয়।।
বে-শরা নেয়ে যাবা
তুফানে যাবে মাবা
একই ধাক্কায়।
তখন কি করবে তোর বদর গাজী
থাকবে কোথায়।।৪

১ হারমণি। ২ হারামণি। ৩ লালন গীতিকা। ৪ লালন গীতিকা।

দয়াল তোমার বৈ আর জানি না, তোবা গাছের সন্ধান পেলেম না।
হাদিছে খবর আছে, তোবা গাছ উবধভাবে, সে গাছের লাক লাক শিকড়
শিকড় কাটলে গাছ মরে হুতাশে প্রাণ বাঁচে না।
হায়াত মউত তাব পাতে লেখা আছে, গাছ তার চামে ঢাকা।
সে গাছেব গোড়া পানিব ভিতবে আজবাইল বসে,
ডালে দৃষ্ট কবে দেখে পাতা পাকে না।
লালন কয় গাছেব তবে গাছ আছে শূন্য ভবে,
সে গাছের তুলনা চলে না,
প্রত্যেক দিন সে আহাব ক'বে আমি খুঁজে পেলাম না ।।[১]

উদ্ধৃতিগুচ্ছের প্রথমটি গো-দোহনের ছবি। কবি দোহনের বিস্তারিত ক্রিয়া এবং সে বিষয়ে সতর্কতার রূপক-চিত্রে শুদ্ধসত্ত্ব পরমেশ্বরের সান্নিধ্য-লাভের উপায় বর্ণনা করেছেন। এই ধরনের একটি রূপক,

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা
গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং
গীতামৃতং মহৎ ।।[২]

দ্বিতীয় উদ্ধৃতি দোকানদারির রূপকে গড়া। লাভ-লোভের বণিকবৃত্তি কেমন করে আত্মার শুদ্ধাবস্থাকে দূষিত করে, এ ছবিতে তারই ইঙ্গিত। তৃতীয় উদ্ধৃতি স্টেশনে ট্রেন ফেলের রূপক-ছবি। শিথিলচেতন মানুষ যেমন ঠিকসময়ের গাড়ী ধরতে পারে না, তেমনি সাধনপথে চিত্তজড়তা পরমতত্ত্বলাভের অন্তরায়। উপমাবস্তুতে আধুনিক যন্ত্রজগতের ছাপ স্পষ্ট। চতুর্থ উদ্ধৃতিতে পক্ষীরূপী মনের মানুষের কথা। পোষা পাখি ধরা দেয় না, পার্থিব লোভের হাত বাড়িয়ে তাকে ধরা যায় না, কেবল সেই দৃষ্টি থাকলে তার দেখা মেলে। বিশুদ্ধ দেহ-তত্ত্বের কথা পাখির গতিবিধির রূপকে আঁকা। পক্ষীরূপকের প্রাচীনতা স্মরণীয়। পঞ্চম উদ্ধৃতিতে দুঃখ উত্তরণের আহ্বান। চর্যাসাধক এই ভব-নদীর আতঙ্কে যেখানে সাঁকো গড়ার উদ্যোগ করেছেন, বাউল তাকেই অধ্যাত্ম তরণীরূপে ভাবনা করেছেন। পরলোকপ্রয়াসী রূপের কথায় নদী, মুক্ত আকাশ, খেয়া পারাপার, নিপুণ নাবিক ইত্যাদির রূপক আবহমান বিশ্বসাহিত্যের উপমালোক অধিকার করে আছে। ষষ্ঠ উদ্ধৃতি দয়াল ঠাকুরের কল্পতরু রূপ।

---

১ হারামণি।

২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, প্রকাশক ননীলাল রায় চৌধুরী, উৎসব কার্যালয়।

আক্ষেপ করে কবি বলেছেন, এ বৃক্ষের জীবনরহস্য মানববুদ্ধিতে ধরা গেল না। বাউলভাবের রূপকগুলিতে চিত্রসংগ্রহের কোন একটা নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। প্রাচীন আধুনিক সবকালের রূপভাণ্ডার থেকে বাউল ছবি নিয়েছেন। শুধু ধর্মেকর্মে নয়, রূপচয়নেও বাউল ব্রাত্য।

বাউলের গানে প্রেমের সার্বভৌম ও নির্বিশেষ পরিচয়ও পাওয়া যায়। সে ভালবাসা 'মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিতবাহিনী'। এ পর্যায়ে কান্তা-কান্তের সম্পর্কে মর্তের সীমাচেতনা নেই :

এই মানুষে সেই মানুষ আছে।
কত মুনি ঋষি চাব যুগ ধবে তারে বেড়াচ্ছে খুঁজে।।
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়।
ধরতে গেলে হাতে কে পায়,
তেমনি সে থাকে সদায়
আছে আলেকে বসে।।১

লৌকিক সম্বন্ধে সেই মনের মানুষ ধরা দেয় না। 'উদক চাঁন্দ্ জিম সাচ ন মিচ্ছা।' এ পর্যায়ের গানগুলির রূপকে সেই অচিন মানুষের আভাসটুকুই মেলে। লালন ফকির তাই গেয়েছেন,

আমাব আপন খবব আপনাব হয না
একবার আপনাবে চিনলে পবে যায় অচেনাবে চেনা।
সাঁই নিকট থেকে দূবে দেখায
যেমন কেশেব আড়ে পাহাড় লুকায়, দেখ না।
আমি ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফিবি আমার কোলের ঘোব তো যায় না।২

কেশের আড়ালে পাহাড় ঢাকা পড়ে যায়। কেশ পার্থিব মোহের রূপক, পাহাড় শুদ্ধসত্ত্ব সাঁই। তাই মনের মানুষ আপন হয় না। এ ব্যথা চিরবিরহীর,

কেন চাঁদের জন্যে চাঁদ কাঁদেরে।
এ লীলের অন্ত পাইনেরে।।
দেখে শুনে ভাবছি বসে
মনে কই কারে।।
আমরা দেখি ঐ গোবাচাঁদ,
ধরবো বলে পেতেছি ফাঁদ,
আবার কোন চাঁদেতে
এ চাঁদেরো মন হরে।।৩

---

১ লালন গীতিকা। ২ লালন গীতিকা। ৩ লালন গীতিকা।

বৈষ্ণবীয় ভাবনার ছায়া আছে সত্যি, কিন্তু এ দৃষ্টান্তের রূপকে ব্যথার স্বরূপ অনির্দেশ্য। বাউল বলে,

> সে যাক্ যাক্ রূপসাগরে আমি যাব না।
> এবার এসে জ্বালায় আমায় রূপ ত ছাড়ে না।
> শয়ন অঙ্গ তব তবে রূপ ঝুপমন ডুবে রয় না।
> ছোট ছোট লব বালা বন বাগীচে করছে খেলা
> ভুবন মোহন করছে নিলা দাঁড়িয়ে দেখো না।[১]

রূপসাগরেই বিশ্বের বিভ্রান্তি। তাতে মূল প্রেমবস্তু স্খলিত হয়ে যায়। কবি তাই রূপের ছলনায় আর জড়াতে চান না। যে প্রেম আপন রহস্যেই বিবর্তমান, তার হদিস কোথা মেলে,

> যে প্রেমে শ্যাম গৌব হয়েছে,
> সামান্য কি তাব মর্ম জানা কি সাধ্য আছে।
> না জেনে যে প্রেমেব অর্থ,
> আন্দাজী প্রেম কবছে কতো
> মবণ ফাঁসি নিচ্ছে সে তো
> পস্তাতে পাছে।।[২]

তাই কবি বারবার গেয়েছেন,

> মনেব মানুষ তালাস কব বে মন,
> তবে পাবে সেই রূপ দবশন।
> মনের মধ্যে আরাক মন আছে,
> সেই মনেব গঠন আছে, এই মনেব সাতে।
> ও ফুলেব আগা কাটা, মাকবী ছাটা, মধ্যে আছে মহাজন।[৩]

গগন হরকরার গানে পাই,

> কোথায় পাব তাবে,
> আমার মনেব মানুষ যে রে।
> হারায়ে সেই মানুষে
> দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।।[৪]

---

১ হারামণি। ২ লালন গীতিকা। ৩ হারামণি।
৪ রবীন্দ্রনাথের 'বাঙলা কাব্য পরিচয়'ধৃত।

এই অচিন মানুষের সন্ধান কবি রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন,

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায় ॥
আট কুঠরী নয় দরজা আঁটা,
মধ্যে মধ্যে ঝলকা-কাটা,
তার উপর আছে সদর-কোটা—
আয়না মহল তায় ॥
মন তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোব তৈরী কাঁচা বাঁশে,
কোনদিন খাঁচা পড়বে খসে,
লালন কয়, খাঁচা খুলে
সে পাখী কোন্‌খানে পালায় ॥১

চেনা খাঁচার এই অচিন পাখি নিয়েই ভাবুকের যত ব্যথা। এ পাখির স্বভাব বিস্ময় জাগায়, কিন্তু রহস্য গোচর করে না। মনের মানুষের অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মতা অচিন পাখির পলাতক স্বভাবের রূপকে রচিত। মানুষ সহজে যে তার নাগাল পায় না, তার কারণ হল, ভালবাসায় শুদ্ধির অভাব। বাউল বলেছে,

কবি যেমন শুদ্ধ সহজ প্রেম সাধন।
প্রেম সাধিতে ফাঁপবে ওঠে কামনদীব তুফান ॥
প্রেম বত্ন ধন পাবাব আশে
ত্রিবেণীব ঘাট বাঁধিলাম কসে
কামনদীব এক ধাক্কা এসে
যায় বাঁধন ছাঁদন ॥২

আর এই অনির্দেয় প্রেমস্বরূপকে আপন করতে যোগসাধনার সংযম-কথা এসে পড়ছে। প্রেমের নিষ্ঠায় অনুক্ষণ কামনা মিশ্রিত হচ্ছে বলেই সে আদর্শ ধরা দেয় না, মানুষ জন্মান্তরে কাতর প্রতীক্ষা করে,

কে ভাসায় ফুল প্রেমেব ঘাটে।
অপার মহিমা তার ফুলেব বটে ॥
যাতে জগতেব গঠন
সে ফুলের হল না যতন
বাবে বারে তাইতে ভ্রমণ
ভবের হাটে ॥

১ লালন গীতিকা।
২ লালন গীতিকা

মাস অন্তে ফোটে সে ফুল
কোথায় গাছ তার কোথায় রে মূল
জানিলে তাহার উল
ঘোর যায় ছুটে ॥[১]

প্রেমের ঘাটে যে ফুল অবহেলায় ভাসে, বাউল বলেন, তার অনাদরেই মানুষের ভবদুঃখ জন্ম-জন্মান্তরের হয়। এ প্রসঙ্গে একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সাধন-রহস্যের যেটুকু সত্য বাউল উপলব্ধি করেছেন, তার রূপাঙ্কনে চিত্রের মাধুর্য যেমন অবিমিশ্র তেমনি আস্বাদ্য। কিন্তু সাধ্যবস্তুর যে পরম পর্যায় এখনও ভাবুকের ধ্যানে অনায়ত্ত, তার ছবিতে রূপের জড়তা স্পষ্ট, যোগপ্রক্রিয়া মুখর, রূপকচিত্রের রস ক্রমশ নেপথ্যগামী। সদ্যোক্ত দৃষ্টান্তে রূপবর্ণনার মধ্যে তত্ত্বারোপের সেই প্রয়াস।

বাউল গানে দেহযোগমণ্ডিত উল্টা সাধনার পরিচয় আছে। উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা যাক,

সহরে ষোল জন বোম্বেটে
করিয়ে পাগল পারা নিল তারা সব লুটে
....
পাঁচজনা ধনী ছিল
তারা সব ফতুর হলো,
কারবারে ভঙ্গ দিল
কখন যেন যায় উঠে ॥[২]

ষোল জন বোম্বেটে = পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও ষড়রিপু। পাঁচ জন ধনী = বিবেক, জ্ঞান, সংযম, বৈরাগ্য, ভক্তি।

যোগসিদ্ধির দ্বারা সেই পরম মানুষকে লাভ করার পথে এরাই বিঘ্ন। এখানে সহরে দস্যুর উৎপাতের রূপক ব্যবহৃত। অতঃপর,

মন চোরেরে ধরবি যদি মন ফাঁদ পাত আজ ত্রিবেণে।
অমাবস্যা পূর্ণিমাতে বারামখানা সেইখানে।
ত্রিবেণীর তিন ধারা বয়,
(ও তার) ধারা চিনে, ধরতে পারলে হয়
কোন্ ধারায় তার সদাই বিহার
হচ্ছে ভাবের ভুবনে ॥[৩]

---

১ লালন গীতিকা। ২ লালন গীতিকা। ৩ লালন গীতিকা।

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর ত্রিবেণী-সঙ্গমে সে গোপনচারীর গতিবিধি। চিত্তকে সংযত করতে হবে সেই মার্গে। বাউল মনের মানুষের গহনলীলা বর্ণনা করেছেন হেঁয়ালী-কথায়,

মেরে সাঁইর আজব লীলেখেলা তা কেউ বুঝতে পাবে।
কালায় শোনে অন্ধ দেখে এই ভাব-নগরে।।
ন্যাংড়া সে নেচে বেড়ায়
অন্ধ জনায় সব দেখেবে।।
জল নাই দেখি সদ্য
ভাসে পদ্ম সেই পুকুরে।।
এ বড় রহস্য কথা বলবো কারে।।১

চিনায়ে দে গুরু ধন, চিনায়ে দে।
জলের তলে তালের গাছটি, তারি তলে চিতে,
মায়ে পুতে যায় সহমরণে দাঁড়িয়ে দেখে পিতে।
....
গাই বিয়াল মধ্য গাঙ্গে, কুমীর বিয়াল চরে,
(ওরে) সেই কুমীর ধরে খা'ল দাঁরকার পোনা মাছ।
রৌদ্র তাপে উঠান ঘামে, আসন গেল স্রোতে,
গঙ্গা ম'ল জল পিপাসে ব্রহ্মা ম'ল শীতে।২

এ সব সাধন-প্রহেলিকা প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। বৈদিক কাল থেকেই এ প্রকৃতির উল্টাসাধন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগের ভক্ত-সন্তদের গানে-গাথায় এই একই জিনিষ মিলেছে। এ বিষয়ে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বাউলের দৃষ্টিতে নৈরাশ্য নেই। সব সময়েই সুমহৎ একটি আদর্শ-সত্য লাভের প্রত্যাশা সাধকের মনে। বৈরাগ্যচর্চার মধ্যেও এই আশাবাদ তার জীবনকে পৃথিবীর প্রতি নির্লিপ্ত অনুরাগে ভরে দিয়েছে। প্রাণের সবটুকু দরদ নিঙড়ে বাউল যেন তার গানের ভাষা বেঁধেছে। একটু দৃষ্টান্ত নিই,

আমার যেমন বেণী তেমনি রবে
চুল ভিজাব না।

---

১ লালন গীতিকা।

২ হারামণি।

বেণীশোভনা নারীর রূপমুগ্ধ সায়রশোভা। অথচ কথার আড়ালে জীবনের নিরাসক্ত দৃষ্টি সাধকের অভিপ্রায় পূরণ করে, এও সত্যি। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিগত মরমীয়তার ওপর নির্ভর করেই এ ছবির মাধুর্য, তত্ত্বগৌরব দেখা দিয়েছে। আর একটি পদাংশ,

> যে নিঠুর গরজী
> তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি
> সবুর বিহনে ?
> দেখনা আমার গুরু পরম সাঁই
> সে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল,
> তাড়াহুড়া নাই।[১]

কি সোহাগে অনুরাগে ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির এমন মুকুল ফুটলো! দৃষ্টান্তের প্রথম ছত্রে অনুযোগের ভাষা কত মর্মস্পর্শী। এখানে ফুলের কোন রূপ-চ্ছবি নেই, কোন অলঙ্কার নেই, অথচ ভাষার যাদুমন্ত্রে কুঁড়ি কত সহজেই ফুল হয়ে ফুটেছে। বাউল গানের রূপের কথাই প্রমাণ করে যে বাউল জীবন-বৈরাগী বটে, কিন্তু জীবন-বিদ্বেষী নয়।

---

১ হারামণি, মদন ফকীর। (অনেকে মনে করেন, এ গানটি বাউলভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব রচনা।)

দ্বাদশ অধ্যায়

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল

একটি যুগ তার বিশিষ্ট ক্ষয় ও ক্ষমতা, সংস্কার ও শক্তি নিয়ে অস্ত যাচ্ছে, আর একটি যুগ আত্মসচেতনতা ও ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য নিয়ে উদয়াভাস দিয়েছে, ভারতচন্দ্রের কাব্যকাল এই দুইয়ের মধ্যবর্তী। সপ্তদশ শতাব্দীর সুরু থেকেই সুদূরবর্তী মোঘলের কেন্দ্রীয় শাসন বাঙলাদেশে শিথিল। নবাবী শাসনও স্বার্থলোভী গৃহকলহে হতবল। সঙ্গে বিদেশী শক্তির ভেদবুদ্ধিতে পরিস্থিতি আরও মর্মান্তিক। এই শক্তিলোপের দিনে রাজকীয ঐতিহ্যের দীক্ষা-বঞ্চিত সামান্য চরিত্রের কতিপয় মানুষ কিছু জনবল সঞ্চয় করে রাজা সেজে বসল। বাহুশক্তি-সর্বস্ব প্রতাপের ধর্মই হল শাসিত জনসমাজের সুখশান্তি কামনার চেয়ে আড়ম্বর ও বিলাসে বেশি করে আত্মপরায়ণ হওয়া। আর এই চরিত্রদৈন্যের সভামণ্ডপে বয়স্যসুলভ রসকলার আদর বেশি। অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ডে (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ) বিদ্যাসুন্দরের সুড়ঙ্গপথে গোপন প্রণয়লীলা এমন একটি রাজসভারই যে পৃষ্ঠপোষকতা পাবে, তাতে আর সন্দেহ কি। বিশেষত স্বয়ং দেবী যে প্রণয়ের পোষ্টা, তাতে জীবনের লজ্জাকর গোপনীয়-তাকে আড়াল করে রাখার কোন হেতু নেই। ভারতচন্দ্রের কাব্যের উপমা নতুন মূর্তিতে দেখা দিলেও দেহের প্রতি সকাম লোভের কটাক্ষ বেশ স্পষ্ট। তাছাড়া 'অন্নদামঙ্গল' মঙ্গলকাব্যেরই আখ্যাবাহী। রচনার বহিরঙ্গ রীতিতেও কিছু কিছু মিল। কিন্তু পূর্বতন মঙ্গলকাব্যে ...কে উপলক্ষ করে পল্লীপ্রাণ, নদীমাতৃক, বাণিজ্যনির্ভর মানুষের হিংসা ও প্রেম, তেজ ও সাহস এবং বিপুল অধ্যবসায়ের কাহিনী যেভাবে লোকজীবনের সৌরভে সুবাসিত, তার ঐতিহ্য অন্নদামঙ্গলে অনুপস্থিত। পল্লীজীবনের সেই ব্যাপক প্রাণ-পরিচয় মুছে গিয়ে নাগরিক চতুরালিতে এ কাব্যের প্রকাশভঙ্গি তির্যক। মধ্যযুগে দেবদেবীর নমস্য পদমর্যাদা দেশের মানুষের হৃদয় জুড়ে ছিল, সংসারের দুঃখে-সুখে তাঁর শরণ নিলে সুরাহা মেলার ভরসা ছিল। অলৌকিক অথবা আধ্যাত্মিক যাই হোক না কেন, দেবতার এমন সার্বভৌম মান্যপদ অন্নদামঙ্গলে নেই। এখানে দেবতা অবৈধ সামাজিক আচরণের সহায়ক। নাগরী দূতীর মত তাঁর ক্রিয়া-কলাপ। ভারতচন্দ্রের কাব্যে মানুষ হয়ত দেবতার দাসত্ব থেকে মুক্ত, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এবং মানবিক সচেতনতা এ কাব্যে অবশ্যই জেগেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের এই দেবনির্ভর স্বরূপধর্মকে অকাতরে বর্জনও করেছে। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।' 'দুধেভাতে' কথাটি সমগ্র মধ্যযুগের

মঙ্গলকাব্য-বাসনার প্রতীক। পূর্বতন মঙ্গলকাব্য এই কামনাকেই সংসারের সুখে-দুঃখে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিল। অন্যদিকে তর্জা ও কবিগানের প্লাবনকে সৃষ্টিশক্তির স্ফুরণ বলা চলে না, সমাজমানসের সঞ্চিত গ্লানি ও স্নায়ুর চাঞ্চল্য হিসেবেই তাদের আবির্ভাব। গোপন প্রণয় মাধুর্য ও মর্যাদায় ভরে উঠতে পারে, বৈষ্ণব পদাবলী তার প্রমাণ। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরে গোপন প্রণয়ের কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতায় প্রেমের সহজ প্রকাশ ব্যাহত। সে আড়ষ্টতাকে ঢাকা দেওয়ার জন্যেই তার মধ্যে ধর্মের আমদানী। 'কেবল তাই নয়, রাজ-সভার কৃত্রিমতায় সে কাহিনী যত পঙ্কিল হয়ে উঠেছে, ধর্মপ্রেরণার অবান্তর আগ্রহে তাকে সজীব করবার চেষ্টাও হয়েছে তত বেশী। ভারতচন্দ্র তাই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রতীক; জীবনের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মন্দার দিনে তাঁর আবির্ভাব স্বাভাবিক ও সংগত।'[১]

'রসমঞ্জরী' রচয়িতা ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনা করেছেন,

চন্দ্রে সব ষোলকলা হ্রাসবৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্রে পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মেলে॥
চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্র-হৃদে কালী সর্বদা উজ্জ্বল॥
দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়॥

স্তাবকতার অভিনব চতুরালিতে গুণগ্রাহী ও পৃষ্ঠপোষক রাজার প্রশস্তি। সর্বাংশে তুলনার দ্বারা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গুণমাহাত্ম্যের পরিমাণ নির্ণয় করে কবি আকাশের চাঁদকে দুয়ো দিয়েছেন। এখানে ব্যতিরেক অলঙ্কার যমক আশ্রয় করে পুষ্ট। ব্যতিরেক অলঙ্কারে এক দিকে যেমন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রূপগুণ অতুলনীয়, অন্যদিকে যমকের চাতুর্যে বক্তব্যও অতিতির্যক। অর্থাৎ একই বর্ণনাপদে যুগ্ম উপমার বিন্যাসে কবির রূপকুশলতার সঙ্গে প্রশস্তি-কুশলতার মালাবদল। উদ্ধৃত বর্ণনাটি নানা কারণে মূল্যবান। ব্যতিরেক অলঙ্কারের পদ হিসেবে এ দৃষ্টান্তকে

---

১ বাঙলার কাব্য, হুমায়ুন কবির।

গ্রহণ করলে দেখা যাবে যে, চিত্তকে রসাবিষ্ট করার বদলে বুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করাই এর আবেদন। ভারতচন্দ্রে উপমা প্রয়োগের এ এক নতুন দিক। এখানে সুন্দরের মনোহারী রূপমূর্তি নেই, কেবল নিপুণ কৌশলে প্রকাশভঙ্গিকে বুদ্ধি-শাণিত করার প্রয়াস ও পরীক্ষা। অবশ্য এ কাব্যের উপমায় সুন্দরের রূপ-মুগ্ধতা কোথাও নেই, এমন কথা বলি না। তবে, রসশাস্ত্রের বিভাগ অনুসারে এ কাব্যের অলঙ্কার যতটা 'দীপ্তি কাব্যের' বোধ জাগায়, ততটা 'দ্রুতি কাব্যের' অনুভূতি প্রকাশ করে না। আমরা বলেছি, এ কাব্যপাঠের সভামণ্ডপ গৌরব-কালের নয়, অবক্ষয় কালের। আর চূড়ান্ত এক অবক্ষয়ের কালে কাব্য রচিত হলে তা কাব্যাশ্রয়ী উপমার সৌন্দর্যকে উদ্বোধিত করার বদলে বাগাড়ম্বরকে বিশদ করে। কবির আরও কয়েকটি যমক-শ্লেষ শব্দালঙ্কার উদ্ধৃত করে পূর্বোক্ত পদের যমক-বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করব।

শিবের কপালে রয়ে প্রভুযে আরতি লয়ে
না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে আরের কপালে দহে
আগুনের কপালে আগুন।

পাইয়া চরণ তরি, তরি ভবে আশা।
তরিবারে সিন্ধু ভব, ভব সে ভরসা॥

অর্ধেক বয়স রাজা এক পাটরাণী।
পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুব ৎ . ॥

আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ।
কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুঃখ॥

দৃষ্টান্তের প্রথম দুটি যমক ও শেষের দুটি শ্লেষ অলঙ্কার। প্রথমটি যমকধর্মী অসঙ্গতি অলঙ্কার। প্রথমটিতে কপাল দেহের প্রত্যঙ্গ বিশেষ, কপাল ভাগ্য। দ্বিতীয়টিতে তরি নৌকা, তরি উত্তীর্ণ হই। ভব জন্ম, ভব মহাদেব। তৃতীয় পদে 'যুবজানি' সমাসবদ্ধ হলে অর্থ হবে, যুবতী জায়া যাদের। ভেঙে লিখলে 'যুবজানি'র অর্থ হবে, সকলকেই যুবা বলে জানি। চতুর্থ পদে কপাল দেহ-প্রত্যঙ্গ, ভাগ্য। আগুন অগ্নি, দুঃখতাপ।

এবার যমকের প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে দু'একটি কথা আলোচনা করে নেওয়া যাক। ধ্বনিশাস্ত্র বলেছেন,

ধন্যাত্মভূতে শৃঙ্গারে যমকাদি নিবন্ধনম্ ।
শক্তাবপি প্রমাদিত্বং বিপ্রলম্ভে বিশেষতঃ ।।১

ধ্বন্যালোক রূপদক্ষ কবিকে এ অলঙ্কারের প্রয়োগবিষয়ে প্রত্যক্ষ নিষেধ করেছেন। 'প্রমাদিত্ব' এই শব্দেব দ্বারা দেখান হচ্ছে যে, কাকতালীয় ন্যায়ে কদাচিৎ কোন একটি যমকের দ্বারা রসনিষ্পত্তি হলেও অন্য অলঙ্কারের মত যমকাদিকে রসের অঙ্গরূপে প্রয়োগ করা কর্তব্য নয়।[২] অধিকন্তু শ্লেষ যমকেরই অনিবার্য পরিণতি।'[৩] চাতুর্যমুখ্য এ দুটি অলঙ্কারের প্রয়োগ ভারতচন্দ্রের কাব্যে অজস্র।

অন্নদামঙ্গলের অলঙ্কার প্রয়োগে চাতুর্য সৌন্দর্যের মণ্ডনকলাকে ছাপিয়ে গেছে। এ জাতীয় দৃষ্টান্তগুচ্ছে ভারতচন্দ্রের আলঙ্কারিক কলাকৌশল লক্ষ্যভ্রষ্ট ভারসাম্যচ্যুত সমাজের পরিচায়ক, সৃজনীশক্তির বহিঃপ্রকাশের ব্যর্থতায় আঙ্গিকের উৎকর্ষ সাধনই বড কথা।

শুধু মানব চরিত্রে অথবা কবিবিবৃতিতেই নয়, দেবদেবী-সংলাপের মধ্যেও এ জাতীয় চাতুর্য প্রকাশিত। অন্নপূর্ণার আত্মপরিচয়,

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তাব, কপালে আগুন ।।
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ-ভবা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ।।
গঙ্গা নামে সতা তাব তবঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা সে স্বামীব শিবোমণি ।।
ভূত নাচাইয়া পতি ফেবে ঘবে ঘবে।
না মবে পাষাণ বাপ দিলা হেন ববে ।।

এটি শ্লেষাশ্রয়ী ব্যাজস্তুতি। অপ্রধান অলঙ্কার বাক্যগত অর্থ-শ্লেষ। আগাগোড়া তার দুটো মানে। এক অর্থে কুলীন ঘরের স্বামী ও সপত্নীর বর্ণনা, পাটনী এই অর্থই বুঝেছে। অপর অর্থ, শিবের স্বরূপ বর্ণনা, সেইসূত্রে দেবীর পরিচয়। নিন্দাচ্ছলে স্তুতি অর্থে ব্যাজস্তুতি। বক্তব্যকে ঈষৎ অবগুণ্ঠিত রেখে তার ব্যঞ্জনাকে প্রসারিত করে দেওয়া এ অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য পদটি কবির কপটপটুত্বের চমৎকৃতি ঘটিয়ে ভঙ্গিতেই আমাদের ভুলিয়েছে। আঙ্গিকের

---

১ ১৫শ শ্লোক, ২য় উদ্দ্যোত, ধ্বন্যালোক। ২ ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
৩ ডঃ সুধীর কুমার দাসগুপ্ত।

উৎকর্ষ সাধনের দিকে কবির যত মনোযোগ, রূপমুগ্ধতার উদ্বোধনে তত মনো-যোগ নেই। আর একটি দৃষ্টান্ত,

সভাজন শুন, জামাতার গুণ, বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
সুখে দুঃখ জানে, দুখে সুখ মানে,
পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কে মানে, কারে নাহি মানে,
সদা কদাচারময়॥

ব্যাজস্তুতির অলঙ্কারাভাস। 'ব্যাজস্তুতি অলংকার-সৃষ্টি স্রষ্টার ইচ্ছাকৃত। কিন্তু ভারতচন্দ্রের 'সভাজন শুন' ইত্যাদি দক্ষরাজার ইচ্ছাকৃত শিবনিন্দা, এর মধ্যে ব্যাজ নাই।'[১] 'এখানে বক্তা দক্ষ কেবলমাত্র নিন্দা-অর্থেই বাক্যগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন। কবির রচনাগুণে আমরা স্তুতি-অর্থটিও উপলব্ধি করিতেছি। কবি অপর অর্থ ইঙ্গিত করিয়া শিবনিন্দার ভাগী হইতেছেন না। একটি অর্থ বাচ্য ও অপরটি গম্য বা প্রতীয়মান।........।'[২] এ অংশটি পাকা-পাকিভাবে যদি ব্যাজস্তুতি নাও হয়, তবু এতে যে ব্যাজস্তুতির আভাস আছে, সে সত্য স্পষ্ট।

ভারতচন্দ্রের রচিত ধ্বন্যাত্মক শব্দালঙ্কারে এক ধরনের সুষমা লক্ষ্য করা যায়। পরিমিত আয়োজনে মনোরম ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টিতে রায় গুণাকরের জুড়ি নেই। এ অলঙ্কারের পারিভাষিক নাম ধ্বন্যুক্তি।[৩] প্রথম উদাহরণ,

লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥

ছলচ্ছল গঙ্গা জলের নৃত্যশীল গতির দ্যোতনা জাগায়। টলট্টল, জলের স্বচ্ছতা গুণের পরিচয় দেয়। কলক্কল, জলের অব্যক্ত ধ্বনি শোনায়। অর্থাৎ, শব্দের অভিনব আঘাতে এ অলঙ্কারে ভাবের তাৎপর্য ঝঙ্কৃত। শব্দের দ্বারা চিত্র-নির্মাণের পরিচয়,

---

১ অলঙ্কার চন্দ্রিকা, শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী। ২ কাব্যশ্রী, ডঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্ত।
৩ রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'শব্দ-কথা'য় এ বিষয়ের মনোজ্ঞ আলোচনা আছে।

লট পট জটা লপটে পায়।
ঝব ঝব ঝবে জাহ্নবী তায় ।।
গর্ গর্ গর্ গরজে ফণী।
দপ্ দপ্ দপ্ দীপয়ে মণি ।।
ধক্ ধক্ ধক্ ভালে অনল।
তব্ তব্ তব্ চাদ মণ্ডল ।।

....

ববম্ ববম্ বাজয়ে গাল।
ডিম্ ডিম্ বাজে ডমরু তাল ।।
ভবম্ ভবম্ বাজায়ে শিঙ্গা।
মৃদঙ্গ বাজাযে তাধিঙ্গা ধিঙ্গা ।।

কবি ভারতচন্দ্র এখানে শিবের জটা, জাহ্নবী, ডমরু, শিঙ্গা, সবকিছুকেই সজীব উল্লাসে নৃত্য করার প্রাণ দিয়েছেন। অথচ কবিব মূলধন কেবলমাত্র কতকগুলি শব্দ। সামান্য সম্বলে রূপেব এমন প্রত্যক্ষ পদধ্বনি শোনানোর ক্ষমতা আধুনিক কবি সত্যেন্দ্রনাথে কেবল দেখেছি। শব্দগুলি যেন কবির কল্পনার মধ্যে মন্ত্র-পূত। শব্দের অতিকুশল প্রয়োগ আমাদের গহন আত্মায় অধিষ্ঠিত রূপের স্মৃতিপুঞ্জকে চাক্ষুষ করায়। বাক্যের আড়ম্বর আর শব্দ-ধ্বনির ঐশ্বর্যছটাই সভামণ্ডলের চাহিদা। রায় গুণাকর কবি তা বুঝেছিলেন। তাই তাঁর কথা বড় নিপুণ, বড়ো সুশ্রাব্য। কৌশলে মাধুর্যে গাম্ভীর্যে ধ্বনিতে ও প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ।

ভারতচন্দ্রের উপমায় হৃদয়াবেগ দুর্লক্ষ্য নয। এ পর্যাযেব উপমা কোমলতার আবেদন আনে, প্রখর চিন্তাক্রমকে কুটিল করে না। তবু আমরা মনে রেখেছি, অন্নদামঙ্গলের দেবতাই বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর পৃষ্ঠপোষক। বাগাড়ম্বরপ্রিয় বিলাসী রাজসভার রায গুণাকর কবিই এ জীবন-ঘটনার কথক। সুন্দবের মালিনী সাক্ষাৎ,

কামেব শবীব নাহি বতি ছাড়া বহে।
তবে সত্য ইহারে দেখিযা যদি কহে ।।
এদেশী না হবে দেখি বিদেশীর প্রায়।

ব্যতিরেক অলঙ্কার। অতিশয়োক্তির ব্যঞ্জনা মিশ্রিত। পদটির দু'রকমের ব্যাখ্যা সম্ভব। কবি বলছেন, সুন্দরকে দেখার পর কেউ যদি বলে, মদনের শরীর নেই এবং সে রতি ছাড়া থাকে, তবেই এ কথা সত্য হবে। অর্থাৎ নায়ক

সুন্দরের মনোরম রূপে শরীরের স্থূলতা নেই, সে মদনের মতই সূক্ষ্মশরীর। এখানে সুন্দর সম্বন্ধে কবির অতিশয়োক্তি। আর মদনভস্মের পর থেকে অনঙ্গ-দেব তো রতি ছাড়াই রয়েছেন। এটি সুন্দরের বর্তমান অবস্থার প্রতি কটাক্ষ। এবার দ্বিতীয় ব্যাখ্যা। বিদেশী এই অচেনা মানুষটিকে দেখে কেউ বলুক দেখি, কামনার শরীর নেই এবং সে রতি ছাড়া থাকে, তবেই বুঝি সত্যি। অর্থাৎ, নায়ক সুন্দর যেন শরীরী কামনা। আর 'রতি' বা প্রেম ছাড়া এ নায়ক (সুন্দর) যে থাকতেই পারে না, তা বলা বাহুল্য। .প্রথম ব্যাখ্যায় 'কাম' ও 'রতি' অর্থে পৌরাণিক ব্যক্তি ও কাহিনীসম্পর্ক। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় 'কাম' ও 'রতি' অর্থে বিশুদ্ধ (absolute) হৃদয়ভাবের পরিচয়। কবির ভাষাভঙ্গিতেই শুধু রূপের এমন একাধিক ব্যঞ্জনা। মালিনীর মুখে বিদ্যার রূপবর্ণনা,

কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক যে আঁখি ধরে বিদ্যাব মাজায়॥
মেদিনী হৈল মাটি নিতম্ব দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥

অলঙ্কার ব্যতিরেক। অতিশয়োক্তিব আভাস আছে। বিদ্যার মনোরম মধ্য-দেশে মদনের অধিষ্ঠান। বিদ্যার গুরু নিতম্ব ধরণীর লজ্জার কারণ। দুটি অলঙ্কারই প্রথাবদ্ধ। কিন্তু প্রথাকে ঈষৎ স্বীকৃতির পর কবির নিজস্বতা এদেব আপন বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করে নিল। প্রকৃতিরূপের সহজ সাদৃশ্যে তাৎক্ষণিক আবেগের আলঙ্কারিক প্রকাশ এ নয়। ভারতচন্দ্র মননের পথেই উপমেয়কে জীবন্ত করেছেন। বিদ্যার এ রূপলাবণ্যে সুন্দরের ভাবনা আবিষ্ট,

স্মরিয়া বিদ্যার নাম ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
জলেতে নিবায় জ্বালা সর্বলোকে কয়।
এ জল দেখিয়া জ্বালা দশগুণ হয়॥

তৃতীয় ছত্রের 'জল' শব্দটি বিদ্যার ঢল ঢল দেহলাবণ্যের প্রতীক রূপ। তার সঙ্গে মিশেছে সুন্দরের উত্তপ্ত কামনার ব্যাকুলতা। ফলে জল তার শীত-লতাগুণ অপসারিত করে জ্বালার তাৎপর্যে মণ্ডিত। অনুপম দেহভাব এবং উদ্বেল মনোভাবের সমন্বয়ে বিষম অলঙ্কার গঠিত। সুন্দর ও বিদ্যার সাক্ষাৎ,

শুভক্ষণে দরশন হইল দুজনে।
কে জানে যে জানাজানি সুজনে সুজনে॥
বিপরীত বিপরীত উপমা কি কব।
ঊর্ধ্বে কুমুদিনী হেটে কুমুদ-বান্ধব॥

কবি নিজেই বলেছেন, এটি বিপরীত উপমা। চন্দ্রের স্থান আকাশে ও কুমুদিনীর স্থান ধরাতলে। এটাই বাস্তব। কিন্তু সুন্দর (চন্দ্র) রথের কাছে নিচে দণ্ডায়মান, এবং বিদ্যা (কুমুদিনী) প্রাসাদের উচ্চে দণ্ডায়মানা। উপ-মেয়ের বিপরীত অবস্থান। এখানে কুমুদিনীর দর্শনপ্রার্থী আকাশের চাঁদ মাটিতে নেমেছে। একদিক থেকে কুমুদ-কুসুমকে অনন্যসামান্য করা হল। আবার সেই অনন্যসাধারণ কুমুদিনী বিদ্যা মাটির চাঁদ সুন্দরকে দেখবার জন্যে আকুল। অর্থাৎ অন্যদিক থেকে চাঁদেরও ভূ-সংস্থান বদল করে কবি সুন্দরকে বিশিষ্ট মূর্তিতে হাজির করলেন। প্রয়োগের নতুন আদর্শে নায়ক-নায়িকার মিলনাকাঙ্ক্ষা এবং রূপশোভা ইঙ্গিতগর্ভ। আর একটি বর্ণনা,

বদন মণ্ডল চাঁদ নিরমল
ঈষৎ গোঁপের রেখা।
বিকচ কমলে যেন কুতূহলে
ভ্রমর-পাঁতিব দেখা॥

মালিনী কর্তৃক সুন্দরের রূপবর্ণনা। উপমান প্রথাবদ্ধ। কিন্তু উপমেয় অভিনব। বদনমণ্ডলকে যখন নির্মল চাঁদের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে, তখন এটা যেন অতি-পরিচয়ের ফলে উপমেয়ের উপস্থাপনা ঘটাচ্ছে। দ্বিতীয় পঙক্তিতেই যেন আসল উপমান আরম্ভ হল। যেহেতু মুখকে বিকচ কমলের সঙ্গে তুলনা না করলে ভ্রমরপঙক্তিকে গোঁপের উপমানরূপে আনা যায় না। সাধারণত দেখা যায়, অলঙ্কার যোজনার ক্ষেত্রে কবিরা প্রস্তুত উপমেয়ের সঙ্গে অপ্রস্তুত উপমান যুক্ত করে সুন্দরের উদ্বোধন করেন। এখানে যেন প্রক্রিয়াটি বিপরীত। প্রথা-জীর্ণ হওয়ার ফলে আহৃত উপমান-বস্তুই যেন প্রস্তুতের মত। আর অভাবনীয় হওয়ার ফলে উপমেয়-বস্তু যেন অপ্রস্তুতের মত। কবি যেন এখানে উপমানের জন্যে উপমেয় সংগ্রহ করেছেন। কেননা, মুখে ঈষৎ গোঁপের রেখা পদ্মে ভ্রমরপঙক্তির মত, এই রূপযোজনা প্রথাকে বিপর্যস্ত করে নতুন স্বাচ্ছন্দ্যে মূর্তিমান। এতকাল পদ্মে ভ্রমর-পঙক্তির উপমান কোমল মুখ, আঁখি, আঁখি-পল্লব ইত্যাদি উপমেয়ের সঙ্গে যোজিত হয়ে এসেছে। তাই উপমান ভ্রমর-পঙক্তি যেন কবির সংগৃহীত রূপ নয়। উপমেয় 'ঈষৎ গোঁপের রেখা'ই অভিনব সংগ্রহ।

সুন্দর (নায়ক) ফুল দিয়ে বিদ্যার রূপ নির্মাণ করেছে,

গড়িয়া অপরাজিতা থরে কৈল চুল।
মুখানি গড়িল দিয়া কমলের ফুল॥

তিলফুলে কৈল নাসা অধর বান্ধুলী।
চাঁপার পাপড়ী দিয়া গড়িল অঙ্গুলী ॥
নয়ন সুন্দর কৈল ইন্দীবর দিয়া।
মৃণালে গড়িল ভুজ কাঁটা ফেলাইয়া ॥
কনক চম্পকে তনু সকল গড়িয়া।
গড়িল চরণপদ্ম স্থল পদ্ম দিয়া ॥
....

চিত্রবাক্যে এক শ্লোক লিখি কেয়াপাতে।

প্রথাবদ্ধ উপমানমালা কায়াকে বাদ দিয়ে তার ছায়াকে আশ্রয় করেছে। অলঙ্কারের প্রথাজীর্ণতা সম্পর্কে কবি সতর্ক। সতর্ক বলেই এখানে বিদ্যার রূপকায়া উপমেয়-রূপে গৃহীত হয়নি। তাই এ বর্ণনায় বিদ্যার বিকল্পমূর্তি রচনার আয়োজন। উপমেয় এখানে বিদ্যার দেহ-প্রতিরূপ বা দেহের বিকল্প রূপ। সুন্দর বিদ্যাকে এই কুসুমমূর্তি উপহার দিয়েছে। মানে পুরোপুরিভাবে প্রথার বশ্যতা স্বীকার করলে বিদ্যার দেহসৌন্দর্যবিষয়ে নায়ক সুন্দরের রূপমোহ নিতান্তই মামুলি ছাঁদে ফুটতো। কবি তাই বিচিত্র পুষ্প দিয়ে অন্য একটি মূর্তি গড়ালেন, যাতে সুন্দরী বিদ্যা প্রতিবিম্বিত। প্রাচীন ও নবীন, এই দুটি যুগ-পরিণয়ের পুরোহিত ভারতচন্দ্র, অতীত রক্ষণশীলতার হাত আগামীদিনের আত্মসচেতনতা ও ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের হাতে মিলিয়ে দিয়েছেন। এ লক্ষণ তাঁর কাহিনী-পরিকল্পনায় যেমন, তেমনি ফুটেছে উপমার শিল্পলোকে।

দেহরূপের একটি বিশিষ্ট পদ লিপিবদ্ধ করি। পর্ণাবয়ব দেহের প্রত্যঙ্গ-বাচী বর্ণনা এখানে নেই। কেবল চাতুর্যদক্ষ কবির আবিষ্ট রূপদর্শনে ঐশ্বর্যের জৌলুষ ঝিকিয়ে উঠেছে,

বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর সার।
অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার ॥
তড়িত ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে।
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণচাঁদে ॥
অঞ্চলে ঢাকিতে চাহে কমলের গন্ধ।
মাণিকের ছটা কি কাপড়ে পায় বন্ধ ॥
দেখামাত্র জিনিয়াছি কহিতে ডরাই।
দেশের বিচারে পাছে হারায়ে হারাই ॥

সুড়ঙ্গপথে বিদ্যার বাসরে সুন্দরের প্রথম আবির্ভাব। সখীপরিবৃত বিদ্যার রূপদর্শনে বিহ্বল নায়কের বর্ণনা। বিদ্যার বসনে বন্দী দেহলতা যেন অগ্নিগর্ভ তড়িত। চকিতগমনা রাধার রূপবিষয়ে বৈষ্ণবকবি বলেছেন, 'ভাল করি পেখি

না গেল। মেঘমাল সঙে, তড়িতলতা জনু।' মেঘমালায় তড়িৎ সম্পূর্ণভাবে আদর্শ-লোকের উপমান। কিন্তু বসনবদ্ধ তড়িতের উপমানে আদর্শলোক ও বাস্তব-লোকের সেতুবন্ধন। লালসার ফাঁদে রূপ বন্দী হওয়ায় এ প্রকাশভঙ্গি passionate, উপমা বাস্তবধর্মী। 'তড়িৎ' শব্দটিতে যতটা energyর ব্যঞ্জনা, ততটা matter-এর ব্যঞ্জনা নেই। ফলে রূপনির্মাণে সূক্ষ্মতা ফুটেছে। অথচ বাস্তব লক্ষণ অনুপস্থিত নয়। এ ঘটনাব অব্যবহিত পূর্বেই বিরহিণী নায়িকার খেদোক্তি, 'এ নীল কাপড়, হানিছে কামড়, যেমন কালসাপিনী।।' পরিহিত বসন যেন নায়িকাদেহে কালসাপের কামড়। যৌবনজ্বালার ছবি। আমাদের বক্তব্য, এ অংশের বর্ণনায় নিসর্গের মামুলি তুল্যযোগটুকু মাত্র নেই। অতীন্দ্রিয়তা ও লালসার এ যেন জড়োয়া রূপশিল্প। সদৃশ অথচ প্রথাপরবশ রূপভঙ্গি ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় অন্যত্র আছে। সুন্দরের রূপ—'বরণ কালিম ছাঁদে, বৃষ্টি জলে মেঘ কাঁদে, তড়িত লুটায় পায় ধড়ার আঁচলে।।' বিদ্যার রূপবর্ণনায় ব্যবহৃত 'ধরিয়া রাখে', 'লুকাইতে চাহে,' 'ঢাকিতে চাহে,' ক্রিয়াপদগুলি উদ্যত এবং আবিলতার ইঙ্গিতবহ। চতুর্থ ছত্রের উপমা প্রথা-বদ্ধ। বসনে ভূষণে সুবাসে সৌগন্ধ্যে এমন সমৃদ্ধ বর্ণনা রাজগৃহের পবিচয় দেয়। আর একটি কথা,

> বসিয়া চত্বর কহে চাতুরীব সাব।
> অপরূপ দেখিনু বিদ্যাব দববাব।।

এ কি নায়িকা বিদ্যার বাসরকক্ষে রূপমুগ্ধ নায়কের প্রশস্তি, অথবা রাজার দরবারে বিলাসপটু বয়স্যের রাজবন্দনা। দ্বিতীয় ছত্রে 'বিদ্যার' শব্দের বদলে যদি 'রাজার' শব্দটি ব্যবহার করি, দেখতে পাবো, নায়িকার নিভৃত বাসর কক্ষে গোপন প্রবেশের কালেও কবিব মনে রাজসভার সাড়ম্বর আয়োজন-স্মৃতি জীবন্ত। চোরকাব্যের উত্তরাধিকারী কবি ভারতচন্দ্রের হাতে যুগ্ম দায়িত্ব, রাজসভার মনোরঞ্জন ও সুন্দরের অর্চনা। চোর পঞ্চাশতের কবি বাক্‌চাতুর্যে সভাকে মোহিত করে রূপের রাজকোষ গোপনে লুঠ করেছিলেন। আর একটি রূপবর্ণনা,

> নারীব যৌবন বড় দুরন্ত।
> শরীবের মাঝে পোষে বসন্ত।।
> বিনোদ বিননে বিনায়্যা বেণী।
> পুরুষে দংশিতে পোষে সাপিণী।।
> ....

দুখানি বিষাণ নিশান রাখি।
হৃদয়ে মৃণাল রেখেছে ঢাকি ॥
....
ত্রিবলি ডোরেতে বান্ধি অনঙ্গ।
কটিতটে থুয়্যা দেখরে রঙ্গ ॥
সম্বরে অম্বর দিয়া কান্তার।
মদন সদন রস ভাণ্ডার ॥

ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'-ধৃত পদাংশ। যৌবনমত্তা নারীর উদ্দাম দেহরূপ বসন্ত-প্রকৃতির সৌন্দর্যে প্রতিফলিত। আমাদের পূর্ব মন্তব্য স্মরণ করি। 'শরীরের মাঝে পোষে বসন্ত।'—ছত্রটিতে ক্রিয়াপদের ব্যঞ্জনা সমগ্র বর্ণনাপদের গূঢ় উদ্দেশ্যটিকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে। কালিদাসের কাব্যে নায়িকার রূপ-বর্ণনায় প্রকৃতিসম্পর্ক স্মরণযোগ্য। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কাব্যের প্রেমিকা বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কোথাও নবযৌবনার যৌবনধর্ম-সাধনের অস্ত্র বা উপায়রূপে নিসর্গের অবস্থান-পরিচয় আমরা পাইনি। ভারতচন্দ্রের রূপবর্ণনায় লালসার ইঙ্গিত সমকালের রুচি-লক্ষণ প্রকাশ করে।

ভারতচন্দ্রের উপমায় নারী নাগরীরূপে অঙ্কিত। পুরুষ-রূপের মধ্যেও নাগররূপই বড়। কাহিনীতে পাই, চোররূপে ধৃত সুন্দর রাজসভায় আপন বৈদগ্ধ্য-পরিচয় দেবার ছলে 'মদনবিহ্বল লালসাঙ্গী' বিদ্যার কামকথা বর্ণনা করেছে। আর তার ফলেই সুন্দরের প্রতি রাজার সম্ভ্রম বেড়ে গেল। জীবনের ব্যাপক ও বহুমুখী অর্থকে কেবল ভোগের মধ্যে সঙ্কুচিত করে দেখার দৃষ্টি সেই যুগেরই, তৎকালীন রাজসভারই। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম ধর্মসাধনার উপায়। মঙ্গলকাব্যে যতটুকু প্রেম আছে তা সমাজের সুস্থ সহজ প্রাপ্তি বা দেবানুগ্রহের দান। ভারতচন্দ্রের কাব্যে কামকলা গোপন সুড়ঙ্গপথের অভিযাত্রী। এর শ্মশানে কামকলা, মশানে কামকলা, গুরুজন সমক্ষে দ্ব্যর্থক কামব্যঞ্জনা। এ যেন ষড়রিপুর মধ্যে প্রথমটির জীবনব্যাপী একাধিপত্য। বৈষ্ণব পদাবলীতে ধর্ম, কামনাকে কিঙ্করে পরিণত করেছিল। এখানে তার নিগূঢ় প্রতিশোধ। তবু কোথাও কোথাও এ কাব্যে উপমার অকপট পরিচয় মেলে। মালিনীর বেসাতির হিসাব,

নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে।
তারা কথায় মনের গাটি কাটে ॥
লাভ কে করিতে চায় মূল রাখা হৈল দায়
এমন ব্যাপারে কেবা আঁটে ॥

পসারি গোপের নারী বসিয়াছে সারি সারি
রসের পসরা গীত নাটে ॥

বেসাতির রূপকে নাগবালির ছবি। মালিনী সোজাসুজি সুন্দরকে আপন বৃত্তি-পরিচয় দিয়েছে। হয়ত অলঙ্কারের আরোপ বক্তার অভিধাকে ঈষৎ তির্যক করেছে, কিন্তু শিষ্টাচারের কপট আচ্ছাদন দিয়ে বিবস্ত্র বাস্তবকে ইঙ্গিত করে দেওয়ার কোন চতুর নির্দেশ নেই। অবশ্য এ সব নারীর মুখের ভাষাই এমন পরোক্ষ ভঙ্গিমূলক। আমাদের বক্তব্য, কবির নিজের কোন অতিরিক্ত চেষ্টা এ বিবরণকে কুটিল করেনি। আর একটি রূপচ্ছবি,

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ি।
ডানি করে ভাঙ্গা লড়ি বাম কক্ষে ঝুড়ি ॥
ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি ॥
ডেঙ্গর উকুন নীক করে ইলিবিলি।
কুটকুটি কানকোটারির কিলিবিলি ॥
কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিলা অধরে ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়াই বুড়ীর রূপবর্ণনার সঙ্গে তুলনীয়। চতুর্থ পঙক্তিতেই অলঙ্কার বর্তমান। রূপবর্ণনা যথাযথ, শোভাধর্মী (decorative) নয়। জোরালো অভিধাভাষায় প্রসারিত রূপের পটে একটিমাত্র অলঙ্কারের আলো ঝিকিয়ে উঠেছে। এই ধরণের রূপবর্ণনায় অভিধাভাষা যত দক্ষ, অলঙ্কারের পরোক্ষভাষণ তত দক্ষ নয়। এ জাতীয় আর একটি বর্ণনাপদ,

বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ ॥
পাটুনী বলিছে মাগো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে ॥
ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল ॥
পাটুনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন।
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ ॥
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি উপরে ॥
....

সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতী হইল সোনা দেখিতে দেখিতে ॥

....

প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে জোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ॥

সাধারণভাবে চরণ-কমলের উপমেয়-উপমানগত অলঙ্কার-সাদৃশ্য জীর্ণ। এ-বিষয়ে শ্রোতার রূপকৌতূহল অবসিত। কিন্তু যে মুহূর্তে বিস্তৃত স্বভাব-বর্ণনার রূপাবহ পটে এই কমলের উপমান অর্পিত হল, সঙ্গে সঙ্গে একাধিক রূপব্যঞ্জনায় কমলের শতদল-দীপ্তি দেখা দিল। উদ্ধৃত পদটির দ্বিতীয় ছত্রেই কেবল অলঙ্কার আছে, প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। তাছাড়া, দীর্ঘ উদ্ধৃতির মধ্যে জোরালো অভিধাকথায় রূপের এবং মানব-ব্যবহারের স্বভাবসুন্দর ছবি। এই ছবিরই প্রসন্ন পটখানি দ্বিতীয় ছত্রের অলঙ্কার-বাক্যকে তার আপন শোভাবিস্তারের নিটোল একটি পরিমণ্ডল দিয়েছে। নৌকার বাহিরে জননীর পা দুখানি নামানো, তাতে মনে হয়, যেন নদীজলে কোকনদ শোভমান। সমগ্র বর্ণনার পটভূমি থেকে এ দুটি ছত্রকে পৃথক করে নিলে চরণ ও কোকনদের উপমেয়-উপমানগত একটা রূপের দর্শন মিলতো, আর সেই রূপচ্ছবিকে আমাদের রূপভাবনার বাঁধাধরা অনুমান-শক্তি দিয়ে একটা প্রস্তুত অলঙ্কারের মার্কা দিতাম। আসলে চরণ ও কোকনদের উপমেয়-উপমানগত অলঙ্কার-চিত্রের কথা শুনতে শুনতে শ্রোতার রূপকৌতূহল শিথিল হয়ে গেছে। তাই এ জাতীয় অলঙ্কার হাতে এলে বিনা রসোপভোগেই শ্রোতার মন একে রূপ-তালিকার কোন নির্দিষ্ট ক্রমে সাজিয়ে রেখে দেয়। কিন্তু এই অলঙ্কার যখন দীর্ঘ বর্ণনার বিস্তৃত রূপাবহ পটে স্থাপিত হল, তখন কেবলমাত্র চরণ-কোকনদের প্রাথমিক সাদৃশ্যের জীর্ণতায় এ রূপ অচল পয়সার মত মন থেকে বাতিল হয়ে গেল না। জননীর আল্‌তাপরা রাঙা চরণ দুখানি নদীতে পদ্মশোভার মত, যার স্পর্শে কাঠের সেঁউতীও সোনা হয়। গৌরাঙ্গীর চরণে রাঙা আল্‌তা, তারই ঐশ্বর্যে সেঁউতীতে দুধে-আল্‌তার বর্ণাভাস। অর্থাৎ, অভিধাকথার বিস্তার রূপের বহুমুখী বর্ণপরিচয়ে অলঙ্কৃত। এখানে 'দেখিতে দেখিতে' বাক্যাংশটি লক্ষণীয়। স্বর্ণবর্ণের আভাস কখন অলক্ষ্যে স্বর্ণবস্তুতে ঘনীভূত হয়েছে, তা যেন সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করে যায়। আর সেই সঙ্গে জননীর গরীয়সী পদ, সতী নারীর শুচিতা, আমাদের গ্রামবাঙলার লক্ষ্মীশ্রী, পল্লীমানুষের সরল কামনার কথা, সবকিছুই অপূর্ব ভক্তিনম্রতায় রূপবান। ব্যাসের প্রতি দেবীর দৈববাণী,

আমার দ্বিতীয় কিম্বা দ্বিতীয় শূলীর।
যদি থাকে তবে হবে দ্বিতীয় কাশীব॥
....
অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত॥
খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত॥
কবিবে দ্বিতীয় কাশী না কর এ আশ।
অভিমান দূব কবি চল নিজ বাস॥

চতুর্থ ছত্রে অলঙ্কার আছে। উপমানটি আমাদের গ্রামে-গড়া তন্তুবায় জীবন থেকে নেওয়া। লোকচিত্রে উপমেয়-উপমানের ভাবস্তর সমোচ্চ বলে তাৎপর্যের তাৎক্ষণিক আস্বাদন মেলে। লোককাব্যের কবিবাসনায় দেবতার অভিজাত গৌরব এমন করেই আমাদের কুটীরাশ্রয়ী হয়েছে। বলা চলে, অন্তত এই সব অংশে ভারতচন্দ্র পূর্বতন মঙ্গলকাব্যের অন্তরাত্মাকে কখনো কখনো রূপোদ্ভিন্ন করেছেন।

এ কবির রূপরচনায় শব্দালঙ্কারের স্থান কোন অংশেই গৌণ নয়। অর্থাৎ কথাকে নিপুণ করার, বাক্যকে তির্যক করার প্রেরণা কবির মনেই ছিল। শ্লেষ-যমক-ধ্বন্যুক্তি-অনুপ্রাসের ঘনঘটা কবির ভাষাপ্রকাশকে কিরীটে-কুণ্ডলে-কঙ্কণে-কণ্ঠমালায় রাজসভার যোগ্য বেশবাস দিয়েছিল। তবু সচেতন কবি মান্য সভাসদের মনরক্ষা করেও তাঁর রচনাকে কাব্যের দীর্ঘজীবন দিতে পেরেছিলেন।

অপ্রধান বিদ্যাসুন্দর কাব্য

বিলহন্-কৃত 'চৌরপঞ্চাশৎ'এর উৎস-প্রেরণা এবং ভারতচন্দ্রের কাব্যাদর্শ অপ্রধান বিদ্যাসুন্দর কাব্যগুলির কারক। যে যুগের পাঠকসমাজ এ জাতীয় কামকাব্যে লুব্ধ, সেযুগে সুলভ আদর্শ অনুসরণের দ্বারা লোকরঞ্জনের ব্যবস্থা অনায়াসে করা যায়। যে কাল শিল্পের রসপ্রত্যাশা করে না, তার উপভোগের আসরে কাহিনীর ঝাঁঝালো মাদকরস জোগাতে পারলেই মোটামুটি দায়িত্ব রক্ষা হয়। তাছাড়া, ভারতচন্দ্র বড় কবি, এ গোষ্ঠির কেউ সে প্রতিভার অধিকারী ছিল না।

প্রথমে নায়ক-নায়িকার রূপবর্ণনার প্রসঙ্গ। দেহের বর্ণনায় কবিমনের সকাম কৌতূহলে সঙ্কেতশক্তির অভাব লক্ষণীয়। অবশ্য কবিদেব ব্যক্তিগত সামর্থ্যের প্রশ্নও বিবেচ্য। পূর্বস্থাপিত আদর্শ অনুকরণ করতে করতে এ সব কবির রূপাবেগে অসাড়তা এসেছিল। সুন্দরদর্শনে নাগরীর উক্তি,

কি মেরু শিখর কিবা বিধুবর
বিবেচনা কব কি তরুতলে।
শিখরী অচল এ দেখি সচল
সপক্ষ সমল সকলে বলে।।
কেহ কহে হাসি মনে হেন বাসি
সৌদামিনী রাশি এমনি হবে।[১]

উপমান প্রথাজীর্ণ হলেও ছন্দ ও ভাষাভঙ্গিতে নাগরীর উচ্ছলতা আভাসিত। মালিনীর সুন্দর-বর্ণনা,

তাহাব ববণ তপত কাঞ্চন
মুখ শবদেব চাঁদ।
তার মধ্যস্থান কেশবী গঞ্জন
রূপ যুবতীব ফাঁদ।।[২]

'রূপ যুবতীর ফাঁদ' বৈষ্ণবীয় উপমার স্মৃতিবাহী। পশু শিকারের জন্যেই ফাঁদ, যুবতী শিকার উক্ত বাস্তব আচরণেরই পরোক্ষ তাৎপর্য। যুবতীমন বন্দী করার মত রূপ। এরই চিত্র-সাদৃশ্য, অরক্ষিত প্রাণীকে সহসা বন্দী করার জন্যে ফাঁদ-বিশেষ। বিদ্যার রূপবর্ণনা,

---

১ রামপ্রসাদ সেন।

২ বলরাম কবিশেখব।

ডুবিল কুরঙ্গ শিশু মুখেন্দু সুধায়।
লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায়।।[১]

এ অংশে বর্ণনার চেয়ে ব্যঞ্জনা বড়। মুখচন্দ্রে নয়ন-কুরঙ্গের অবগাহন। দ্বিতীয় ছত্রে তনুদেহের রূপ নির্যাসের মত নায়িকার নয়নে প্রতিফলিত। চপল অনুপ্রাস রূপের গভীরতা জ্ঞাপন করে না। দেহরূপ ও মনোভাবের সূচীপত্রের মত মানুষের চোখের মূল্য কবির কথায় গভীরতা পেয়েছে। সুন্দরের কাছে মালিনী কর্তৃক বিদ্যার রূপবর্ণনা,

অবনি উপব যুগ রকত কমল।
সরোজ উপবে শোভে কদলী যুগল।।
শুন গুণমণি তথি অতি সুশোভন।
কুসুমকেতন অর্চনের সিংহাসন।।
কিছুমাত্র নাহি ভাব তাহাব উপব।
তারপুব শোভিত যুগল গিবিবব।।
তাহাব উপব পূর্ণ বিধুব উদিত।
চপল চকোর চারু চান্দেতে চুম্বিত।।
এমন অদ্ভুত কন্যা কিবা কব আব।
বিদগ্ধ বটহ বুঝ বলিলাম সাব।।[২]

বিদগ্ধের কাছে চতুরের রূপবর্ণনা। বিদ্যাপতির 'কমল যুগল পর চাঁদক মাল' পদের অনুকরণে রচিত। বিদ্যাপতির মনোহারিত্ব এ পদে নেই। সুচতুর অভিধাভাষা অলঙ্কার-বাক্যের অস্থানে শান দিয়েছে। আসলে অস্ত্র হবার উপযোগী আকারের ইস্পাতে শান পড়লে তবেই তার বিদ্ধ করার শক্তি জাগে। দু'এক ক্ষেত্রে অনুপ্রাসের আয়োজন দুর্লক্ষ্য নয়। কামপূজারত বিদ্যার রূপ,

উন্নত নাসিকা তথি মুকুতা লোলিছে।
তিলফুলে হিমবিন্দু যেমন শোভিছে।।
....

---

১ রামপ্রসাদ সেন।
২ দ্বিজ রাধাকান্ত।

কিবা ফণী জিনি বেণী পৃষ্ঠেতে দোলিছে।
কণক প্রাঙ্গণে যেন যমুনা চল্যাছে ॥১

প্রকাশভঙ্গিতে রূপের সতেজ পরিচয় স্পষ্ট। নায়িকার নাকে মুক্তার নোলক যেন তিলফুলের পাপড়িতে ভোরের শিশির। উপমানে গ্রামবাঙলার চেনা ছবি। নাসা ও তিলফুলের উপমেয়-উপমান সম্পর্ক প্রথাজীর্ণ হলেও এখানে উপমান-সাদৃশ্য ছেড়ে একটি স্বতন্ত্র চিত্র-দৃশ্য পরিস্ফুট হয়েছে। শেষের দুটি ছত্র। কবি প্রথমেই 'বেণী-ফণী'র প্রথাবদ্ধ উপমা-সম্পর্কের কথা বলে নিয়েছেন। স্নানের পর খোলা পিঠে এলানো ভিজে চুল। দেখে মনে হল, স্বর্ণবর্ণ বালুবেলার ওপর দিয়ে কৃষ্ণা কালিন্দী বহমানা। রূপের এমন ব্যাপক ব্যঞ্জনা এ পর্বের কাব্যে নেই। এখানকার তুল্যযোগ একেবারে নতুন। কবি নিজেই বলেছেন তিনি প্রাচীন কবিদের কাছে অনেক ঋণী। বিশেষত বৈষ্ণব কবিতার অনিষ্ট পাঠক এ কবি। মালিনীর বিদ্যা-রূপ বর্ণনা,

সভায় মুকতি আশা নাসায় শিশির ॥
লীলায় লইল সুধা হরিয়া শিশির ॥২

পূর্বোক্ত উপমেয়-উপমানের মতই রূপপ্রয়োগের ভঙ্গি। কিন্তু প্রকাশের জড়তায় ছবিটি পরিচ্ছন্ন নয়। বিদ্যার মান,

কোপেতে লোহিত হইল বদন সুন্দর।
উদয় কালেতে যে রক্ত সুধাকর ॥৩

সুন্দরের বিরহে মানিনীর কোপ। মধুসূদন চক্রবর্তীর 'বিদ্যাসুন্দরে' অলঙ্কারের কুশলতা কম, তবে দু'এক ক্ষেত্রে তাঁর কবিদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। উদয় চাঁদের আরক্ত শোভার উপমান নতুন, তদুপরি নায়িকার কোপনভঙ্গির সঙ্গে সুন্দর সাদৃশ্যযোগ পেয়েছে। তাছাড়া অলঙ্কারটির ব্যঞ্জনা দূরবাহী। উদীয়মান চাঁদের রক্তাভা ক্ষণিকের, কোপ-নার মুখের রক্তাভাও ক্ষণস্থায়ী। উদয় চাঁদে রমণীয় জ্যোৎস্নার প্রতিশ্রুতি, মানের অন্তে তৃপ্তা নায়িকার পুলকশোভাও আসন্ন। সবদিক থেকে

১ দ্বিজ রাধাকান্ত। ২ কৃষ্ণরাম। ৩ মধুসূদন চক্রবর্তী কবীন্দ্র।

উপমাক্রিয়া সার্থক। পূর্ণচন্দ্র, দ্বিতীয়ার চন্দ্র, প্রতিপদের চন্দ্র, অর্ধচন্দ্র, নিশীথের চন্দ্র, মেঘাবৃত চন্দ্র, রাহুগ্রস্ত চন্দ্র, তারকাশোভিত চন্দ্র, দিগন্ত-স্থায়ী চন্দ্র, যমুনাজলে চন্দ্র, পর্বতশীর্ষে চন্দ্র, প্রভাতের চন্দ্র, দিবসের চন্দ্র ইত্যাদি বহুপ্রকার অবস্থানভঙ্গির উপমান পূর্বে পেয়েছি। এদের প্রায় সবগুলিই বহুব্যবহারে কমবেশি বিবর্ণ। কিন্তু উদয়কালের 'রক্ত সুধাকর' বাঙলা কাব্যে কোথাও পাইনি।

নায়ক-নায়িকার রূপবর্ণনা ছাড়া আরও কতকগুলি বর্ণনাপদ। সরস্বতীর রূপবন্দনা,

> ইন্দু-কুন্দ-ক্ষীবসিন্ধুবিন্দু বদ আভা।
> পুণ্ডবীক সম কম্বুগ্রীবাধিক শোভা।।
> বন্দোঁ বন্দোঁ সরস্বতী বচনবাদিনী।
> দীপ্ত বৌপ্য গিবিকব সমান ববণী।।১

কালিকার রূপবন্দনা,

> লহ লহ কবে জিহি ভীষণ বদন।
> বকপুষ্প জিনি তাব বিকট দশন।।
> ....
> দ্বীপিচর্ম পবিধান শবে আরোহণ।
> চল চল কবে অঙ্গ জলদ ববণ।।২

শঙ্কর বন্দনা,

> ভসম লেপতি অঙ্গ হব করুণাময
> শূল-ডমরুকব ঈশ।
> শংখ-তুহিন তুল দেহবরণ তুভ্র
> গল রহ কালিম বীস।।৩

স্তোত্র এবং ধ্যানে সরস্বতী 'ঘনান্তবিলসচ্ছীতাংশু তুল্যপ্রভা', 'মৌলিবদ্ধেন্দু-লেখা', 'হিমচন্দনকুন্দেন্দুকুমুদাম্ভোজসন্নিভা', 'হিমরুচিমুকুটা', 'শশিরুচিক-মলাকল্পবিস্পষ্টশোভা', 'সিতাব্জা' [৪]। কবি বলেছেন, দেবীর দেহবর্ণ দীপ্ত রৌপ্যগিরিকরের মত। উপমানটি যদি সংস্কৃত দেবীবন্দনার কোথাও

---

১ বলরাম কবিশেখর। ২ ঐ। ৩ বিদ্যাবিলাপ নাটক, কাশীনাথ। ৪ স্তব কবচমালা, শ্রীমৎ কুমারনাথ সুধাকর।

থাকে, তবু তা বহুব্যবহারে জীর্ণ নয়। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে কালিকার দশন বকপুষ্পের সঙ্গে উপমিত। কালিদাসের দাঁতের উপমান 'শিখরিদশনা', অন্যত্র 'দন্তৈর্জ্জাম্বুনদাভৈঃ'। শুভ্র বকপুষ্পের উপমায় লোকায়ত রূপভাবনা। গীতগোবিন্দ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে কেতকী কুসুমের উপমান পেয়েছি। কিন্তু বকপুষ্প অভিনব। এর তুল্যযোগিতা অধিক, উপমানের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ও ঘনিষ্ট এবং বহুব্যবহারে মলিন নয়। তৃতীয় দৃষ্টান্তে শিবের দেহবর্ণ শঙ্খ এবং তুহিনের মত। ধ্যানে শিবরূপ 'রজতগিরিনিভং'। তুহিনের সঙ্গে সাদৃশ্য দূরগত। রাজসৈন্যের রূপবর্ণনা,

কালা গায়ে হেমহার গলে অভিরাম।
পর্বত শিখরে যেন কর্ণিকার দাম॥
চাপ দাড়ি প্রসন্ন বদনে হেন বাসি।
রাহু যেন গরাসিল একভাগ শশী॥
দুই গোঁফ্ পরিপাটি সে যেন কলঙ্ক।
মোচড়িয়া লীলায় গরবে কাঁপে অঙ্গ॥[১]

প্রথম দুটি ছত্রের রূপগত পরিস্থিতিতে সচরাচর মেঘ-বিদ্যুতের উপমান প্রযুক্ত হয়ে থাকে। বাঙলা রামায়ণ মহাভারত তার দৃষ্টান্তস্থল। পর্বত-কর্ণিকারের সদৃশ উপমান কালিদাসে ও বৈষ্ণবপদে পাই। আলোচ্য ছত্রের বর্তমান উপমান একযোগে শৌর্য ও সৌন্দর্যের আভাস দিয়েছে। তৃতীয় থেকে পঞ্চম ছত্রের উপমান ভারতচন্দ্রের উপমা প্রসঙ্গে আলোচিত। দেহ কৃষ্ণবর্ণ হলে বদন চন্দ্রতুল্য কেমন করে হবে। গোঁফদুটিকে কলঙ্ক বলায় মুখে চন্দ্রের উপমান পুনরায় কথিত। কবির পরিমাণবোধ এখানে বিচলিত। পূর্বস্থাপিত আদর্শের অন্ধ অনুকরণই এ রূপবিভ্রান্তির কারণ।

নায়ক-নায়িকার মিলনের কয়েকটি পদ। এখানকার চিত্রে যুগ্ম-রূপের আবেদন স্থিতিশীল নয়। কোথাও দেহধর্মের অনুগত আলঙ্কারিক প্রকাশ-ভঙ্গি সক্রিয়। কবিমনের অতিরিক্ত কৌতূহলে অসংযত বিবৃতির দ্বারা রূপের প্রকাশ স্থূল। ভারতচন্দ্রের সঙ্কেতকুশলতা এ পর্বের কবিদের রচনায় বিশদ ও শ্লীলতাদুষ্ট।

---

১ কৃষ্ণরাম।

ক্ষণেক অন্তরে কহে কবি মহাপতি।
বিপরীত রতিদান দেহ লো যুবতী॥
....
কেমনে এমন কথা মুখ ভবে কও॥
সাঁতারে হাঁপায়্যে শেষে স্রোতে ঢাল গা।[১]

উক্তি-প্রত্যুক্তির ঘরোয়া ছাঁদে উপমার কুশলতা দেখা দিলেও লালসার স্থূল রূপ প্রত্যক্ষ। আর দুটি ছবি,

রঙ্গে অঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা নয়নে নয়ন।
সরসি ভুজঙ্গ যেন করে মধুপান॥[২]

সঘনে নিতম্ব দোলে মুকুত কুন্তল।
তাহা আবরণ কৈল বদন মণ্ডল॥
সিহালায় সরোজ ঢাকিয়া হেন বাসি।
রাহু গরাসিল যেন পূর্ণিমার শশি॥[৩]

সরোবরে ভুজঙ্গের মধুপান-দৃশ্যে অলঙ্কার আছে, কিন্তু বাস্তবতা অনুপস্থিত। যে নিরাসক্তিতে রূপরচনা যথাযথ হয়, এখানে তা নেই। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে শৈবাল-শতদলের উপমান রাহু-পূর্ণচন্দ্রের উপমানের মত বহুব্যবহৃত নয়। ফলে আমাদের স্মৃতিধৃত রূপের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি উদ্বুদ্ধ। চতুর্থ ছত্রের রূপচয়ন কৌতূহল জাগায় না। 'সিহালা' কথাটি 'কেশ'এর উপমানরূপে অন্যত্র ব্যবহৃত ('শিহাল কুন্তল', শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। আর 'সরোজে'র উপমান তো সর্বত্র পাই। কিন্তু বদন ও কুন্তলে একত্র হয়ে যে লীলার বেগ প্রকাশ করে, শৈবাল ও শতদলের নিসর্গলীলায় তা ঠিক ঠিক ফুটলো। এই উপমানদুটির জড়িত প্রয়োগ বিপরীত-বিহারের উপমেয়ের সঙ্গে অন্যত্র দেখিনি।

উত্তম ঘটক সুন্দরের গাঁথা হার।
বরকর্তা কন্যাকর্তা চিত্ত দোঁহাকার॥
পুরোহিত হইলেন আপনি মদন।
....
উলু দিছে ঘন ঘন পীক সীমন্তিনী।
....
বরযাত্র মলয় পবন বিধুবর।
মধুকর নিকর হইল বাদ্যকর॥

---

১ রামপ্রসাদ সেন। ২ গোবিন্দদাস। ৩ কঞ্চরাম।

কান্তাকুচে জলদগ্নি বিচারিয়া কবি।
করপদ্মে করে হোম স্নেহ করি হবি ॥
উভয়ত কুচুম্ব রসনা ওষ্ঠাধর।
পরস্পর ভুঞ্জে সুধা মুখেন্দু উপর।[১]

গান্ধর্ব মিলনের গর্হিত সংসর্গ কবি বৈধী বিবাহের সামাজিক পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। রূপরচনায় বৈষ্ণবপদের আদর্শছায়া থাকলেও বিবাহ ব্যাপারে সমাজবিধির এমন স্থূল অথচ বিশদ বিবরণ অন্যত্র নেই। রামপ্রসাদের এ পদ পরিপূর্ণভাবে যুগবাসনার প্রতিনিধিত্ব করেছে। একদিকে গোপন দেহ-মিলনের চরিত্রদৈন্য, অন্যদিকে রক্ষণশীল বনেদী সমাজব্যবস্থার শাসনভয়, এই দুয়ের যোগফল কবির রূপরচনায় মনস্তাত্ত্বিক আকার পেল। বৈধ বিবাহের শাক দিয়ে গান্ধর্ব বিবাহের মাছ ঢাকার চেষ্টা শাঠ্য ও শিল্পরুচিতে রূপাঙ্কিত।

এবার রূপপ্রকাশক এমন দু'একটি দৃষ্টান্ত দেখবো, যেখানে অলঙ্কার বস্তুর রূপ-কে অবারিত করে না, হৃদয়ের মধ্যে একটি রমণীয় ভাবমূর্তি গঠন করে,

নিজ দেহ-ছবি নিরখিয়া কবি
তনয়ে তনু নেহালে।
মন্দ মন্দ হাসে এই মনে বাসে
যেন দীপে দীপ জ্বলে ॥[২]

নবজাতকের শোভায় আপন প্রতিচ্ছবি দর্শনে পিতা সুন্দরের যে রূপভাবনা, তা যৌবনের দুঃসহ বেগে কামতর্পণের ত্বরিত পুলক নয়। এ রূপানন্দ স্মিত, সান্দ্র এবং আবেশময়। একটি দীপশিখা যেমন অন্য একটি দীপের মুখে আপন আলোর ভাগ দিয়ে তাকে উদ্ভাসিত করে, সুন্দর যেন তেমন করেই আপন প্রাণের অংশে এই নবজাতকের জীবন জাগিয়েছে। অপরিণামদর্শী কাম-কৌতূহলের অলক্ষ্যে এ মঙ্গলের জন্ম। স্বয়ংশুদ্ধ এই শিশু-শিখায় স্নিগ্ধ আত্মসংরক্ষণের বিপুল ব্যঞ্জনা নিহিত। প্রসঙ্গত বলি, 'তনয়', 'তনু' ইত্যাদি শব্দের গঠনে বীজ-ধাতু 'তন্' অর্থে 'বিস্তৃত করা'র ভাব বর্তমান।

শ্বশুরের সন্নিকটে কবিবর কহে বটে
স্বরূপ কহিলা মহারাজ।
....
সত্য সত্য শুন শুন আগমন শীঘ্র পুনঃ
হবে তব রাজ্যে মহাশয়।

---

১ গান্ধর্ব মিলন, রামপ্রসাদ সেন।
২ পুত্রদর্শনে সুন্দর, রামপ্রসাদ সেন।

অপবাহ্নে তরুছায় অতি দূরতর যায
সে যেমত ছাড়া নহে মূল।
অন্যতম ভাব পাছে মানস তোমার কাছে
থাকিল গমন সেই তুল।।১

ছায়ার দূরগমন গতিবিভ্রম জাগালেও যেমন বাস্তবে অলীক, বিদ্যা ও সুন্দরের স্বদেশগমনও সেইরূপ। প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি গাছের ছায়াতেও আছে, বিদ্যা-সুন্দরের গমনেও। বৃক্ষ, বৃক্ষচ্ছায়া ইত্যাদির উপমান জড়ত্বগুণ-বিশিষ্ট হলেও হৃদয়সম্পর্কের আতপ্ত মাধুর্যে প্রাণবান। লক্ষণীয়, এখানে উপমেয়ের জীবৎশক্তি (animation) উপমানের জড়ত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে।

নন্দকুমার কবিরত্ন অনূদিত 'চৌরপঞ্চাশৎ' গ্রন্থে পঞ্চাশটি সংস্কৃত শ্লোকের উভয়পক্ষীয় ব্যাখ্যা (কালীপক্ষে এবং বিদ্যাপক্ষে) আছে। দ্বিতীয় শ্লোকের অংশ এবং তারই উভয়পক্ষীয় ব্যাখ্যা নমুনা হিসেবে এখানে লিপিবদ্ধ করি,

পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তিম্।২

এই পদের বিদ্যাপক্ষীয় ব্যাখ্যা, 'তাহে উচ্চ স্তনভারে গৌরবর্ণ কান্তি।' দেবী-পক্ষীয় ব্যাখ্যা,

পীন শব্দে উচ্চ আর স্তন শব্দে রব।
বড় ঘোর শব্দযুক্ত বুঝায় ভৈরব।।
অভিধানে গৌর শব্দে শ্বেতবর্ণ কয়।
সেই বর্ণযুক্ত শিব বুঝায় নিশ্চয়।।

কেননা কবি জানেন,

উপমার কথা শুন এক মত নয়।
কখন সদৃশ কোথা গুণে গণ্য হয়।।

এ জাতীয় চতুরালি অবশ্যই বৈদগ্ধ্যনির্ভর কিন্তু পাণ্ডিত্যের ছদ্মবেশ কতক্ষণ দেহের শ্লীলতা রক্ষা করতে পারে। উপরের ছত্রগুলিতে দেখা যাচ্ছে, সাড়ম্বর পাণ্ডিত্য এবং মুখর বিদগ্ধবচন কেবল বাইরের একটা প্রচ্ছদ মাত্র। এসব

১ বিদ্যাসহ সুন্দরের স্বদেশগমন, রামপ্রসাদ সেন।
২ শ্লোক ২, চৌরপঞ্চাশৎ।

পাণ্ডিত্যের মূলে রচনার বহিরঙ্গ আঙ্গিক চর্চা ছাড়া উন্নততর নিষ্ঠা নেই প্রাণে কামনার বেগ যতই প্রবল, আবরণের শিষ্ট আয়োজন ততই স্তূপীকৃত।

এবার বিভিন্ন চরিত্রেব বাকভঙ্গি লক্ষ্য করা যাক। এগুলি প্রত্যক্ষভাবে উপমাপ্রক্রিয়ার বিষয় নয়। তবে কবির মনোভূমির যৎসামান্য পরিচয় এর থেকে সঠিক মিলবে। বিদ্যাব গর্ভ সংবাদে রাণীর খেদ,

বাণী বলে কি কহিলে সর্বনেশে কথা।
বুঝি বা খাইল বিদ্যা অভাগীব মাথা।।
শ্রীবামপ্রসাদ বলে দেও সাদ ভেট।
সে বড় জোয়াল মেযে বাজাযেছে পেট।।

বিদ্যাকে রাণীর তিবস্কার,

জন্মিলি আমাব গর্ভে আ লো।
এই বাজ্য ত্যজ্য কবে যদ্যপি ভাতাব ধবে
বেরুতিস সেও ছিল ভাল।।

বিদ্যার বাক্‌চাতুবী,

আ লো ভক্ষণ যে পোডা মাটি।
বিদ্যা বলে ছি মাগি তোবে না অাঁটি।।
তাবা মাযে ঝিযে যত ভাষে।
আডে থাকি বসি আলি হাসে।।

বাণীব প্রতি সখীদেব পরামর্শ,

গলায অঙ্গুলি দিযা কেন তোল কাণ।
আপনিই আপনাব কব সর্বনাশ।।
কাল বড কুৎসিত আমাকে কব মাপ।
খুঁডিতে কেচুযা পাছে উঠে কাল সাপ।।

বামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর কবিগোষ্ঠীব (ভাবতচন্দ্র ছাড়া) প্রধান। তবু উল্লিখিত চারটি দৃষ্টান্তে তাঁর শক্তিপ্রাধান্য প্রকাশ পায়নি। জীবনে জটিল সমস্যার মুখোমুখি এসেও চরিত্রগুলিতে ভাবের গভীবতা নেই। অথচ এরাই রাজরাণী, রাজকুমারী, পরিচারিকা। পদমর্যাদার স্তর অনুসারে চরিত্রগুলির বাক্‌রুচি

ভিন্ন নয়। জীবনভূমির এই সামান্যতাটুকু ভিত্তি করে কবিদের রূপশিল্পকর্ম। ফলে সৌন্দর্যের কোন মহৎ আদর্শ এখানে দেখা দেয়নি। সহরে গুজবের ছবি,

> সহরে গুজব উঠে একে শত শত।
> গল্প ঝাড়ে বড়ই আঠারমেসে যত॥
> দরজায় বস্যে কেহ মণ্ডলের ঠাট।
> পথের মানুষ ডেকে লাগাইছে হাট॥
> একসবা ভরা টিকা হুকা চলে দুটা।
> পোয়া দেড় গুড়াকু তামাকু চেঁকি-কুটা॥

বর্ণনায় অলঙ্কার নেই। অথচ রূপ আছে। অভিধাবাক্যে কবি অনায়াসে জটলার ছবি এঁকেছেন। উপাদেয় অবসর-যাপনের চিত্রে বাঙালী চরিত্রের বিশিষ্টতা প্রকাশিত।

অকারণে প্রথানুসরণ করতে গিয়ে কবিরা তাঁদের রচনাকে একঘেয়ে বাগাড়ম্বরের বিষয় করে তুলেছেন। অভিধাকথায় নিপুণ ছবি আঁকতে যাঁরা সিদ্ধহস্ত, রূপের প্রকাশে অলঙ্কারের আশ্রয় না নেওয়াই তাঁদের উচিৎ ছিল। সার্থক আর্টিষ্টের কল্পনাশক্তি সাধারণের কল্পনাভূমি ছাড়িয়ে স্বতন্ত্র ভাবস্তর পায় বলেই সে আর্টিষ্টের রচনা আমাদের মুগ্ধ করে। শিল্পীর সে দক্ষতা এ কবিদের নেই। এ রচনায় নতুন করে নৈবেদ্য সাজানো হয়েছে, তথাপি নিষ্ঠাহীন অর্চনার প্রসাদটুকু মহার্ঘ হয়নি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শাক্ত সঙ্গীত

শাক্ত সঙ্গীত মাতৃমহিমার বন্দনাগান হয়েও রূপকচিত্রে সমাজজীবনের একটি স্বতন্ত্র প্রেক্ষিত উদ্ঘাটিত করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলাদেশে রাজদীক্ষাহীন অথচ রাজা নামধারী স্বেচ্ছাচারীর চরিত্রদৈন্যপটে সমাজের যে নতুন রূপ জেগেছিল, শাক্তগীতিকার কবি তার চিত্রকর। সহস্ররাজকতার অত্যাচারে দেশবাসীর গৃহজীবন অনিশ্চিত, মাঠের ধান ঘরে তোলার আশা লুপ্ত, কুলবধূর সতীত্বরক্ষার দায়িত্বে গৃহস্বামী অপারগ, গৃহভোগ্য উপকরণ নিয়ে যখন প্রবলের হাতে দুর্বলের লাঞ্ছনা এবং পরিশেষে সর্বহারা হওয়ায় নৈরাশ্য, তেমন এক অপচয়ের ভাবাকাশে এ শাক্ত গীতিগুলির জন্ম।

> জানিগো জানিগো তারা তোমার যেমন করুণা।
> কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে, কার পেটে ভাত গেটে সোনা।
> কেহ যায় মা পাল্কী চড়ে, কেহ তারে কাঁধে করে।
> কেহ গায়ে দেয় শাল দোশালা, কেহ পায়না ছেড়া টেনা।[১]

দৈববিচারের ছদ্মবেশে দেশজোড়া দুর্ভাগ্যের রূপ। সাধারণ মানুষের সামান্য সঞ্চয়টুকু ক্ষমতামত্তের খেয়ালে বলিপ্রদত্ত।

আবশ্যিক গৃহোপকরণের অভাবে শাক্তকবির শিল্পচেতনা আরও বেশি বস্তুমুখী। শাক্তগীতি প্রবঞ্চিত মানুষের ভোগস্বপ্নের রূপক। সংসারী সুখের বাঁধা পথের চেনা শান্তি বৈষ্ণবীয় নায়ক-নায়িকার অবাঞ্ছিত, অপহৃত সংসার-সুখের স্মৃতিবেদনা শাক্তকবির রূপবচনার প্রধান বিষয়। ঘরের কথা, পাশা খেলা, মাছ ধরা, ঘুড়ি ওড়ানো, ভূমি-স্বত্ত্ব পাওয়া ইত্যাদি প্রয়োজনীয় এবং প্রমোদমূলক স্মৃতির কথায় এ গীতির রূপকগুলি নির্মিত। ডিক্রি-ডিস্‌মিস্, তহবিল-তছরূপ, হিসাবের খাতা ইত্যাদি বৈষয়িক জীবনের রূপানুষঙ্গ এ কাব্যে প্রতিফলিত।

> আমায় দেও মা তবিলদারী।
> আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।।
> পদ-রত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
> ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।।[২]

দেব-শরণাগতির রূপকে হৃতসর্বস্বের বিলাপ। এ যদি রামপ্রসাদের ব্যক্তিকণ্ঠ নাও হয় (আমরা মনে করি, প্রসাদী সঙ্গীতের রূপে একটি নির্বিশেষ ভক্তি-

১ রামপ্রসাদ সেন।
২ ঐ।

তন্ময়তা ছিল), তবু সমগ্র জনপদ-জীবনের ব্যথা-বঞ্চনার রূপ এখানে তির্যক-ভাবে প্রতিফলিত।

মা গো তারা ও শঙ্করী।
কোন অবিচারে আমার উপর, করলে দুঃখের ডিক্রীজারি।।
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বল মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছে করে ঐ ছটারে, বিষ খাইয়ে প্রাণে মারি।।
প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি, তারে দিলি জমিদারী।।
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে. বসে আছ রাজকুমারী।।
হুজুরে উকিল যে জনা, ডসমসে তার আশয় ভাবি।
করে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দী, যেরূপে মা আমি হারি।। ১

মায়ের এম্নি বিচার বটে।
যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে, তারি কপালে বিপদ ঘটে।।
হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা, দাঁড়াইয়ে আছি করপুটে।
কবে আদালত শুনানি হবে মা, নিস্তার পাব এ সঙ্কটে।।
সওয়াল জবাব করব কি মা, বুদ্ধি নাহিক আমার ঘটে।
ওমা ভরসা কেবল শিব বাক্য ঐক্য বেদাগমে রটে।।২

দুটি ডিক্রিজারির পদেই বাস্তবজীবনের অবিচার উৎপীড়নের অভিযোগ। আদালতের আইন-প্রক্রিয়ার পারম্পরিক বৃত্তান্ত দিয়ে কবি রূপক গঠন করেছেন। মাতৃসাধক রামপ্রসাদ এ কাব্যের কবি। সাধনার যে উপলব্ধিতে সাধক দেবীকে পরমভাব্য উপাস্যরূপে লাভ করেছেন, নির্মম ভাগ্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি সেই দেবীর উদ্দেশ্যেই অর্পিত। আসলে, পদগুলিতে মানুষের কথা এবং সাধকের কথা একই সূত্রে বিধৃত হয়ে একদিকে জননীর কাছে সন্তানের আবেদনে, অন্যদিকে পরমারাধ্যার কাছে সাধকের আত্মনিবেদনে প্রকাশিত। তাই এ রচনায় ষড়রিপু, পঞ্চেন্দ্রিয়, ভবতাপ, বাসনামুক্তি ইত্যাদি যোগ-পরিভাষা ছয় পেয়াদা, উকিল, আদালতের শুনানি, সওয়াল জবাবে জয়লাভের আশা ইত্যাদি রূপকে রূপান্তরিত।

---

১ রামপ্রসাদ সেন।
২ ঐ।

এবার আমি করব কৃষি।
ওগো এ ভব সংসারে আসি ।।
তুমি কৃপাবিন্দু পাত করিয়ে বসে দেখ রাজমহিষী ।।
দেহ জমীন জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি মা সকল চসি।
মাগো যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হইলে আনন্দ সাগরে ভাসি ।।
হৃদয় মধ্যেতে আছে পাপরূপী তৃণরাশি।
তুমি তীক্ষ্ণ কাটারীতে মুক্ত কর গো মা মুক্তকেশী ।।
কাম আদি ছয়টা বলদ, বহিতে পারে অহর্নিশি।
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে, শস্য পাব রাশি রাশি ।।
প্রসাদ বলে চাষে বাসে, মিছে মন অভিলাষী।
আমার মনের বাসনা তোমার, ও রাঙ্গা চরণে মিশি ।।

এবার বাজি ভোর হলো।
ও মন কি খেলা খেলাবে বল ।।
সতবঞ্চ প্রধান পঞ্চ পঞ্চে আমায় দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘর করে ভব মন্ত্রিটি বিপাকে মলো ।।
দুটা অশ্ব দুটা গজ ঘরে বসে কাল কাটালো।
তারা চলতে পারে সকল ঘরে তবে কেন অচল হল ।।

....

শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে এই কি ছিল।
ওরে অতঃপরে কোণার পাশে পীলের কিস্তি মাত হল ।।

যদি ডুবলো না ডুপায়ে বা ওরে মন নেয়ে।
মন হাল ছেড় না ভবগা বাঁধ পাববি যেতে বে‍‍ ।।
মন চক্ষু দাঁড়ি বিষম হাড়ি, মজায় মজে চেয়ে।
ভাল ফাঁদ পেতেছে শ্যামা বাজিকবের মেয়ে ।।
মন শ্রদ্ধা বায়ে ভক্তি বাদাম, দেওরে উড়াইয়ে।
রামপ্রসাদ বলে, কালীনামের যাওরে সাবি গেয়ে ।।

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি।
(ভবসংসার বাজার মাঝে)
ঐ যে মন-ঘুড়ি আশা-বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া-দড়ি ।।
কাক গণ্ডী মণ্ডী গাঁথা, পঞ্জরাদি নানা নাড়ি।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্মাণ করা কারিগিরি বাড়াবাড়ি ।।
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষে দুটা একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি ।।
প্রসাদ কয় দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভবসংসার সমুদ্রপারে পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি ।।

দৃষ্টান্তগুচ্ছে রূপকের মূলকথা দুটি। অনিশ্চিত মানব জীবন সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত হুঁসিয়ারী। দ্বিতীয় ভাব, সাধককবির দেবনির্ভরতা। চর্যাগানেও মানবচিত্তের দুটি ভাবস্তর। যোগনিরত সাধকচিত্ত এবং যোগবিরত প্রাকৃত জনচিত্ত। প্রথমটিতে যোগসিদ্ধিবলে ভবভোগ উত্তীর্ণ হওয়ার আনন্দ। দ্বিতীয়টিতে ভবভোগের আবর্তে লোকদুর্গতির দৃশ্য। শাক্তগীতিপদেও 'চিত্তের' সে দুটি অবস্থার পুনর্দর্শন। সংসারের প্রয়োজনীয় এবং প্রমোদমূলক রূপকের ছবিতে সেই দুটি চিত্তাবস্থার যথাযথ পরিচয়। দৃশ্যে ও আদর্শে মিলে সাধকের গোটা বক্তব্যটি অলঙ্কারে অর্পিত। উদ্ধৃতিগুলির প্রতিক্ষেত্রে কবি নিজেই রূপকের আবরণ ভেঙে দিয়েছেন। এসব দৃষ্টান্তে রূপকের পূর্ণশক্তি ছবির রসকে সর্বাতিশয়ী করেনি। ঘরোয়া ক্রিয়াকর্মের বা আমোদ প্রমোদের রূপের সঙ্গে আমরা নিয়তই এত পরিচিত যে এর আবেদন কোন উচ্চাঙ্গের শিল্পরূপ ফোটায় না। তবু এসব ছবি যদি উপমানসর্বস্ব হতো, তাহলেও এর থেকে একটা পরিপাটি গার্হস্থ্যরস উপভোগ করা চলত। কিন্তু আলোচ্য চিত্রগুলিতে মুখর উপমেয়-কথা প্রায় সর্বত্র দৃষ্ট। রূপ-কে সম্পূর্ণভাবে আপন শিল্পচিন্তার আয়ত্তে আনতে পারলে তবেই প্রকাশভঙ্গিতে অলঙ্কার-কর্ম সার্থক হয়। এখানকার কবিতা-গুলিতে রূপ-সংসর্গ করাব শিল্পবাসনাই কবিমনে নেই। সমজাতীয় একটি পদ,

মন পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বোলে।
মন মহামন্ত্র যন্ত্র যার, সুবাতাসে বাদাম তুলে॥
মহামন্ত্র কব হাল, কুণ্ডলিনী কব পাল.
সুজন কুজন আছে যাবা, তাদের দে বে দাঁড়ে ফেলে॥
কমলাকান্তের নেয়ে, নঙ্গব তোল্ দুর্গা কোযে;
পড়িবি তুফানে যখন, সাবি গাবি সবাই মিলে॥

এখানেও একই রূপকপ্রক্রিয়া। 'মহামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল।' উপমেয়ের ভারে রূপকের আবরণ ছিন্নভিন্ন। মূলত রূপসৃষ্টি করার বাসনা কবিদের নেই। দার্শনিক উপমার সাধারণ নিয়মের মত কেবল প্রকাশ্য তত্ত্বকে ঈষৎ আলোকিত করার জন্যে যতটা অলঙ্কারের দরকার এখানে ততটাই আছে। তাই রূপার্পিত এ গীতিপদে সাধকের প্রয়োজনার্থক দিকটি উদ্‌ভাসিত।

তত্ত্বকথার প্রাবল্য যতই রূপক-ভূষণ অপসারিত করুক, তবু একথা সত্যি, ভোগজগতের তুচ্ছ উপকরণের প্রতি কবিদের মনোযোগ প্রবল। রচনাগুলিতে কবিকর্মের যেটুকু সৌন্দর্য ফুটেছে, তা ঐ বস্তু-মনোযোগের ফলেই। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের একটি গান স্মরণযোগ্য। 'জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।' মমতায় গড়া সংসারের প্রীতিবন্ধন

একদিন দুঃখে-দুর্যোগে হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল বলেই, ব্যথিত স্মৃতিভাণ্ডার আলোড়িত করে এ সব নিত্যভোগ্য বিষয়গুলি উপমালোকে পরোক্ষ হয়েছিল। প্রাকৃত জনচিত্তের আসক্তি লক্ষ্য করে কবি গেয়েছেন,

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না।
ভাল পেয়েছ ভবে কাল বিছানা।।
এই যে সুখের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না।
তোমার কোলেতে কামনা কান্তা, তারে ছেড়ে পাশ ফের না।
আশার চাদর দিয়াছ গায়, মুখ ঢেকে ঢেকে তাই মুখ খোল না।।

আর সেই আসক্তি বিনাশের উপদেশ,

আয় মন বেড়াতে যাবি।
....
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্বকথা তায় শুধাবি।।
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘর করে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি।।

সম্ভোগ ও সম্ভোগ বিনাশের দৃশ্য ও আদর্শে প্রসাদী গানের একটা বড় দিক ভরে আছে। প্রসাদী গীতিপদে এমন অংশও আছে, যেখানে সাধনার প্রভাবে রূপক-প্রয়াস সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ,

ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে চারি শিব চৌকি রয়েছে।
এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে।।
সহস্রদল কমলে শ্রীনাথ, অভয় দিয়ে বসে আছে।।
....
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে কণ্ঠমূলে ভুরুমাঝে।
এ চারিস্থানে চারি শিব নবদ্বারে চৌকী আছে।।

এই জাতীয় আর একটি গীতিপদ,

কালী কালী বল রসনা রে।
ও মন ষট্‌চক্র রথ মধ্যে, শ্যামা মা মোর বিরাজ করে।।
তিনটে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত বাঁধা মূলাধারে।
পাঁচক্ষমতায় সারথি তায়, রথ চালায় দেশ দেশান্তরে।।

সাধনকথায় রূপকের চিত্রধর্ম কবলিত। আবার এমন পদও মেলে, যেখানে রূপকের চিত্রশক্তি তত্ত্বভাবনাকে অনেকটা গোপন করে,

থাকি একখানা ভাঙ্গা ঘরে।
তাই ভয় পেযে মা ডাকি তোরে।।
হিল্লোলেতে হেলে পড়ে, আছে কালীব নামেব জোবে।
ঐ যে ঝাত্রে এসে ছয়টা চোবে, মেটে দেওয়াল ডিঙ্গিযে পড়ে।।

এ প্রসঙ্গে কমলাকান্তের একটি পদ উদ্ধৃতিযোগ্য,

শুকনা তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা, ভাঙ্গে পাছে।।
তরু পবন-বলে সদাই দোলে, প্রাণ কাঁপে মা, থাকতে গাছে।।
বড় আশা ছিল মনে, ফল পাব মা, এই তরুতে।
তরু মুঞ্জরে না, শুকায় শাখা, ছটা আগুন বিগুণ আছে।।
কমলাকান্তের কাছে ইহাব একটি উপায় আছে।
জন্ম-জরা-মৃত্যুহবা তারা নামে ছেঁচলে বাঁচে।।

রূপকচিত্রে বাস্তবের উপভোগ-ফলেব কথা। আব তারই অন্তবে গোপন উপমেযের বিষয সিদ্ধি-ফলের আভাস। তৃতীয ছত্রে ভোগবঞ্চিতেব চিত্ত-ক্ষোভ। পঞ্চম ছত্রে ভোগজয়ীব চিত্তপ্রত্যয। একই চিত্তে আঘাত ও উপশমের বিপরীত রহস্য।

এ পর্যন্ত শাক্তগানে বস্তুজীবনের বিচিত্র ছবির স্মৃতি-রূপ দেখা গেল। কমলাকান্তের রচনা গীতিময ও দার্শনিক, বাস্তব জীবনের এত ভোগ্য বিষযের রূপকমণ্ডিত নয। প্রসাদী গানে সংসারের বাস্তব ছবি প্রচুব, রূপেব প্রতি তাঁর-মনোযোগ যত বেশি, অন্য কবির তেমন দেখা যায় না। রামপ্রসাদ ও কমলা কান্ত উভয়েই মাতৃসাধক ও গীতিকার। উভয় কবির দুটি বিশিষ্ট গীতিপদাংশ থেকে তাঁদের স্বতন্ত্র ভাবাদর্শের সূক্ষ্মতা লক্ষ্য করা যাক,

কাশীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে সে শিবেব উক্তি,
ওবে সকলেব মূল ভক্তি, মুক্তি তাব দাসী।
নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওবে চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।

মজিল মন-ভ্রমরা কালীপদ-নীলকমলে।
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হৈল, কামাদি কুসুম সকলে।।
চরণ কালো ভ্রমব কালো, কালো কালোয় মিশে গেল;
দেখ সুখ দুখ সমান হোলো, আনন্দসাগর উথলে।।

রামপ্রসাদ ভক্তিপথিক, কমলাকান্ত মুক্তিপথিক। রামপ্রসাদ তাঁর আরাধ্যের সামীপ্যলাভেই ধন্য, কমলাকান্তের প্রার্থনা অদ্বয়ত্ত্বের। রামপ্রসাদ বলেছেন, তিনি চিনি হতে চান না, পরমতত্ত্বে লীন হওয়ার সাধনা তাঁর নয়। চিনি খাওয়াতে তাঁর সুখ অর্থাৎ সেই পরম অচিনের সান্নিধ্যগৌরবেই তাঁর সাধনা সফল। কিন্তু কমলাকান্ত বলেন, কালো চরণে কালো ভ্রমর লীন হল। আরাধ্যের সঙ্গে একতাপ্রাপ্তিই জীবনের সার্থকতা। রামপ্রসাদ দ্বৈতবাদী, কমলাকান্ত অদ্বৈতবাদী। আর সেই বিশ্বাসের কাব্যপটে এক কবির দৃষ্টিতে রূপের লীলা, অন্য কবির দৃষ্টিতে অরূপের উপলব্ধি। প্রসাদী গীতিপদে জীবনের অজস্র চিত্রচেষ্টা লীলাপ্রয়াসী দ্বৈতবাদী দর্শনের ফল। কবি দেবীকে দিয়ে সংসারে সুখ-দুঃখের, প্রয়োজন-প্রমোদের কত কাজই যে করিয়ে নিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। আর নিজে কাছে কাছে থেকে সহায়তা করার ছলে বিশ্ব-বস্তুর রূপবিন্যাস লক্ষ্য করেছেন। অন্যদিকে কমলাকান্তের দৃষ্টি ধ্যানতন্ময়, আরাধ্যের সঙ্গে আপন সত্তার ভেদ লোপ করার ব্রত তাঁর।

এ কাব্যে নারীর রূপবর্ণনা সবই দেবীবিষয়ক। রামপ্রসাদ গেয়েছেন,

> ঢল ঢল ঢল তড়িৎপুঞ্জ মণিমরকত কান্তি ছটা ;
> এ কি চিত্তচলনা দৈত্যদলনা ললনা নলিনী বিড়ম্বিনী (?) ॥
>
> ....
>
> শ্মশানে বাস, অট্টহাস, কেশপাশ কাদম্বিনী।
>
> নবনীল নীরদ তনুরুচি কে ঐ মনোমোহিনী রে''
> তিমির শশধর, বাল দিনকর, সমান চরণে প্রকাশ।
>
> ....
>
> শশী মুকুল ভালে, বিরাজে মহাকালে, ঘোর ঘন ঘন হাস ॥
>
> ওকে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি বিগলিত বেশ!
> বসনহীনা কে সমরে
> মদন মথন উরসী রূপসী, হাসি হাসি বামা বিহরে ॥
>
> ও কার রমণী সমরে নাচিছে।
> দিগম্বরী দিগম্বরোপরি শোভিছে ॥
> তনু নব ধারাধর, রুধিরধারা নিকর
> কালিন্দীর জলে কি কিংশুক ভাসিছে ॥

কমলাকান্ত গেয়েছেন,

> নব জলধর কায়।
> কালো রূপ হেরিলে আঁখি জুড়ায় ॥

কপালে সিন্দূর, কটিতে ঘুঙ্গুর, রতন নূপুর পায়।
হাসিতে হাসিতে , কত দানব দলিছে, রুধির লেগেছে গায় ।।
অতি সুশীতল চরণযুগল, প্রফুল্ল কমলপ্রায়।
কমলাকান্তের মন নিরন্তর ভ্রমর হইতে চায় ।।

জান না রে মন পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয় ।।
....
যে রূপে যে জনা করযে ভাবনা, সে রূপে তার মানস রয়।

দক্ষিণ কালিকার ধ্যানরূপের সঙ্গে উক্ত প্রতিমা-কল্পনার সাদৃশ্য,

মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী-গলদ্রুধিরচর্চিতাম্ ।।
....
বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাম্ ।।
....
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং শ্মশানালয়বাসিনীম্ ।।১

কালীর বর্ণনায় রামপ্রসাদের রূপকৌতূহল অপেক্ষাকৃত বেশি। দেবী কখনো 'মণিমরকত কান্তি ছটা', 'নবনীল নীরদ তনুরুচি', আবার কখনো 'ইন্দীবর নিন্দি কান্তি', 'তনু নব ধারাধর' অথবা রুধিরসিক্ত কৃষ্ণতনু কালিন্দীর জলে রক্ত কিংশুকের মত। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে রণোন্মাদিনীর চরণের আঘাতে উৎক্ষিপ্ত চন্দ্র সূর্যের ছটায় রূপের ব্যাপক ব্যঞ্জনা। রামপ্রসাদ 'মদন-মথন উরসী রূপসী'র রূপাঙ্কনে সৌন্দর্য-চলোর্মিমালার গতিভঙ্গি প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। কিন্তু কমলাকান্তের দেবীপ্রতিমা শান্ত ও প্রসন্ন। কালো রূপ দেখে কবির চোখ জুড়িয়ে যায়। দেবীর 'প্রফুল্ল কমলপ্রায়' চরণযুগল সুশীতল (মনোমুগ্ধকর বলেন নি কবি)। কবি চরণকমলে ভাবাবিষ্ট, রূপমুগ্ধ নন। 'বিকশিত কমলে'র দ্বারা রূপাক্ষিপ্ত হবার মুহূর্তে 'সুশীতল' এই বিশেষণে চরণ রূপবারিত হয়েছে। কবির চরণভরসা যত বেশি, কমলকান্তি রূপাগ্রহ তত নয়। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের শেষছত্র লক্ষণীয়। কবি ধরে নিয়েছেন, দেবী অরূপময়ী। সেক্ষেত্রে রূপ-কল্পনা যতটা আপাত, ততটা প্রকৃত নয়, একথাও কবি জানেন।

১ স্তবকবচমালা।

ভক্তের ভাবুকতারও একটি বিশেষ দিক আছে। আরাধ্য দেবতা ভক্তের হৃদয়ে অপূর্ব ভাবমূর্তি ধারণ করেন। রামপ্রসাদ গেয়েছেন,

কাল মেঘ উদয় হল অন্তর অম্বরে।
নৃত্যতি মান শিখী কৌতুকে বিহরে॥
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জে ধরাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হসি, তড়িৎ শোভা করে॥
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ-চাতকের তৃষা ভয় ঘুচিল সত্বরে॥

কমলাকান্ত গেয়েছেন,

আপনারে আপনি দেখ, যেয়ো না মন কারু ঘরে।
যা চাবে এইখানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন পরশমণি যে অসংখ্য ধন দিতে পারে॥

বারিধারা পতনের রূপকে রামপ্রসাদ দেবীভাবনার ভক্তি-বিকারক্রম প্রকাশ করেছেন। কমলাকান্তে কেবল আত্মগত অনুভবের নির্দেশ। ভাবানুসরণের পথেও উভয় কবির দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য।

শাক্তগীতিপদের আগমনী ও বিজয়া অংশে জগন্মাতার রূপ-পরিচয় অভিনব। বৈষ্ণবগানে দেবতাকে সংসারের আপন জন করে তোলার অধ্যাত্মসাধনা লক্ষ্য করেছি। এ পর্বে দেবতাকে আর এক নতুন সংসার-সম্পর্কে লাভ করতে চাওয়ার পেছনে কয়েকটি বস্তুগত ও ভাবগত কারণ ক্রিয়াশীল। এ কালে বস্তু-জীবনের অনিশ্চয়তায় মানুষ আপন আত্মার আশ্রয় খুঁজছিল। অনাথের চোখের জলটুকু মুছিয়ে দিয়ে বাঁচার ভরসা মাতাপুত্রের সংবাদেই অতঃপর পাওয়া গেল। রাধাকৃষ্ণের পরকীয় প্রণয়তত্ত্বের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতা সাধারণ মানুষের সরল বুদ্ধির পক্ষে কিছুটা দুর্বোধ্য থাকায় একদিকে যেমন বৈষ্ণববাদের সমুন্নত ভাব-ধারা কবিওয়ালার গানে অধোগতি পেতে সুরু করেছিল, তেমনি অন্যদিকে মাতাপুত্রের সরল সর্বজনবোধ্য সম্পর্ক ক্রমেই লোকপ্রিয়তা লাভ করতে লাগলো। তাছাড়া শাস্ত্রশাসিত, স্মৃতিব্যবস্থা-প্রভাবিত সমাজ ও পরিবারে পরকীয়া তত্ত্বের অসামাজিক প্রণয়াভিনয় সে যুগে প্রবল আপত্তির লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। আর এসব কারণেই জগজ্জননী আমাদের ঘরের মেয়ে উমা বা গৌরীতে পরিণত হলেন। দেবতাকে সংসারের পরিজন করে তোলায় আরাধ্যার অধরা রূপ সঙ্কুচিত হল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় গার্হস্থ্য কল্পনায় স্পর্শযোগ্য রূপের

রমণীয়তা দেখা দিল। এ প্রসঙ্গে উৎকৃষ্ট উপমার পরিচয় না থাকলেও নবীকৃত রূপকল্পনার বৈশিষ্ট্য আমাদের লক্ষ্যের বিষয়। রামপ্রসাদ গেয়েছেন,

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমায় পাঠাবো না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না।।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়।
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মানব না।।

কমলাকান্ত গেয়েছেন,

কাল স্বপনে শঙ্করী-মুখ হেরি কি আনন্দ আমার
হিমগিরি হে, জিনি অকলঙ্ক বিধু, বদন উমার।।
বসিয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে,
আধ আধ মা বলে বচন সুধাচার;
জাগিয়ে না হেরি তারে প্রাণ রাখা ভার।

'মা মেনকার অশ্রুকণায় বিশাল গিরিশ পড়ল ঢাকা।'[১] মানুষের মন ছোট ছোট সুখদুঃখের কথায় সংসারের সমস্ত সঙ্কল্প উজাড় করে দিল। বাঙলাদেশের মানুষ বিচিত্র ভঙ্গিতে হৃদয়ের ব্যাকুলতা দেবীর চরণে নিবেদন করেছে.

আমার উমা এলো বলে রাণী এলোকেশে ধায়।
যত নগর-নাগরী, সারি সারি সারি, দৌড়ি
গৌরী-মুখ-পানে চায়।
কারু পূর্ণ কলসী কক্ষে, কারু শিশু বালক বক্ষে,
কারু আধ শিরসি বেণী, কারু আধ অলকাশ্রেণী.
বলে, চল চল চল, অচল তনয়া হেরি ও মা, দৌড়ে আয়।।

দেবীভক্তির পারিবারিক সংস্করণের চেনাজানা বাস্তব ছবি সুখের ব্যথায় আকুল,

বারে বারে কহ রাণি, গৌরী আনিবারে।
জানতো জামাতার রীত অশেষ প্রকারে।।
বরঞ্চ ত্যজিয়ে মণি ক্ষণেক বাঁচয়ে ফণী,
ততোধিক শূলপাণি ভাবে উমা মারে।

---

১ ছোটর দাবী, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক'

আনন্দবেদনার ঘরোয়া ঘটনার কথায় উমারূপের কল্পনায় নৈকট্যসৃষ্টি। 'বিজয়া'র কয়েকটি গান,

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার ॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশমাতা, ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ-প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদার ॥

জননীর তীব্র হৃদয়বেদনার মধ্যে নবমী নিশি মানবায়িত হয়ে উঠেছে,

ওরে নবমী নিশি না হইও রে অবসান।
শুনেছি দারুণ তুমি না রাখ সতের মান ॥
খলের প্রধান যত, কে আছে তোমার মত
আপনি হইয়ে হত, বধরে পরেরি প্রাণ ॥

মেয়েকে ঘরে রাখার শেষ চেষ্টা,

জয়া, বল গো পাঠানো হবে না।
হর, মায়ের বেদন কেমন জানে না ॥
ওগো হৃদয় মাঝারে রাখিব বাছারে, প্রহরী এ দুটি নয়ন।
যদি গিরিবর আসি কিছু কয়, জয়া, তখনি ত্যজিব জীবন ॥
সবে মাত্র ধন, গৌরী মোর প্রাণ, তিন দিন যদি রয় না
তবে কি সুখ আমার এ ছার ভবনে,
এ দুঃখে প্রাণ আমার রবে না ॥

কন্যা-জননীর দুঃখে-সুখে আমাদের বারোমাসী দিনগুলি অপরূপ ভক্তিকথার প্রসাদ লাভ করেছে।

শাক্তগানে উপমার রূপাবেদন ঘরের কথায় ভরা। উদ্বেগে আশ্বাসে দেবীর মাতৃরূপই আমাদের সংসারে প্রতিষ্ঠিত। মাতৃশরণের ব্যাকুলতা ও ত্বরা শিল্পীর উপমালোকে রূপ ধরেনি।

চতুর্দশ অধ্যায়
কবি সঙ্গীত

বাঙলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালার গান, বলেছেন [1]রবীন্দ্রনাথ। দেবতার বেদিমণ্ডপ অথবা রাজার সভামণ্ডপে গীত প্রাচীন গানগুলি ভাব ও রূপাদর্শের দুরূহ বিচার-পরীক্ষায় নীত হত। একদিকে যেমন দেবতার নৈবেদ্য সাজাতে নিষ্ঠার প্রযোজন ছিল, অন্য দিকে তেমনি সূক্ষ্মরুচি রাজা-অমাত্যের মনোরঞ্জন করতে উচ্চাঙ্গ শিল্পপ্রতিভার প্রমাণ দিতে হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে দেবমণ্ডপ অথবা সভামণ্ডপের ভরসা কবিচিত্ত থেকে অপগত হল। নিষ্ঠা ও কলা-সংযমের প্রয়োজন গেল। স্বৈররুচির স্বেচ্ছাপটে মনের অনুচ্চার্য প্রণয়বেদনা আত্মপ্রকাশ করল। প্রেমের বিচিত্র রস-রহস্য দীক্ষিত চিত্তের অনুভব-ভূমি ত্যাগ করে মুচি, ময়রা, বৈরাগী, বণিক, ফিরিঙ্গি, পাটুনীর কামনা-কল্পনা আশ্রয় করল। সংস্কারবশে অথবা প্রেমের সুলভ নিদর্শন-প্রত্যাশায় কবিরা বৈষ্ণবগীতির পরকীয়া প্রণয়কথা এবং শাক্ত গীতির বাৎসল্য-কথাকে রচনার বিষযবস্তু করে নিলেন।

> 'ইংরেজের নূতনসৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল, সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান।'[১]

যেখানে উদীয়মান বণিক-চেতনা কর্মক্লান্ত সন্ধ্যার বৈঠকে দু'দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চায়, সেখানে সাহিত্যরস অতিরিক্ত।

আসরের চাহিদামাফিক লঘু আমোদের উত্তেজনা সৃষ্টি করতে কবিয়াল রচনার প্রকাশভঙ্গিতে কৃত্রিম প্রতিপক্ষতা আমদানী করলেন। তর্কের লড়াই দিয়ে আসর-জমানো একটা স্নায়বিক তাপ সহজেই সঞ্চার করা গেল। কবিতা তখন কথার ছল এবং কৌশল মাত্র। কবিগান রচনার একটা বিশেষ পদ্ধতি এই রচয়িতাদের মধ্যে পাকাপাকিভাবে গড়ে উঠল। 'গীতাবলী বা নিধু-বাবুর (রামনিধি গুপ্তের) যাবতীয় গীত সংগ্রহ'[২] গ্রন্থে শ্রীনবীন চন্দ্র দত্ত রচিত প্রবন্ধ থেকে কবিগীতি রচনার নিয়ম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অংশ এখানে উদ্ধৃত করলুম,

> দাঁড়াকবির প্রথমে চিতান ও পরচিতান, তৎপর ফুকা, ফুকার পর মেল্‌তা, মেলতার পর মহড়া, পরে শওয়ারি থাকিবে। শওয়ারির পর খাদ, পুনর্বার ফুকা, মেল্‌তা ও মেল্‌তার

---

১ লোকসাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ।

২ প্রকাশক শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক। ১৩০৩ সাল।

পর অন্তরা রচনার নিয়ম। অন্তরা সমাপনে দ্বিতীয় চিতেন।......যে অক্ষরে চিতেনের শেষ হইবে, পর্-চিতেনের মিলও তাহার সমানাক্ষরে থাকিবে। ফুকার প্রথম ও শেষ পদে সমানাক্ষরে মিল। মেলতার শেষপদের সহিত মহড়ার শেষপদে সমানাক্ষরে মিল। খাদেও ঐরূপ মিল থাকিবে। খাদের পর যে দ্বিতীয় ফুকা ও মেল্‌তা থাকে, তাহার ও মহড়ার মিলের সহিত সমানাক্ষরে মিল।

কবিগানে বিবিধ বিভাগের গঠনগত বিষয় আমাদের আলোচ্য নয়। তথাপি শব্দ বিন্যাসের, ছন্দ গঠনের, গোটাগুটিভাবে সমগ্র প্রকাশভঙ্গির মধ্যে কি পরিমাণ কৃত্রিম বিধিনিষেধ ছিল, উদ্ধৃতাংশে সে পরিচয় স্পষ্ট। ভাষার কারিগরি এবং কথার কারসাজিতে এ কবিতায় আঘাত-প্রত্যাঘাতের আসরগড়া আদর্শই একমাত্র, কাব্যের উচ্চ ভাব ও সৌন্দর্যের গভীর রসপ্রত্যাশা এখানে বৃথা।

সরস্বতীর বীণার তারেও ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে ঝংকার দিতে হইবে আবার বীণার কাষ্ঠদণ্ড লইয়াও ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দে লাঠি খেলিতে হইবে!'[১]

এ উত্তেজিত আসরের সশব্দ বাহবাধ্বনির মধ্যে কাব্যের ললিত মাধুর্য দুর্লভ.

একে আমি শ্যাম-কলঙ্কী আছি কুলে।
এসে যমুনার কূলে, ভাবি কূলে কূলে,
যাই কোন্‌ কূলে, হাসে পাছে শত্রুকুলে,
আমি কুলের বৌ, ভাসি অকূলে :
তুমি হযে অনুকূল, রাখ রাখ কূল
নইলে দুকূল ডুবে যায অকূলে॥[২]

গেল গেল কুল কুল, যাক্‌ কুল--
তাহে নই আকুল।
লযেছি যাহার কূল, সে আমার প্রতিকূল॥
যদি কুলকুণ্ডলিনী অনুকূলা হন আমায
অকূলের তরী কূল পাব পুনরায॥
এখন ব্যাকুল হযে কি দুকূল হারাব সই।
তাহে বিপক্ষ হাসিবে যত রিপুচয়॥[৩]

'কুল' শব্দের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি। অথচ আসরগানের সশব্দ কলরবে শ্রোতৃচিত্ত উত্তেজনাবিবশ।

একে বাংলা শব্দের কোন ভার নাই, ইংরেজি প্রথামত তাহাতে অ্যাক্‌সেণ্ট নাই, সংস্কৃত প্রথামত তাহাতে হ্রস্ব-দীর্ঘ রক্ষা হয় না, তাহাতে আবার সমালোচ্য কবির গানে সুনিয়মিত

---

১ লোকসাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ। ২ কলঙ্কভঞ্জন, পরাণচন্দ্র সিংহ। ৩ লোকসাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উদ্ধৃত।

ছন্দের বন্ধন না থাকাতে এই সমস্ত অযত্নকৃত রচনাগুলিকে শ্রোতাব মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য ঘন ঘন অনুপ্রাসের বিশেষ আবশ্যক হয়। সোজা দেওয়ালের উপর লতা উঠাইতে গেলে যেমন মাঝে মাঝে পেরেক মারিয়া তাহার অবলম্বন সৃষ্টি করিয়া যাইতে হয়, এই অনুপ্রাসগুলিও সেইরূপ ঘনঘন শ্রোতাদের মনে পেরেক মারিয়া যাওয়া; অনেক নির্জীব রচনাও এই কৃত্রিম উপায়ে অতি দ্রুতবেগে মনোযোগ আচ্ছন্ন করিয়া বসে।'[১]

আব বাধার অভিমান কে সবে, বিনে কেশবে
হরি পরিহরি একি অন্যে সম্ভবে।।
আমি যে সেই গৌরবিণী, তারি গৌরবে।[২]

দৃষ্টান্তের শেষ পঙক্তি বৈষ্ণব পদাবলী থেকে ধারকরা। 'তোমার গরবে গরবিণী হাম রূপসী তোমার রূপে।' প্রসঙ্গ ও প্রকাশের ভাবগৌরব তৎসহ একনিষ্ঠ প্রেমের আর্তি, আলোচ্য অংশে বিন্দুবিসর্গও নেই। যমকের চপলতা ও চাতুর্যে শেষ পঙক্তির কবিভাবনা বিকশিত হতে পারেনি। পৃথক প্রেরণা ও উপস্থাপনায় হৃদয়ন্তর কত ভিন্ন।

এত বড় জ্বালা হল শুন গো ললিতে,
'রাই' বলে রাই করিছে রোদন
এই বসে কৃষ্ণের বামেতে।।
এত সুখে শ্রীমতীকে মনেব দুঃখ
কে দিল বুঝিতে নাবি।[৩]

'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।' অপূর্ব সংযমে প্রেমিক হৃদয়ের রহস্য প্রকাশিত। কবির কথায়, 'দীপশিখা সম কাঁপে ভীরু ভালবাসা।' আলোচ্য দৃষ্টান্তে রাধার বেদনা কথার বাচালতায় শ্রোতৃচিত্তে বিজ্ঞাপিত হতে পারেনি। প্রেমের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় দেবার কালে বৈষ্ণবকবি এ ভাবাবেশের দুর্জ্ঞেয়তা ও রহস্যটুকু রক্ষা করেছেন, শ্রোতাকেও এ বিষয়ে ভাবনার অবকাশ দিয়েছেন। কবিওয়ালার গান সেদিক থেকে একতরফা, এর শ্রোতা কেবল অনর্গল কথার মানেটুকু পেয়েই খুশি, আপন মনের দ্বারা পুনর্সৃষ্ট করার সুযোগ বা সময় তার নেই। কবিগানে তাই বাচ্যার্থ বড়, ভাব-তাৎপর্য গৌণ বিষয়।

তোমার কমলিনী, কাল মেঘ দেখে
কৃষ্ণ বলে ধরতে যায়,
....

---

১ লোকসাহিত্য, 'রবীন্দ্রনাথ। ২ সখীসংবাদ, হরুঠাকুর। ৩ প্রেমবোধক, বলহরি দাস।

দেখে বিদ্যুলতা কাল মেঘের সঙ্গে, কালাচাঁদ হে--
বলে পীতবসন, ওই সখি শ্যাম-শ্রীঅঙ্গে ;
যত গরজে জলধর, রাই বলে ধর গো ধর,
আমার বংশীধর, মোহন মুরলী বাজায়।[১]

এখানে ভ্রমাত্মক কোন অলঙ্কার নেই। রাধার উন্মাদদশায় এ ভ্রম বাস্তবিক। গদাধর মুখোপাধ্যায়ের 'মাথুর' অধ্যায়ে অনুরূপ বর্ণনা পাই। উভয়ক্ষেত্রেই সখীর কৌতূহল, উদ্বেগ, আশঙ্কা, সান্ত্বনা ইত্যাদি অভিধাকথার অতিরিক্ত সমাবেশে প্রকাশভঙ্গির সাঙ্কেতিক সূক্ষ্মতা নষ্ট হয়েছে। চণ্ডীদাসে নায়িকার এই একই বিরহমূর্তি, 'রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।.......সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে, না চলে নয়ানতারা। ...... ময়ূর-ময়ূরী কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।' রাধাচিত্তের কাতরতায় 'সূক্ষ্ম' অলঙ্কারের সৌন্দর্যব্যঞ্জনা। তথাপি সূচনাছত্রের রহস্য-বিস্ময়ে ভাবনামণ্ডল অনেক গভীর। শ্রোতৃহৃদয়ের অনুভবক্ষমতা এইভাবেই অবকাশ পায়।

তুমি কার প্রাণ করি দেহশূন্য এলে বাহিরে।
হেরে যেরূপো, বাসনা করে।।
করি পরিত্যাগ, আপনো প্রাণ, সেইখানে রাখি তোমারে।
পদার্পণে যে কমলে পূর্ণিতো করিলে বসুমতী।
জ্ঞানো হয় প্রাণ তেমনি।
নয়ন কটাক্ষে কুমুদো প্রকাশ পাইতেছে তব অম্বরে।[২]

প্রিয়তমের পদার্পণে বসুমতীতে কমল ফুটে উঠছে। 'যাহাঁ যাহাঁ অরুণ চরণে চল চলই।'—ইত্যাদি বিদ্যাপতির এ রূপাংশ কালিদাসের মেঘদূত থেকে নেওয়া,

রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কান্তঃ প্রত্যাসন্নৌ কুরুবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য।
একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদন-মদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ।।

অনুবাদসূত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—'অশোক শাখা উঠতো ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে।' বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস বিদ্যাপতি-বর্ণিত দেহশোভায় প্রেমের আবেশ সৃষ্টি করলেন,--

যাঁহা পঁহু অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত।।

১ বসন্ত, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য।
২ সখী সংবাদ, হরুঠাকুর।

যদি অনুকরণই করতে হয়, তবে পূর্বসূরীদের একাধিক প্রকাশভঙ্গির শ্রেষ্ঠ যেটি, সেইটি বেছে নেওয়া উচিৎ ছিল। কেবল ভাবের ব্যাপারে নয়, রূপের ক্ষেত্রেও বৈষ্ণব কবিতায় অন্তরের গাঢ় অনুভূতি-পরিচয়। কবিওয়ালার রূপাঙ্কনে যুগের চাহিদা পূরণের লক্ষণ।

কবিওয়ালার গানের পাত্রপাত্রী তিনজন। নায়ক, নায়িকা এবং সখী। বর্ণনীয় বিষয় দুটি, কলঙ্ক ও ছলনা। পরকীয় প্রেম সযত্নে গোপনীয়, তাতেই তার পবিত্রতা-রক্ষা, বৈষ্ণব কাব্য এ কথার প্রমাণ। কবিগানে নায়ক, নায়িকা অথবা দূতীর প্রগল্‌ভতায় প্রেমের সে সৌন্দর্য ও গভীরতা অনেক কমে গেছে। বিষয়টি বিচারের আগে দেখা যাক, প্রেমিক ও প্রেমিকা সম্বন্ধে কবিওয়ালার ধারণা কেমন। পুরুষের স্বরূপ,

> কমল ফুটায় হে প্রভাকর আদরে,
> পতি তার দিবাকর,
> জেনেও ত মধুকর
> ভুলেও ত্যজে না পদ্মেরে।[১]

নারীর স্বরূপ,

> নলিনী তপনে তেজিয়ে
> বনের পতঙ্গ, সে ভৃঙ্গ, তারে
> মধু বিতরয়।[২]

প্রণয়কথা যে বৈষ্ণব কাব্যে অবারিত ধারায় হৃদয়-রহস্যের বিচিত্র ছবি এঁকেছে, তাতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক অপরাধ হিসেবে অভিযুক্ত হয়নি। বরং সে প্রেমের সার্থক পরিণতির উদ্দেশ্যেই কবিমনের অকুণ্ঠ সমবেদনা।

> যাহে লাগি চলইতে চরণে বেঢ়ল ফণী
> মণি-মন্ত্রির করি মানি।
> গোবিন্দদাস ভণ কৈছন সো দিন
> বিছুরব ইহ অনুমানি॥[৩]

সখির মত সর্বদাই আনুকূল্য দিয়েছেন কবি। বৈষ্ণবকবির এ মনোভঙ্গি পরকীয়া তত্ত্বের এক আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ থেকে জন্ম নিয়েছিল। শিল্পের সঙ্গে ভক্তির মিলন ঘটেছিল বলেই বৈষ্ণবীয় প্রণয়বাদ লোকায়ত স্থূলতার স্পর্শ থেকে মুক্ত। পণ্য নয়, মহৎ হৃদয়-প্রেরণারূপে এ প্রেম জীবনের

---

১ বিরহ, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী। ২ সখীসংবাদ, রাম বসু। ৩ মাথুর, গোবিন্দদাস।

নিভৃত সঙ্কল্পের মধ্যে স্থান পেয়েছিল। কবিওয়ালার গানে বৈষ্ণবের আদর্শপ্রেরণা অনুপস্থিত। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-ঘটনার বস্তুগত খবরটিকে সর্বস্ব করে কবিওয়ালা আপন বাসনানুকূল ও পরিবেশযোগ্য ভাব রচনা করেছিলেন।

উত্তমেরে ত্যজ্য কোরে অধমে যতন।
নারী বারি, দুই জনারি,
নীচ পথে গমন॥
তার প্রমাণ বলি প্রাণ,. ....[১]

রাধাকৃষ্ণের নাম নিয়ে সরব প্রগল্‌ভতায় কবিয়াল প্রেমের ব্যভিচার অংশটি অকপট করেছেন। উন্নত হৃদয়দৃষ্টির আলোকে যে প্রেম একদা সমাজ-বহির্ভূত হয়েও সমাজ-স্বীকৃতি পেয়েছিল, কবিগানের অসংযত উচ্ছ্বাসের মধ্যেই তার স্তরচ্যুতি।

অতি নীচ যদি হয়, নিত্য ধন দেয় যেচে তারে সঁপে যৌবন।
তাহে কুৎসিতো কুজনা, নাহি বিবেচনা, স্বকার্য করে সাধন॥
কেবল অর্থেরই লোভো,
মৌখিকো সবো,
কহে যে প্রেমো কখন।
পীরিতি রসেরো, রসিকো নারী, সহস্রে মেলে একজন॥[২]

সহস্রে একজন ছাড়া বাদ বাকি সকলের পক্ষেই প্রেম হল, নরনারীর দেহ-সম্ভোগের ভালোনাম। প্রেম যে ভাবাকাশে ···্যের মত ক্রয়বিক্রয়ের বস্তু, সেখানে রূপে রেখায় প্রেমকথার মধ্যে শরীরী লুব্ধতার চটুল ইঙ্গিত থাকতে বাধ্য।

পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুনলো সজনি বলি তোমাকে॥
শুনেছ কখনো, জ্বলন্ত আগুণো, বসনে বন্ধনো, করিয়া রাখে।
প্রতিপদের চাঁদো, হবিষে বিষাদো, নয়নে না দেখে উদয়ো লেখে।
দ্বিতীয়ের চাঁদো, কিঞ্চিতো প্রকাশো, তৃতীয়ের চাঁদো জগতো দেখে।[৩]

কবিয়াল প্রেমের লক্ষণ বুঝিয়েছেন। 'জ্বলন্ত আগুন' এখানে বিকশিত যৌবন। জ্বলন্ত আগুন বসনে গোপন করার অসম্ভব প্রত্যাশার মত নবোদ্ভিন্ন যৌবন অগোচর রাখার ইচ্ছা ব্যর্থ। 'বসন' শব্দ ব্যবহারের দ্বারা

---

১ সখী সংবাদ, রামবসু। ২ সখী সংবাদ, হরু ঠাকুর। ৩ সখী সংবাদ, হরু ঠাকুর।

কবি নারী-শরীরের মাংসল রূপের প্রতি সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করেছেন, অথচ একই সঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখতে হচ্ছে, কবির বক্তব্য বিষয় 'পীরিতি' বা প্রেম। প্রকাশের কৌশলে কবি কি সূক্ষ্মভাবে হৃদয়ভাবকে এক লুব্ধ দেহসংবাদে পরিণত করলেন। এ রূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, 'জ্বলন্ত আগুন' নায়িকার লোভন দেহশোভার তাৎপর্য অতিক্রম করে নায়কচিত্তের দুর্বার কামতাপকে সঙ্কেত করে দিয়েছে। দ্বিতীয় বক্তব্য হৃদয়গত পীরিতির ভাব। নায়ক-নায়িকাব প্রেম হৃদয়ের অদৃশ্য অঙ্কুর থেকে প্রকাশ্য পল্লবশোভায় রূপবান। গোচর অথবা গোপন, যাই হোক না কেন, তার অস্তিত্ব যে ঐ মৃদুবৃদ্ধি চন্দ্রকলার মতই সত্য, সে ইঙ্গিত সার্থক উপমানে প্রকাশিত।

কবিওয়ালার দৃষ্টিতে প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয় দর্শন করা গেল। নায়ক-নায়িকার এ জাতীয় চিত্তস্তরকে মানদণ্ড করে প্রেমের যে রূপচ্ছবি রচিত, সেখানে নিষ্ঠার পরিবর্তে ছলনা এবং ভাব-শুচিতার পরিবর্তে কলঙ্কের কথা বড় হওয়াই স্বাভাবিক।

কবি সঙ্গীতে বিশুদ্ধ দেহবর্ণনার অংশ খুব কম। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের দেহরূপ অগণিত ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করে পদকর্তা তাঁর বর্ণনীয় পাত্রপাত্রীকে প্রথমে শোভা-সৌন্দর্যের অনন্যতা দিয়েছেন। আর সেই অতুলনীয় মানুষদুটির প্রেম-বৈচিত্ত্য সেই কারণে (কতকাংশে) বারোয়ারী রুচির মালিন্যমুক্ত হয়ে ভাবের এক অসামান্য লোকে উত্তীর্ণ। কবিওয়ালার প্রেমকথায় দেহশোভা বর্ণনাব ধৈর্য নেই। মুখর কলঙ্ক-কথা এবং হৃদয়-ছলনার অভিযোগে অভিযুক্ত চরিত্রগুলি যেন সরাসরি আসরে হাজির। প্রেম যেখানে হৃদয়ের পণ নয়, সদাগরি পণ্যের মত যার সুলভ কেনাবেচা চলে, সেখানে দেহ ঘিরে উচ্চাঙ্গের কোন রূপ-কল্পনা না থাকাই স্বাভাবিক। অবশ্য দু'এক ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমও দেখা যায়,

> ও কি অপরূপ দেখি শুনি।
> পৃষ্ঠেতে লম্বিত ধরণী সম্বিত কিংবা ফণী কিংবা বেণী।
> অলক বেষ্টিত কনকে রচিত সীঁথি কিম্বা সৌদামিনী।
> তার অধোদেশে অন্ধকার নাশে সিন্দুর কি দিনমণি।
> খঞ্জন যুগল নয়ন চঞ্চল কি সফরী অনুমানি।
> কিবা বিধুবর কি মুখ সুন্দর কিছুই না জানি।।[১]

---

১ সখী সংবাদ, লালু নন্দলাল।

পূর্ণাঙ্গ দেহবর্ণনার অংশমাত্র সংগৃহীত। উপমেয়-উপমানের তুল্য সংশয় থাকায় রূপের পরিধি বিস্তৃত। আহৃত উপমাগুলি প্রথাবদ্ধ। নায়কের রূপবর্ণনা,

সই, সজল নবজলদ বরণ, ধরি নটবর বেশ।
চরণ উপরে থুয়েছে চরণ
এই কি রসিক শেষ॥
চন্দ্র চমকে চলিতে চরণ নখরের ছটায়।
আমার হেন লয় মনো, জীবনো যৌবনো
সঁপিব ও রাঙ্গা পায়॥১

চতুর্থ ছত্রের অনুপ্রাসে গতিশীল চরণের চকিত রূপচ্ছটার আভাস। অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে পদনখের রূপমাধুরী চন্দ্রের উপমানে পূর্ণ বিকশিত। আসলে, শব্দালঙ্কার অনুপ্রাসের সহায়তায় অর্থালঙ্কার অতিশয়োক্তি আপন রূপপ্রকাশের অতিরিক্ত শক্তি পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে আর একটি রচনাংশ উদ্ধৃত করি,

মুখপদ্মো নীলপদ্ম আঁখি।
আঁখিপদ্মো বহে জল, মুখ শতদল,
ভাসিছে দেখ গো সখী।
আমরা এ পথে আসি যাই, এমন রূপ দেখি নাই
কমলের জলে কমল ভেসে যায়।
তোরা দেখে যা গো সখী হল এ কি দায়
তোরা দেখ ওই প্রাণসই, এ ত বারি নয় অনল
শ্রীমুখ-কমল শুখাল বল করি কি উপায়।২

পঞ্চম ছত্রের আলঙ্কারিক প্রকাশভঙ্গি দৃপ্ত ও মনোহর। 'কমলের জলে কমল ভেসে যায়।' পূর্বগামী ছত্রগুলির অলঙ্কার-বিবৃতি উক্ত ছত্রে সংহত হয়েছে। পরবর্তী (শেষ) তিন ছত্র সখীর প্রগল্‌ভ উদ্বেগ-কথায় তরল। কবিওয়ালাদের আলঙ্কারিক রচনার সাধারণ ত্রুটিই এই। অভিধাকথার প্রগল্‌ভতা রূপের ঘনীভূত ব্যঞ্জনাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তরল করে। ফলে রূপের ব্যঞ্জনা আটপৌরে জীবনের অতিসন্নিহিত হয়ে লৌকিক আকার পায়।

১ সখীসংবাদ, হরু ঠাকুর।
২ সখী সংবাদ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

দেহরূপ-বর্ণনা তৎসহ নায়ক-নায়িকার তৎকালীন মনোভাবের ব্যঞ্জনা-ধর্মী কয়েকটি দৃষ্টান্ত,

রাই, তোমার ঐ চরণতলে
দেখ কালো মানিক কেমন জ্বলে
সূর্যকান্ত মণির কোলে
যেমন নীলকান্ত।
রক্তশতদলে
ভ্রমর যেমন খেলে
পায় তেমন মানিক দ্বলে এইক্ষণে।১

রাইএর অনুগত কৃষ্ণের শোভাবর্ণনার দুটি ছবি। সূর্যকান্ত মণির কোলে নীলকান্ত মণি। রক্তশতদলে লীলাচপল ভ্রমর। কিন্তু লক্ষণীয়, অলঙ্কারের রূপগোচর শক্তিকে গৌণ করে সখির সাধারণ উক্তি অনেক বেশি উচ্চকণ্ঠ। আসলে গানের সুরে, তালে, লয়ে, কণ্ঠস্বরের কৌশলে, মীড়-গমকের লীলায় রূপের ত্রুটিগুলি যত সহজে পূরণ হয়, কবিতার বিশুদ্ধ অনুভব-ভূমিতে তাদের বিচার করলে শোভার তারতম্য ঘটবেই। সঙ্গীতের কারসাজিতে এ সব অযত্নে-গড়া অসংযত উচ্ছ্বাস উপস্থিতমত একটা রমণীয়তা পেয়েছিল। সুরভ্রষ্ট হওয়ার ফলে অস্ত্রহীন সৈনিকের মত রচনাগুলি অনেকাংশে নিরর্থক। আর একটি উদ্ধৃতি,

আমার নাগরো, গিয়েছিলেন কাবে
কলঙ্ক সাগর মথিতে।
ফুরায়ে মন্থনো, এনেছেন নিশানো,
আঁখির অঞ্জনো গলাতে।।২

পৌরাণিক কাহিনীকে বিপর্যস্ত করে নায়িকার 'খণ্ডিতা' রূপনির্মাণে কবি আপন বাসনানুকূল রূপ-চিত্র গঠন করেছেন। নায়িকার মৃদু অভিযোগের আড়ালে নায়কের রূপলক্ষণ প্রকাশিত। এখানে 'অঞ্জনে' হলাহলের ব্যঞ্জনা। সমুদ্র-মন্থনের প্রতিচ্ছায়ায় কৃষ্ণের এ কলঙ্ক-কথা রচিত। অভিধা-বাক্যের চপলতা না থাকায় উপমার সঙ্কেত গভীর হয়েছে।

যাহারো লাগিয়ে নিশি করিলে প্রভাত।
ওই সই সেই প্রাণোনাথ।।
প্রভাতের অরুণ সহ উদয় আসি
বঁধুর হোয়েছে অরুণো আঁখি নিশি জাগরণেতে।৩

১ সখী সংবাদ, উদয়চাঁদ। ২ সখী সংবাদ, রাসু-নৃসিংহ। ৩ সখী সংবাদ, হরু ঠাকুর

এখানেও খণ্ডিতার ছবি। উদয়সূর্যের রক্তাভার সঙ্গে সদ্যপ্রত্যাগত 'পরঘরিয়া' নায়কের নিশিজাগরণক্লান্ত রক্ত আঁখির উপমেয়-উপমানগত সাদৃশ্য-আয়োজন প্রস্তুত ছিল, কেবল কথাকে সংযত করে তার সঙ্কেতময়তা বাড়াতে পারলেই এটি সুন্দর উপমায় পরিণত হতে পারতো। কিন্তু, কলঙ্ক-কীর্তি রূপাঙ্কিত করা নয়, আসরের মাঝখানে রটনা করাব উদ্দেশ্য কবিওয়ালার। বৈষ্ণব পদাবলীর সদৃশ রচনা-পরিস্থিতি স্মরণযোগ্য। আর একটি দৃষ্টান্ত,

> বিহারচ্ছলে কদমতলে দেখাব তোমারে,
> তার চরণে চরণে ছাঁদা বঙ্কিম নয়ান
> হেরি জুড়াবে পরাণ।
> তার কালো অঙ্গে শোভা করে বিন্দু বিন্দু ঘাম॥১

কৃষ্ণরূপের কথা। বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি বর্ণনা, 'চপল চরণ-গতি লোচন পাব।' যৌবনাগমে শরীরী চঞ্চলতা স্থানান্তরিত, বিদ্যাপতিতে তারই মনস্তাত্ত্বিক রূপরচনা। কবিওয়ালা বলেছেন, চরণের চপলতার বাস্তব লীলা প্রকাশের সঙ্গে নয়নের চপলতায় হৃদয়ভাবের লীলা প্রকাশিত। প্রণয়ীর পার্থিব গতিবিধি এবং হৃদয়ের ভাবভঙ্গি একযোগে সঙ্কেতিত। আর একটি উদ্ধৃতি,

> হর নহি হে, আমি যুবতী।
> কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি॥
> . ...
> হায়, শুন শম্ভু অরি, ভেবে ত্রিপুরারি
> বৈরি হও না আমার।
> বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিত কেশা,
> নহে নহে এ তো জটাভার॥
> কণ্ঠে কালকূট নহে,
> দেখ পোরেছি নীলরতন।
> অরুণো হোলো নয়ন,
> কোরে পতিবিরহে রোদন॥
> এ অঙ্গ আমারো, ধূলায় ধূসরো,
> মাখি নাই মাখি নাই বিভূতি।২

১ সখী সংবাদ, লালু নন্দলাল। ২ সখী সংবাদ, রাম বসু।

পুরাণ মন্থন করে কবি বাসনানুকূল চিত্র রচনা করেছেন। বৈষ্ণব গানে এরই পূর্বরূপ বর্তমান। ললিত মৈথিল ছন্দে সে পদ হৃদয়ের মিনতিমাখা আবেগের অপূর্ব কাব্যরূপ। সমালোচ্য অংশে চল্‌তি কথার উৎপাত খুব বেশি। 'কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি' ইত্যাদি কথা কাব্যের লক্ষণবর্জিত। আর এগুলি অকারণে ইতস্তত সন্নিবেশিত থাকায় ভাবপ্রবাহ বহুস্থানেই ছিন্ন। হয়ত গানের সুরে এ সব স্থানে শব্দে ও বাক্যাংশে কিছুটা দোলা সৃষ্টি করা সম্ভব, কিন্তু পাঠ্য কবিতার আলোকে এদের ব্যঞ্জনা প্রায় শূন্য। অথচ এ জাতীয় শব্দ, বাক্যাংশ ও পূর্ণ বাক্যের অজস্র আয়োজনে কবিওয়ালার রূপাঙ্কন। অবশ্য আমরা স্মরণ রেখেছি, পাঠমূল্য অথবা আবৃত্তিমূল্যের চেয়ে সাঙ্গীতিক মূল্যের প্রতি বেশি নজর দিয়ে এগুলি লেখা। কোনরকমে কথা বেঁধে ভাল করে গাইতে পারাতেই এদের সার্থকতা। কবিআখ্যাধারী হলেও আমাদের আলোচ্য কবিরা যত বড় গীতকার, তত বড় কবি নন।

কবিওয়ালার দৃষ্টিতে প্রেমের আদর্শ ও মূল্যের সূচক কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করি,

দেশ চলালেম প্রেম করে সই,
প্রাণ গেলে বাঁচি।
বিচ্ছেদ বিষে, লোকের বিষে,
আমি দুই জ্বালাতে জ্বল্‌তেছি।।[১]

বিরহিণীর কাতর আর্তি অনুপস্থিত, জীবন সম্বন্ধে ছদ্ম বিতৃষ্ণার নাগরালি স্পষ্ট। প্রেম যে জীবনের একটা বৃত্তিমাত্র, অনন্য আদর্শ নয়, কবিওয়ালার নায়িকার আক্ষেপবাণীতে তার পরিচয়। আর এই মানদণ্ডেই হৃদয়ভাবের সবটুকু-লীলাকলা নির্ধারিত।

পীরিতি নগরে বিষমো সখি,
মনোচোরেরো সে ভয়।
বসতি ইহাতে দায়।।
নয়নে নয়নে সন্ধানো,
মনো অমনি হরিয়ে লয়।
সন্ধানো করিয়ে মনোচোর,
ভ্রমিছে নগরময় ২

১ সখী সংবাদ, রাম বসু। ২ সখী সংবাদ, নিত্যানন্দ বৈরাগী।

নায়িকা তাই নায়ককে সম্বোধন করে বলে,

তুমি হে চোরা বোম্বেটে।
নবদ্বারের কপাট কেটে
কোন রমণীর যৌবন লুটে
বঁধু ছুটে এলে প্রভাতে।
তোমার বাঁশটি যেন সিঁধেলের কাটি
কাটে অনায়াসে সিঁধেলের মাটি।
জানা আছে।১

সখীকে সম্বোধন করে নায়িকা বলে,

সখি ঐ মনোচোরো মোরো,
মনো লয়ে যায়।
কেমনে গো প্রাণ সখি, ধরিব উপায়।।
আঁখিরো অন্তরো হোতে অন্তরে লুকায়।২

প্রেমের প্রথম পর্বে হৃদয়ের যে লুকোচুরি, স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে তার পরিচয়,

কমল কম্পিতো পবনে।
অলি কাতরো প্রাণে।।
. ...
হায় যেদিকে নলিনী হেলে,
মধুকরো ধায়।
পবনেতে বাদো সাধে,
বসিতে না পায় পায়।।
হায়, গুন্ গুন্ স্বরে কাঁদে অলি, অধোবদনে।
ধারা বহিছে অলির দুটি নয়নে।।
অলিরো দুর্গতি দেখি হাসে তপনে।৩

সখীও কৃষ্ণপ্রেমের রহস্য জানার জন্যে ব্যাকুল,

কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি, রাধায় কর উদাসিনী,
সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও।।৪

১ সখী সংবাদ, হরু ঠাকুর। ২ সখী সংবাদ, নিত্যানন্দ বৈরাগী। ৩ সখী সংবাদ, নিত্যানন্দ বৈরাগী। ৪ সখী সংবাদ, হরু ঠাকুর

প্রেমের এই বেসাতিতে কবিওয়ালার কল্পনা গড়া। দৃষ্টান্তগুলির কোথাও কোথাও আলঙ্কারিক রূপপরিচয় আছে, ভাবের গভীরতাও ক্বচিৎ মেলে, কিন্তু সব মিলিয়ে এ যেন দুশ্চরিত্রের প্রণয়লীলা,

আমার কাজ কি আর সতী নামে,
মন যেন তোমার প্রেমে,
সদাই রয় হে।
বলে বলবে কলঙ্কিনী হে।
ছলের জল নিতে এসে
না পারি কর্মদোষে,
তবে কালামুখ দেখাব শেষে
কেমন করে॥
....
তাই বলে কি কৃষ্ণনিধি,
সৃজিলে চিন্তাজ্বর ব্যাধি,
আনতে মহাজন ঔষধি
ছিদ্র ঘট দিলে॥১

বৈষ্ণবী নায়িকাও কলঙ্কের কণ্ঠহার পরেছিলেন, কিন্তু প্রেমের অপমান সহ্য করেন নি। নীরব অশ্রুজলে কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেও কোন মুহূর্তেই হৃদয়বল্লভকে বিস্মৃত হননি। কবিয়ালের নায়িকা বঞ্চনাটুকু অকাতরে সহ্য করে যেন নায়ককে তিরস্কারের দুর্লভ সুযোগ পেয়ে গেছেন,

আমার প্রেম ভেঙ্গে প্রাণ, কার প্রেমে মজেছ।
এমন রসিকা নারী কোথা পেয়েছ॥
বদন তুমি কথা কও হেসে, প্রাণ বুঝি আভাসে।
তুমি ভালবাস কি সে ভালবাসে॥
তুমি যেমন কি সে তেমন, দুই দুজনে মিলেছ॥২

অবশ্য দু'এক স্থানে কবিওয়ালার রচনায় ব্যতিক্রমও পাওয়া যায়,

হায় পীরিতিরো কিবা সৌরভো আছে,
সে সৌরভো মম অঙ্গে রয়।
কলঙ্ক পবনে লইয়ে সে বাসো,
ব্যাপিলো জগতোময়।৩

---

১ কলঙ্ক ভঞ্জন, ভবানীচরণ বণিক। ২ সখী সংবাদ, রাম বসু। ৩ সখী সংবাদ, হরু ঠাকুর।

কলঙ্কের বাতাসে প্রেমের সৌরভ ছড়ালো। উপমাটি মনোজ্ঞ। চিত্ররসে উত্তেজনা কম।

রাধা যে চিরন্তনী নায়িকা, তার সম্পর্কে মাতৃত্ব-কল্পনা যে রোমান্টিক ভাবাষঙ্গকে ধ্বংস করে উৎকট রসাভাস সৃষ্টি করবে, এ ধারণা বৈষ্ণব কবিদের নিশ্চয়ই ছিল। সুর-রসের সাম্যরক্ষার জন্যে প্রশ্নের দ্বারা এ সংশয়-কণ্টক তীক্ষ্ণ করে তুলতে তাঁরা চাননি। বাচাল কবিওয়ালার সে সংযম নেই। তিনি সরাসরি সখিকে প্রশ্ন করে বসেছেন, কোন সদুত্তর মেলেনি, তবু নায়িকার সেই অবাঞ্ছিত সম্ভাবনাটিকে আসরে উচ্চকণ্ঠে বিজ্ঞাপিত না করলে যেন রসোপভোগ পূর্ণ হচ্ছিল না,

কও দেখি সখি রাধারে কেন,
মা বাপা কেউ বলে না।
শ্রীমতী বটে সজনি, প্রকৃতিরূপে প্রধানা।।
যদি ভাবি মনে মা বলি বদনে,
জড় হয় তার রসনা।[১]

বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্ব অনুযায়ী হ্লাদিনী পরিচয়েই রাধাচিত্তের প্রকাশ। প্রসঙ্গভ্রষ্ট হবার ভয়ে কোনদিনই সেই নায়িকা সম্বন্ধে অসঙ্গত জিজ্ঞাসার কৌতূহল বৈষ্ণব কবি মনে রাখেন নি। কিন্তু পল্লবগ্রাহী কৌতূহল নিয়ে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতির সব সীমা ছাড়িয়ে গেছেন কবিওয়ালা। মুক্তকণ্ঠ কবিয়াল যেখানে কুৎসা-কলঙ্কের লজ্জাকর বিষয়কে সুরে, তালে, ছন্দে, রূপে রসানুকূল করে তোলে, সেখানে একটি জুগুপ্সিত ভাবাটে রাধার মাতৃত্বের প্রশ্ন অনুক্ত রাখাই অসঙ্গত হত। বৈষ্ণব পদসাহিত্যের সুলভ সংস্করণের মত কবির গান ভাবের বাতাসকে কেবল দূষিতই করেছে। বৈষ্ণবীয় প্রেম-কবিতায় দুর্বলতার যেটুকু আভাস ছিল, তারই প্রসঙ্গবিচ্ছিন্ন, অষ্টাদশ শতাব্দীর রুচিশীলিত, এক অতিশয়িত (magnified) প্রকাশ দেখি কবিওয়ালার হাতে। এবার নায়িকার বিরহমূলক কয়েকটি দৃষ্টান্তের আলোচনা করব,

আজু সখি একি রূপ
নিরখিলাম হায়।
নীর মাঝে যেন স্থির
সৌদামিনী প্রায়।।

১ সখী সংবাদ, নিত্যানন্দ বৈরাগী।

ঢেউ দিও না কেউ
এ জলে বসে কিশোরী।
দরশনে দাগা দিলে
হইবে সই পাতকী।।১

সই দেখ দেখি শোভা, কিসের আভা
হেরি জলের মাঝেতে।
প্রস্ফুটিত তমাল বৃক্ষ যাবো কালো
ঐ ছায়া কি ইথে।।২

আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি
ঐ কালোরূপ দেখি,
সেই দিকে দেখি, উপায় করি কি.
আঁখি ছলে আমার মন ছলে।।৩

অঙ্গ দহে অঙ্গহীন জন।
ছি ছি নাথো বিনে কি লাঞ্ছন।।
হর কোপে যার তনু হয়েছে দাহন্।
সে দহিছে বিনে প্রাণনাথ।
করহীনে করে করাঘাত।।
এ সব লাঞ্ছনা হতে বরঞ্চ ভালো মরণ।।৪

দেখে এলাম শ্যাম, তোমার বৃন্দাবন ধাম,
কেবল নাম আছে।
তথা বসন্ত ঋতু নাই, কোকিল নাই, ভ্রমর নাই,
জলে কমল নাই, শুধু রাইকমল ধূলায় পড়ে রয়েছে।৫

দেখলাম যমুনার কূলে
যতসব সখিগণ মিলে
রাইকে লয়ে কূলে
ভেসে যায় নয়ানের জলে।
তবে শ্রীরাধিকার নয়নজলে
কুলনদীর জোয়ার হয়েছে।।৬

---

১ সখী সংবাদ, রাম বসু। ২ ঐ। ৩ কৃষ্ণলীলা, ভীমদাস মালাকার। ৪ সখী সংবাদ, রাম বসু। ৫ উদ্ধব সংবাদ, সাতু রায়। ৬ মাথুর, সারদা ভাণ্ডারী।

দৃষ্টান্তগুচ্ছে রাধাবিরহের বিচিত্র অবস্থার কথা। উপমাক্রিয়া উদ্ধৃতির সর্বাঙ্গে নেই। প্রকাশভঙ্গির চাতুর্য তেমন প্রখর নয়। এ অংশে রাধাহৃদয়ের বেদনা কিছুটা ঘনীভূত। শেষের দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। 'শ্রীরাধিকার নয়নজলে, কূলনদীর জোয়ার হয়েছে।' কুলপ্রথার সরল ধারা মানুষের সংস্কারের মধ্যে আশ্রয় নেয়। আদর্শের আদেশপালনের কালে এই কুলপ্রথা নায়িকার হৃদয়েরই একটা বড় বাধা। বিরহদশায় অশ্রুর মূল্য দিয়ে নায়িকা সেই কুলের মমতা কাটাতে পেরেছে। তাই কুলনদীতে জোয়ার এল। কুলের বৈরী ধারা জোয়ারে বিপরীতমুখী হল।

কবির গান ভাবের বাতাস দূষিত করেছে সত্যি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভাবের একটি পথও খুলে দিয়েছে। পান-বেচা 'কৃষ্ণ পান্তী'র দল যে যুগের জমিদার-ভূস্বামী, সেখানকার সভায় পূত অথবা দূষিত হৃদয়ভাবের সমস্যা নিয়ে কারুর মাথাব্যথা নেই। বড় কথা হল, মুখোশের ঘটা-ছটায় মুখশ্রীটুকু যতটা গোপন করা যায়, জমজমাট আসরখানিকে মাতোয়ারা করে তোলা যায়। বৈষ্ণবীয় প্রেমের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতা অথবা মঙ্গলকাব্যলোকের নীতিশাসিত ঘরোয়া প্রেমের ছবিতে তখন অরুচি ধরেছে। এই ভাবাকাশেই নতুন হৃদয়ভাবের জন্ম,

এসো নূতন্ প্রেম্ করি, প্রাণে বাঁধা রেখে প্রাণ।
বাখ্‌বো হৃদয় মন্দিরে বেঁধে প্রেমডোরে,
প্রেমের প্রহরী থাক্‌বে আমার দুনয়ান।।
....
....
যাতে মন দিলে মন পাই,
হাতে রেখে হাতে যাই,
যেন কেউ কারে হান্‌তে নারে বিচ্ছেদ বাণ।।[১]

বৈষ্ণবীয় প্রেমকাব্যে শ্রীরাধার বিরহ অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাবপাত্রে প্রতারণার স্মৃতিরূপে সংগৃহীত। ফলে এ কালের 'নূতন প্রেমে'র নতুন নায়ক-নায়িকা যথেষ্ট সতর্ক। 'হাতে রেখে হাতে যাই; যেন কেউ কারে হান্‌তে নারে বিচ্ছেদ বাণ।' এমন হাতে রেখে প্রেম করার গানই কবির গান।

এমন ভাব্ রাখা ভাব্ কোথায় শিখিলে।
সে ভাব্ কোথা হে, যে ভাবে ভুলালে।।

১ রাম বসু

ভাব দেখি নব ভাবে, কি ভাবে ছিলে।
ভাবে ভাবে কোরে ভাবান্তর,
এখন তার অভাবে ভাবালে ॥

প্রথার পাশমুক্ত প্রেমকল্পনার এই পথেই নতুন রূপশোভার জন্ম। প্রথম অধ্যায়ে নিধুবাবুর গানের ইমেজে অসহিষ্ণু শিল্পীর প্রতিবাদ লক্ষ্য করেছি। অব্যবহিত পরবর্তী উনবিংশ শতাব্দীতে প্রেমকল্পনায় যে সততা ও স্বাধীনতা দেখা দিল, তাতে ইমেজ সৃষ্টির ক্ষেত্রে শক্তি ও সাহসের পরিচয় মুদ্রিত। কল্পনার সততা ও সাহসেই মধ্যযুগীয় উপমালোকের রূপান্তর।

কবি সঙ্গীতে ভবানীবিষয়ক কিছু গানও পাওয়া যায়। সেগুলির আলোচনায় বিরত হলুম। কেননা সে অংশের রূপরচনা ও ভাবগঠন আরও অকিঞ্চিৎকর। কিছুটা শ্লীলতাদুষ্ট হলেও কবির গান বিশেষ কোন তত্ত্বাশ্রয় অথবা দৈবানুগত্যের শাসন থেকে মুক্ত। এর ফলেই অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে, বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে নিধবাবুব গানে সত্যিকারের গীতিকবিতা জন্মলাভ করল। শিল্পসৃষ্টিতে কবি সঙ্গীত যে স্তরের গৌরবই পাক না কেন, নিরপেক্ষ মানবপ্রেমের গীত-উৎস এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের উদয়াভাস হিসেবে এর ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকৃত হবে।

গ্রন্থনাম

ব্যক্তিনাম